পঞ্চম বর্ষ

বৈশাখ, ১৩৪২

বৈশাখ হইতে চৈত্র সংখ্যা

প্রতিষ্ঠাত্রী

শ্রীলীলাবতী নাগ এম্-এ

সম্পাদিকা

শ্রীবীণাপাণি রায় এম

কার্য্যালয়—২৩নং ওয়ার

জয়শ্রী

সূচীপত্র

১৩৪২ সন, বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা

জয়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ, নাই শব্দ সুর,
মহাতৃষ্ণা মরুতলে মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর,
সে মহা নৈঃশব্দ্য মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

আস্ফালিছে লক্ষলোল ফেন-জিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা,
তরঙ্গ-তাণ্ডবী মৃত্যু কোথা তার নাহি হেরি সীমা ;
সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকার পথে
আবর্ত্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে,
দুর্গম রহস্য ভেদি সেথা উঠে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যবালে
বর্ষিয়া বিদ্যুৎবিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল,
নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

চিত্তের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ
আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে মুক্তির দ্বার রোধ
অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

পঞ্চম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪২ | প্রথম সংখ্যা

অস্পৃশ্যতা-কার্য্যে মালাবার-ভ্রমণ

শ্রীউর্ম্মিলা দেবী

সময়টা এযোড়া জেলে মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনের মাস দুই পর। দেশের মাথার উপর তখনও গুরুবায়ুর মন্দিরসমস্যা ঝুল্‌ছে। সমস্ত ভারতবর্ষ শঙ্কাকুল চিত্তে চেয়ে আছে মালাবার প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের এই বিখ্যাত মন্দিরের দিকে। হঠাৎ একদিন মহাত্মাজীর কাছ থেকে তার পেলাম "অস্পৃশ্যতা কাজে মাস দুইএর জন্য মালাবার যেতে পার কি? সম্ভব হ'লে শীঘ্র রওনা হ'য়ে এস।" তারটি পেয়ে আনন্দও হ'ল আবার মনটি নানা চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

ভারতবর্ষের ঐ দিকটাই তখন দেখা বাকী। যে দেশ দেখিনি, যেখানকার মানুষদের সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়নি বিশেষ করে যাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে হ'বে বিদেশী ভাষায়। সেখানে গিয়ে কতটা কি করে উঠ্‌তে পারব ভেবে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌লাম। এসব কাজে বড় বড় সভায় বক্তৃতা কর্‌তে হয়। নিজের ভাষায় সভায় বক্তৃতা করা এক রকম অভ্যাস করে ফেলেছিলাম। কিন্তু বিদেশী ভাষায় হাজার হাজার লোকের মনের দ্বারে ঘা দিতে পারব কি? তাছাড়া এসব বিষয়ে জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, একই ধরণের কথায় সকলের প্রাণ স্পর্শ করা যায় না। কাউকে শুষ্ক যুক্তি তর্ক দিয়ে কারু কাছে প্রাণের মর্ম্মস্পর্শী ভাষা নিয়ে যেতে হয়। কেউ বোঝে বুদ্ধির ভাষা

কেউ বোঝে প্রাণের ভাষা। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশবাসীদের মনোভাব ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য মধ্যে পার্থক্য আছে। এইসব চিন্তায় কাতর হ'য়ে পড়লাম। নিজের উপযুক্ততা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে এত বড় কাজের ভার মাথায় তুলে নেব?

মনটা বড়ই বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেল। সে দিনটা কাটিয়ে পরদিন তারের উত্তর দিলাম, "আপনার ইচ্ছাই আমার পক্ষে আদেশ—কিন্তু কথা আছে চিঠি লিখ্‌ছি।" চিঠিতে নিজের মানসিক অবস্থা সবই লিখে দিয়ে জানালাম, তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত মাথায় পেতে নেব। পত্র পাঠ আবার তার এল, "রওনা হও—সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" এরপর আর চিন্তার কারণ রইল না। আজ ১২।১৪ বছরের নিবিড় সম্বন্ধের ভেতর দিয়ে আমার অন্তর বাহির সবই তাঁর কাছে মুক্ত। তিনি যদি বলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে' তবে তাঁর আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। ২।১ দিনের মধ্যে তাঁর চিঠিও এল। প্রথম পুণা হ'য়ে তাঁর উপদেশ নিয়ে তবে যেতে হবে। আমার শরীর খুব ভাল ছিলনা ব'লে আমার পুত্রকে সঙ্গে নিতে লিখলেন—"জিতেন তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারব।'

২১শে নবেম্বর তারিখে বি এন আর বম্বে মেলে রওনা হ'য়ে, ২৩ শে সকালে কল্যাণ জংশনে গাড়ী বদল ক'রে বেলা ১১½টায় পুণা পৌঁছলাম। কল্যাণ জংশনে গাড়ীতে উঠে অহমদাবাদের আম্বালাল সারাভাই এর পত্নী শ্রীমতী সরলা বেনের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি তার ৩৪ জন সঙ্গিনী নিয়ে পুণা যাচ্ছিলেন, মহাত্মাজীর সঙ্গে অস্পৃশ্যতাকাজ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলার জন্য। কল্যাণ হ'তে পুণা পর্য্যন্ত পথটি এতই রমণীয় যে অনেক বার এ পথে আসা যাওয়া করা সত্ত্বেও এ দৃশ্য আমি বড়ই উপভোগ করি। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এ পথে যেতে আস্‌তে একদিকে গর্ব্বে অন্য দিকে ব্যথায় আমার মন ভ'রে ওঠে। পথের এই পার্ব্বত্য দৃশ্যের মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি—স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে যাই। মহারাষ্ট্র-গৌরব বীর শিবাজীর চিত্রে দেখা তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে! তাঁর প্রিয় অশ্ব যেন সেই বীর মূর্ত্তি পিঠে করে সেই গভীর অরণ্য ভেদ করে পার্ব্বত্য পথে আজও ছুটে চলেছে! এক এক সময়ে মনে হয় অশ্ব ক্ষুরের শব্দও যেন কাণে এসে বাজে! হায়! সেই অতীত আর এই বর্ত্তমান! অতীত স্বপ্ন জীবনে অনেক দেখি, আবার ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্নও দেখি! এর কূলও নাই কিনারাও দেখিনা। যাক্—

পুণা ষ্টেশনে পৌঁছে দেখ্‌লাম খাদিপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় ষ্টেশনে হাজির, মহাত্মাজীর আদেশমত তিনি এসেছেন আমাদের নাবিয়ে নিতে। তাঁর সঙ্গে আমরা লেডী থ্যাকার্সে'র "পর্ণকুটিরে" (সত্য কথায় প্রাসাদে) উপনীত হ'লাম। এখানে এসে দেখলাম শ্রীমতী সরলা বেন ও তাঁর সঙ্গিনীরাও এখানে অতিথি। সতীশ বাবুর মুখে শুনলাম পুণায় ৫ দিন থেকে ২৭শে তারিখ মালাবার অভিমুখে রওনা হওয়ার ব্যবস্থা হ'য়েছে। আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাই এই তাঁর ইচ্ছা। ভারতবর্ষের

যে প্রান্তেই তিনি থাকুন, ট্রেণ থেকে নেবে তাঁর দর্শন না হলে আমি কখনও জল গ্রহণ করিনি। কিন্তু তিনি এখন জেলে, ইচ্ছামত দশবার যাওয়াআসা করার উপায় নেই। বিশেষ করে তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার সাধ্যাতীত!

বেলা দুইটার সময় আমি সতীশ বাবু ও জিতেন তাঁর কাছে গেলাম। তার তখন বেলা বারটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যতা কাজে লোকজনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল। এই দেখাশোনার ব্যাপারে জেল কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল না। মহাত্মাজী নিজের ইচ্ছামত দেখা করার অনুমতি দিতেন। তিনি এ সময়ে একমাত্র অস্পৃশ্যতা কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করতেন না। জেল কর্ত্তৃপক্ষের চোখে ধূলা দেওয়া তবু সম্ভব—কিন্তু গান্ধীজিকে ফাঁকী দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাই গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বিবাদে তার হাতেই এ ভার দিয়েছিলেন। আমরা জেল গেটে পৌঁছে নিজেদের নাম লেখা কাগজ পাঠিয়ে দেওয়ার অল্পক্ষণ পরেই ভেতর যাওয়ার অনুমতি এল। মহাত্মাজীর ইয়ার্ডের দরজা পার হয়ে প্রাঙ্গণে দাঁড়াতেই মহাদেব (দেশাইটা উহাই রইল—কারণ তার সঙ্গে আমার মাতাপুত্র সম্বন্ধ) সহাস্য মুখে এসে প্রণাম করে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করল। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মনটা ক্লিষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। বারম্বার দীর্ঘকালব্যাপী কারাভোগ করে করে সে যেন এর মধ্যেই প্রবীণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রদীপের শিখার মতই যেন তার মুখের জ্যোতিঃ! কারাক্লেশে শরীর তার যতই শীর্ণ হক, মুখে আনন্দের জ্যোতিঃ বেড়েই চলেছে! তাই তখনই মনে হ'ল ক্লিষ্ট হই কার জন্য!

মহাত্মাজী তাঁর সেই বিস্তীর্ণ আম্রবৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসে শ্রীযুক্তা সরলাবেন ও তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন। তাঁরা সেই দিনই ৪টার ট্রেনে আহমেদাবাদ ফিরে যাবেন তাই তাঁদের সঙ্গে কথা শেষ করা দরকার! কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই পিঠে সশব্দে একটা চড় পড়ল! এটাই তাঁর সব চেয়ে আন্তরিক অভ্যর্থনা। ছোট ছোট শিশুদের পিঠে কীল ও কাণমলা তাঁর অন্যতম অভ্যর্থনা। এ নিয়ে আমাদের অনেক হাসাহাসি হয়। আমি সর্ব্বদাই তাঁকে বলি, "আপনার কীল চড় গুলি মোটেই unviolent নয়"—তিনিও শুনে হাসেন। তিনি যখন কারু সঙ্গে কথা বার্ত্তায় ব্যাপৃত থাকেন—তখন অন্য কারু সঙ্গে একটাও কথা বলতে ভালবাসেন না। এ কথা আমি জানি বলেই প্রণাম করে একান্তে গিয়ে মহাদেবের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলাম। তিনটার সময় সরলা বেনরা উঠে বিদায় নিলেন। তারা একেবারে ষ্টেশনে চলে যাবেন। তাঁরা গেলে আমাদের ডেকে সর্ব্বপ্রথম কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন। আমার কাজ সম্বন্ধে সেদিন আর বিশেষ্‌ কথাবার্ত্তা হ'ল না। বল্লেন, "তুমি এখানে ২৮শে পর্য্যন্ত বিশ্রাম কর। আমি তোমার সব বন্দোবস্ত করে তবে তোমায় পাঠাব। এ কয়দিন রোজ এখানে আসবে। আমি সময় করে তোমায় সব কথা বুঝিয়ে দেব।" ৪টার সময় আমরা চলে এলাম। যে কয়দিন ছিলাম বেলা বারটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত তাঁর কাছে থাকতাম। ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে লোক প্রত্যহ

তাঁর কাছে আসত অস্পৃশ্যতাকার্য্যে আদেশ ও উপদেশ নেওয়ার জন্য। এ কয়দিনে মহাদেবের কাছে অনেক সংবাদ পেলাম। এত কাজের মধ্যেও আমার সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে তার ব্যবস্থার জন্য নানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখ্ছেন। ২।১ খানা চিঠি চোখেও দেখ্লাম! তাতে খাওয়া দাওয়ার কথা থেকে মায় মশারীর কথা পর্য্যন্ত—আবার আমার শরীর ভাল নয় হার্ট দুর্ব্বল—যথেষ্ট বিশ্রামের ব্যবস্থার কথা পর্য্যন্ত সব আছে। এ সব দেখে শুনে লজ্জায় যেন আমি মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম। এ সব খুঁটি নাটি কথা নিয়ে তিনি তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করছেন! কিন্তু মহাত্মাজীর মহত্ব ঐ খানে। ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রকেও তিনি ক্ষুদ্র মনে করেন না।

একদিন মহাদেব গম্ভীরভাবে আমায় বল্লে, "তুমি যে কত বড় দায়িত্ব নিয়ে সেখানে যাচ্ছ তা তোমায় বলি। যখন এই কাজের জন্য উত্তর ভারত থেকে কোন নারী কর্ম্মীকে পাঠাবার আবেদন মালাবার থেকে আসে তখন আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। ১০।১২ জনের নাম উঠেছিল কিন্তু বাপু অনেক চিন্তা করে তোমার নামই ঠিক করেন। দেখো যেন বাপুর মুখ রক্ষা হয়।" আমি বললাম, "বাপুর কাজ ভগবান করবেন—আমি নিমিত্ত মাত্র।" যে কথা আমার মুখ দিয়ে সেদিন বেরিয়ে গেল, তা যে কতদূর সত্য তা মালাবারে প্রতিদিন প্রতি পদক্ষেপে বুঝেছিলাম।

২৭শে তারিখ বিকেল ৪½ টার সময় মাদ্রাজ এক্সপ্রেসে পুণা থেকে রওনা হই। আগের দিন মহাত্মাজীর কাচ থেকে মালাবার, সেখানকার অধিবাসীদের ও সে দেশের অস্পৃশ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শুনে ও কার্য্যসম্বন্ধে উপদেশ নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আমরা বিদায় নিলাম। প্রণাম করতেই তিনি পিঠে হাত রেখে বল্লেন, "God be with you" সেই স্পর্শে যেন আমার সমস্ত শরীরে তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল। মনে বসে কে যেন বলে উঠল, "আর ভয় নেই।" চলেছি অজানা দেশে, পথ ঘাটও চিনি না, মানুষ জনও চিনি না। অথচ এদেশেই দুমাস কাল কাটাতে হবে, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ স্থাপন করে এদের সঙ্গে কাজ কর্তে হবে! কিন্তু মন তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। বেশ মনের আনন্দেই পথ চলা সুরু হল। পরদিন বেলা ৫½ টায় মাদ্রাজ সহরে গাড়ী আসল। দেখি ষ্টেশনে শ্রীযুত রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার ও কয়েক জন বন্ধু বান্ধব উপস্থিত। এ সব ব্যবস্থা মহাত্মাজীই করেছেন।

ব্রিটিশ মালাবারের প্রধান নগর কালিকটই আমাদের প্রথম গম্য স্থান। ২৯শে সেখানে পৌঁছিতে হবে। সুতরাং সেই দিনই রাত্রি ৮টার সময় "মাঙ্গালোর এক্সপ্রেসে" আমাদের রওনা হতে হবে। ষ্টেশনে মালপত্র রেখে, ওয়েটিং রুমে বেশ করে স্নান করে নিয়ে, শ্রীযুত রঙ্গস্বামীর গাড়ী করে আমরা মাদ্রাজ সহর ঘুরে এলাম। মাদ্রাজের সমুদ্রতীরটি বড় সুন্দর! শুন্লাম পৃথিবীর মধ্যে এর স্থান তৃতীয়। কিন্তু সমুদ্র এখানে বড় শান্ত, পুরীর মত ঢেউএর খেলা এখানে দেখা যায় না। পথে শ্রীযুত রঙ্গস্বামীর বাড়ী নেবে কিছু জলযোগ করে ষ্টেশনে ফিরে এলাম।

তাঁর চেষ্টায় রেল কর্ত্তৃপক্ষ আমার খুব ভাল বন্দোবস্ত করে দিলেন। রাত্রিতে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে কাটালাম। খুব ভোরে "কফি" "কফি" ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একটা খুব বড় জংশনে গাড়ী থেমেছে। ৩।৪ জন তামিল ব্রাহ্মণ পেতলের পাত্রে অতি উষ্ণ তৈরি কফি নিয়ে ছুটাছুটি কর্‌ছে। একজনকে ডেকে দুপাত্র কফি ফ্লাস্কে ভরে নিলাম। বেশ বড় এক পাত্র কফি মাত্র এক আনা, জিনিষটি সত্যই উপভোগ্য। পরে অনেক বার দেখেছি শ্বেতাঙ্গিনী যাত্রীরাও রেষ্টোরার চা ফেলে এই "ব্রাহ্মিণ কফির" জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই ষ্টেশনটির নাম "পোদ নোড়"। নীলগিরি যাওয়ার পথ এই খান থেকে ঘুরে গিয়েছে। অপর প্লাটফর্ম্মে নীলগিরি মেলও এসে দাঁড়িয়েছে। এ দেশে এই প্রথম পদার্পণ তাই সবই যেন নতুন মনে হল। পরে দুমাসে সব জায়গাই চেনা হয়ে গিয়েছিল। ঘুরে ফিরে অনেক বারই একই রাস্তায় যাতায়াত কর্‌তে হয়েছে। এ লাইনে অনেক বড় বড় জংশন আছে। বেলা ৮½ টায় আর একটা বড় জংশনে গাড়ী থামল। এখান থেকে "কোচিন ষ্টেট রেলওয়ে" আরম্ভ হয়েছে। এ ষ্টেশনের নাম "শোর নোড়।"

ব্রিটিশ মালাবারে কাজ সেরে আমরা এই ষ্টেশনে ফিরে এসে পরে কোচিন রাজ্যে প্রবেশ করেছিলাম। বেলা এগারটার সময় আমাদের ট্রেণ "কালিকাট" ষ্টেশনে প্রবেশ করল। গাড়ী থামবার আগেই দেখ্‌তে পেলাম, ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। ট্রেণ আস্‌তেই দেখি মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুত রাজা গোপালাচারীকে অগ্রে নিয়ে বহু নরনারী ষ্টেশনে সমবেত। ট্রেণ থেকে নাবিয়ে শ্রীযুত রাজা গোপালাচারী অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে দক্ষিণ কানাড়ার নেতা শ্রীযুত সদাশিব রায় ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। আমরা মহাত্মাজীর এক প্রিয় শিষ্য, সেখানকায় একজন গুজরাটি চাউলব্যবসায়ী শ্রীযুত শ্যামজী সুন্দর ভাই এর বাড়ীতে অতিথি হ'লাম। তাঁর গৃহটি সহরের বাইরে বেশ খোলা জায়গায় বলে এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সহরবাসী অনেকেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এখানে এলেন। তাঁদের মুখে শুনলাম সেই দিনই বিকাল পাঁচটার সময় টাউন হ'লে বিরাট সভার আয়োজন হ'য়েছে—সেখানে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে। শুনে যে আমার চক্ষু স্থির! স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ হ'লনা—কর্ম্মীদের সঙ্গে কোন রকম ভাবের আদান প্রদান হ'লনা—তায় তিন দিন অবিশ্রান্ত পথ চলে শরীর অবসন্ন! এঅবস্থায় কার বক্তৃতা আসে? তাও আবার বিদেশী ভাষায়; হায় ভগবান! এ কি পরীক্ষায় ফেল্‌লে আমায়! কিন্তু মুখে কিছু বলার উপায় নেই। শুধু বিনীতভাবে তাঁদের বুঝিয়ে বল্লাম, "প্রথম প্রথম আমার হয়তো অনেক গলদ হ'বে, আপনারা ক্ষমা ক'রে নেবেন। ইংরেজী ভাষায় কথা বল্‌তে পারি বটে কিন্তু বক্তৃতা কখনও করিনি। তবে ক্রমে অভ্যাস হ'য়ে যাবে"।

"সেজন্য কোন ভাবনা নেই সব ত্রুটি আমরা সেরে নেব"। শুনলাম এখানকার

সাধারণ লোকেরা ইংরেজীও বুঝবেন না। খানিকটা ক'রে আমি বলব—একজন তর্জ্জমাকারী তা "মালায়লম" ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন। আবার আমি খানিকটা বলব। ব্যাপার যে কি দাঁড়াবে বেশ বুঝতে পারলাম। যতক্ষণ তর্জ্জমাকারী আমার কথার তর্জ্জমা করবেন—আমার ভাবের ও ভাষার সেই তত্ক্ষণ নিশ্চয় হারিয়ে যাবে এবং পরে যে আমি বাক্যহারা হ'য়ে পড়ব সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহও আমার মনে রইল না। কিন্তু ৺ভগবান ভরসা ও মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ পাথেয় করে যখন কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছি তখন আর ফেরার উপায় নেই।

গুরুবায়ু সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুত কেলাপ্পান তখন কালিকাট সহরে আছেন। ঠিক হ'ল পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সভায় যব। কথাবার্ত্তায় ও স্নানাহারে বেলা গড়িয়ে গেল। একটু বিশ্রাম করেই রওনা হওয়া গেল। হ'লে প্রবেশ করে দেখি সভায় তিলধারণের স্থান নেই। আমি তখন মনে মনে জপ করছি, মহাত্মাজীর শেষ কথা "God be with you" এবং মানসিক সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে বলছি, "God is with me"— আমি সেদিন সভায় কি বলেছিলাম কি করে ছিলাম তার কিছুই আমার মনে নেই। আমি জানতাম প্রথম দিনকার impression এর ওপরই ভবিষ্যত কাজের সফলতা নির্ভর করবে। আমার বলার আগে একটি মহিলা কিছু বল্লেন। তিনি একজন গ্রাজুয়েট ও স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। আমার বলার পরে শ্রীযুত কেলাপ্পন কিছু বল্লেন। দুজনেই নিজদের ভাষায় বল্লেন, আমার শুধু মনে আছে আমি ব'সে প'ড়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "Shall I do" (আমাকে দিয়ে কাজ হবে তো), তিনি একটু হেসে বল্লেন, "Yes, you will do very well" (হ্যাঁ, বেশ ভাল কাজই হ'বে) আমার মন আশ্বস্ত হ'ল।

এখানে মালাবার দেশটা সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বেনা। ভারতের মানচিত্রের দক্ষিণ পশ্চিমে গোকণম থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত দেশটি মালাবার নামে অভিহিত। এর প্রাচীন নাম কেরল প্রদেশ। মালাবারের অধিবাসীরা এখনও তাঁদের দেশটিকে "কেরালা" ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন। যদিও মালাবার আজ মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত, কিন্তু মাদ্রাজের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে মালাবারের প্রভেদ। ওয়েষ্টার্ণ ঘাট্স্ (western ghats) নামক গিরিমালা যেমন মালাবার ও তামিল তেলেঙ্গ রাজ্যের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃজন করেছে তেমনই এই দুই স্থানের অধিবাসীর চেহারা থেকে আরম্ভ করে, তাদের পোষাক আচার ব্যবহার মনোবৃত্তি ইত্যাদি সবই সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। প্রকৃতির রূপেও অনৈক্য। মালাবার বাঙ্গলা দেশের মত শ্যামলা। মাদ্রাজের অন্যান্য সমস্ত স্থান শুষ্ক ও ধূসরবর্ণা। মালাবারের অধিবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস তাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অধিকাংশই বাঙ্গলা দেশ থেকে এসে এখানে বসবাস করেছিলেন। প্রাচীন কিম্বদন্তী আছে,

এই ভারতবর্ষের এই স্থান কিছু পূর্ব্বেও সাগরে নিমজ্জিত ছিল। অগস্ত্য পুত্র পরশুরাম তার বাণের সাহায্যে একে উত্তোলন করেন। এবং পরে অন্যান্য স্থান হ'তে সকলে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। একথা কত দূর সত্য তা জানা সম্ভব নয়, কিন্তু মহাসাগরে ঘেরা এই রমণীয় স্থানটি দেখে স্বতঃই মনে হয় সাগরের কোলেই এর জন্ম। ব্রিটিশ মালাবার, দক্ষিণ কানাড়া, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য নিয়ে এই কেরল প্রদেশ বা মালাবার। মালাবারের উত্তরে কানাড়া। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে ওয়েস্টার্ণ ঘাট্‌স্ দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভারত মহাসাগর ও আরব্য মহাসাগর।

এখানে প্রকৃতি দেবী ঐশ্বর্য্য সম্ভারে রাজরাণী। "আমাদের কেয়ালা প্রকৃতির প্রিয় শিশু বলে দেশবাসীরা গর্ব্ব করেন। তাঁদের এ গর্ব্ব বৃথা নয়। আমি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত অবধি ভ্রমণ করেছি কিন্তু কাশ্মীরের পর এমন দেশ আর দেখিনি। বাঙ্গলা দেশের মেয়ে আমি তাই বোধহয় এর শ্যামল কান্তি আমায় মুগ্ধ করেছিল। আমার দু'চোখ যেন জুড়িয়ে যেত। বাঙ্গলা দেশের শোভা তার শ্যামরূপ। কিন্তু এখানে প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়ী। একদিকে মহাসাগরের অসীম সৌন্দর্য্য অন্য দিকে গিরিমালার বিরাট সৌন্দর্য্য। মাঝে সাগর কন্যা Black waters এর শান্ত সৌন্দর্য্য। এই black waters কোচিন বন্দর দিয়ে দেশের বুকে প্রবেশ ক'রে, সহজ অবাধ গতিতে সমস্ত দেশটার বুকের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। এর রূপেই বা কত বৈচিত্র্য! কোথাও স্বল্প পরিসর, কোথাও দীর্ঘ, কোথাও বা নদীর মত সুদীর্ঘ রূপ নিয়ে কোথাও শান্ত, কোথাও লীলা চঞ্চল হ'য়ে, দুই দিক শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করে দিয়ে আপন মনে চ'লে গিয়েছে। যেন মা অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণ স্নেহভরে, দুই হস্তে অন্ন বিতরণ ক'রতে ক'রতে আনন্দময়ী রূপে, ও অবাধ গতিতে পথ চলেছেন। দুই তীরে ঘন বিন্যস্ত নারিকেল বৃক্ষের কি অপূর্ব্ব শোভা! না দেখ্‌লে বোঝা যায় না। মালাবারের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হ'লে এই black waters এ মধ্যদিয়ে নৌকা ক'রেই যেতে হয়। আজ কাল মোটর বাসের চল হ'য়ে এই আনন্দ থেকে জন সাধারণকে বঞ্চিত কর্‌ছে। এদেশে চাল ও নারিকেলের চাষই বেশী। একজন গ্রাম্যগৃহস্থের দশটি নারিকেল গাছ থাকলে সমগ্র পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হ'য়ে যায়' নারিকেল তৈল রান্নায় ব্যবহার হয়—নারিকেল মালা, শুষ্ক নারিকেল, ও বহু পরিমাণে রপ্তানী হয়। আর এক প্রকার কলা মালাবারের নিজস্ব। তাহারও চাষ খুব। কলাগুলি প্রায় এক হাত লম্বা ও খুব মোটা। এই কলা মালাবার দেশবাসীর অত্যন্ত প্রিয় খদ্য। তাহারা এই কলা পাকা তো খায়ই কাঁচা অবস্থায় রেঁধে খায়, আধপাকা অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ক'রে সেদ্ধ ক'রে খায়। এটা আতিথ্য সৎকারের একটি প্রধান উপকরণ। এই কলা ভজ্জিত হ'য়ে প্রায় প্রত্যেক দোকানে কাঁচের আবরণে সজ্জিত থাকে। আর বস্তা বোঝাই হ'য়ে বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী

হয়। এই কলা নিয়ে বহুবার বিপদে পড়েছি। আমাদের কাছে এই কলার স্বাদ বড়ই অপ্রীতিকর ছিল। কিন্তু সে কথা এক গৃহস্থের বাড়ীতে একবার ব'লে যে অপ্রস্তুত হয়েছিলাম তা বলার নয়। এই কলার নিন্দা কোন মালাবারী সহ্য ক'রতে পারে না। তাদের মুখগুলি মুহুর্ত্তে মলিন হ'য়ে যায় ও ব্যথায় চোখ দুটি ছল ছল ক'রতে থাকে। আমি একবারের অভিজ্ঞতার পর আর কখনও ও কথা উচ্চারণ করিনি। বিশেষ ক'রে আতিথ্যের উপকরণ সামান্য বা অপ্রীতিকর হ'লেও তার সঙ্গে প্রাণের যে একাগ্রতা ও মধুরতার স্পর্শ থাক্‌ত তাতে তাদের প্রাণে ব্যথা দিয়ে নিজেই ব্যথিত হ'তে হ'ত। মালাবারের লোকদেয় মধ্যে যে সরলতা, মধুরতা, ও প্রেমের আদর্শ দেখে এসেছি তা আর কোথাও দেখিনি। আমাদের পুরাকালের যে আতিথ্যের গল্প মাঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তার আস্বাদ পেয়ে এসেছি সেই মালাবারে। তাই মালাবারের স্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় অমর হ'য়ে থাক্‌বে।

পূর্ব্বে বলেছি ব্রিটিশ মালাবার, কোচিন রাজ্য, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, ও দক্ষিণকানাড়া নিয়ে এখনকার মালাবার বা কেরল প্রদেশ। ব্রিটিশ মালাবার—ব্রিটিশ-শাসিত। তবে মাসহারাভোগী একজন রাজা যিনি জামেরিণ (Jamarin) নামে খ্যাত—এখনও আছেন। পূর্ব্বে যখন কেরল প্রদেশ এক রাজার অধীন ছিল, তখন রাজার খেতাব ছিল, "সামুদ্রিপাদ"। বর্ত্তমান "জামোরিণ" কথা তারই অপভ্রংশ। বর্ত্তমান জামোরিণের রাজপ্রাসাদ আছে, মাসহারা আছে কিন্তু রাজ্য শাসনের কোন স্থান নেই। বিখ্যাত "গুরুবায়ুর মন্দির" এই ব্রিটিশ মালাবারেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ব্রিটিশ মালাবার দশটি মহকুমায় বিভক্ত। কোচিন রাজ্যের যে অংশটুকু ব্রিটিশ অধিকৃত তাও এই দশ মহকুমার মধ্যে। একজন কলেক্টর এই দশটি মহকুমার দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা। এঁর হেড কোয়াটার কালিকাটে। এঁর অধীনে অনেক বিভাগ ও অনেক কর্ম্মচারী আছেন। এই ব্রিটিশ মালাবারের লোক সংখ্যা ৩৫,৩৩,৯৪৪ এর মধ্যে শতকরা ৩৭জন মোপলা (মুসলমান)...শতকরা ২৮ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী শিক্ষিত। ইহার পরিসর ৫৭৮৭ বর্গ মাইল। কোচিন রাজ্য...ব্রিটিশ মালাবারের দক্ষিণ থেকে কোচিন রাজ্য আরম্ভ রাজ্যের পশ্চিমে বিখ্যাত কোচিন বন্দর। মহারাজা শ্রীরামবর্ম্মা ইহার বর্ত্তমান অধীশ্বর। ইনি ১৯৩২ সালের ১০ই মে গদী আরোহণ করেন। এই রাজ্য "মারমাকাচারম্‌ আইন" দ্বারা অনুশাসিত। এই আইনে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী। পুত্র কন্যা কেহ নয়। এই হিসাবে কোচিন রাজ্যে পরিবারের সংখ্যা ১৫১ নর ও ১৪১ জন নারী। রাজ্য-শাসনের জন্য দেওয়া আছেন ও শাসন নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা পরিষদ আছে। ইহার অধিকাংশ সভ্য প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত। এই নির্ব্বাচন নরনারী নির্ব্বিশেষে হয়। কোচিনের লোকসংখ্যা কমবেশ ১২,৩৪,২৩৫ (১৯৩১ সালের গণনায়)। এ দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষক ব্যবসায়ী রাজ্যে অনেক বনানী ও এগুলি নানা রকম দামী কাঠের জন্মস্থান। চা, কফি, রবার ও

প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সাউথ ইণ্ডিয়ন রেলওয়ের বড় জংশন শোরনোড় নামক ষ্টেশন থেকে কেচিন ষ্টেট রেলওয়ে আরম্ভ হয়েছে। বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর "কোক্‌জেম" (Co-co-gem) ফ্যাক্টরী কোচিন ষ্টেটের "আরনাকুলাম" Ernaculum সহরে স্থাপিত। এই সহরটি কোচিন বন্দরের সন্নিকটবর্ত্তী।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। এই রাজ্য কোচিন রাজ্যের দক্ষিণ থেকে আরম্ভ হ'য়ে কন্যাকুমারী (Cape Comorin) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এর পরিসর ৭৬২৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা (১৯৯১ এর গণনায়) ৫,০৯৫,৯৭৩এর মধ্যে ৩১৩,৪৮৮৮ জন হিন্দু, ১৬০৪,৪৭৫ জন খ্রীস্টান, ও ৩৫৩,২৭৪ মুসলমান। রাজ্যের উত্তরাধিকারীর "মারমাকাচারন্‌" আইন দ্বারা শাসিত। মহারাজার পুত্রকন্যা বর্ত্তমান থাকলেও বর্ত্তমান ভাগিনেয় গদীর উত্তরাধিকারী। এজন্য ভগ্নি না থাকলে, বা নিঃসন্তান গত হ'লে পোষ্য ভগ্নি লওয়ায় প্রথা আছে। অবশ্য ভগ্নি নিঃসন্তান পুত্রহীন হ'লে তিনিই পোষ্যপুত্র গ্রহণ ক'রে থাকেন। বর্ত্তমান মহারাজা এইরূপ পোষ্যভগ্নীর পুত্র। ভুতপূর্ব্ব মহারাজার ভগ্নী না থাকায় বা নিঃসন্তান অবস্থায় গত হওয়ায় তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী লাভের জন্য দুইটি ভগ্নী গ্রহণ করেন। দুই ভগ্নী পোষ্য লওয়ার তাৎপর্য্য যে যদি একজন নিঃসন্তান হ'ন বা গত হন তবে রাজ্য উত্তরাধিকারীহীন না হয়ে অন্য ভগ্নী দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হ'বে।

এ দুই ভগ্নীই বর্ত্তমানে বড় (সিনিয়ার) মহারাণী ও ছোট (জুনিয়র) মহারাণী নামে পরিচিত। মহারাজার ভগ্নিগণ ভবিষ্যত রাজমাতা হিসাবে মহারাণী আখ্যা পান। মহারাজার দুই ভগ্নীর বিবাহ এক সঙ্গেই দেন। ছোট মহারাণীর ভাগ্যক্রমে তিনিই আগে পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রই বর্ত্তমান মহারাজা। বৃদ্ধ মহারাজার মৃত্যুসময় বর্ত্তমান মহারাজা নাবালক ছিলেন। তখন রাজ্য পরিচালনার জন্য বড় মহারাণী regency পান। এই মহিয়সী মহিলার Regencyর সময় "ভাইকম সত্যাগ্রহ" ত্রিবাঙ্কর রাজ্যে আরম্ভ হয়। তিনি কিরূপ বিচক্ষণ ও সহৃদয়তা দ্বারা এর পরিসমাপ্তি করেছিলেন তা বোধহয় সকলেই জানেন, ত্রিবাঙ্করের দুর্ভাগ্যক্রমে ইনি রাজ্য থেকে বহুদূরে সরে গেছেন। এঁর পুত্র সন্তান হয়নি—দুই কন্যা। কিন্তু উভয় কন্যাই ছোট মহারাণীর কন্যা অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা। ছোট মহারাণীর কন্যার বিবাহ গত বৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। এখন ইনি পুত্রবতী হলেই ছোট মহারাণীর বংশ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য কায়েমী হয়ে যাবে। ইনিই এখন প্রর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ রাজমাতা।

মহারাজারা যাদের বিয়ে করে নিয়ে আসেন তারা মহারাণী আখ্যা পান না। এরা এবং এদের সন্তানসন্ততিরা মহারাজার সামান্য প্রজার সামিল। রাজমাতারাও মাঝে মাঝে আসেন যান—এই পর্য্যন্ত। পতি পত্নীর কোন নিবিড় সম্বন্ধস্থাপনের সুযোগ এদের জীবনে হয় না। এখানেও দেওয়ানই রাজ্য শাসন করেন। তবে শাসন-

নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থাপক সভা আছে। তার উপর শ্রীমূলস পচ্ছলার এ্যাসেম্বলি আছে। এই সব সভার সভ্যসাধারণ প্রজাদ্বারা নির্ব্বাচিত। মহারাজার নামাঙ্কিত ৩।৪ রকম মুদ্রাও এখানে প্রচলিত কিন্তু আমরা ব্রিটিশ মুদ্রাই বেশী প্রচলন দেখেছি। এদেশে 'অন্তল' বলে পোষ্টাল সার্ভিস আছে এবং মহারাজার নামাঙ্কিত ডাক টিকিটও দেখেছি। এখানে চা, দারচিনি, গোলমরিচ, রবার, কাজুবাদাম, নারিকেল তৈল বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও রপ্তানী হয়। নানারকম দামী কাঠের বনানীও এ রাজ্যে আছে। শিক্ষার প্রচলন এখানে খুব বেশী।

দক্ষিণ কানাড়া—ব্রিটিশ মালাবারের উত্তরে ও উত্তর কানাড়ার দক্ষিণে স্থাপিত। বাস্তবিকই কেরল প্রদেশে ইহার স্থান সত্যই হওয়া উচিৎ কি না সে বিষয়ে চিন্তার কথা আছে। ব্রিটিশ মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটে একই ভাষা (মালায়লম্) চলিত। কিন্তু দক্ষিণে কানাড়ার কোঙ্কনী নামে ভাষা চলিত। ইহা এরকম মারাটি ভাষার অপভ্রংশ। এদেশবাসীদের আচার ব্যবহার ও বেশ ভুষা মারাটিদেরই মত। মনে হয় যেন জোর করে একে বোম্বাই প্রদেশ থেকে কেটে নিয়ে মাদ্রাজ প্রদেশে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে কফি, গুড়, চন্দন, তেল, কাজুবাদাম ইত্যাদি উৎপন্ন ও রপ্তানী হয়।

ক্রমশঃ

অষ্টম্ হেনরির নীল রক্ত

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী, পণ্ডিচেরী

জ্যোৎস্নার বাবা সাবেক-কালের অভিজাত মানুষ, এবং সেরকম লোকদের সচরাচর যা হয়—মনটাও তাঁর ভারি সাদাসিদে। কিন্তু কৌলীন্য-গর্ব্বে একেবারে আকণ্ঠ মগ্ন। ওঁর স্থিরবিশ্বাস, উচ্চবংশের লোকের স্বভাবচরিত্র অতি উচ্চ-স্তরের না হয়ে পারেই না। তাই জ্যোৎস্নাকে যখন বিলাত পাঠালেন, অভিভাবক ঠিক করে দিলেন এক প্রাচীন বংশের অশীতিপর প্রাচীনকে এবং বিশেষ করে বলে দিলেন যেন একটু কষ্ট করে দেখেশুনে রেণুকে কোন মার্জ্জিতরুচি সদ্বংশজাতা মহিলার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়—যেখানে সে ঘরের মেয়ের মত যত্ন পাবে এবং ভদ্রপরিবারের ভদ্র ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে ইংলণ্ডের কাল্‌চারটুকু সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে দেশে ফির্‌তে পার্‌বে। তারজন্যে খরচপত্র একটু বেশী হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু রেণু যেন নিম্নশ্রেণীর লোকের কবলে না পড়ে। বৃদ্ধ হ্যালিডে সাহেব উত্তরে লিখ্‌লেন যে মেয়ের জন্যে চাটার্জ্জির কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা কর্‌বার দরকার নেই।

প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা জ্যোৎস্নার মোটের উপর ভালই।

হ্যালিডে-বাড়ীর সবচেয়ে ছোট ছেলে, ষোলবছর বয়সের শান্তদর্শন রবার্ট-ওরফে ববী, ভিক্টোরিয়ায় একা দাঁড়িয়েছিল। জানালা থেকে জ্যোৎস্নার উদ্বিগ্নমুখ প্ল্যাটফর্মে উঁকি দিতেই কাছে গিয়ে নম্রভাবে বল্‌লে, পিতার আদেশে সাউথ কেনসিংটনে নিজেদের বাড়ীতে ওকে নিয়ে যেতে এসেছে। দেখেশুনে জ্যোৎস্নার মনে হল এ যেন ঠিক এক কল্‌কাতা থেকে আর এক কল্‌কাতায় আসা। এই যদি বিলাত, তবে লোকে এত ভয় পায় কেন এর নামে?

---

* য়ুরোপ-প্রত্যাগত তরুণীরা য়ুরোপ সম্বন্ধে গল্পাদি লিখুন এ ইচ্ছা এযুগে কার না হয়? কিন্তু জ্যোতির্ম্মালার আগে আমাদের এ ইচ্ছা কোনো তরুণীই পূর্ণ করেন নি। ইনি ইতিমধ্যে য়ুরোপ সম্বন্ধে চার পাঁচটী গল্প লিখেছেন ও তা অনেক রসজ্ঞেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সবারই খুসি হবার কথা, যেহেতু এঁর গল্পে আছে শুধু যে গাল্পিকতা তাই নয়, আছে তার চেয়ে বড় জিনিষ ওদের দেশকে বোঝবার ও আঁকবার দুর্লভ ক্ষমতা, কেবলমাত্র ওপর ওপর আঁকা নয় ওদের দেশের "মনের পরশ"। এ যুগে সাগর পারের বিদেশী ও বিদেশিনী এসেছে কাছে—তার ফলে আমাদের কার মন না হয়ে উঠেছে বিচিত্র? আমার দৃঢ় বিশ্বাস জ্যোতির্ম্মালা দেবীর লাবণীল ভাষার নিপুণ তুলিতে আঁকা হাসি ব্যঙ্গ আশা বেদনা ভরা ওদের দেশের ছবি দেখে সবাই তাঁকে করবেন অভিনন্দন। 'নীলরক্ত' হচ্ছে blue blood ইংরাজীতে বলে। কটাক্ষ হচ্ছে অভিজাতদের রক্তও আলাদা রঙের, লাল নয়, নীল। ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরির ছিল ছয়টি স্ত্রী ও এছাড়াও নানান্ উপসর্গ ইতিহাসে বলে। তাই গল্পটির নামও মনে হয় সবাই উপভোগ করবেন।

বাড়ী পৌঁছতেই বৃদ্ধা হ্যালিডে গৃহিণী এসে অতি যত্ন করে হাত ধরে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। দু'চারটি সাধারণ কথাবার্ত্তার পর—যদিও কর্ত্তা সেখানে বসেছিলেন তবু তাঁর হয়ে মিসেস্ হ্যালিডে বল্লেন, "তোমার জন্যে আমরা নর্থ-ওয়েষ্ট অঞ্চলে বাড়ী ঠিক করে রেখেছি।"

—"বাবা যেরকম চান সেরকম তো? শিক্ষিত, ভদ্রবংশ?—"

—"তাতে সন্দেহ নেই, কি বল হ্যারি? ঠিক নয়কি?"

হ্যালিডে বল্লেন—"নিশ্চয়ই। যদিও আমরা তাঁদের চিনি না, কিন্তু বিস্তর চিঠি লেখালেখি হয়েছে যে—এই দেখুন না মিস্—"

জ্যোৎস্না সবিনয়ে বল্লে—"আমাকে জ্যোৎস্না বলেই ডাক্‌বেন আপনি—"

মিসেস্ হ্যালিডে জিজ্ঞেস কর্লেন—"তোমার বাবা 'রেণু' লেখেন কেন? তোমাদেরও দু'তিনটে নাম থাকে বুঝি যেমন আমাদের—ইসাবেল লুসি মেরায়া—ধরণের?"

জ্যোৎস্না হেসে বল্লে,—"না—আমার ভালো নাম জ্যোৎস্না-রাণী, রেণু শুধু ডাক-নাম—"
"ওঃ বুঝেছি, এই যেমন রবার্টকে আমরা 'বব্—ববী' বলে ডাকি—বুঝেছ, হ্যারি? আদরের নাম। কিন্তু তুমি যাঁদের বাড়ীতে যাবে আজ খাওয়াদাওয়ার পর, তাঁদের কাছে শুধু একটা নামই ব্যবহার করো—তোমার বাবাকেও তা-ই করতে বোলো।'

হ্যালিডে বল্লেন—"তারপর কি বল্‌ছিলাম শোন। 'রীড্ বাক্‌লিরা' থাকে হ্যাম্প্‌ষ্টেড অঞ্চলে—বেল্‌সাইজ্ পার্কে। এককালে খুব অবস্থাপন্ন ছিল। কোন্ এক কোম্পানীকে অনেক টাকা ধার দিয়ে সেটা হঠাৎ ফেল হবার পর থেকে অভাবে পড়েছে—তাই বাড়ীতে একজন পেয়িং গেষ্ট্ রাখ্‌তে চায়—"

—"আপনাদের চেনা লোক যখন—"

—"না চেনা লোক নয়, কিন্তু তার থেকে কম কি? সব খবর নিয়েছি তন্ন তন্ন করে। আমি বাড়ী থেকে বেরোতে পার্লে একবার দেখা ক'রে আস্তাম—মিসেস্ হ্যালিডেও বাতরোগে—কিন্তু তবু এই দেখনা কত খবর নিয়েছি—"

—"চিঠি-পত্রে?"

—"হ্যাঁ, কিন্তু ইংলণ্ডে তা সামান্য বলে মনে করো না। রীতিমত ভদ্রলোক—অভিজাত—যাকে জেণ্টল্‌ম্যান বলি আমরা কী পরিষ্কার ইংরেজী লেখে দেখ। আমি বলেছিলাম কিনা যে তোমাকে বিশুদ্ধ ইংরেজী শেখাতে চাই—যে সে বাড়ীতে গেলে যেমন তেমন উচ্চারণ শুনে অভ্যেস মন্দ হ'য়ে যায়। তুমি কিন্তু তোমাদের দেশের স্বাধীনচেতা লেডিদের মত যখন খুশী বাড়ী-টাড়ী বদ্‌লাতে পার্‌বে না তা আগে থেকে বলে রাখ্‌ছি। আমাকে জানিয়ে করতে হ'বে সব কাজ—"

শুনে জ্যোৎস্নার কাণের পাশটা গরম হয়ে ওঠে কিন্তু উপায় নেই কিছু বলবার, তাই চুপ করে থাকে।

হ্যালিডে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—"রীড্‌ বাক্‌লিদের পরিচয় শোন। স্বামী স্ত্রী, তিনটি ছেলে। বড়টি ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যাণ্ডে কাজ করে—"

মিসেস্‌ হ্যালিডে বিস্ময়সূচক শব্দ ক'রে বল্‌লেন—"ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যাণ্ডে? তাহ'লে সত্যি জেণ্টল্‌ম্যান"—

—"তা না তো বল্‌ছি কি?—ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যাণ্ডে যাকে তাকে তো কাজ দেয় না। হুঁ, তারপর, মেজ ছেলে কাজ করে রয়্যাল ম্যারিণে—লেফ্‌টেনাণ্ট হ'বে শীঘ্রিই এবং ছোটটি অক্সফোর্ডে পড়ে। ছেলেরা মাঝে মাঝে বাড়ী আসে, তা না হ'লে বুড়োবুড়ী আর মেড্‌ ছাড়া অন্য কেউ নেই—ঠিক আমি যা চাই, বুঝেছ তো এলিজাবেথ?"

মিসেস্‌ হ্যালিডে ঘাড় নেড়ে জানালেন—"বুঝেছি বই কি। তুমি নিঃসন্দেহে যাও সে বাড়ীতে—মাই ডিয়ার, কিছু মনে করো না, আমরাও তোমাকে রেণু ব'লেই ডাক্‌ব। সবই তো ঠিক হ'য়ে গেল আর কি, আজকের লাঞ্চটা এখানেই খেয়ে যাও। কারি রান্না হয়েছে তোমার জন্যে।—খাওয়া দাওয়ার পরে বব্‌ রেখে আস্‌বে তোমায়।

* * *

জ্যোৎস্না বেলসাইজ পার্কে এসেছে আজ তিনদিন, বিকালবেলা উপরে শোবার ঘরের জানালার কাছে ব'সে অন্যমনস্কভাবে বাইরে বাগানের দিকে চেয়ে আছে। থেকে থেকে শীতে শরীরটা কেঁপে উঠ্‌ছে, পায়ের উপর পা ঘ'সে একটু গরম হ'বার চেষ্টা করছে এক একবার—কিন্তু উঠে গিয়ে বিছানার পাশ থেকে গরম 'রাগ্‌'-টা এনে পা-দু'টো ঢাকা দেবার কথা একবারও ওর মনে হচ্ছে না। ব'সে ব'সে আকাশ পাতাল ভাব্‌ছে। এই দিনতিনেকের মধ্যে এখানে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটেছে যাতে ওর ভারতীয় মনটাকে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়ে গেছে।—বব্‌ হ্যালিডে তো সেদিন ওকে এ বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েই খালাস—মিনিট পাঁচেকও দাঁড়াল না, জ্যোৎস্নাকে একলাই বাড়ীর কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ সার্‌তে হয়। অতি দীর্ঘ—ছয় ফুট বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—শুক্‌নো পাকাটির মত চেহারা মিসেস্‌ রীড্‌ বাক্‌লির। স্বয়ং সদর-দরজা খুলে গম্ভীর 'টোনে'—পরিমিত-তালে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কি প্রয়োজন, কাকে চাই?"—

—"মিঃ হেন্‌রি হ্যালিডের কাছ থেকে আস্‌ছি—আমি মিস্‌ চাটার্জ্জি—আজকে যার আস্‌বার কথা ছিল—"

—"ও, ভেতরে এসো—রোস, বাইরে জুতোটা ঝেড়ে নাও আগে; ব্যস্‌—এবার আস্‌তে পার। ছাতা রাখো ওখানে। মাদ্‌লীন!

—"মাদাম"!—একটি মোটাসোটা হাস্যমুখী যুবতী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো নীচের রান্নাঘর থেকে।

মিসেস্‌ রীড্‌ বাক্‌লি জ্যোৎস্নাকে দেখিয়ে বল্‌লেন—"তেতলার ঘরে নিয়ে যাও—

পেছনেরটায়।" অতঃপর জ্যোৎস্নার দিকে ফিরে—'উপরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হ'য়ে এস গে—ঠিক্ চারটায় চা—মিঃ রীড বাক্‌লি একমিনিটও এদিক-ওদিক হওয়া পছন্দ করেন না। অবশ্য বলো—মাদ্‌লীন চা তোমার ঘরেই দিয়ে আস্‌বে—কিন্তু সেটা তোমার অভিভাবকের অভিপ্রেত নয়—তিনি বলেছেন তোমাকে আদব-কায়দা শেখাতে—তবে আজকের দিনটা আমি—"

জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বল্‌লে—'কিচ্ছু দরকার নেই চা ওপরে পাঠাবার—আমি এক্ষুণি তৈরী হ'য়ে নিচ্ছি।'

"সে-ই ভালো—আমি সববিষয়ে নিয়ম মেনে চল্‌তে ভালোবাসি—যেমন কথা তেমনি কাজ—ইংলণ্ডের অভিজাত পরিবারে কথার নড়চড় হ'বার যো নেই—'

ভয়ে আর ভক্তিতে জ্যোৎস্না প্রায় গ'লে যায় আর কি! ভয়—এই গিন্নীর সঙ্গে সব সময় তাল রেখে চল্‌তে পার্‌বে কিনা ভেবে। ভক্তি—এঁদের উচ্চ নীতিজ্ঞান, উঁচু চালচলন দেখে। নাঃ—হ্যালিডে জ্যোৎস্নাকে নেহাত জলে ফেলেননি তাহ'লে—যদিও বৃদ্ধবয়স আর বাতের দোহাই দিয়ে—না মিষ্টার, না মিসেস্ কেউ একবারও বাড়ীটা বা বাড়ীর কর্ত্রীকে নিজের চোখে দেখ্‌তে এলেন না—সেটাও বোধ হয় ইংলণ্ডের অভিজাতদের কায়দা—এটিকেট! ববী হ্যালীডে তো ছেলেমানুষ—চট্ ক'রে চ'লে যাওয়ার জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।...যাহোক—জ্যোৎস্না কি ভুলটাই করেছিল মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যে ওঁরা ওকে না দেখেশুনে একটা আজগুবী জায়গায় একলা পাঠাচ্ছেন। ওর ভেবে দেখা উচিত ছিল যে এটা হ'চ্ছে ইংল্যাণ্ড—আছে সে জগতের সেরা সহর লণ্ডনে, যেখানে তারে-বেতারে খবরের লেন-দেন হতে পারে ঘরে ব'সেই—বাত বা বার্দ্ধক্য আটকাতে পারে না। হ্যালিডেরা ঠিকই বলেছেন—এরা সত্যিকার জেণ্টল্‌ম্যান, ঘরদুয়ার তকতক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। মাদ্‌লীনের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে জ্যোৎস্না ভাবে, আর মনটা ওর হাল্‌কা হ'য়ে যায়।

ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আধ-আধ ইংরেজীতে মেড বল্‌লে—'তবে আমি এখন যাই, মাদ্‌মোয়াসেল্?'

জ্যোৎস্না আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—'সে কি তুমি ইংরেজ নও?'

রক্ত অধর ফুলিয়ে হাত নেড়ে চোখ মুখ ঘুরিয়ে মেড জবাবটা অতি পরিষ্কার করেই দিল, 'ইংরেজ হতে যাবো কোন্ দুঃখে? ওরা জানে কী? রান্না যা করে—'

জ্যোৎস্না হাসি চেপে বাধা দিয়ে বল্‌লে, থাক্, কিন্তু তুমি তবে কোন্ দেশী?'

'বেলজিয়ান মাদমোয়াসেল্, খাঁটি বেলজিয়ান। সাধ ক'রে এসেছি এ পোড়া ইংরেজদের দেশে? পেটের জ্বালায়—' বাকি কথাটা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, 'ঐ কোণে আপনার মুখ ধোবার জল, তোয়ালে, সব সাজানো আছে। ঘণ্টা বাজ্‌তে শুন্‌লেই নীচে ছুটবেন কিন্তু, একমিনিট দেরী না হয়, নইলে—'মুখভঙ্গী ক'রে বাকি কথাটা উহ্য রেখেই বুঝিয়ে দিল।

জ্যোৎস্না হেসে ফেল্‌ল, 'আচ্ছা, কিন্তু খাবার ঘর কোন্‌টা চিন্‌ব কি ক'রে ? এখনো তো এবাড়ীর কিছুই জানি না।'

—'খাবার-ঘরে নয়, রীড বাকলিরা চা খাবে খাবার ঘরে ? আপনি বল্‌ছেন কি ?'

জ্যোৎস্না অবাক হ'য়ে গেল, 'কেন ? এমন কি বল্‌লাম—'

'বাঃ, এঁদের যে সব সাবেকী চাল !...শোনেননি ?—কার বংশধর ওরা ?'

—'তার মানে ?'

—'মানে এখনো না জান্‌লে শুন্‌বেন আস্তে আস্তে, থাকুন তো দিনকতক।'

জ্যোৎস্না এত আশ্চর্য্য হ'য়েছিল মাদলীনের রহস্যময় কথাবার্ত্তা ধরণধারণ দেখে—এতক্ষণ ওর খেয়ালই হয়নি যে, যে বাড়ীতে থাক্‌তে এসেছে ও, সে বাড়ীর লোকের বিরুদ্ধে তাদেরই চাকরাণীর বিদ্রূপাত্মক টীকা টিপ্পনী শুনে যাচ্ছে এতটুকু বাধা না দিয়ে। এখন সেটা স্মরণ হওয়ায় চকিত হ'য়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "এই যা, চায়ের সময় হ'য়ে গেছে, এখনি তো ঘণ্টা বাজ্‌বে, কাপড় ছাড়্‌বার সময় নেই আর। আচ্ছা, তুমি যাও এখন। কী নাম যেন ?"

—"আমার, মাদমোয়াসেল্‌ ? মাদলীন্‌—মাদলীন বুরিয়েন।"

—"বিবাহিতা ?"

"হুঁ"—মাদলীন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

* * *

ড্রইংরুমে পা দিতেই মিসেস্‌ রীড্‌ বাক্‌লি ব'লে উঠ্‌লেন, "তোমার কিন্তু পাঁচমিনিট দেরী হ'য়ে গেছে আজ।" মিঃ বাক্‌লি তাড়াতাড়ি উঠে মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে অভিবাদন ক'রে একখানা চেয়ারের পিঠে হাত দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে সেটা আবার সেখানেই রেখে দিল অর্থাৎ ভাবখানা এই যে 'এখানটাই বসো তুমি।' জ্যোৎস্না বস্‌ল। মিসেস বাক্‌লি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ওর আপাদ মস্তক পরীক্ষকের দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বল্‌লেন—"তুমি ড্রেস বদ্‌লাওনি ?'

—"না, সময় পাইনি। রাত্রে বদ্‌লাব।"

—"চায়ের সময় একটা হাল্‌কা রংএর চিয়ারফুল পোষাক পরে আসা উচিত ছিল তোমার—এটার বড্ড গাঢ় রং—নিশ্চয় ট্রাভেলিং গাউন, কি বলো ?"

—"গাউন ? না, শাড়ী—

—'কি ? কি বল্‌লে ?"

'শাড়ী—আমরা শাড়ী বলি আমাদের এরকম কাপড়কে—'

"ও—ঈষ্টের কোন বিশেষ ফ্যাসান বুঝি ?'

—"না—ফ্যাসান ট্যাসান নেই আমাদের সব একই রকম কাপড়—পাঁচ গজ, ছ, গজের পিস্‌ এক একটা—"

"ব্লাউজ আলাদা ?"

'নিশ্চয়। দেখতে চান আপনি ? বেশ তো, দেখাব একদিন—

মিসেস্ বাক্‌লি তাড়াতাড়ি—বোধহয় নিজেদের আভিজাত্য স্মরণ ক'রে—বললেন, "তোমাদের কাপড় চোপড় সম্বন্ধে আমার অন্য কোন্ কৌতূহল নেই—কেবল, এরকম আউট্-ল্যান্ডিশ ধরণের পোষাক পরে তো আমার বাড়ীতে আসা চল্‌বে না—'

জ্যোৎস্না কণ্টকিত হয়ে বললে—'কি করতে হবে ?"

—"কালই টেলার ডাকিয়ে পোষাক করতে দেব তোমার জন্যে—"

উত্তেজনায় জ্যোৎস্না চেয়ারটা ঠেলে উঠে পড়্‌ল—"বলেন কি ? না মিসেস্ বাক্‌লি, না—আমি কিছুতেই ফ্রক পর্‌তে পারব না আপনাদের মত—আপনার বাড়ী থেকে চলে যেতে হয় তা-ও ভালো—"

মিসেস্ বাকলি পিঠটা সোজা করে উঁচু হয়ে বসে বল্‌লেন,—"বসো শান্ত হয়ে। উত্তেজিত হওয়াটা আভিজাত্যের লক্ষণ নয়, তোমায় ভারতীয় বনেদি ঘরের মেয়ে জেনেই রাজি হয়েছি বাড়ীতে রাখ্‌তে। তোমার অভিভাবক বলেছিলেন যে ছেলেমানুষ, প্রায় স্কুলগার্ল-গড়ে পিটে মানুষ করে নিতে বেগ পেতে হবে না। তা তুমি প্রথম থেকেই এমন দুষ্টু ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়ে চললে—হুঁ, তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে হ্যালিডে পরিবারকে সব রিপোর্ট কর্‌তে হবে।"

'জ্যোৎস্না অসহায়ভাবে একবার মিঃ বাক্‌লির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল ভদ্রলোক যদি ওর হয়ে একটা কথাও বলে! কিন্তু ওর দৃষ্টির উত্তরে বাক্‌লি শুধু একটু মৃদুহাস্য কর্‌ল। তখন কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে—"আমি সত্যি বল্‌ছি আপনাকে আমায় কেটে ফেল্‌লেও শাড়ীছাড়া আর কিছু পর্‌তে পারব না—হ্যালিডে আমাকে জোর করে বিলিতি পোষাক পরাতে পারবে না তো!"

—"মাই ডিয়ার, তোমার কথাবার্ত্তা বড় ঝাঁঝালো আর একটু নরম হয়ে কথা বলতে শেখ—আমাদের জেণ্টল্ ব্লাডে সয়না ও রকম অভব্য কথাবার্ত্তা।

—"আমি শুধু এটুকু করতে পারি যে শাড়ীখানা আর একটু উঁচু করে পরব এবং গায়ের দিকে খুব টান্‌টুন করে দেব যাতে যতটা সম্ভব ফ্রকের মত দেখায় তার বেশি না।"

—"আচ্ছা, সে তোমার অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করব আমি, তোমার কিছু বলার দরকার নেই। মনে রেখো, তুমি এসেছ এখানে উচ্চতর শিক্ষা দীক্ষা নিতে। তোমার থেকে যারা বেশি জানে শোনে, তাদের বিবেচনা মত চলতেই হবে তোমার। আর, এই দেখ, ওটা কি তোমার কাণে ?"

"দুল বলি আমরা। আপনারাও তো পরেন, না ? পেনডাণ্ট, না ইয়ারিং কী বলেন যেন ?'

—"ইয়ারিং ? একে আবার নাকি আমরা ইয়ারিং বলি ? ছিছি। এরকম অসভ্যের মত,' বোঁ করে মিঃ বাক্‌লির দিকে ফিরে দেখেছ জর্জ্জ, কাণে নাকি ইয়ারিং পরি আমরা এত বড়।

ঠিক কাফ্রি.দের মত রুচি। কাগজে যে পড়ি ইণ্ডিয়ান মেয়েদের বিকট বিকট গয়না-প্রীতির কথা, সব দেখ্ছি সত্যি। কী বিশ্রী! আর কী সখ?

বেচারী জ্যোৎস্নার সাধের ঝুম্কো! কল্কাতার সেরা কারিগড়ের তৈরী! রাগে দুঃখে ওর বুকের ভিতরটায় কী যে করে। চা আর চোখের জলে প্রায় এক হয়ে যায়।

জর্জ্জ! বলি, শুন্ছ?

মিঃ বাক্লি তাড়াতাড়ি হাতটা কাণের কাছে নিয়ে ঝুঁকে বসে বল্লে, কি বল্ছ হ্যারিয়েট?

"তোমাকে নিয়ে ঐ এক মুস্কিল হয়েছে, কাণের মাথা একেবারে খেয়ে বসেছ। একটা সুখ দুঃখের কথা বল্বার, কাজকারবারের আলোচনা পরামর্শ কর্বার যো নেই। কালই যন্ত্রটা সারিয়ে এনো। বলছিলুম কি, এই মেয়ে এরকম সাজ পোষাক ক'রে আমার বাড়ীতে থাক্লে ছেলেরা এলে লোকে কি বল্বে? ওর সঙ্গে মেলামেশাই বা করতে দিই কি ক'রে?"

—"এটাও আমাকে বোঝাতে হ'বে, হ্যারিয়েট? এমনিতেই লোকে যথেষ্ট খারাপ বল্বে। 'জনি' তো ফি শনিবারেই বাড়ী আসে, 'ক্রিস্' আস্বে ছুটিতে। দেখো, ছেলেরা যেন ওর সঙ্গে কোথাও বাইরে টাইরে না যায়।"

—"নিশ্চয় না। শুন্ছ গা মেয়ে? ভালো কথা, তোমার ক্রিশ্চিয়ান নাম তো বল্লে না—"

—"ক্রিশ্চিয়ান নাম টাম নেই, আমার হিন্দুনাম—"—"কি জ্বালা! আত্মনাম জিজ্ঞেস করছি—তোমার নিজের নাম—"—"জ্যোৎস্না-রাণী, বাবার নাম—চাটাজ্জি"

—"দুটোর একটাও আমি উচ্চারণ কর্তে পার্ব না, সে তুমি যতই রাগ কর না কেন। ছোট্ট ক'রে একটা নাম বলো—"

—"জ্যোৎস্না"

—চোখ কপালে তুলে ভদ্রমহিলা বললেন—:

"জট্স্—না, অসম্ভব। তোমাকে আমরা ডাক্তে পারি এমন একটা নাম দিতে হ'বে ···হাঁ, এই ঠিক হ'বে—জয়্—জয়্ (Joy)—"

—"আমি এসে খুব তো 'জয়' হ'য়েছে আপনাদের। ওনাম চাইনে, রেণু ডাক্তে পারেন ইচ্ছা হ'লে। বাড়িতে আমাকে ঐ নামেই ডাকেন নিকট আত্মীয়েরা।" সজোরে ঘাড় নেড়ে নামকরণী বললেন—:

"না, না, ইংরেজী নাম চাই, নইলে আমাদের সুবিধা হ'বে না।" ব'লে মিসেস্ বাক্লি এবিষয়ে সমস্ত আলোচনা হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন।—জ্যোৎস্না সারা সন্ধ্যাটা ব'সে ব'সে ভাব্লে—"এই বুঝি এদেশের এ্যারিষ্টক্র্যাট্? আচ্ছা, আমি কি সত্যি ভারি উঁচুদরের ভদ্রপরিবারেই এসেছি? কাকেই বা জিজ্ঞেস্ করি? একটা জানা লোক নেই কোথাও। হ্যালিডেরা হয়ত আরো যা তা ব'লে বস্বে।"

* * * *

সন্ধ্যা ঠিক সাতটায় রিড বাক্‌লিরা ডিনার খেতে বসে। আধ-ঘণ্টা আগে থাকতে মিঃ বাক্‌লি পোষাক পর্‌তে যায়। ডিনার স্যুট প'রে নেমে আস্‌তে সিঁড়ির নীচে জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা। ওকে দরজাটা খুলে দিয়ে নিজে একটু পরে এলো।

শাড়ীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে জ্যোৎস্না রাগ ক'রে একটা জমকালো বেনারসী প'রে নেমেছে। বারবার আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে মিসেস্ বাক্‌লি বল্‌লেন—"পোষাকের বিষয়ে না হয় পরে বিবেচনা করা যাবে জয়্, ফ্রকের মত ক'রে যদি পর্‌তে পার—"

জ্যোৎস্না বিজয়ের আনন্দ গোপন ক'রে সংক্ষেপে বল্‌লে—"দেখি।"

—"তখন কি-যে একটা রং পরেছিলে—ভারি ডিপ্রেসিং!—এটা দেখো তো জর্জ্জ—'

বাক্‌লি সাহস পেয়ে বল্‌লে—"রোজ ডিনারের সময় যদি এরকম স্যুট পর, ভারি খুসী হ'ব।"

জ্যোৎস্না মনে মনে বল্‌লে—"ব'য়ে গেছে আমার রোজ ডিনারে এত হাঙ্গাম করতে তোমাদের জন্যে। একদিন পরেছি কত না! এরকম অতি অভিজাত পরিবারে থেকে আমার কাজ নেই। হ্যালিডে না শোনেন তো বাবাকে টেলিগ্রাম কর্‌ব।" মুখে বল্‌লে—"বিকালেরটা বাইরে পর্‌বার শাড়ী ছিল কিনা, গাঢ় রং না হ'লে ময়লা হ'বে যে শীগ্গির।"

—"তুমি কাপড়চোপড় বাড়ীতেই ধোয়াতে পার, তার জন্যে অবশ্য একস্ট্রা দিতে হ'বে মাদলীনকে।"

—"তা তো বটেই"—

ছোট্ট কাঁচের গ্লাসে একটা হল্‌দে পদার্থ ঢেলে মিঃ বাক্‌লি জ্যোৎস্নার দিকে এগিয়ে দিল।

—"এটা কি?"—

—"পানীয়। খাও, সারাদিনের ক্লান্তি চলে যাবে।"

—"অর্থাৎ মদ তো? কিন্তু তা আমরা স্পর্শ করিনে, মিসেস্ বাক্‌লি।"

—"আজ খেতে হয়। তুমি আমাদের অতিথি প্রথম রাতটা। না খেলে অভদ্রতা হবে।"

—"আমার অভ্যাস নেই, কিছু মনে কর্‌বেন না।'

মিঃ বাক্‌লির মুখটা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কিছু বল্‌ল না। মিসেস্ বাক্‌লি কঠিন মুখে বল্‌লেন—"তুমি আমাদের আতিথ্যকে অপমান কর্‌লে? ওয়াইন্ আমরা যাকে তাকে অফার্ করি না।"

জ্যোৎস্না কাতর হ'য়ে বল্‌লে,—"আপনাদের আতিথ্যকে অপমান কর্‌বার আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই। শুধু দয়া ক'রে ভেবে দেখুন—আমি একটি বিদেশী মেয়ে, আপনাদের আদব

কায়দা আর আমাদের আদব কায়দায় এক এক সময় আকাশ পাতাল তফাত থাক্‌তে পারে। না খেলে আপনারা রাগ কর্‌ছেন, খেলে আমার আজীবন সংস্কারে আর প্রিন্সিপ্‌লে আঘাত লাগ্‌বে। আমি কর্‌তে পারি এমন কোন কাজ বলুন,—দেখ্‌বেন, আপনাদের ভদ্রতার জন্যে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ কিনা।...

কিন্তু সারা সন্ধ্যাটা মিষ্টার ও মিসেস্ বাক্‌লির মুখের কাঠিন্য ঘুচ্‌ল না।

রাত্রে শুতে গিয়ে কাপড় ছাড়বার সময় জ্যোৎস্নার ভারি শীত কর্‌তে লাগ্‌ল। মাদলীনাকে ডেকে বল্‌ল—"আমাকে একটু আগুন ক'রে দিতে পার?"

—"পারব না কেন? কিন্তু ঠাকুরাণীর হুকুম লাগ্‌বে।"

—"বেশ তো, যাও না—জিজ্ঞেস ক'রে এসো।"

খানিক পরে মাদলীন এসে বল্‌লে--"মাদমেয়াসেল, মাদাম বল্‌লেন শোবার ঘরে আগুণ জ্বালানো তাঁর ইচ্ছা নয়। আপনার যদি এ-ঘর ঠাণ্ডা লাগে, তবে কাল দোতলার একটা ঘরে যেতে পারেন—এরই ঠিক নীচেরটা। সেখানে গ্যাস্‌রিং আছে, একটা শিলিং বাক্সে ফেলে দিলেই দিব্যি আগুন পোয়াতে পারবেন। কিন্তু—"

—কি?

মাদলীন—মুখ টিপে হেসে বললে,

—'ভাড়া বেশি লাগ্‌বে'—

—'কত?'—

—'এখন যত দিচ্ছেন তার দ্বিগুণ।'

—'বলো কি? আগুনের জন্যে তো এছাড়া এম্‌নিই বাক্সে শিলিং ফেল্‌ব আমিই—তবু এত?'

—'হাঁ'

—'আর, যদি না যাই ও-ঘরে, তাহ'লে রাতের পর রাত এখানে হিমে বসে পড়াশুনো-কর্‌তে হবে আমাকে?'

—'সেটা জিজ্ঞেস করে আস্‌ছি আবার।'

জ্যোৎস্না ঠাণ্ডায় আর দাঁড়াতে না পেরে বিছানার কম্বলের নীচে ঢুকে পড়্‌ল।

মাদলীন এসে দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে বল্‌লে—'মাদাম বল্‌ছেন—ডাইনিংরুমে প্রায় না। পর্য্যন্ত আগুণ জ্বল্‌তে থাকে। ডিনারের পর সেখানেই বসে পড়াশুনা কর্‌তে পারেন আপনার ইচ্ছা হলে।'

—'ধন্যবাদ মাদলীন। অনেক কষ্ট করেছ তুমি, এবার যাও।'

—'কি ঠিক কর্‌লেন, মাদমেয়েসেল?'

—'কিছুই ঠিক করিনি এখনো, ভেবে বল্‌ব কাল। এত গোলমালে পড়্‌ব জান্‌লে আমি—'

—'জান্‌লে কী-ই বা কর্‌তেন, মাদামায়াসেল? এ বিদেশ বিভূঁয়ে—আপনি অসাহায় মেয়ে?'

—'তাইতো দিনকতক সহ্য কর্‌তেই হবে। পরে বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞেস কর্‌ব আমাদের দেশের কত ছেলেমেয়ে আছেন এখানে। কারো না কারো সঙ্গে দেখা হবেই দুদিন পরে।'

'সেই ভালো। এখন আমার স্টোভ্‌টা এনে দেব কি? ঘরটা একটু গরম হলে নিয়ে যাবো আবার—'

—'তোমার শীত কর্‌বে না?'

—'কর্‌লেও আপনার মতন নয়, আমাদের হাড়ে—'

বাইরে মিসেস্ রীড বাক্‌লির গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। 'আস্‌তে পারি কি?'

দোরটা খুলে দিয়েই মাদলীন ছুটে চলে গেল।

ভদ্রমহিলা ধীর পদক্ষেপে জ্যোৎস্নার কাছে এসে বল্‌লেন,—'কেমন, আরাম হয়েছে তো?'

'আর একখানা কম্বল দেব? শীত আর একটু বেশি পড়্‌লে গরম বোতল দেব বিছানায় এখন থেকেই আগুন পোয়ানো আর গরম বোতল পিঠে দিয়ে শোওয়ার অভ্যাস কর্‌লে শীতের সময় তোমাকে চারটে বোতল আর ভারে ভারে কয়লা দিয়েও পার পাব নাকি আমি?'

—'তাই বুঝি দিচ্ছেন না? কিন্তু আমার গরম দেশের হাড় যে এ শীতেই—'

—'চুপ, বেশি কথা বলো না—এতটুকু মেয়ে বড়দের সঙ্গে সমানে জবাব করে! যা বলি তা-ই শোন। ভালো কথা, ও-ই মাদলীনের সঙ্গে তোমার মেলামেশা ঘেঁষাঘেষি আমার পছন্দ হয় না। ওরা ছোটলোক, চাকরাণী, খারাপ ইংরেজী বলে—কাল্‌চারের জানে কি যে তুমি ওর সঙ্গে এত রাত্তিরে মুখোমুখি ফিস্‌ফাস্ কর্‌ছিলে?'

—'কিন্তু ও খুব ভালোমানুষ—'

—'ভালোমানুষ? ভারি তো জান তুমি। ডুবে ডুবে জল খায়। কেন এসেছে এদেশে জান? ওর ছেলে আছে—ছাদে ছোট্ট পায়রার খোপের মত একটা ঘরে থাক্‌তে দিই—'

—'তাতে কি হয়েছে?'—

—'তাতে কি হয়েছে? বাঃ বেশ মেয়ে তুমি—এ-ও বলে দিতে হবে নাকি? পালিয়ে এসেছে বেলজিয়ম থেকে। বুঝ্‌তে পারছ না?'

—'না?'—

—'হাঁসপাতালে নার্স ছিল। স্বামী নেই তবু বুঝ্‌তে পারছ না? ও বিবাহিতা নয়, বুঝলে তো এবার?'

—'ওঃ'—

'—হাঁ; তাই ওর সঙ্গে তোমার কোনরকম ঘনিষ্ঠতা আমি পছন্দ কর্‌ব না।'

—'বেশ তো, মিসেস্ বাক্‌লি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যতটা ভদ্রতা আর সুশীল ব্যবহার না কর্‌লে চলে না, ততটা আমাকে কর্‌তেই হবে—তা সে যেরকম লোকই হোক।'

—'আমি কিন্তু কথাটা তোমাকে ব'লে রাখ্‌লাম আমার ছেলেদেরও ওর সঙ্গে বেশি আলাপ কর্‌তে দিই না।—আচ্ছা, তুমি এখন ঘুমোও। আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম ও তোমার এখানে বসে বসে অনর্গল বকে যাচ্ছে তাই আস্‌তে হল ওপরে।'

—'আমি ভেবেছিলাম বুঝি আমায় দেখ্‌তে এসেছেন।'

—'তার কোন দরকার আছে কি? তোমায় তো নীচেই শুভরাত্রি জানিয়েছিলাম।'

জ্যোৎস্না চুপ করে রইল। বলবে কি ও এই কঠোর-চিত্ত শুষ্ক কাঠের মত নারীর কাছে? হৃদয় বলে কোন জিনিসই হয়ত ওর নেই।

প্রথম রাতটা জ্যোৎস্নার নানান্ দুঃস্বপ্নে কাটল। পরের দু'দিন শনি আর রবিবার। 'জনি' বাক্‌লি এই দুটো দিন বাপ-মার কাছে থাকতে আসে। এই ওদের বড় ছেলে, মায়ের মত ছয় ফুট লম্বা কিন্তু চোখেমুখে সে ধূর্ত্তামি আর কূটবুদ্ধির ছাপ নেই। বরং কেমন নির্ব্বোধ ধরণের চেহারা। খেতে বসে যত রাজ্যের আজ্‌গুবী গল্প করে। ডিনারের টেবিলে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেয়ে মুখ লাল করে ফেলে—তবু থাম্‌বার নাম নেই। জ্যোৎস্না উঠেও যেতে পারে না, বসে থাকতেও ভয়ানক কষ্ট হয়। এক একবার জনি ওর দিকে এমন করে তাকায় আর হাসে যে ইচ্ছা করে কিছু একটা ছুঁড়ে মারে। ওর মদ খেতে আপত্তি করার কথাও শুনেছে বাড়ী এসে তাই নিয়ে টেবিলে আর ড্রইংরুমে হাসাহাসি করে। জ্যোৎস্না যত শীগ্গির পারে সেই ঠাণ্ডা শোবার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে গায়ে কম্বল জড়িয়ে ব'সে ব'সে ভাবে কি করলে এই পোড়া বাড়ী থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? সোজা বাবাকে লিখবে, না আগে হ্যালিডেকে সব খুলে বলবে? শেষেরটাই ওর ভাল মনে হয়। যতই কড়া সুরে কথা বলুক—ভারতীয়দের সঙ্গে ওদের ধরণই তো ও রকম—তবু হ্যালিডেরা সত্যি ভদ্রলোক অর্থাৎ এত নিষ্করুণও নয় এবং এরকম ছেলেও ওদের নেই যে প্রতি সপ্তাহের শেষে বাড়ী এসে মদ খেয়ে খেয়ে ভয় দেখাবে ওকে। বাক্‌লি পিতা-মাতা কিন্তু সে সময় ছেলেকে একটি কথা বলে না—কোথায় যায় তখন ওদের আভিজাত্য কোথায় বা এটিকেট? আজ দুপুরে জ্যোৎস্না দেখেছে, জনি কর্ম্মনিরতা মাদলীনের পিছন পিছন ঘোরাফেরা করে কি সব বিশ্রী রসিকতা করছে—মাদলীন কিছুতেই ওর হাত এড়াতে পারছে না। বিকেলে এক ফাঁকে জ্যোৎস্নার ঘরে এসে বেচারী বললে,—"দেখেছেন তো মাদমোয়াজেল? অথচ এর জন্যে সব গালমন্দ শুনতে হয় আমাকেই মিঃ জনি চলে যাওয়ার পরে। কম বিরক্ত করে আমায়?"

—"ও না কোথায় মস্ত চাকরী করে, মাদলীন?"

—"হ্যাঁ! খুব মস্ত!—ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডে একটা কেরাণীগিরির জন্যে উমেদারী করছে আজ কবছর ধরে!"

—"পায়নি ?"—

—"পাওয়া কি অত সোজা ? ওকে চাকরী দেবে কে ? তাদেরও দায়িত্ব আছে তো একটা ? শুনেছি কি-সব ফাই-ফরমাসের কাজ করে দেয় মাঝে মাঝে—তাইতেই গোটা দশ বারো শিলিং করে পায় হপ্তায়। বাকি খরচ সব বুড়োবুড়ীকে দিতে হয় ঘর থেকে। দেখেননি একটা মোটর-বাইকে করে এসেছে ?—মাসের মধ্যে কবার যে জরিমানা দিতে হয় বেকায়দায় গাড়ী চালানোর জন্যে, তার ঠিক নেই। সে পয়সাও দিতে হয়। ও হচ্ছে বাকলি ঠাকুরাণীর সবার বড় আর সব চেয়ে প্রিয় ছেলে—দেখতে মার মত, তাই। বুড়োও ওকে কিছু বল্‌তে সাহস পায় না। থাকুন না ক'দিন, মাদমোয়াসেল, টের পাবেন সব এক এক করে। ওদের জাতের অভিমান, ঠাট, ভড়ং সব ওপরকার—তলায় পাঁক যে কত—" ব'লে কাছে স'রে এসে এদিক ওদিক চেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে—"উইক-এণ্ডে বাড়ী এলে আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না—ভাগ্যিস্ খোকাটা ছিল, কাঙালের ধন!—"

জ্যোৎস্না বিবর্ণ মুখে বললে—"বলো কি ?—এতটা"

—"সত্যি বলছি, মাদমোয়াসেল, এই ক্রস ছুঁয়ে—"

—"বলে দাও না কেন"

—"কাকে—গরীবের আছে কে ? আর, জনির বিরুদ্ধে বলব ওর মাকে"...তাও বলেছিলাম দু'একবার। ঠাকরুণ কি উত্তর দিলেন জানেন ?" মাদলীনের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। —"বললেন, তোমার বেবিটার বাপের ঠিকানা—'

—"ছি ছি, থাক, আর বোলো না।"

—"এটুকুতেই মাদমোয়াসেল ? আপনার লোক চিন্‌তে বাকি আছে।"

—"তুমিই বা থাকো কেন এখানে ?

—"থাকব না তো আর বেশীদিন। কিন্তু বিদেশী মেয়ে, সহজে কাজ জোটে কি ? সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে কোলের ঐ একরত্তিটাকে নিয়ে—একলা হলে ভাবত কে ? একটা পেট চলে যেতই, কিন্তু কপালদোষে যখন একবার"— মুখ রাঙা হয়ে উঠল বেচারীর। থেমে গেল।

জ্যোৎস্না চোখ নামিয়ে নিলে।

মাদলীন বলল, "একজনের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা প্রায় ঠিকঠাক। খোকার ভারও নেবে সে। ও একটা চাকরী পেলেই চ'লে যাবো এখান থেকে।"

জ্যোৎস্না খুসি হয়ে বললে, "সে-ই বেশ হবে। নিজের ঘর-সংসারে নিজের মর্য্যাদায় থাকবে, যতই গরীব হও না কেন। কিন্তু থাক এখন এসব আলোচনা মাদলীন, মিসেস্ বাকলির কাণে গেলে তোমায় বকবেন"—

"মাদামের ভয় পাছে আমি ভিতরের অনেক কথা ব'লে দিই আপনাকে। জানি কিনা একটু আধটু! ওরা বুঝি শুধু শুধু রেখেছে আপনাকে? কেবল নানাদিক দিয়ে আপনার থেকে বেশী টাকা আদায় কর্‌বার ইচ্ছায়। ছিল এখানে আপনার আগে এক রাশিয়ান ছেলে—"

"সত্যি? তবে না ওঁরা আর কখনো পেয়িং গেষ্ট্‌ রাখেননি?"

—"রাখেননি আবার! শুনুন তারপর—সে ভদ্রলোক কারবারী, ইংরেজী জানে—তাকে ঠকানো সহজ নয়। সে শুধু পঁয়ত্রিশ শিলিং দিয়ে থাক্‌ত, আর তা-ও ঐ দোতালার ভালো ঘরটায়—যেখানে গ্যাস্‌রিং আছে—সেটাই আসলে পেয়িং গেষ্ট্‌দের জন্যে। আপনার অভিভাবক সে রুমটার কথাই লিখেছিল, ওরা যদিও দেবার সময়ে দিয়েছে আপনাকে ওপরের বাজে ঘরটা, কিন্তু কেন জানেন? যত ভাড়ায় রাজি হ'য়ে এসেছেন, তার চাইতে আর একটু বেশি আদায়ের জন্য। দ্বিগুণ বলা—তাও একটা চাল। জানে যে দ্বিগুণ চাইলে অন্ততঃ দেড়গুণ দেবেই অনভিজ্ঞ বিদেশীরা। কিন্তু এসব কাজ কর্‌বে কি ক'রে জানেন? খুব সাবধানে—ভদ্রভাবে।"

"তুমিই বা এত কথা জান্‌লে কি করে?"—"খাবার টেবিলে সব বলাবলি কর্‌ত মাদ্‌মোয়াসেল। আমাকে কি ওরা একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে যে ভয় কর্‌বে? আর শুধু তাই নয়—কালা-বিদ্বেষ যে সাদার মজ্জাগত—সেই আশায় ওরা ভেবেছে আমিও লুটপাটে ওদের সঙ্গে যোগ দেব। আপনার কাপড় ধুয়ে—বেশি ক'রে আদায়ের ইসারা—"

—"হুঁ, শুনেছি"—জ্যোৎস্নার আর ভালো লাগছিল না এসব শুন্‌তে। ভিতরে ভিতরে ও মন বড় কান্নাটাই কাঁদ্‌ছিল। জীবনে আগে কখনো এত প্যাঁচ, এত কুটিলতার ওর পরিচয় হয়নি। তাই সামান্য সাধারণ লোভের দৃষ্টান্তেও সংসারটা যেন ওর বিষাক্ত লাগে!—আজ রবিবার, ও ঠিক করেছে কাল্‌কেই সাউথ্‌ কেনসিংটনে যাবে হ্যালিডের কাছে। এই ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে ব'সে পা দু'খানি জমে যাবার উপক্রম হয়েছে। উঠে—বিছানায় ঢুকবে, না কি করবে—ভাবছে, মাদলীন বাইরে থেকে ডেকে বল্‌লে—"মাদাম আপনাকে নীচে আগুণের ধারে গিয়ে বস্‌তে বললেন। ড্রইংরুমে দিব্যি আগুণ জ্বলছে, যান মাদ্‌মোয়াসেল—অত মন খারাপ করবেন না, আপনাদের ভাবনা কি, পয়সা থাক্‌লে এদেশে আর সত্যিকার ভয় পাবার কিছু নেই।"

বাস্তবিকই তা-ই! জ্যোৎস্না কেন এতক্ষণ এত দুর্ভাবনা ক'রে মরেছে! হ্যালিডে ওকে বিশ্বাস না কর্‌লেও, এবাড়ী বদ্‌লাতে না দিলেও, বাবা তো ওর আছেনই! শুধু একটা টেলিগ্রাম কর্‌বার অপেক্ষা। নাঃ, এরকম 'পল্লবিনী লতেব' হ'লে চল্‌বে না, একটু শক্ত হ'তে হ'বে—মনটা দৃঢ় করে গড়ে তুল্‌তে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'বে। চিরদিন—

মাধবী-লতার মত সহকার খুঁজে বেড়ায়, পেলে বাঁচে, না পেলে ধুলোয়-কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে জীবনান্ত করে,—ভারতীয় নারীর দুর্ব্বলতার এই অপবাদ আপনীত হওয়া দরকার। ভাব্‌তে হবে নিজেকে এখন ছাত্রী—স্কুল অব্ লাইফ-এর, এবং প্রতি কঠোর পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে হ'তে হ'বে উত্তীর্ণ।

মুখহাত ধু'য়ে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে জ্যোৎস্না নীচে চলল। ড্রইংরুমের সাম্‌নে জনির সঙ্গে দেখা।—"কি মিস্—ই'য়ে—জয়, আমরা যে আপনার দেখাই পাই না! মাঝে মাঝে আস্‌লেন একটু নীচে কিংবা এপাশ-ওপাশ—বেডরুমে গিয়ে তো আর উঁকি মার্‌তে পারি না—এখনও কি ততটা—"

"ধন্যবাদ মিঃ জনি, একবার কেন, হাজারবার দেখবেন নীচে—যদি ততদিন আপনাদের বাড়ী থাকি। এখন একটু স'রে দাঁড়ান দেখি, আমি ভেতরে যাই—"

জনি দোরে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—"আছে কোনো সুইট্‌হার্ট-টার্ট?—নেই?—তাহ'লে তো আরো ভালো। ডার্লিং সুইট্‌হার্ট আমারও একটিও নেই—"I swear—"

জ্যোৎস্না জোরে দরজার টোকা দিল। তারপরে জনির দিকে ফিরে চোখে এক ঝালক আগুণ এনে বললে'—'ভেবো না যে এটা তোমাদের বাড়ী ব'লে যা-তা ব'লে পার পাবে...আমরা ভিখিরী মেয়ে নই যে তোমার মার ভয়ে সব সহ্য কর্‌ব—"

পট্ ক'রে ড্রইংরুমের দরজাটা খুলে মিসেস্ বাক্‌লি বললেন—"কি, এত গোলমাল কিসের? দরজা তো খোলাই ছিল—"

—'মামি, এটা একেবারে আগাগোড়া জিপ্‌সী মেয়ে—স্‌স্রীম্প্ (shrimp) একটা—ছুঁতে না ছুঁতে তড়্‌বড়্ করে ওঠে। জিজ্ঞেস করিলাম লাভার টাভার আছে কিনা—শুধু শুধু ক্ষেপে গেল—'

মিসেস্ বাক্‌লির মুখের ভাবখানা পলকে বদ্‌লে যায়। 'এসো জয়, এসো'—চল একটু গল্প করিগে ডিনারের আগে। আজ আমাদের কোনো কাজকর্ম্ম নেই রবিবার ঢের অবসর।"

"রবিবার আপনারা চুপচাপ থাকেন না গির্জ্জায়—"

ওঃ—সেসব কি জান—ক্যাথলিকরাই একটু বেশি বেশি ভড়ং করে। আমরা অনেক কাল থেকে প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ কখনো ধর্ম্ম নিয়ে বাইরে বাড়াবাড়ি করি না, ধর্ম্ম হচ্ছে ভেতরকার জিনিষ—যেখানে সেখানে প্রকাশ কর্‌তে নেই।'

—'হুঁ'—

—"আমার স্বামী" মিঃ বাক্‌লিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে—'ভয়ানক উঁচু বংশের ছেলে, রাজার নীল রক্ত এঁর শরীরে—'

"বলেন কি?"—

"অ-বি-ক-ল"

অষ্টম হেনরীর এক বংশধর ইনি! আমিই বরং একটু নীচু বংশের অর্থাৎ কিনা কর্ণেলের মেয়ে। কিন্তু তাও বলি—আমার বাপকে কর্ণেলী নিয়ে ভারতবর্ষে যেতে হয়—'

—'ও'

—'শুধু এদেশের নিয়মে বড় ভাইই সমস্ত ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে।—অন্য ছেলেদের খেটে খেতে হয়—

জ্যোৎস্না মাথা নেড়ে বললে—'পড়েছি বটে ইতিহাসে —'

মিসেস্ বাক্‌লি সগর্ব্বে বললে—পড়্‌বে বই কি। তা শোন—আমার স্বামী আজ পর্য্যন্ত ডিনারের ড্রেস না পরলে খেতেই পারেন না, হপ্তায় একবার অন্ততঃ টার্কিস্ বাথ্ ওঁর চাইই—বাড়ীতে নিত্যি স্নান তো আছেই। এককালে বিস্তর টাকা ছিল—এখনো কম নয়—বাপের দিক থেকে দেওয়া আমার বিয়ের যৌতুক সব জমা আছে—আমরা তিনবোন বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে পেন্সন পেতাম—

—'সে কি আপনারাও চাকরী—'

—'পাগলের মত কথা বলো না। আমরা চাকরী করতে যাবো কোন দুখে? আমাদের বাপ বড় চাকুরে, তাই আমাদের খোরপোষ দিত গবর্ণমেণ্ট—

—"কই, সে রকম তো কোনদিন শুনিনি"

—'তুমি কি-ই বা শুনেছ, কি-ই বা জানো বলো? তখনকার দিনে বাপ পেন্সন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও পেত। আই-সি এস্-এর বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর পেন্সন আজীবন ভোগ কর্‌তে শোননি? তুমি দেখ্‌ছি কিছুই জান না তোমার নিজের দেশের সম্বন্ধেও।'

জ্যোৎস্নার চোখ দু'টো একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তাই বুঝি ভারত আর ভারতবাসীকে ভালোবাসেন এত?'

—'ভালোবাসি?' মিসেস্ বাক্‌লি কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না।

—আমাদের দেশে প্রবাদ আছে একটা—যার নাকি নুণ খায়—'

—"তুমি বুঝতে পারছ না কিছুই। ভারতবর্ষে যাই ইনি কোনোদিন, নুণ খাব কি? টাকা ঘর ব'য়ে এখানে আসত।"

জ্যোৎস্না আর কথা কাটাকাটি কর্‌ল না। মিসেস্ বাক্‌লির এত ধূর্ত্ত মাথাটাও সূক্ষ্ম খোঁটা বুঝ্‌বার মত তত সূক্ষ্ম নয়। ধর্‌তেই পারেনি।

—"এতই টাকা যদি আপনাদের, মিছে কষ্ট করে পেয়িং—গেষ্ট রাখেন কেন?"

—"তাইতো বলছি বাপু। টাকার জন্যে অতিথি রেখেছে কে? এত বড় বাড়ী, ছেলেরা সব বছরের বেশির ভাগ বাইরে বাইরে কাটায়। লোকজন না থাকলে খালি—খালি লাগে ঘরদোরে ঝাঁট পড়ে না কখনো—"

৪—

—"তাহলে ভাড়া সম্বন্ধে কোনো কড়াকড়ি নেই বলুন? লাভের দিকে চোখ তো ওই ল্যাণ্ডলেডিদের। আপনাদের ঠিক খরচটুকু দিলেই চলে যায়, সত্যি না?'

—"তার থেকে বেশি আমরা নেবই বা কেন? নেহাত নিজের পকেট থেকে তো আর খাওয়াতে পারি না—সবাই নিজেরটা দেখে—?"

—"তাহলে ওপরতলা আর নীচের তলায় আড়াই গিনি তফাত হ'ল কেন, মিসেস বাক্‌লি? আড়াই গিনি দর দস্তুরে এসেছি—এখন পাঁচগিনি চাইছেন সেই একই রুমের জন্যে।'

—"তুমি যে এত অভিজাত পরিবারে স্থান পেয়েছ, তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমানে মিশবার, একটেবিলে বসে খাবার আলাপ করবার এমন কি সমান সমান হাসি মস্করা কর্‌বার পর্য্যন্ত সুযোগ পেয়েছ, তার কি একটা মূল্য নেই মনে করেছ?"

—"ওঃ—তাহ'লে বাড়তি পয়সাটা আভিজাত্যের ট্যাক্স, কি বলেন? তাই না, মিসেস্ বাক্‌লি?"

—"তাতো বটেই—একশোবার তাই। যাও না দেখি স্লামে,—সবই খুব সস্তা পাবে—।"

"এমন কি, সুইট্‌হার্টও" জনি চোখ টিপে বল্‌লে।

মিসেস্ বাক্‌লি বলে চললেন—'কিন্তু পাবে কোথায় এমন ড্রইংরুম, এমন কাঠের আগুন, ডিনার-টেব্‌লে কচি মুরগী আর গরুর বাচ্চা, যখন বেল টিপ্‌বে তখনই চাকরাণী—বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ, রিফাইনমেণ্ট্—অক্সফোর্ডের ষ্টুডেণ্ট ছেলে—রয়েল ম্যারিনের লেফ্‌টেনাণ্ট—"

—'থাক্' জ্যোৎস্নার মুখ লাল টক্‌টক্ করছে। মিসেস্ বাক্‌লি বাধা পেয়ে চম্‌কে চুপ কর্‌লেন। —'বর খুঁজতে আসিনে এদেশে, ভারি দুঃখিত। তা নইলে পাঁচ গিনি কেন, দশগিনিও দেওয়া যেত। কিন্তু ঢের হয়েছে—আর না। আমি চললুম আমার ঘরে, দয়া করে মাদলীনকে দিয়ে আজকের খাবারটা ওপরেই পাঠাবেন।"

—"কেন—টেবিলে খাবে না কেন?"

—"মিসেস্ বাক্‌লি, আমার দেহে রাজ-রক্তের অভাব, নেহাত প্লিবিয়ান মেয়ে—আপনার রয়্যাল টেব্‌ল্ আর কলুষিত কর্‌ব না—"

মিসেস্ বাক্‌লি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"তুমি তাহলে আমার বাড়ীতে থাক্‌তে চাও না?—এই মতলব, কেমন?"

"অ-বি-ক-ল"

মিসেস্ বাক্‌লির মুখচোখ লাল হয়ে উঠল তাঁর কথার এই প্রতিধ্বনিতে। বললেন, "আমি কিন্তু সহজে ছাড়ব না তাহলে। তোমার অভিভাবকের কাছে সমস্ত রিপোর্ট করে মজা টের পাওয়াব—"

—"অভিভাবকের উপরও অভিভাবক আছে। আচ্ছা, গুডনাইট—সবাই।"

—"অবাধ্য, উদ্ধত মেয়ে। তুমি ইচ্ছা করলেই যেতে পার না হ্যালিডের অনুমতি ছাড়া—তা জান?"

জনি এসে দোরের হাতল চেপে ধরে বললে, "এত চটো কেন? ফি শনিবারে আমি আসি, বাইকের পাশে টুকটুকে ক্রেডল্-সিটটা দেখেছ? মাইলকে-মাইল হাওয়ার বেগে উড়ে যাব আমরা একটু অভ্যাস—"

জ্যোৎস্না পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে চলে গেল।

তারপর, কোন মতে উপরে গিয়ে—প্রতিক্রিয়া—কান্না আর কান্না!—

মিনিট কয়েক পরে বাইরে মিসেস্ বাক্‌লির গলা শোনা গেল—"আমরা সিনেমায় যাচ্ছি, আসবে তুমি আমাদের সঙ্গে?"

—'না।'

—'কেন? এসো না, বেশ ভালো ছবি আছে।'

—'আমার ইচ্ছে করছে না।'

—"আচ্ছা, থাকো তাহ'লে, আমি জনিকে নিয়েই চল্‌লাম।"

সিঁড়িতে মিসেস্ বাক্‌লির পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

* * *

জ্যোৎস্না কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? ...কি একটা শব্দে হঠাৎ চোখ খুলে দেখে ঘরের ভিতর ওর বিছানার একেবারে কাছে—কে যেন দাঁড়িয়ে। ধড়মড় করে উঠে ত্রস্তকণ্ঠে বল্‌লে, "কে" কে ওখানে?

—"আমি—আমি!"

—"মিঃ বাক্‌লি"

—"হাঁ, হাঁ, ভয় পেয়ো না।" বাক্‌লি পাশের চেয়ারে বসে পড়ে সান্ত্বনার সুরে বললে, 'বাস্তবিক আমি ভারি দুঃখিত যে মিসেস্ বাক্‌লি তোমায় যখন তখন যা-তা ব'লে এত কষ্ট দেয় মনে। কিন্তু কিছু বলতে তো পারিনা ওদের সামনে!'

—'এই কথা বল্‌বার জন্য এত রাত্তিরে আমার ঘরে—'

বুড়ো ওর হাতখানা প্রায় ধরে ফেল্‌বার উপক্রম করলে, "শুধু সেজন্য নয়, প্রথম হ'তে তোমাকে আমার সত্যি কী যে ভালো—"

বিস্ময়ে ভয়ে জ্যোৎস্নার প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে যেতে চায়। অতর্কিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "মাগো!"

বাক্‌লি হঠাৎ ওর হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধর্‌ল, বল্‌লে, "যাবে আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে? এই অঞ্চলেই ভালো 'শো' আছে, কফি হাউস্ ও—"

বৃদ্ধের দেহে সাতটা জোয়ানের বল এখনো। মুখেই বা এ গন্ধ কিসের?…একলা, অসহায়!—জ্যোৎস্নার সমস্ত দেহ-মন পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মত স্তম্ভিত, প্রায় জ্ঞানশূন্য।…

হঠাৎ পাশের ঘরের দরজা গেল খুলে। মাদলীন্ কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে ব্যাপারটা চেয়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "যা ভেবেছি তা-ই।"—ছুটে এসে হতবুদ্ধি জ্যোৎস্নার অন্য হাতখানা ধ'রে টেনে তুলে বললে, "ভয় কি, মাদমোয়াসেল্ ভয় কি, একটু শক্ত হোন দেখি এখন। কী করবে ও? এ স্বাধীন দেশ,—আশেপাশে মানুষও আছে।"

এতক্ষণে বাক্‌লির মুখে কথা ফুট্‌ল, "কে এমন ক'রে আস্‌তে বলেছে তোমায় এঘরে? মিস্ চাটার্জ্জির শরীর ভালো নেই, তাই আমি—"

—"চুপ করুণ, বেশি গোলমাল কর্‌লে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করব।" জ্যোৎস্নার দিকে ফিরে বললে, "ওঁকে এঘরে অমন চুপি-চুপি ঢুকতে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার।"

—"খবরদার মাদ্‌লীন!"

মাদ্‌লীন জ্যোৎস্নাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলো। দু'হাতে ওর একখানা হাত চেপে ধরে স্খলিত কণ্ঠে জ্যোৎস্না বল্‌লে, "এখনই একখানা ট্যাক্সি—"

—"ডেকে দিচ্ছি মাদমোয়াসেল, জিনিষ পত্তরও গুছিয়ে রাখব। কালই লোক এসে নিয়ে যায় যেন।"

পাঁচমিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এলো। উঠে বসে জ্যোৎস্না মুখ বাড়িয়ে বল্‌লে, "বোনের কাজ করলে এবিদেশে। তুমি না থাক্‌লে আজ—, কিন্তু মাদ্‌লীন্, এর পর তোমারই কি আর এ বাড়ীতে থাকা চলবে?"

হাসিমুখে মনের চিন্তা ঢেকে মাদ্‌লীন উত্তর করলে, কালই বিদায় করে দেবে, কিন্তু তাতে কি—যে কোনো রকমে—"

—"বেশি কথার সময় নেই এখন। কিন্তু কাল নিশ্চয় এসো একবার,—নম্বর গার্ডেন্‌স্, সাউথ কেনসিংটন। আমার অভিভাবকের বাড়ী, তাঁরা সত্যি ভদ্রলোক। তোমার যতদিন না ভালো কাজ জোটে একটা—"

—"ধন্যবাদ, মাদমোয়াসেল্। মেরীর দিব্যি, আসবই আমি।"

—"জানো তো আমার টাকা আছে যথেষ্ট, বেকার অবস্থায় কোনো কষ্ট হতে দেব না তোমার।"

মাদ্‌লীনের চোখে জল এলো।

—"গুডবাই মাদমোয়াসেল্!"

"গুডনাইট মাদ্‌লীন! মনে থাকে যেন।"

* * *

হ্যালিডে-গিন্নী মিটার দেখে চমকে উঠলেন, 'কী সর্ব্বনাশ, তুমি তো ফতুর করবে দেখছি তোমার বাপকে—এমনি ভাবে ট্যাক্সিতে ঘোড়দৌড় খেললে!

সব কাহিনী শোনা শেষ হল। হ্যালিডে কর্ত্তা তাকালেন গিন্নীর পানে, গৃহিনী তাকালেন কর্ত্তার পানে।

কতক্ষণ পরে '—হ্যারি!'

'উঁ!'

'রাজার নীল-রক্ত Blue blood'ই বটে! ঘোরতর নীল—মস্ত ঘরের আভিজাত্য! কথা নেই যে মুখে? কি?' মুখে তাঁর বিজয় হাস্য!—জ্যোৎস্নার মনে পড়ে যায়—প্রথম দিন ওঁদের এখানে লাঞ্চ খেয়ে বিদায় নেবার একটুখানি আগে হঠাৎ মিসেস্ হ্যালিডের হয়েছিল সন্দেহ—ছেলেমানুষ মেয়েটিকে না দেখে শুনে কোথায় কার বাড়ী পাঠানো হচ্ছে কে জানে! তা-ই নিয়ে কতকথা কাটাকাটি শ্লেষ—অবশেষে সেই চিরাচরিত কী বলে যেন? 'সেই দাম্পত্য "বহ্বরম্ভে?'

হ্যালিডে অধোমুখে নতুনকেনা চশমাখানি মুছতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। স্ত্রীর সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কাণ দিতে গেলে পুরুষের যদি চলত! কেবল, আজ কিসে যেন বড্ড নাড়া দিয়ে গেছে তাঁর আভিজাত্যের ধারণায়,—উপলক্ষ্য একটি ভারতীয় মেয়ে!

মানব জীবনে আনন্দের স্থান

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ বি, এ

মানুষের জীবন কেবলমাত্র সুখে পরিপূর্ণ, না নিছক্ দুঃখে ভরা, না উভয়ের সংমিশ্রণ এবং সংমিশ্রণ হইলেও কোনটিই বা বেশী এবং কোনটিই বা কম, ইহা লইয়া আনন্দবাদী ও দুঃখবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে কিন্তু আজও ঐ তর্কের কোনো প্রকৃত সমাধান হয়নি—কোনো সুদূর অতীতে হইবে কিনা কে জানে।

প্রশ্নটা উঠিয়াছিল নানাভাবে, কেহ বলিয়াছিলেন পৃথিবীতে দুঃখই একমাত্র সত্য, কেহ বা বুঝিয়াছিলেন যে সুখই প্রকৃতির মূল কথা, আবার কেহ বা দেখিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে সুখ দুঃখ, উভয়ই বীণার তারের মত পরস্পরকে জড়াইয়া রহিয়াছে। এইসকল প্রশ্নের মধ্যে প্রথম দুইটির সমাধান একরকম হইয়া গিয়াছে; আজকাল খুব কম বিজ্ঞব্যক্তিই সুখ বা দুঃখ এ দুইটির কোন একটিকে একান্ত সত্য বলিয়া মনে করেন।

শেষোক্ত মতটিই এখন প্রায় সর্ব্বজনগ্রাহ্য—কিন্তু এখানেও সমস্যা উঠিয়াছে দুঃখ বা সুখের আপেক্ষিক স্বল্পতা বা আধিক্য লইয়া। একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিলে কিন্তু এই সমস্যাকে আপাত দৃষ্টিতে যত জটিল বলিয়া বোধ হয় তত জটিল বলিয়া বোধ হইবে না। এই যে কেহ কেহ ভাবেন জগতে দুঃখেরই প্রাধান্য অধিক, আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আনন্দেরই প্রাবল্য বেশী ইহার মুলে বোধ হয় রহিয়াছে ব্যক্তিগত বিভিন্ন মনোভাবের প্রেরণা। প্রত্যেক মানুষই যে জন্মের সময় কোন এক বিশেষ মনোভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং সে যা কিছু অনুভব বা উপলব্ধি করে সে সকলের উপরেই সেই মনোভাবের ছায়া আসিয়া পড়ে এবং তাহারই ফলে পৃথিবীর যে কোন দুটি মানুষেরই যে সর্ব্ববিষয়ে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইতে পারে না, একথার সত্যতা আজকাল খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন। মানবমনের এই ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের ফলে একই কবিতার অর্থ বিভিন্নব্যক্তির নিকট বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়, একই চিত্র দর্শক বিশেষে বিভিন্নরূপ ধারণ করে এবং একই বস্তুর প্রভাব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। ঠিক এই একই কারণে জগতের ঘটনাবলীকে কেহ বা বলেন আনন্দের বিচিত্রলীলার মধ্যে দুঃখের দুয়েকটি বুদ্‌বুদে পূর্ণ আবার কেহ বা বলেন গভীর দুঃখরাশির মধ্যে আনন্দের দুয়েকটি কণায় ভরা। বিভিন্ন রঙ্গের চশমা পরিলে যেমন একই জিনিষকে বহুভাবে দেখা যায়, সেইরূপ বিভিন্ন মনোভাবের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া জাগতিক ঘটনাবলী বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। আনন্দের রঙ্গে রঙ্গানো চশমার মধ্য দিয়া দেখিলে যে কত আনন্দের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রহণ করিতে পারিলে যে কত আনন্দ পৃথিবীর মাটীতে ছড়ানো আছে দেখিতে পাওয়া যায় আজ সেই কথাই বলিবার চেষ্টা করিব।

আনন্দের কথা বলিতে গেলেই হয়ত প্রতিপক্ষ বলিবেন সে মানবজীবনে আনন্দের উল্লেখ বিদ্রূপমাত্র কারণ মানুষের জীবন মানেই এক প্রচণ্ড সংগ্রাম। সৃষ্টিকর্ত্তা জীবের যত অভাব সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অনুপাতে অভাব নিবারণের উপকরণ সৃষ্টি করেন নাই—কাজেই জীবন সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। এই জীবন যুদ্ধে যে জয়লাভ করিবে শেষ পর্য্যন্ত সেই টিঁকিয়া থাকিবে—অতএব মানুষের সমগ্র জীবনই স্বাস্থ্য, সম্পদ, যশ, মান, সুখ এ সবকিছুর জন্যই মারামারি, কাড়াকাড়ি করিয়া কাটাইতে হয়। জীবনের পথ পুষ্পাবৃত আস্তরণে সজ্জিত তো নহেই, বরং কর্দ্দমাক্ত এবং কণ্টকাকীর্ণ। এই দুর্গম পথের যাত্রী, এই কঠোর সমরক্ষেত্রের সৈনিকের জন্য আনন্দের স্থান কোথায়?

একথা সকলই সত্য-মানবজীবনের দুঃখ, ক্লেশ, শোক, অশান্তি কে অস্বীকার করিবে? জীবনের সকল আঘাত, বেদনা, অপমান, উপেক্ষা কে ভুলিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া কি বুঝিব যে ইহারাই একমাত্র সত্য? দুঃখকষ্ট আছে বলিলেই কি প্রমাণ হইল যে ইহারাই একমাত্র সত্য এবং আনন্দ বলিয়া কোন কিছু নাই? ইহাই যদি বুঝি তাহা হইলে বলিতে হইবে আনন্দের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান আমাদের হয় নাই। কারণ আনন্দ মানেইতো আর নির্বিঘ্ন, নিশ্চিন্ত জীবনযাপন নহে;—নির্বিঘ্ন জীবন মানেই নিষ্ক্রিয় জীবন আর তাহা মৃত্যু বা সমাপ্তির নামান্তর। মানুষের জীবন যদি সেইরূপ কর্ম্মহীন, বাধাহীন, সংগ্রামহীন হইত তাহা হইলে তাহার আনন্দও থাকিত না কারণ যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহার সুখ দুঃখ কিছুই থাকিতে পারে না। যাহা চলমান তাহারই দুঃখ আছে আবার আনন্দও তাহারই আছে। যে কোনদিন চেষ্টা করে সেই বিফল হয় সত্য কিন্তু সাফল্যের আনন্দও একমাত্র তাহারই পক্ষে সম্ভব যে নিশ্চেষ্ট সে ব্যর্থতার বেদনা পায় না বটে, সার্থকতার আনন্দও সে ধারণা করিতে পারে না। চতুর্ব্বেষ্টিত দীর্ঘিকা চিরদিন স্থির হইয়া আছে; তাহার কোনো বাধাও নাই, কোনো ভয়ও নাই। কিন্তু স্রোতস্বিনী নদী চলিতে পদে পদে বাধা পায় এবং সেই বাধা অতিক্রম করিয়া আনন্দের ধারায় স্নান করিয়া, স্রোতে স্রোতে আনন্দের তুফান তুলিয়া সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়। মানুষের জীবনেও দুঃখ কষ্ট আছে বলিয়াই আনন্দও আছে। তাহা নিশ্চল, নিঃশব্দ জড় প্রস্তরস্তূপ নহে, চলিষ্ণু ও প্রাণবন্ত এবং যাহার প্রাণ আছে তাহারই আনন্দ বা দুঃখ পাইবার অধিকার ক্ষমতা আছে। কাজেই দেখা গেল যে দুঃখের অস্তিত্ব আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান করিয়া তুলে না বরং পরোক্ষভাবে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণই করে।

দুঃখের অস্তিত্ব আনন্দকে কেবলমাত্র একভাবে নহে, বহুভাবে প্রমাণ করে। মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌গণের মতে আমাদের প্রত্যেক অনুভূতির সত্ত্বাই অপর কোন অনুভূতি হইতে ভিন্নতা ও প্রভেদের উপর নির্ভর করে। একটি অনুভূতি আর একটি অনুভূতি হইতে পৃথক্ হইলে তবেই আমাদের পক্ষে তাহার জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। নতুবা একই অনুভূতি ক্রমাগত মনের মধ্যে

থাকিলে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান হয় না। সেই জন্যই আমরা যখন সুস্থ থাকি তখন স্বাস্থ্যের বা স্বাচ্ছন্দ্যর কোন বিশেষ অনুভূতি হয় না। কিন্তু যখনই অসুস্থ হইয়া পড়ি তখনই পূর্ব্বেকার স্বাস্থ্যের আনন্দ বুঝিতে পারি। অবশ্য সুস্থাবস্থাতেও আমাদের মনে স্বাস্থ্যের অনুভূতি যে একেবারেই হয় না তাহা নহে—তবে সে অনুভূতিও অতীতে অস্বাস্থ্যের অনুভূতির সহিত তুলনা করিয়া সম্ভব হয়। যে কোনদিন অসুস্থতা ভোগ করে নাই—সে যে স্বাস্থ্যের অনুভূতির জ্ঞানও কখনও পায় নাই—একথা বলা চলে। প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান তাহার ব্যক্তিগত সত্বার উপর যে ভাবে নির্ভর করে, অন্য বস্তু হইতে তাহার বিভেদের উপরও ঠিক সেই পরিমাণেই নির্ভর করে। কোন বস্তু অন্য বস্তু হইতে পৃথক হইলে তবেই তাহাকে বোঝা যায়। পৃথিবীতে যদি কেবল একটি মাত্র পদার্থ থাকিত তবে আমরা তাহাকে জানিতে পারিতাম না—তাহার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান আমাদের হইত না। অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে তবে কোন বস্তুকে বিশেষ করা যায় আর তবেই তাহার জ্ঞান সম্ভব হয়। বৃক্ষকে বৃক্ষ বলিয়া বুঝি তখনই যখন জানি সে উহা প্রস্তর বা প্রাণী নহে, বৃক্ষই যদি পৃথিবীতে একমাত্র বস্তু হইত তাহা হইলে উহাকে জানা যাইত না কারণ জানা মানেই অন্য বস্তু হইতে পৃথকী-করণ। এই কারণেই দুঃখের সম্ভাবনার মধ্যে সুখের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে নিরানন্দ আনন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া বিরাজ করিতেছে। অতএব দেখা গেল যে আনন্দ বা নিরানন্দের অস্তিত্ব পরস্পরকে অপ্রমাণ না করিয়া প্রমাণই করিতেছে কারণ ইহারা একে অপরের বিপরীত নহে—সম্পূরক এবং ইহাদের যে কোনটিই যদি একমাত্র সত্য হইত তাহা হইলে আমরা কোনটিকেই জানিতে পারিতাম না।

আর সত্যই কি আনন্দের সম্পূর্ণ অভাব সত্য হইতে পারে? আনন্দ না থাকিলে কি মানুষ বাঁচিতে পারিত? কেবল দুঃখে কি মানুষ বাঁচে? মানুষের অধিকাংশ কার্য্যই আনন্দ হইতে স্বতঃ উৎসারিত হয়। একথা অবশ্য সত্য যে পৃথিবীর বেশীর ভাগ শিল্প, সঙ্গীত ও কাব্যরচনার মূলে ছিল প্রবল বেদনাবোধ ও দুঃখানুভূতি কিন্তু সেখানেও সেই পরম বেদনার মধ্যেও সৃষ্টি করিবার আপনাকে প্রকাশ করিবার, সৃষ্টির মধ্যে আপন অন্তরাত্মাকে মুক্তি দিবার বিপুল আনন্দানুভূতিই মানুষকে সৃষ্টির পথে অনুপ্রেরিত করিয়াছে। কারণ কেবলমাত্র দুঃখবোধ মানুষকে সৃষ্টি করিবার শক্তি দেয়না—তাহাকে অগ্রসর হইতে সহায়তা করেনা। দুঃখবোধই একমাত্র সত্য হইলে মানুষ চিরদিনই একই স্থানে স্থির হইয়া থাকিত—কারণ তখন আর তাহার চলিবার কোনো প্রয়োজন হইতনা। শতদুঃখকষ্টের মধ্যেও বিপন্ন মানবজাতির মনে সুখ ও আনন্দের অস্তিত্বের আশার বাণী মধুর সুরে ধ্বনিত হয় বলিয়াই, আনন্দের সত্তাকে সত্য বলিয়া জানে বলিয়াই, মানবজাতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে—নতুবা যাহার আশা করিবার কিছু নাই, আঁকড়াইয়া ধরিবার কোনো অবলম্বন নাই, সম্মুখে চাহিয়া

দেখিবার কোনো লক্ষ্য নাই, সে কখনও চলিতে পারে? হয়ত একটি মানবের ব্যক্তিগত জীবনে এ জন্মের মত আনন্দের শেষ হইতে পারে, কিন্তু জাতিগত ভাবে যদি মানবের জন্য কোন আনন্দ সঞ্চিত না থাকিত তবে সে বাঁচিত কি লইয়া, কিসের বলে?

কিন্তু এসব তর্ক ছাড়িয়া দিয়া সুহজভাবে সাধারণ বুদ্ধি দিয়া ভাবিলেই দেখা যাইবে এ জগতে আনন্দ আছে এবং বহুভাবে এবং বহুপ্রকারে আছে। রূপরসশব্দগন্ধের অপরূপ সম্ভারে সজ্জিতা সুন্দরী বসুন্ধরার পানে চহিয়া, পথযাত্রী অগণিত লোকের হাসিভরামুখ দেখিয়া, নিত্যনূতন আনন্দ-উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত জনগণের প্রচুর উৎসাহ দেখিয়া কে বলিবে পৃথিবীতে আনন্দের অভাব ঘটিয়াছে। এই সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধিজরা প্রপীড়িত; দুঃখক্লেশভারজর্জ্জরিত, জরামৃত্যুশোকবিধ্বস্ত মানবজাতির মধ্যেও এমন লোক খুব কমই আছে যে বলিবে যে সে জীবনে কখনও আনন্দের আস্বাদ পায় নাই।

সংগ্রামবহুল মানবজীবনে দুঃখকার্য্যের শেষ নাই কিন্তু জীবনে এমন আনন্দও পাওয়া যায় যাহা দারুণ দুর্দ্দিনেও ভুলিবার নহে এবং পরম দুঃখের ক্ষণেও যাহা হৃদয়ে অমৃতসিঞ্চন করে। পারিবারিক জীবনের বিমল আনন্দ একবার সে উপভোগ করিয়াছে, ঘোর দুর্দ্দিনেও সে তাহার স্নিগ্ধ প্রভাব অনুভব না করিয়া পারে না। মাতাপিতার অসীম স্নেহ, ভ্রাতাভগিনীর মধুর প্রণয়, পতিপত্নীর নিঃস্বার্থ পরিপূর্ণ প্রেম, সন্তানের প্রতি মধুর বাৎসল্যানুভূতি—এই সকল পরম আনন্দময় অনুভূতি একবার তাহার হইয়াছে সেকি আর কখনও সেই স্মৃতির আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে? বন্ধুত্বও মানবজীবন এক মধুর আনন্দের উৎস। সে কোনদিন বন্ধুত্বের মর্ম্ম উপলব্ধি করে নাই, সে সত্যই দুর্ভাগ্য। প্রকৃত বন্ধুত্ব সত্যই মানুষকে অনেক দুঃখকষ্ট ভুলাইয়া দেয়; তাহার সে অনাবিল আনন্দ তাহার তুলনা কোথাও মেলেনা।

সমাজের, স্বদেশের ও মানবজাতির হিতসাধন করিয়াও মানুষ যথেষ্ট আনন্দ পায়। সম্পূর্ণতা লাভকরিতে মানব জাতির এখনও বহু বিলম্ব আছে—সুতরাং সকল সমাজেই কমবেশী ভুলভ্রান্তি আছে। সেই সকল ভুল ভ্রান্তি যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়া; স্বদেশকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করিবার প্রয়াস করিয়া এবং সর্ব্বোপরি বিপন্ন মানবের কোনও প্রকার উপকার করিয়া মানুষ পরিপূর্ণ, মহান্ আনন্দ লাভ করে। জীবনে যখন আশার কোন স্থান নাই, জীবনে যখন কোন অবলম্বন থাকেনা, জীবন যখন সীমাহীন অবসাদে ভরা তখনও এইভাবে স্বজাতি, স্বদেশ এবং বিপন্ন মানবজাতির সেবা করিয়া প্রকৃত, অবিমিশ্র, বিমল আনন্দলাভ করা যায়। তাইবলি আনন্দের সত্তা পৃথিবীতে পরম সত্য বস্তু কারণ যে চরম দুঃখী তাহার জন্যও পরম আনন্দের খনি লুকানো আছে।

সহজ সৌন্দর্য্যানুভূতির দ্বারাও মানুষ বিশুদ্ধ আনন্দলাভ করিতে পারে। রূপরসশব্দে-গন্ধস্পর্শের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দর সমন্বয়ে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ প্রকাশে, জ্ঞান ও সভ্যতার

নূতনতর বিকাশে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর নির্ব্বিবাদ, নির্নিন্দ পরিপূর্ণতায় মানুষ যে আনন্দ পায় তাহা দুঃখলেশহীন, অবিমিশ্র, বিমল আনন্দমাত্র। নানাজনে নানাভাবে এই আনন্দের অধিকার লাভ করে। এই আনন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই বাল্মীকিব্যাস হোমার কালিদাস সেক্সপীয়রগেটে শেলীকীট্‌স্ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জগতের অমরকবিবৃন্দ তাঁহাদের অমর কাব্যসমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আবার বহুশত প্রকৃত যোদ্ধাও তাঁহাদের রচনাবলী পাঠ করিয়া এই আনন্দই পাইতেছেন। কবি যেমন লেখার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, চিত্রকর, খোদাইকার ও সঙ্গীতজ্ঞও সেইরূপ তাঁহাদের চিত্র, মুর্ত্তিগঠন বা গীতের মধ্য দিয়া আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেন। আনন্দের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল, রবিবর্ম্মণ, অজন্তার শিল্পিবৃন্দ বীটোফোন, তানসেন, ভাতখণ্ডে আপন আপন অন্তরাত্মার অপূর্ব্ব অনুভূতিকে বিভিন্ন কলার মধ্য দিয়া রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। আবার বহু প্রকৃত রসবেত্তা তাঁহাদের সৃষ্টির আনন্দ আপন আনন্দ দ্বারাই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন। শিল্প ও ললিতকলা মানবমনের সহজ আনন্দের প্রতীক্। তাই যেদেশে শিল্প ও ললিতকলার বিকাশ যত অধিক ও পরিপূর্ণ সে দেশ তত বেশী সভ্য, উন্নত ও আনন্দপূর্ণ।

বিশুদ্ধ জ্ঞানালোচনার সে আনন্দ তাহা সহজ সৌন্দর্য্যানুভূতির আনন্দ হইতে পৃথক্ হইলেও অনেকটা ঐ একজাতীয়। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে জ্ঞানের আনন্দ অন্যকোন আনন্দ অপেক্ষাই কম নহে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিকগণ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অন্যান্য নানাশাস্ত্রালোচনায় যে আনন্দ লাভ করেন তাহা অতুলনীয় ও অন্যের অপরিজ্ঞেয়। কপিলমুনি, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, প্লেটো, হেগেল, নিউটন, গ্যালিলিও, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি পৃথিবীর খ্যাতনামা মনীষিগণ তাহাদের নব নব আবিষ্কারে অনির্ব্বচনীয় বিমল আনন্দ পাইয়াছেন; তাঁহাদের জ্ঞানপিপাসু অনুশীলনকারিগণও পরম আনন্দ পাইয়া থাকেন।

উন্নত নৈতিক-জীবন ও ধর্ম্ম-জীবনে মানুষ ভূমা আনন্দ ও পরাশান্তি লাভ করে। কিন্তু সেরূপ আনন্দ জগতে বিরল। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গ, পরমহংস, বিবেকানন্দ, গান্ধীর পরিপূর্ণ আনন্দ কয়জনে লাভ করিতে পারে? তথাপি ইহাদের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে, ইঁহাদের উপদেশানুসারে জীবনে সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধান করিবার চেষ্টা করিলেও গভীর আনন্দরসের অনুভূতি হয়।

এইভাবে চারিদিকে আনন্দের এত বিচিত্রলীলা দেখিয়া জীবনে আনন্দের স্থান নাই একথা কি করিয়া বিশ্বাস করিব? কি করিয়া বলিব যে এ সকলই মায়া, সকলই মিথ্যাভ্রমমাত্র? সন্তানের মৃত্যুতে মাতার ভাষাতীত, অপরিমেয় শোক যেমন সত্য, নবজাতশিশুর হাসিমুখ চাহিয়া জননীর যে গভীর আনন্দ তাহাও কি তেমনই সত্য নহে? অকাল বৈধব্যের অসহ

যন্ত্রণা যেমন প্রকৃত, নববধূর লজ্জাবিজড়িত সুখও কি তেমনই প্রকৃত নহে? ব্যর্থতার দুঃখকেই কেবল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব, সফলতার আনন্দকে কি একেবারেই অস্বীকার করিব?

কিন্তু তাহা সম্ভব নহে; আনন্দের সত্তাকে অস্বীকার করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। পৃথিবীতে যেমন শোক আছে, সেইরূপ শোকের সান্ত্বনা আছে, নদীর একপ্রান্তে যেমন ভাঙ্গন ধরে, অন্যপ্রান্তে তেমনিই নির্ম্মাণ কাজ আরম্ভ হয়. মৃত্যুর পর জন্ম হয়, প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি হয়। এইরূপে, নবনব সৃষ্টির আনন্দের মধ্য দিয়া মানবজাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, এইরূপে মানব মনের বিচিত্রলীলার বহুমুখী ধারায় অভিষিক্ত হইয়া মানুষের পৃথিবী ফুলে, ফলে, শোভায়, সৌন্দর্য্যে, হাসি, আনন্দ গানে স্বর্গপুরী হইয়া উঠিতেছে।

কমলাকান্ত ও দুষ্ট-সরস্বতী সংবাদ

পূরাণে মহাভারতে দেখা যায় দুষ্ট-সরস্বতী একজন ছিলেন। কি রকম ছিলেন, কেমনতর ছিলেন, আকৃতি কেমন, তা কিন্তু কোথাও লেখা নেই। অথচ ক্রমাগত তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাবের অপ্রতুল নেই। কারুর কিছু বাড় অর্থাৎ অহঙ্কার হয়েছে, ডাক একজন মুনিকে, তারপরে তাঁর জিহ্বায় দুষ্ট-সরস্বতীকে,—তারপর আর কি! অথবা কারুকে জব্দ কর্‌তে হবে তার মুখেই এলেন দুষ্টসরস্বতী। সে মুনিঋষিকে কিছু বলে যখন। কিন্তু এই অঘটন ঘটনপটীয়সী দেবীর রূপ বর্ণনা কিন্তু কোথায়ও নেই। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আকাশবাণীর মত কেউ। এই আকাশবাণী দেবতামানুষের নরবানরের যক্ষরক্ষ-যারই যখনি বিপদ হয়েছে অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হয়ে 'মুস্কিল আসান' করেছেন। অতএব ধরে নেওয়া যায় এঁরা দু'জনেই দেবকন্যা তাই অঘটন ঘটনপটিয়সী।

আশ্চর্য্য এই যে, সরস্বতীর পূজা আছে, লক্ষ্মীর ও পূজা আছে। এবং লক্ষ্মীর অলক্ষ্মী একজন আছেন, লোকাচারে তাঁর অর্চ্চনাও হয়। অথচ দুষ্টসরস্বতীর অর্চ্চনার নামও নেই। মানুষ যে কখন কাকে পূজা করে কেউ জানে না!

সন্ধ্যার অন্ধকারে আর পূরাণ ঘাঁটা গেল না। ছাতে বেরিয়ে গেলাম। এবার আশ্বিনেও শ্রাবণের সন্ধ্যা।

পশ্চিমপূর্ব উত্তরদক্ষিণ সব ঘিরে মেঘ জমাট হচ্ছে। কেউ নড়ছে না অথচ খুব ধীরভাবে মন্থর আয়োজনে বড় লোকের বাড়ীর কাজের সময়ে পুরোণো চাকরের মত মুরুব্বিযুক্ত গম্ভীর চালে নড়াচড়া করে কাজ করেছে, যেন এই অতিশয় বনিয়াদী পূরাণো

পৃথিবীতে যেন তারো চেয়ে পুরোণো বিবর্ণ একটী চাঁদোয়া টাঙ্গানো হচ্ছে, তাদের কিসের উৎসবের জন্য।

কতক্ষণ বসেছিলাম অথবা মাদুরে শুয়েছিলাম মনে নেই হঠাৎ দেখি যেন কে এসে দাঁড়ালো পাশে। অন্ধকারে ঠাহর হয় না, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম 'কে'?

মধুর সহজ অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর এলো, 'বৎস আমি'। উঠে বললাম, 'কে আপনি?'

"যাঁকে ধ্যানে পাওয়া যায় নাই, অথচ ব্রহ্ম নন, আকারে পাওয়া যায় নাই তথাপি নিরাকার নহেন, আধারে কেহ দেখেন নাই, আমি জিহ্বাবাহিনীবাণী নই, তথাপি জিহ্বাগ্রেই আমার বাস। আমার বর্ণ নাই, বীণা নাই, বাণী নাই, কিন্তু মু্নি ঋষি ব্রাহ্মণের জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান হইতাম; আমি অরূপা বা অজ্ঞাতরূপা, কিন্তু তথাপি আমি অনেকের প্রিয়; বীণা বাদন করিনা, কিন্তু আমার গান অনেকে বীণার মতই শ্রবণ করেন। বাণী প্রচার করিনা, কিন্তু আমার কথা সুস্বাদু সন্দেহ নাই এবং সুন্দরও সর্ব্বত্র প্রচারিত।

অর্থাৎ যাহাকে ধ্যান করিতেছিলে আমি সেই দুষ্ট স্বরস্বতী। আমি চরাচরে এখনো আছি, অলক্ষ্মীর মত আমারও গতি সর্ব্বত্র। তবে তাহাকে বিদায় করে বলিয়া তাহাকে দেখিতে পাও, আমাকে অর্চ্চনা-আদর করে তাই বুঝিতে পার না, আমি কোথায় আছি অথবা নাই। আমি প্রকৃতজনের ও স্ত্রীজাতির জিহ্বায় যখন আবির্ভূত হই, তখন আমার নাম হয়—'হককথা'। যে কথা লোকে 'নাহক' বলে, পণ্ডিতজনের জিহ্বায় স্থান নিলে আমার নাম দুষ্টসরস্বতী। তুমি আমাকে ধ্যান করিয়াছ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাই আসিলাম।"

এতক্ষণে তাঁকে দেখ্‌তে পেলাম—

রং তাঁর ঈষৎ নীলাভ গৌর; যেন শ্যামের আভা মিশ্রিত। গলায় মর্ত্তমী ফুলের মালা (কমলমাল্য নয়) একহাতে বরাভয় মুদ্রা, বামহস্তে বিদেশী পত্রিকা ও বই। আবার মৃদু হাসির মত, চোখে করুণা। পরিধানে ঈষৎ নীল বসন। সশঙ্ক বিস্ময়ে কৌতুহলে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। ঈষৎ হেসে তিনি বল্লেন, কি দেখিতেছ? এযুগে আমার সেই আলৌকিক গতিবিধি প্রয়োজন নাই। ইহারা অবিশ্বাসী এবং অসহিষ্ণু। শাপ ও শাপান্ত কাল অপেক্ষা করে না, ব্রাহ্মণ মুনি গ্রাহ্য করে না, সহসাই দণ্ডবিধিও বিচারশালায় শরণ গ্রহণ করে। সেইজন্য আমি এক্ষণে অন্যত্র কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়াছি। তাহা সাহিত্য প্রাঙ্গনের মধ্যে জিহ্বায় নহে লেখনীতে।

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, আমার যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা বাণী উপাসক অপেক্ষা শীঘ্র যশস্বী হইয়া থাকেন। এই আমার বামকরস্থিত নানাবিধ রচনাতে বহুমনীষি—বহু প্রতিভাশালীর রচনা আছে। আমার প্রসাদ যাঁহারা লাভ করিতে চান, তাঁহাদের সাধনায় প্রয়োজন নাই, শ্রবণ দরকার নাই, তপস্যা অনাবশ্যক। এই প্রসাদ লাভ করিতে হইলে শুধু প্রয়োজন তাড়া। অতিশয় তৎপরতাসহ এই নানা দেশীয় সাহিত্য পাঠ। তাহার পর?'

ঈষৎ হাস্যে দেবী বল্লেন, বুঝিলে কি তারপর কি? তাহারপর চমক প্রয়োগ। পাণ্ডিত্যের চমক, ভাষার চমক, সমস্যার চমক্, নানাবিধ রূপ চমক্ প্রয়োগ। যথাসম্ভব সত্বর এইসব চমকক্রিয়া যাহারা আয়ত্ব করিয়া লইতে পারে, আমি তাহাদেরই প্রতি সন্তুষ্ট হই। এই যন্ত্র যুগে সাধনায়, ধীরতায়, শ্রমের কর্ম্মের মূল্য নাই, তাহা সময়ের হানিমাত্র। বাণী উপাসকের হাতে 'কাল অন্তহীন' কিন্তু আমার উপাসকরা জানেন যে মানুষের আয়ু অন্তহীন নহে!

তুমি এই পাঠ লইতে চাও? তৎপরতা থাকে, গ্রহণ কর। রচনার নামকরণে বা পুস্তকের নাম রচনায় বাঙ্গালী পিতামাতার মত নূতনত্ব খুঁজিয়া লও ইহাই ইহার গূঢ়তত্ত্ব। প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম উপায়। তুমি লইতে পার এই প্রসাদ।'

সভয়ে উত্তর দিলাম, 'না, আমার তাদৃশ তৎপরতা নাই। তবে অনুমতি করেন তো, আপনার আবির্ভাবের ঘটনাটী আমি প্রচার করি।'

দেবী বল্লেন, 'তথাস্তু। অতঃপর সরস্বতী পূজার পরদিন আমার পূজার বিধানও তুমি প্রচার করিয়ো। উপকরণাদি সমস্তই দেবী বাণীর মত। মাত্র আমাকে বীণা ও কমল মালিকাশূন্য দ্বিভুজদেবতারূপে ধ্যান করিয়ো। যাঁহারা অলক্ষীর ন্যায় আমারও দেবী সরস্বতীর পূজা কর্‌বেন, তাঁহারা বাণীর ও আমার বিশেষ প্রসাদভাগী হইবেন। আমার প্রসাদ দেবীর প্রসাদ অপেক্ষা স্থলভতর জানিয়ো।'

দেবী অন্তর্হিতা হলেন। দেবীর রথচক্রের গুরু ঘর্ঘরে জেগে উঠ্‌লাম।

দেখলাম, আকাশে মেঘ ও বিদ্যুতের ব্যস্ত যাতায়াত আরম্ভ হয়ে গেছে। বৃষ্টি আস্‌তে দেরী নেই।

আমেরিকায় জাপানী সমস্যা।

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

কয়েকদিন আগে থিয়েটার দেখে রাত ১২টার সময় নিউইয়র্কের বিখ্যাত টাইমস্ স্কোয়ার ষ্টেশনে Subwayর জন্য (মাটির নীচের গাড়ী) অপেক্ষা করছিলাম। তখন সবে থিয়েটার ভেঙ্গেছে, সবাই গৃহমুখী, তাই ষ্টেশনে ভীড়ও বেজায়। ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই আমাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে, বই বগলে ও হাতে সুটকেস্ নিয়ে পাঁচটী যুবতী ও দুইটী প্রৌঢ়া উঠ্‌ল। ট্রেণে বসার জায়গার অভাব থাকায় প্রৌঢ়া দুটীর বসার স্থান কোনমতে করে ঐ পাঁচটী মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজেদের মধ্যে হাস্যালাপ কর্‌তে লাগলো। তাদের হাসিতে, ভাব ভঙ্গিতে, ও চ্যাপটা নাক মুখ দেখে বুঝ্‌লাম তারা শুধু যে স্কুলের মেয়ে তাই নয়, তারা জাপানী, চীনা বা ঐ জাতের কিছু হবে। কিন্তু তাদের কথায় বার্ত্তায়, কাপড়ে চোপড়ে, ছাঁটাচুলের পারিপাট্যে তাদের সঙ্গিনী আমেরিকানদের চেয়ে কোন পার্থক্য ছিল না। আমার তখন একটা হাসির কথা মনে পড়ে গেল এখানে সেটা না লিখে পারছিনা। কলিকাতার কোনও হোটেলে একটী আমেরিকান পরিব্রাজক ও একটী চীনা ভদ্রলোকের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে কথোপকথন হয়। (চীনা ভদ্রলোকটীর ইউরোপীয় কাপড় চোপড় পরাছিল)।

আমে—Say, what kind of "ese" are you ? অর্থাৎ তুমি আবার কোন রকমের "ইজ" ?

চীনা—I don't understand what you mean sir ! (আপনি কি বলছেন আমি তা বুঝ্‌তে পারছিনা মশায়!)

আমে—I have seen Japanese. I have seen Javanese, I have seen Chinese, but what kind of "ese" are you ? আমি জাপানীজ দেখেছি, জাভানিজ দেখেছি, চাইনীজ দেখেছি, কিন্তু বুঝতে পারছিনা তুমি কোন দেশীয় 'ইজ' ?

চীনা—O ! May I ask, what kind of 'ese' are you sir ? ওঃ, মশায়কে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনি কোন্ দেশীয় "ইজ" ?

আমে—I don't understand what you mean ? তুমি কি বলতে চাও তা আমি বুঝতে পারছিনা। (কেননা ইনি আমেরিকান পোষাকে ছিলেন সুতরাং এর ধারণা ইনি যে আমেরিকান তা সকলেরই বোঝা উচিত।)

চীনা—I mean that I have seen monkies. I have seen donkies and I have seen Yankees, but what kind of "ese" are you ? আমি মাঙ্কি (বানর) দেখেছি, ডঙ্কি (গাধা) এবং আমেরিকান ইয়াঙ্কি দেখেছি কিন্তু জান্‌তে চাই আপনি কি ?

গাড়ীতে আমরাও আমাদের মধ্যে পুরা বাংলা ভাষাতেই এই ক'টী মেয়ের 'ইজ' নিয়ে খানিকটা হাসাহাসি করলাম। আমেরিকায় বিশেষতঃ নিউইয়র্কে এইরকম আরও অনেক রকমের 'ইজ' দেখা যায়।

বর্ণ-বিভেদ ও বর্ণ-বিদ্বেষ আমেরিকায় অতি প্রবল এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সব চ্যাপটা মুখ, আকারে ছোট, বর্ণে হলুদ জাপানী-সমস্যা এদেশে কিরূপ দ্রুতবেগে বেড়ে যাচ্ছে তা এ দেশের সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে যা আভাস পাওয়া যায় তা দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। সোজা কথায় বল্‌তে হলে এই বল্‌তে হবে, যে এই শ্বাদা জাতীয় ছুঁচালো মুখ, বৃহৎ আকার মানুষগুলো অর্থাৎ শাদা আমেরিকানরা, চ্যাপটা মুখো, শ্রমশীল, স্বাবলম্বী, জাপানীগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। দেখা যাক্ এর কারণ কি ?

আদম শুমারীর হিসাবে দেখা যায়, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৯৩১ সালে মোট ১৩৫,০০০ হাজার জাপানীর বাস। তার মধ্যে এক ক্যালিফোর্ণিয়া (California) ষ্টেটেই ৯৭,০০০ হাজার বাস করে। কাজেই যুক্তরাজ্যের জাপানী-সমস্যা না বলে ক্যালিফোর্ণিয়ার জাপানী-সমস্যা বল্লেই বোধ হয় অনেকটা ঠিক বলা হয়। তবে ক্যালিফোর্ণিয়া যখন যুক্তরাজ্যেরই অন্তর্গত তখন এরা জাপানী সমস্যাটাকে এদেশের জাতীয় সমস্যার মধ্যে মনে করে। অথচ এদের বড় বড় সহরগুলির চীনা পাড়া বা জাপানী পাড়া দেখ্‌লে মনে হবে বুঝিবা আমেরিকা ছেড়ে চীন বা জাপানে গিয়াছি

(Los angenles) লছ এঞ্জেলিসে, যেখানে মেক্সিকান্, চাইনিজ, ফিলিপিলো ও ইটালিয়ান্ জাতীয় বিদেশী লোকে ভরপুর, সেইখানেই 'Little Tokyo' বা "ক্ষুদ্র টোকিও" ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে জাপানী ভাষায় জানিয়ে দেয় এটা আমেরিকা হলেও জাপানী দেশে এসেছি। দোকান, পসার, হাট, বাজার, সংবাদপত্র, রেষ্টুরেণ্ট, ঔষধালয়, ব্যাঙ্ক, ধর্ম্ম-মন্দির, বায়স্কোপ সমস্তই জাপানী রকমে, জাপানী কায়দায়, জাপানী ভাষায়। দেখলে মনে হয় সমস্ত দেশজোড়া বুঝি কেবল জাপানীরই বাস। আমেরিকার কথা তখন ভুলে যেতে হয়। ক্যালিফোর্ণিয়া ষ্টেটের এ সমস্যা লছ্ এঞ্জেলেস্ সহরেই সর্ব্বপ্রধান। নিউ ইয়র্ক ষ্টেটে মাত্র ৬,০০০ জাপানীর বাস। জাপানীরা যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে না এসে পশ্চিমাঞ্চলেই অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায় ও কায়েমী ভাবে বাস করছে। কাজেই ক্যালিফোনিয়ার শাদারা জাপানী সমস্যা নিয়েই বেশী চিন্তিত ও ভীত ; এবং সর্ব্বদা তাই নিয়ে আলোচনা করে থাকে। অবশ্য এসব আলোচনা যে জাপানীদের খুব রুচিকর মনে হয় তা আদৌ নয়।

লছ এঞ্জেলেস্ সহরে যত জাপানী এত আর কোনও সহরে নাই। সহরে হৌক আর পাড়াগায়ে হৌক জাপানীরা সাধারণতঃ নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই বাস করে। তাদের সন্তানরা একই Public School এ অন্যান্য শাদা ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে শিক্ষা পেলেও, সামাজিক ব্যাপারে শাদার সংস্পর্শে আস্‌বার সুযোগ এদের অত্যন্ত কম। তবু উদ্যমশীল জাপানী অহরহ তাদের নিজেদের সমাজের উন্নতির জন্য ব্যস্ত। বিভিন্ন ব্যবসায়ে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি লক্ষপতি হয়েছে। এমন কি কোন কোন ব্যবসায়ে এবং দু' একটি কৃষিকাজে আমেরিকানদের পিছনে ফেলে কয়েকজন কোটিপতি উপাধি পর্য্যন্ত পেয়েছে।

অনেক জায়গায় শাক্ শব্জির দোকান হাটবাজার সবই জাপানী লোকের দ্বারা চালিত। অনেক শাদা মার্কিনরা অন্য কোনও সময়ে আসুক বা না আসুক বাজার হাট কর্বার সময় জাপানীদের সংস্পর্শে এসে থাকে। জাপানীদের অসাধারণ কৃষি ও শিল্পের জ্ঞান তাই বাগান তৈরী করবার জন্যও অনেক আমেরিকানকে জাপানীর শরণাপন্ন হতে হয়। নতুবা তারা 'যিশু খৃষ্টের প্রেম' এক বিন্দুও জাপানীকে অকারণে বিলায় না। কাজেই জাপানীদের সম্বন্ধে শাদারা যখন কথা বলে তখন জাপানী সমস্যার কথা ছাড়া আর কিছু হয় না। এই জাপানী বিদ্বেষ ক্যালিফোর্নিয়ার শাদারা গভীরভাবে হৃদয়ে পোষণ করে থাকে। অন্যান্য ষ্টেটের লোকেরা, যারা কখনো জাপানী ইতিপূর্ব্বে চোখে দেখেনি তারাও ক্যালিফোর্ণিয়াতে এসে ছোয়াচে রোগের মত জাপানীদের বিষয়ে তিক্ত ভাব ও ঘৃণা দেখাতে সুরু করে। এটা সত্যই একটা ছোঁয়াচে রোগ সন্দেহ নাই।

১৮৯০ সালের পর থেকে যুক্তরাজ্যে জাপানীরা সংখ্যায় বেশীরকমে আস্তে আরম্ভ করে। এবং ১৯১০ সালের মধ্যে ৭০,০০০ হাজার এদেশে Immigrants হিসাবে প্রবেশ করে। ১৯০৮ সালে "Gentlemen's agreement" এ্যাকট্ এ ইমিগ্রেসন (অর্থাৎ বাইরে থেকে আসা) প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯২৪ সালে ইহা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বর্ত্তমানে আমেরিকার মোট ১৩৫,০০০ হাজার জাপানীকে দুই দলে ভাগ করা যায়। যারা জাপানে জন্মেছে তারা অবশ্য প্রবাসী জাপানী আর যারা আমেরিকায় জন্মেছে তারা চেহারায় জাপানী হলেও আইনতঃ আমেরিকান। অতএব নাগরিক হিসাবে শাদার মতই তার সকল দাবী ও সকল অধিকার আছে। প্রথম দলটী অর্থাৎ যারা জাপানে জন্মিয়া আমেরিকায় আছে, তারা সুসভ্য, সুশিক্ষিত পরিমার্জ্জিত বা (Cultured) হলেও আমেরিকার আইনে নাগরিক হিসাবে কোন অধিকার পায় না; আর যারা আমেরিকার মাটিতে জাপানী চেহারা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে—তারা শাদার মত আইনতঃ সকল জিনিষের অধিকারী হলেও অনেক রকমে সুযোগ পায় না। 'মার্কিন জাপানী' আমেরিকার জাতীয় খাবার Corn Beet & cabbage খেতে বসবে, 'Black Botton' নাচ নাচতে বসবে, অথবা আমেরিকার 'বিশুদ্ধ slang' বল্তে পারে, কিমানো ছেড়ে হ্যাটকোট পরে জাপানীজ" না হয়ে "ইয়াঙ্কি" "হতে পারে, তবু তার মার্কামারা জাপানী রূপ, এ্যামণ্ড বা (almoud) বাদামের মত চোখ তাকে জাপানী করেই রাখে। তার সাদা আমেরিকান ভায়ের মত সকল সুযোগ সুবিধা তার জোটেনা।

যুক্তরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে, অর্থাৎ ক্যালিফোর্ণিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটী ষ্টেটের আইনে কোন জাপানী জমীর অধিকারী হতে পারেনা। এবং বিভিন্ন জাতিতে (অর্থাৎ শাদা ও কাল বা শাদা ও হলুদ জাতি ইত্যাদি) বিবাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ, কাজেই আইন পাশ হওয়ার আগে যারা সাদা বা জাপানী বিয়ে করবার সুযোগ পেয়েছে, তারা বিয়ে করেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে

শাদা বিয়ে ক'রতে পারে না তাই প্রতি তিনটী জাপানী পুরুষের জন্য মাত্র দুটী জাপানী মেয়ে জোটে। বাকীদের যে কি উপায় হবে আমেরিকা তার জবাব দিতে নারাজ।

সুচতুর জাপানী জমির অনধিকারী হলেও দম্‌বার পাত্র নয়। তাদের সন্তান জন্মিলেই ২।৩ বছরের শিশুদের নামেই জমি কিনে চাষ আবাদ করে। সন্তান আমেরিকান হওয়াতে তার জমির অধিকার অবশ্য আছে। অগত্যা এখন পর্য্যন্ত এর বিরুদ্ধে কোনও আইন পাশ হয় নাই।

যে সব জাপানী এদেশে এসেছে তাদের অধিকাংশই কৃষক, কাজেই খুব কম সংখ্যক জাপানীই কল কারখানায় কাজ করে বা কর্‌বার চেষ্টা করে। অধিকাংশ জাপানী সহরের বাইরে চাষ আবাদ, মাছ ধরার কাজ ও ফুলের বাগানের কাজ করে থাকে। যে সব জাপানী সহরে বাস করে—তারা অধিকাংশই ক্ষুদ্র বণিক এবং সাধারণতঃ স্বজাতির মধ্যেই ব্যবসায় করে। খুব কম সংখ্যক জাপানীই চাকরের কাজ করে থাকে। যদিও সাধারণের ধারণা ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ চাকরের কাজে জাপানীরা বিশেষ অভিজ্ঞ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্যালিফোর্ণিয়ায় ইহা আদৌ সত্য নয়।

জাপানী ইমিগ্রাণ্ট্‌স্‌রা ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ চালাবার মত ইংরাজি শিখ্‌তে পারলেই যথেষ্ট মনে করে এবং স্বজাতির মধ্যেই বাস করতে ভালবাসে। আত্ম-সম্মান জ্ঞানী, জাপানীদের কখনো Charity-roll এ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। জাপানী সোসাইটী তাদের দরিদ্রদের দারিদ্র্যতা নিজেদের মধ্যেই সমাধান করে থাকে। চ্যারিটী (charity) নেওয়া এরা অতিশয় মানহীনতার কাজ মনে করে থাকে, কাজেই আমেরিকার Charitable Society গুলো দরিদ্র জাপানীর দারিদ্রতা সমস্যার ভাবনা থেকে অব্যাহতি পায়। ইহাছাড়া আমেরিকায় বছরে যত খুন, ডাকাতি, Kidnapping. চুরি, Rackteering অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলে যতরকমের পাপ (Crime) হয়, জাপানীদের সংখ্যা এক্ষেত্রে সমস্ত জাতীয় লোকের অতি নিম্নে। আমেরিকায় জাপানীদের মধ্যে (Crime) জিনিষটা নাই বল্লেই হয়। এজন্য জাপানীরা অতিশয় গর্ব্ব অনুভব করে থাকে। করিবার কারণও যথেষ্ট আছে। এদেশে তারা নিজেদের খরচে হাঁসপাতাল অনাথ ও আতুর আশ্রম চালায়, কাজেই জাপানীযুক্ত রাজ্যে বাস করেও সকল রকমে স্বাবলম্বী। আমেরিকার গলগ্রহ হতে চায় না, হয়ও নাই।

যে জাতের লোক একনিষ্ঠার সঙ্গে জীবিকা উপার্জ্জন করে, যারা দেশের সকল আইন কানুন মেনে নীরবে কাজ করে যায় এবং তাদ্বারা নিজেদের ও দেশের উন্নতি করে তাদের প্রতি এত বিদ্বেষের কারণ অনেকে মনে করেন যে কর্ম্মপটু জাপানী বাস্তবিকই শ্রমশীল, সে, দিন রাত খেটেও কাতর হয় না, বরং সে তার কর্ম্মের মধ্যে তিক্ততা না পেয়ে আনন্দের আস্বাদ পায়, কাজেই তার জিনিষ সে বাজারে যত সস্তায় বিক্রি করতে পারে শাদা জাতের লোকেরা তা

পারে না। জাপানীর Standard of living আমেরিকানদের তুলনায় নীচু ইহাও অনেকের ধারণা। এবং এই সব কারণে বোধহয় মাকিন চাষীরা ইহাদের সঙ্গে পেরে উঠে না। এরা খাটে বেশী—তাই উপায়ও করে বেশী, আবার খরচ করে কম তাই সঞ্চয় করেও বেশী। আমেরিকানরা ঠিক এর বিপরীত—তাই এত রাগ।

ক্যালিফোর্ণিয়ার জনসাধারণের জাপানীর প্রতি বিদ্বেষের আরও একটী কারণ, যে, সাধারণের বিশ্বাস জাপানী মা প্রতিবৎসরে একটী করে সন্তান জন্ম দিয়া থাকে এবং যতকাল সম্ভব হয় এভাবে কেবল সন্তানের জন্ম দেয়। কাজেই এদেশে শীঘ্রই হলদে মানুষে ভরে উঠ্‌বে। আর শেষটা কি না এই হল্‌দের কাছে শাদাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এভয়ের কোন ভিত্তি নাই। কিছুদিন আগে Stanford বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে বিশেষ Survey ও গবেষণা করে দেখিয়েছে, যে ক্যালিফোর্ণিয়ায় জাপানীদের জন্মহার শাদাদের চেয়ে মাত্র হাজার করা ৩ জন বেশী। এ তুলনা করা হয়েছে সমস্ত যুক্তরাজ্যের মোট জন্মহারের সঙ্গে (১৯৩০ শালে যুক্তরাজ্যে জন্মহার ছিল হাজার করা ১৯ জন)। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কোনও ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে তুলনায় জাপানী জন্মহারের পার্থক্য কিছুই নয় বল্‌তে পারা যায়। গ্রামবাসী জাপানীর সংসার প্রতি ৩-৫ জন ও সহরবাসী মাত্র ২-৭ জন সন্তান আছে। কাজেই এ ভীতি ভিত্তিশূন্য।

কয়েক সপ্তাহ আগে Phoenix arizona তে জাপানী বাসিন্দাদের উপর সেখানকার শাদারা ভয়ানক অত্যাচার ও মারধর করেছে। সাদাদের তুলনায় সেখানকার জাপানীদের আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল, তাই এত হিংসা। শাদাদের আক্রোশ, জাপানীরা সস্তায় জিনিষ বিক্রী করে (underselling) কিন্তু শাদারা তা পারে না; এবং শাদা চাষীরা তাদের জমিতে কিছু না কর্‌তে পেরে যখন ফেলে রাখে তখন এই হলদে রংয়ের মানুষগুলো সেই জমিতেই চাষ আবাদ করে দিব্য স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করছে। জাপানীদের প্রতি এরকম অত্যাচার আজ নূতন নয় ক্যালিকোর্ণিয়াতে এরকম অত্যাচার বহুবার হয়েছে। ইহার শেষ কোথায় বা কবে কে বল্‌তে পারে?

মুস্কিল হয়েছে এই তরুণ আমেরিকান—জাপানীজ সমাজ নিয়ে। তারা আমেরিকার আব্‌হাওয়ায় শিক্ষা দীক্ষায় মানুষ হয়েও না হচ্ছে আমেরিকান, আবার না হতে পারছে খাঁটী জাপানী। কাজেই তাদের চাঞ্চল্য। তাদের অশান্তি—তাদের নীরব ক্রন্দন!

যুক্তরাজ্যে জাপানীসমস্যা, নিগ্রোসমস্যার মতই দিন দিন জটিলতর হয়ে উঠ্‌ছে। ইহাদের উপায় কি? এদের ফেলাও চলেনা, নিয়েও চলা যায়না, তবে শাদায়, কালোয়, হল্‌দে লালে এক হলেই বা মন্দ কি? তাতে গলা কাটাকাটি কমে হয়ত প্রীতির বন্ধনই বাড়্‌বে। কিন্তু গর্ব্বান্ধ মানব তা বোঝে কই, বুঝলেও মান্‌তে চায় না। সংস্কার তাকে এমনি করে ধরে বসে আছে এবং উদার অনন্তকে দেখেও দেখছেনা।

মা বাপ ও সন্তান

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

বহুদিন হল একজন আমেরিকান মহিলা বার্থকন্ট্রোল সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দিলেন। একদিন শুধু মেয়েদের, একদিন মেয়ে ডাক্তারদের, একদিন শুধু ডাক্তারদের, এবং একদিন সর্ব্বসাধারণকে তিনি তাঁর বক্তব্য বল্লেন।

তিনি যা বলেছিলেন, তার মর্ম্ম এই প্রত্যেক মানুষের তার যে ক'টী সন্তানকে মানুষের মতকরে পালন করবার ক্ষমতা আছে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে ও স্বচ্ছন্দে; তার সেই ক'টাই সন্তান যাতে হয় তার সুযোগ এখন বিজ্ঞান দিয়েছে। অর্থাৎ মা বাপের আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্যের অবস্থা, বিবেচনা করে তাদের ইচ্ছামত সংখ্যক সন্তানের মা বাপ হ'তে তারা পারে। মানুষকে তার সন্তানকে পালন করলেই যখন শুধু হয় না, নানারকম সুযোগ সুবিধা তাকে দিতে হয়, সব মাতা পিতারই, সেটা একটা আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও; তখন বিজ্ঞানের এই সাহায্য গ্রহণ কর্‌লে মা বাপ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য, উৎকৃষ্ট গুণ ও সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা তাদের দিতে পারবেন ইত্যাদি। এর পরেও তিনি অনেক কথা বিশদ করে বুঝিয়ে বল্লেন, দেশবিদেশে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি নেওয়া, তাদের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা থেকেভবিষ্যৎ বংশীয়দের রক্ষাকরা তাদের বাধা পাওয়া এবং তথাপি এর প্রচার ও প্রসার ইত্যাদি।

যথারীতি তিনি তাঁর বক্তব্য বলার পর প্রতিবাদ বা জিজ্ঞাস্য কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতিবাদও একটী উঠ্‌ল।

প্রতিবাদ কারিণীর বক্তব্য ছিল, যেহেতু ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিকাজ যেহেতু জনসাপেক্ষ, সেইজন্য ভারতবর্ষে যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ অবাধে প্রবর্ত্তিত হয়—তাতে দেশের ক্ষতিই হবে।

অবশ্য প্রতিবাদকারিণীর ও কথার প্রতিবাদ হল। দেশের দারিদ্র্য, তার কারণ দেশের জনসংখ্যা সত্যই বেশী বা কম কিনা, এবং জন্মসংযম মানুষের কেন দরকার খানিকটা এদিক ওদিক আলোচনার পর সভাশেষ হ'ল।

সমস্ত বক্তৃতাটির চুম্বক পেলে ভাল হ'ত জয়শ্রীর জন্য, এই ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম।

দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, যে বুকচাপের মত প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধিমান সাধারণ সকলের বুকে চেপে আছে, সেকথা বেশী বলবার দরকার করে না। মানুষের মত ক'রে তারা সন্তানকে মানুষ করতে পারেন না, তার স্বাস্থ্যের, তার শিক্ষার, তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমরা যে কোনো সভ্য দেশের মত কোন সাহায্যই করতে পারি না, এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ সাহায্য পাইনা, এও নির্ম্মম সত্য। আর এই সম্বন্ধে সেদিনের সভায় বিদেশিনীদের মত দেখলাম, দেশ over populated অর্থাৎ জন্মহার বেশী দেশে তাই দরিদ্রতা এত পরিস্ফুট; যাঁরা তাঁদের মতের

প্রতিবাদ করলেন, তাঁরা সেটাকে দেখালেন অন্যদিক দিয়ে যে, দারিদ্রবলেই জন্মহার (এবং মৃত্যুহার।) বেশী মনে হচ্ছে, যে দারিদ্র্যের কারণ অন্য অনেক দেওয়া যেতে পারে। জন্মসংখ্যা হার যত বেশী মনে হচ্ছে তত নয় অন্যদেশের সঙ্গে কসে দেখ্‌লে। কেননা অন্যদেশেও জন্মসংখ্যা বেড়েছে এবং মৃত্যুসংখ্যা কমেছে।

কবে দেশের আর্থিক দুর্দ্দিনের অবসান ঘটবে, কবে ভগবান দয়া এবং দেশের ভাগ্যনিয়ন্তারা তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে সুদৃষ্টিপাত করবেন, কবে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মড়ক, বন্যা, মারী, ব্যাধি দেশে আর হবে না, কিম্বা এথেকে আত্মরক্ষা করতে শিখবে মানুষ, সেকথা কেউ জানে না। কাজেই সাধারণ দিকথেকে অতিশয় সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, দরিদ্র নিরন্ন দম্পতীর দিকে চেয়ে মনে হল, এইবিষয়ে মা বাপের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের আলোচনাই দেশের এখন দরকার। যদি কিছু প্রতিকার সম্ভবহয় তো, ঘরে ঘরে এই ছোটদিক দিয়েই হবে, এই মা বাপের হাতে থেকেই হবে। অর্থ দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, প্রচার করে, রাষ্ট্রের সহায়তায় ধনীর দেশের মত করে হবে না, যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী করে বাপমার মনকে জাগ্রত করে তুলতে হবে এইদিকে। সত্যিকরে সন্তানের হিত ভাববার জন্য। আমাদের অদৃষ্টবাদী দেশে যেটা দেখাহয় না, ভাবাহয় না সাধারণতঃ।

অনেকে এই বিষয়টার এমনিই প্রতিবাদ করেন, অনেকে এটা আলোচনা পছন্দ করেন না, অনেকে এটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধতা ও মনে করেন।

এমনিই যাঁরা প্রতিবাদ করেন ভেবে না দেখে, আমার বিশ্বাস, ভাবতে পারলে তাঁদের মত বদলাবে। তাঁরা সংস্কার বলেই করেন। যাঁরা আলোচনা পছন্দ করেন না, তাঁরাও এটাকে সহজ ভাবে দেখেন না। তাঁরা বুঝতে পারেন না, যে, সমাজের ও মা বাপের লজ্জা, সন্তানের অস্বাস্থ্যে, অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে রাখায়, তার প্রতিকারের জন্য চেষ্টায় মানুষের অন্ততঃ মা বাপের লজ্জার কিছু নেই।

প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়ার কথা যাঁরা ভাবেন বা বলেন, তাঁদের ধারণা নেই, প্রকৃতিকে আমরা কতদূর, কত বেশী, কত অদ্ভুত ভাবে ছাড়িয়ে—অতিক্রম করে এসেছি। আমরা প্রকৃতির শিশু নই, প্রাণী জগতের মত আমাদের জীবন যাত্রা নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধেই মানুষের অভিযান, মানুষের জীবন, পুরাণ ও অদৃষ্ট শাস্ত্রে তাই লেখে। এবং এও দেখা যায়, প্রকৃতিই প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলে। কেননা, প্রাকৃতিক নিয়মেই একজন পুরুষ যদি বহু বিবাহ করেন, তাহলে তার বহু স্ত্রীর অনেক অজস্র সন্তান হ'তে পারে। (যাদের প্রতিপালন করা, মানুষ করা, একজনের সাধ্য নয়।) আর একজন জননীর পক্ষে স্বাস্থ্য, সেবা, শিক্ষা দেওয়াও সাধ্য সীমার মধ্যেই সম্ভব। বহু তো দূরের কথা।

এ বিষয়ে বড় বড় কথা এবং বিজ্ঞান ও অন্য আলোচনা যাদের প্রয়োজন তাঁরা করছেন, সেকথা আমাদের নয়। আমরা যা দেখতে পাই, তাতে দেখি, কৃষিপ্রধান দেশহিসেবে চাষী

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অথবা বিলাস ইচ্ছায় বা বিব্রত না হবার আকাঙ্খায় জন্ম সংখ্যার হ্রাস, এই দুয়েরি বাইরে সাধারণ মানুষের সত্যকার প্রয়োজন।

সাধারণ মা বাপের একমাত্র বিবেচনার বিষয় এই, যে,—যে কটী সন্তান একজন মা বাপের পক্ষে মানুষ করা সম্ভব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে—সেই কটী সন্তানই তার হওয়ার উপায় গ্রহণ করা। আমরা দেখ্‌তে পাই, যে সন্তান বাঁচবে না, কিম্বা স্বাস্থ্যহীন হয়ে বাঁচবে, সে সন্তান চাষীর দেশে চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধিরও কাজে লাগে না। আমাদের রোগমারীগ্রস্ত দেশে তার দৃষ্টান্তও অপ্রতুল নেই। আর যে সন্তানকে মা বাপ শিক্ষা দিয়ে, স্বাস্থ্য দিয়ে, মানুষ করতে পারবেন না, সে সন্তানও তাঁদের শোকের ভাবনা নিয়ে বাঁচে, তার নিজেরও সুখহীন জীবনই হয়। আর যখন সবচেয়ে বড় কথা, বিশিষ্টভাবে উপযুক্ত ভাবে প্রতিপালন করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাঁরা অর্থাভাবের জন্য তা পারেন না; সকলকেই অল্প শিক্ষা, স্বল্প স্বাস্থ্য, অত্যল্প স্বাচ্ছন্দ্য বণ্টন করে বাঁচাতে হয়; ফলে কেহই যোগ্যতম বা সুযোগ্য হয়েও ওঠে না, দীর্ঘজীবীও হয় না; বেশীর ভাগই আমাদের দেশের এই অল্পায়ু জীবনেই আশার শেষ করে দেয়; সেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্যই প্রতি জনক জননীর নিজের অবস্থা আর ও স্বাস্থ্যানুসারে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

সব মা বাপ ভেবে দেখতে পারেন, কজন মা বাপ কটী সন্তানকে তার সমস্ত উচ্চাকাঙ্খার সুযোগ দিতে পারেন? স্বাস্থ্য দিতে পারেন? সেবা, আহার্য্য দিতে পারেন তার পরিপোষণের উপযোগী করে? সাধারণ বাঙালীর মধ্যবিত্ত দরিদ্র ঘরের অবস্থা দীনতম বল্লে অত্যুক্তি হয় না। কিছু অশিক্ষা, কিছু কুশিক্ষা, কিছু সংস্কার, কিছু অপচয়, আর বাকি সমস্তটার নির্ম্মম অভাব একসঙ্গে জয়যাত্রা করেছে। তার মধ্যে বহু পরিবার, একান্নবর্ত্তী পরিবার, রুগ্ন পরিবার একত্রে অর্দ্ধাশনে অহিতকারী অশনে দিন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। শিক্ষা ও সেবা তো তার পাওয়া হয় নাই। অথচ মানুষের মনে তার জন্য আকাঙ্খা সত্যিকার প্রয়োজন ও অভাব বোধ কমনেই।

এতে ভাববার কথা এই, প্রত্যেক দম্পতির তার নিজের সন্তানলালন ও মানুষ করার দায়িত্ব বোধ জাগিয়ে তোলা। আরো, মায়ের স্বাস্থ্য, মায়ের মানসিক ক্ষমতা, তার শিশুদের প্রতি নিয়োগ করবার শক্তি দেখা। কেননা মায়েদের স্বাস্থ্য ও চিরস্থায়ী নয়, সেবার শক্তিও অসীম নয়।

ধর্ম্ম, সমাজ, পূরাণ আলোচনায় দেখা যাবে, এটা নিন্দনীয় নয়, প্রয়োজনীয়। হয়ত উপায় অন্য। হয়ত এর মধ্যে আরও দিক আছে ভাববার এবং বলবার। কিন্তু সে অন্য দিকের কথা বিবেচনায়, রাষ্ট্রের, সমাজের রাষ্ট্র তার সাহায্য ও নির্ভর যদি প্রজাদের জন্য দেয়, তার শেষ ও শিক্ষার সুযোগ দেয়, তাহলে অবশ্য যারা কৃষিপ্রধান দেশ সম্বন্ধে ভাবেন, অথবা যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচার অসমর্থন করেন, তাদের মতের অনুযায়ী পিতামাতার দায়িত্ব কিছু রাষ্ট্রেরও ওপর থাকে। প্রজার লাভ তার রাষ্ট্রের। সে তাকে মানুষ করায় কিছু ভার নিতে পারে।

কিন্তু সাধারণ ও সত্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ও সুসন্তান লাভই দেশের সত্য লাভ। সে যদি বহু হয় তো ভাল, নাহলে অল্পও ভাল। হীনবুদ্ধি, ক্ষণস্বাস্থ্য মূর্খ, দরিদ্র বহুকে দেশ বা সমাজ মর্য্যাদা দেয় না। মা বাপও কি দেন? তার শ্রেষ্ঠ সন্তানের চেয়ে? অথচ প্রত্যেকটী সন্তানকে সু ও শ্রেষ্ঠ করে মানুষ করার তাঁদেরই সবচেয়ে দায়িত্ব। একথা স্পষ্টকরে ভাব্‌বার সময় এসেছে তাঁদের।
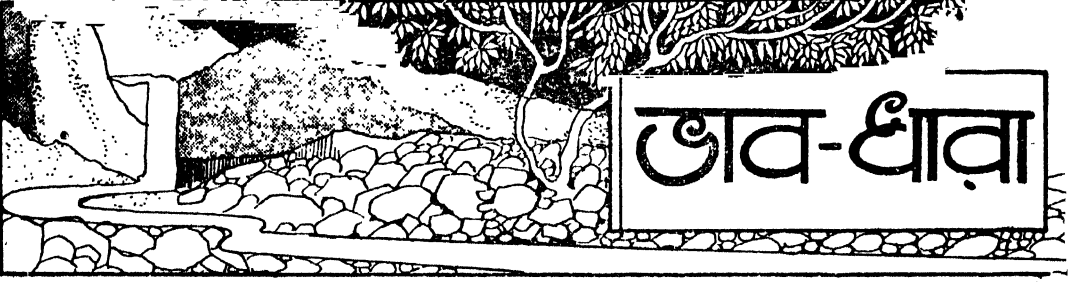
প্রসূতি ও শিশু

ডাঃ বিপিনচন্দ্র পাল এম্, বি।

শিশু সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান্ হয় সকল পিতামাতাই ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়া থাকেন। সুন্দর এবং সবল শিশু যেন একটি লোভনীয় জিনিষ; সকলেই ইহাদিগকে আদর করিতে চায়। বাস্তবিক্ টাকাপয়সা ধনদৌলত অপেক্ষা সুন্দর সবল শিশুই পিতামাতার অধিক গৌরবের জিনিষ। দুর্ব্বল এবং রুগ্ন ছোট শিশুকে দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়। শীঘ্রই তাহারা বড় হইয়া উঠিবে, অথচ তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখ তাহাদের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের উপরই নির্ভর করিতেছে। আজ যে অসহায় শিশু, কালই হয়ত সে বড় হইয়া সংসারী হইয়াছে, এবং এক পরিবারের ভার গ্রহণ করিরাছে। সে এখন যুবক; কাজেই দেশের অনেক কিছু তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই এখন দেশের আশা ভরসার স্থল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে নিজেই যদি হীন স্বাস্থ্য হইয়া কোন কঠিন কাজ করিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে দেশ তাহার নিকট কিছুই আশা করিতে পারে না। ফলে দেশের সমূহ ক্ষতি হয়; পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাহার মাতৃভূমি তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য যে, যে দেশের যুবকবৃন্দ সকল, কষ্টসহিষ্ণু এবং উদ্যমশীল সেই দেশ তত উন্নত। এই সত্য কেবল বর্ত্তমান যুগে কেন, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আবাহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে দেশের জনবলের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। পিতামাতা হইতে অর্জ্জিত সিফিলিস্, যক্ষা প্রভৃতি রোগে মৃত মুষ্টিমেয় শিশুর সংখ্যা বাদ দিলে দেখা যায় যে অধিকাংশই উপযুক্ত জীবনীশক্তির অভাববশতঃ, অথবা গরহজমজনিত কোনপ্রকার রোগবশতঃ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। নানা

কারণ বশতঃই, শিশুদের এই সমস্ত দোষ হইতে পারে। তবে প্রধান কারণটি বোধ হয় মাতার অসুস্থতা এবং দুর্ব্বলতা। আমাদের দেশের মাতৃজাতির স্বাস্থ্যের অবস্থা যে কিরূপ, শোচনীয় তাহার নিষ্প্রয়োজন। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই অনেকে নানাপ্রকার রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ সকল স্ত্রীলোকের শরীরই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শরীরের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার সঙ্গে এই গর্ভাবস্থার দুর্ব্বলতা মিশিয়া এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে এই সমস্ত গর্ভজাত সন্তানের অনেকেই দুর্ব্বল এবং অল্পায়ু হইয়া অচিরকাল মধ্যেই ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করে। যাহারা বাকী থাকে তাহাদের জীবনের মেয়াদও বেশী হয় না। আমাদের দেশের গড়পড়তায় বাঁচিবার কাল ২৫ বৎসরেরও কম। অবস্থার এই জটিলতা আরও বাড়াইবার জন্য দারিদ্র্য রাক্ষস হাঁ করিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। ফলে, অনুকুল আবহাওয়ার মধ্যে সুস্থ হইতে পারিত, এইপ্রকার অনেক শিশুই অল্পায়ু অথবা হীনবল হইয়া জীবনধারণ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিশু রোগের আসল কারণটি হইতেছে প্রসূতির অসুস্থতা। সুতরাং দেশের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রসূতিগণের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থা হইতেই প্রসূতিদিগের রীতিমত গৃহকর্ম্ম করা উচিত। তাহাতে একদিকে যেমন শরীরের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম হয়, অপর দিকে তেমনই প্রসূতির সুখে প্রসব হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে দুই দিকেই লাভ। অনেক অবস্থাপন্ন লোকের ধারণা এই যে গর্ভিণীকে কাজ করিতে না দিয়া বিশ্রাম দেওয়া উচিত ইহা ভুল ধারণা, এবং ইহাতে অপকার ছাড়া উপকার হইতে কখনও দেখা যায় নাই। গর্ভাবস্থা হইতেই গর্ভিনীর পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা উচিত। ইহাতে প্রসূতির যেমন উপকার হয় গর্ভস্থ সন্তানেরও তেমনই উপকার হইয়া থাকে। প্রসবান্তে আমাদের দেশের অনেক মহিলাই সূতিকা নামক ভীষণ রোগে ভুগিতে থাকেন। এই সূতিকা হওয়ার ফলে প্রসূতির অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দুধ শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি রোগ হয়, এবং পরিণামে ভয়াঙ্কর, রক্তহীনতা রোগ দেখা দিয়া প্রসূতিকে একেবারে জীর্ণশীর্ণ করিয়া ফেলে। প্রসবান্তে প্রসূতিকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে, এবং এমন পথ্য গ্রহণ করিতে হইবে যাহা গুরুপাক নহে কারণ তখন পাকস্থলী এবং পেটের অন্যান্য যন্ত্রসমূহ কাঁচা অবস্থায় থাকে।

শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু প্রসূতির বুকের দুধ শুকাইয়া যাওয়ার দরুণ শিশু পেট ভরিয়া দুধ খাইতে পারে না এবং সেইজন্য খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্তনদুগ্ধই শিশুর প্রকৃত খাদ্য। সুস্থ মাতার দুধই শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার প্রকৃত উপাদান, এবং ইহাই শিশুকে নানাপ্রকার রোগ হইতে রক্ষা করিতে পারে। দূষিত দুধ খাইয়া শত শত শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রসূতির দুগ্ধই শিশুর অপক্ক হজমী নাড়ীর

পক্ষে অনুকুল, এবং একমাত্র ইহাই শিশুকে সুস্থ এবং সবল করিয়া তুলিতে পারে। বুকের দুধ শোধিত করিবার নিমিত্ত, এবং শুষ্ক দুগ্ধকে পুনরায় বাড়াইবার নিমিত্ত প্রসূতির শালিধানের চাউলের ভাত, কালশাক, রশুন, লাই, নারিকেল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত। অবশ্য ইহাই প্রকৃত চিকিৎনা নহে। ইহা হইতেছে পথ্য মাত্র, যাহা ঔষধের আনুসঙ্গিকরূপে সেবন করা কর্ত্তব্য।

প্রসূতির শুষ্ক স্তন্যে দুগ্ধ পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত এবং তাহার রক্তহীনতা রোগ দূর করিবার জন্য আমি অনেক ক্ষেত্রে রচিটোস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ টনিক ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল লাভ করিয়াছি ইহা বিখ্যাত রচি.কাম্পানীর তৈয়ারী একটি যুগান্তকারী মহৌষধ। ইহা সেবনে প্রসূতির হজমশক্তি উৎকর্ষ লাভ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, এবং জরাজীর্ণ দেহ পুনগঠিত হইয়া রক্তহীনতা চিরতরে লুপ্ত হয়। রচিটোস্ গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসবের পর বেশ কিছুকাল পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে সেবন করিলে প্রসূতিরত কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকেই না, শিশুরও চিররুগ্ন হইবার অথবা অকাল মৃত্যু হইবার ভয় থাকে না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে শিশুকে বাজারের কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াইয়া তাহার স্বাস্থ্যও ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট না করিয়া, তাহার মাতাকে নিয়মিত ভাবে রচিটোস্ সেবন করাইলেই শিশু প্রকৃতিদত্ত খাদ্য (স্তন্যদুগ্ধ) খাইয়া স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য উভয়ই লাভ করিতে পারিবে।

ফ্যাসিইজ্‌ম্‌ ও নাজীই্‌জ্‌মের গোড়াপত্তন

হোস্‌নে আরা বেগম

ফ্যাসিইজ্‌ম্‌ —

ইউরোপের রাজনৈতিক গগন যে কয়টী মতবাদ ধূমায়িত করিয়া রাখিয়াছে তন্মধ্যে দুইটী আজ বিশ্বের অধিকতর ও নিকটতর বিপর্য্যয়ের কারণ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই দুইটীর একটী হইল ইতালীর ফ্যাসিইজম্‌ বা মুসোলিনীর ফাসীবাদ এবং অপরটী জার্ম্মাণীর নাজীইজ্‌ম্‌ বা হিটলারবাদ।

গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপের শক্তিমদমত্ত জাতি সমূহ সভ্যতার মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া রণতাণ্ডবে মাতিয়াছিল, ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বীর মানব সন্তানের বুকের রক্তে শোণিত সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। কত শক্তি হারাইল তাদের শক্তি, হারাইল রাজ্য; শক্তিমান দুর্ব্বলের ঘাড়ে অপমানের বোঝা চাপাইয়া দিল, পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া দিল তার সারা অঙ্গে। শক্তি সমূহের এইরূপ আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্কট মুহূর্ত্তে এই দুই মতবাদ—ফ্যাসিইজ্‌ম্‌ ও নাজী-ইজ্‌মের জন্মলাভের সূচনা করিল।

কোন ঘটনা বিপর্য্যয়ের মধ্যে ফ্যাসিইজ্‌ম্‌ জন্মলাভ করিল তাহাই প্রথমে দেখা যাক।

জাতীয় সম্মান বজায় রাখিবার জন্য, অর্থাৎ জাতীয় শক্তির পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, যখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, ইতালী তখন নিরপেক্ষ থাকিতে পারে নাই। তার যা কিছু বিত্ত, যা কিছু শক্তি লইয়া সে সমরানলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইষ্টানিষ্ট খতাইয়া দেখিবার অবকাশ সে পায় নাই, আবশ্যকতাও অনুভব করে নাই। যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে বাধা যে সে পায় নাই তা নয়। আর বাধা আসিয়াছিল সাম্যবাদীদের তরফ্‌ হইতে। তারা বিশ্ব-শান্তির নামে, আন্তর্জ্জাতি-কতার নামে, ইতালীকে নিবৃত্ত করার প্রয়াস পাইয়াছিল, ইতালী সে কথায় কাণ দেয় নাই।

যুদ্ধ চলিতেছে। সীমান্ত হইতে নিত্য সংবাদ আসিতেছেঃ অষ্ট্রিয়ার নিকট ইতালী পরাজিত হইতেছে। অঙ্গে ক্ষত চিহ্ন লইয়া, ভগ্ন দেহে, ভগ্ন মনে সৈন্যগণ এক এক করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। যুদ্ধে যাইতে যারা নিষেধ করিয়াছিল, তারা এই পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

বিরুদ্ধবাদী, অকর্ম্মণ্য ও অলস লোকদিগের এই বিদ্রূপ একজনের অন্তরে শেলের মত বিঁধিল। তিনি একজন যুদ্ধ-প্রত্যাগত আহত সৈনিক ও সংবাদপত্র সম্পাদক—নাম মুসোলিনী।

মুসোলিনী দেখিলেন, ইতালীর এতগুলি সন্তানের জীবন—উৎসর্গের পর যদি ইতালী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসে, যদি অপমানের কলঙ্ক—কালিমা শিরে ধারণ করিয়া সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে জগতে তার অস্তিত্ব বজায় থাকারই বা এমন কি আবশ্যকতা আছে। তিনি মনে করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলে চলিবে না। যেমন করিয়াই হউক এ-যুদ্ধে জয় লাভ করা চাই। কিন্তু তিনি নিজে আহত, শত্রুর গোলা ও বেয়নেটের আঘাতে সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত; অসি হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে বুক পাতিয়া দাঁড়াইবার মত অবস্থা তাঁর নাই। নিরুপায় হইয়া তিনি অসি ছাড়িয়া লেখনী ধারণ করিলেন। সেই দিন হইতে জগত বুঝিতে পারিল যে একটী কলমের মধ্যে ও সহস্র বেয়নেটের শক্তি লুকাইয়া থাকিতে পারে।

মুসোলিনী তাঁর কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইতালীর জাগ্রত যৌবনের নিকট অগ্নিময়ী ভাষায় আবেদন করিলেন,—আবেদন বলিলে হয়ত ভুল হয়, আদেশ করিলেন, তীক্ষ্ণ উদাত্ত কণ্ঠে আদেশ করিলেন জাতির সম্মান রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইতে, জাতিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য। তাঁর লেখা দেশের যৌবনের দ্বারে আঘাত হানিল। যুবক ইতালী, অবসাদগ্রস্ত, দুর্ব্বল, পঙ্গু ইতালী বুঝিল, দেশকে বাঁচাইতে হইবে। আর বাঁচিতে হইলে বিজয়ীর বেশে বাঁচিতে হইবে। মুসোলিনীর লেখা ইতালীর জীবনে নব-যৌবনের ঢল নামাইল। মুসোলিনী লিখিলেন:—"আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতে পারি, শীত সহ্য করিতে পারি। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিনা। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসা মানে হীনতার মধ্যে ফিরিয়া আসা, অপমানের মধ্যে ফিরিয়া আসা, উপরন্তু অনাহার ও দুঃখের মধ্যে ফিরিয়া আসা। কাজেই আমরা ফিরিবনা। আমাদিগকে যুদ্ধ করিতেই হইবে এবং আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব।

মুসোলিনীর বজ্র-গম্ভীর ঘোষণা সফলতার মহিমামণ্ডিত হইল। একটীর পর একটী যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ইতালীর নিকট পরাজিত হইতে লাগিল। এমন কি ইতালী তার বহুপূর্ব্বের হারানো প্রদেশ ত্রেন্তা ও ক্রিয়েস্ত ফিরিয়া পাইল।

এই সময় ইউরোপের কুরুক্ষেত্রের উপর শান্তির আবহাওয়া বহিল। রণোন্মত্ত জাতিসমূহ তাদের অস্ত্র সংহত করিল।

যুদ্ধ বিরতির পর মুসোলিনী দেখিলেন যে ইতালী এই মহা আহবে তার সাড়ে ছয়লক্ষ সন্তানকে রণদেবতার করালগ্রাসে তুলিয়া দিয়াছে, সাড়ে চারি লক্ষ লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। জীবনযাত্রার পক্ষে তারা নিরুপায়। রাষ্ট্র তাদের উপর সদয় নয়, জাতি তাহাদিগকে পরিহাস করে। এই শোচনীয় অবস্থা মুসোলিনীর মনে তীব্রভাবে আঘাত হানিল। তিনি স্থির করিলেন, লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে যে বিজয় ক্রয় করা হইয়াছে, ধরিতে গেলে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া যে গৌরব অর্জ্জন করা হইয়াছে, তাহা কোনমতে কলুষিত হইতে দেওয়া হইবে না। যারা এই গৌরবের অধিকারী

তাহাদিগকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইতে দেওয়া হইবে না। এই সময় যুদ্ধ-প্রত্যাগত বিজয়ী সৈনিকদের প্রতি জনগণের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মুসোলিনী লিখিয়াছিলেন :—"We suffered the humiliation of seeing the banners of our glorious regiments returned to their homes without being saluted...Politicians and Philosophers, profitees and losers, Sharks trying to save themselves, promoters of wars trying to be pardoned, demagogues seeking popularity, spies and instigators of trouble waiting for tbe price of their treason, agents paid by foreign money —in a few months threw the nation into an awful spiritual crisis. I saw before me with awe the gathering dusk of our end as a nation and a people".

জাতির এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মুসোলনী স্থির করিলেন, রাজনৈতিক কূটতর্ক বাদ দিয়া প্রথমে পঙ্গু আহত বিজয়ী বীরদিগকে বাঁচাইতে হইবে, ইতালিকে আবার শক্তিমান ও সংযত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা না হইলে ইতালীকে যে যেমন ভাবে পারে স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিবে। স্বার্থান্বেষীদের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য তিনি এক কর্ম্মপন্থা স্থির করিলেন। তাঁর প্রথম কর্ত্তব্য হইল :—

১। জাতিকে তার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা

২। জাতির সমগ্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে এমন যে কোন আন্দোলনকে ব্যহত করা। প্রথমে জাতিকে শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ করিয়া গড়িয়া তোলা

৩। যুদ্ধের পর শাসকবর্গের অক্ষমতা ও সাম্যবাদীদের প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব জাগিয়াছে তাহা দূরীভূত করা

মুসোলিনীর এই বাণী প্রচারের প্রধান অবলম্বন হইল তাঁর পত্রিকা "El-Popolo Di'talia."

মুসোলিনী তাঁর আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ইতালী গঠন করার জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মিলান শহরে ব্যবসায়ী সঙ্ঘের একটী হলে এক সভা ডাকিলেন। এই সভায় মাত্র ৫০। ৫২ জন লোক তাঁর কর্ম্মপন্থা অনুমোদন করিল। এই সামান্য সংখ্যক লোক লইয়া Fascidi Combatiments ফ্যাসিস্তি আন্দোলনের গোড়াপত্তন হইল।

অন্যান্য মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ একটী দল গঠিত হয়। মুসোলিনী কিন্তু কোন দল গঠন না করিয়া তাঁর অনুচরদিগের সাহায্যে আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। এই আন্দোলনের ধর্ম্ম হইল—প্রাণের প্রাচুর্য্য, যৌবন-ধর্ম্ম; এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্র হিসাবে, জাতি হিসাবে ইতালীকে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা। একজন ফ্যাসিস্তের নিকট কোন মতবাদই পরিত্যাজ্য নয়, যদি না সে মতবাদ তার দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

মুসোলিনী নিজে ছিলেন আরদিতি সৈন্যদলের সৈনিক। এই আরদিতি সৈন্যদল ছিল ইতালীর সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, বে-পরোয়া। এরা দাঁতে তীক্ষ্ণ ছুরী ধরিয়া ও হাতে বোমা লইয়া শত্রু সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িত। এই আরদিতি দলের ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণকে মুসোলিনী তাঁর সঙ্গে পাইলেন। আর এইরূপ মরণজয়ী, নির্ভীক সৈন্যগণেরই বোধহয় তাঁর দরকার ছিল। ইহাদের দলে টানিয়া লইয়া তিনি ইতালীর শাসনক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুসোলিনী বুঝাইতে লাগিলেনঃ—যারা ইতালীর হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, আজ ইতালীর উচিত তাহাদিগকে রক্ষা করা। ইতালীর বর্ত্তমান শাসকগণ তাহা করিতেছেন না—সুতরং আমরাই তাহা করিব। আহত সৈনিকগণের ঘরে ঘরে যদি ক্ষুধাতুরের ক্রন্দনরোল ওঠে তবে এ বিজয়ের সার্থকতা কি? ইতালী কি জগতের সামনে শক্তিহীনতার পরিচয় দিবে? যে সব যুবক হাজারে হাজারে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল, তাদের প্রাণের কি কোন মর্য্যাদা নাই?

মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত আন্দোলনের পিছনে প্রথমে ইহা ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক আদর্শবাদ গড়িয়া ওঠে নাই। মুসোলিনীর এইরূপ প্রচারের ফলে ইতালীর যৌবনশক্তি জাগ্রত হইল, তারা আত্ম-চেতনা লাভ করিল এবং সর্ব্বোপরি তারা বুঝিল, শক্তিহীন জাতির স্থান জগতে নাই। আরও বুঝিল, স্বার্থপর জগতে, অসংখ্য হিংস্র জাতির মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীর কোন মূল্য নাই। ভাববাদীরা যাহাই বলুকনা কেন, বিশ্বকে যতই ভালবাসুকনা কেন, নিজের দেশের মাটীর চেয়ে পবিত্র কিছুই নাই। তাই যুবক-ইতালী আজ বলিতে শিখিয়াছে, আন্তর্জ্জাতিক মিত্রতা ইতালীকে কখনও রক্ষা করিবে না, রুগ্ন দুর্ব্বল-দেহ ইতালীয়তার কোন কাজে আসিবেনা। তারা সব সময়েই পরিত্যজ্য। ইতালীকে রক্ষা করিবে ফ্যাসিষ্টের ইস্পাতের বর্ম্ম ও বেয়নেট।

নাজীবাদ ও জার্ম্মাণী

ইউরোপীয় মহাসমরে ইতালীর ন্যায় জার্ম্মাণীও তার বহুলক্ষ বীর সন্তান হারায়। যুদ্ধের পর ইতালী দেশে ফিরিয়াছে বিজয়ীর গৌরব মুকুট শিরে ধরিয়া। কিন্তু জার্ম্মাণী? সে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত গর্ব্ব, সমস্ত আশার সমাধি করিয়া ফিরিয়া আসে।

সে ১৯১৯ সালের জুনমাসের কথা। যুদ্ধাবসানে দুই পক্ষে সন্ধি হইল। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে সন্ধিপত্র রচিত হইল। এই সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরকারীদের একপক্ষে বিশ্বত্রাস এবং পরে পরাজিত জার্ম্মাণী এবং অপরপক্ষে বিজয়ী ফ্রান্স এবং তাহার মিত্রশক্তিবর্গ। বিজয়ী শক্তির ইচ্ছামত সন্ধিসর্ত্ত রচিত হইল। পরাজিতের ক্ষীণকণ্ঠের অস্ফুট প্রতিবাদ বিজয়ীদের উল্লাসে ডুবিয়া গেল। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মাণীর রাজ্য খণ্ডিত, উপখণ্ডিত হইল, তার সমর-শক্তি হরণ করা হইল। দেশ রক্ষা করার মত ক্ষুদ্রতম ক্ষমতাও তাহার হাতে থাকিল না। সর্ত্তানুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সমরসম্ভার হাতে রাখিয়া উদ্বৃত্ত সমস্ত সমরোপকরণ ধ্বংস করা হইল। পরাজিত জার্ম্মাণী নিরুপায় হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল।

ইহারপর জগত দেখিয়াছে, ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক দেহের ক্ষতের উপর একটা শান্তির প্রলেপ পড়িল। কিন্তু দেখেনাই যে, জার্ম্মাণীর প্রজ্জ্বলিত আগুনের উপর খুব পুরু করিয়া ছাই চাপা দেওয়া হইলেও ভিতরে অপমানের তীব্র দহন জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মাণীর উপরটা নিস্তেজ ও শান্ত দৃষ্ট হইলেও অন্তরে তার বিসুবিয়স সৃষ্টি হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর এ অপমান বড় বড় রাষ্ট্রনেতারা হজম করিয়া গেলেও একজনের মনে ইহা অত্যন্ত তীব্র হইয়া জাগিয়াছিল। তিনি হার হিট্লার। হিটলার দেখিলেন, ভার্সাই-সন্ধি যতদিন জার্ম্মাণীর স্কন্ধে চাপিয়া থাকিবে ততদিন অপমান ও লাঞ্ছনার গুরুভারে জার্ম্মাণী মাথা তুলিতে পারিবে না। তাই হিটলার পণ করিলেন, ১৯১৯ সালের ভার্সাই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া জার্ম্মাণীকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে; নূতন করিয়া ভার্সাই-এর সন্ধিপত্র লিখাইতে হইবে। তারজন্য জার্ম্মানীকে সব বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

হিটলার এইপণ রক্ষার জন্য ভন প্যাপেন, জেনারেল গোয়েরিং, ডাঃ গোয়েবল্স্, ভনশ্লেচার প্রভৃতির সাহায্যে একজাতীয় আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন। এই আন্দোলনের নামই নাজী-আন্দোলন।

নাজী আন্দোলনের পিছনে কোন বিশেষ আদর্শবাদ নাই, কোন সূক্ষ্ম অঙ্কের হিসাব নিকাশ, বিচার বিশ্লেষণ নাই। ফ্যাসিজমের মতই উন্মত্ত স্বদেশ প্রেমের ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। হিট্লার যৌবন-ধর্ম্মী পুরুষ। জাতীয় যৌবনকে ইনি বিশ্বাস করেন। তিনি জানেন, দেশের যৌবন-শক্তি যদি জাগ্রত হয় তবে জাতিকে, দেশকে উন্নত করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় না। তাই তিনি জাতির যৌবন-শক্তিকে স্বদেশের মুক্তি সাধনার নামে জাগাইয়া তুলিলেন। জাগ্রত যুবশক্তি তাঁর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। নাজী আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করিল। জাতি তার আদর্শের পথে আগাইয়া চলিল।

নাজী আন্দোলনের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে সোশ্যালডিমোক্রাটদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কিন্তু তাদের আদর্শবাদ জার্ম্মাণীর উপর আরোপিত অপমানের প্রতিশোধ লইতে অক্ষম ছিল। বরং তাদের প্রতিক্রিয়ামূলক প্রচারের ফলে জার্ম্মাণীর ক্ষতিই হইত বেশী। যাহোক নাজীদের অসাধারণ প্রচারকার্য্যের ফলে জার্ম্মানী অচিরে নাজীবাদ গ্রহণ করিল। যারা বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাঁড়াইল তাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ নাজীসৈন্য বা ঝটিকা বাহিনীর দ্বারা ধ্বংসীকৃত হইল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র জার্ম্মাণীর শাসন-ক্ষমতা নাজীদের হাতে আসিল। হিটলার হইলেন জার্ম্মানীর ভাগ্য-নিয়ন্তা। এটা ১৯৩৩ সালের ঘটনা।

জার্ম্মাণীর শাসনক্ষমতা হাতে পাইয়া হিটলার প্রথমেই ভার্সাই সন্ধির অপমানের প্রতিশোধের জন্য তৈরী হইতে লাগিলেন।

যুদ্ধের পর হইতে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ শক্তিসমূহের ন্যায় ও অন্যায় কার্য্যের বিচারক স্বরূপে কাজ করিতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের যাঁরা শক্তিমান সদস্য তাঁরা সকলেই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধি। ন্যায় অপেক্ষা অন্যায়, বিচার অপেক্ষা অবিচারই তাঁদের দ্বারা সঙ্ঘটিত হয় খুব বেশী। জার্ম্মাণী তাইমনে করিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মায়াজাল ছিন্ন করিতে হইবে, তাহা না হইলে ইচ্ছামত শক্তিসঞ্চয় করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। তাই, এবং কতকটা রাষ্ট্রসঙ্ঘের যথেচ্ছাচারিতায় বিরক্ত হইয়া জার্ম্মানী রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিল।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া জার্ম্মাণী কিছুদিন চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এবং দেখিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় কিনা। কিন্তু যখন সে দেখিল, নিষ্ফল আস্ফালন ব্যতীত কেহ কিছু করার প্রয়াস পাইতেছেন না, তখন সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিল যে জার্ম্মানী ভার্সাইসন্ধির সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া বিমানবাহিনী গঠন করিয়াছে এবং উক্ত সন্ধির ৫ম পরিচ্ছেদ অগ্রাহ্য করিয়া বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই ঘোষণা করা হয় ১৯৩৫ অব্দের ১২ই ও ১৬ মার্চ্চ তারিখে। এই ঘোষণার বহু পূর্ব্ব হইতেই অবশ্য জার্ম্মাণী তলে তলে শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে। জার্ম্মাণীর এই বে-পরোয়া ভাব লক্ষ্য করিয়া বিশ্বের শক্তি সমূহ অবাক্ বিস্ময়ে তার পানে তাকাইয়া আছে। তারা হয়ত শঙ্কাকুলচিত্তে আবার এক মহাসমর সম্ভাবনার কথা ভাবিতেছে। জার্ম্মাণীর অন্তরে কিন্তু সেই একই সঙ্কল্পঃ—পরাজয়ের কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিতে হইবে। ভার্সাই সন্ধিপত্র নূতন করিয়া লিখাইতে হইবে।

শান্তির জন্য নারী কি করিতেছে?

এলেন ষ্টার ব্রুন্‌টন্‌ ও গ্লিনডা কোষ্টা

১৯১৫ সাল। নয় মাস ধরিয়া মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। দিন কাটিতেছিল সঙ্কটের মধ্য দিয়া। সেই সময় একদল সাহসী নারী হেগ সহরে মিলিত হন। যুদ্ধের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবার এবং শালিসীর দ্বারা যুদ্ধের মীমাংসা করা যায় কিনা তাহা দেখিবার জন্য ঐ মিলন সভার অধিবেশন হইয়াছিল। যাঁহারা ঐ সভায় যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের সাবমেরিনে, উড়োজাহাজের বোমায় এবং কামানের গোলায় মরিবার খুবই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এই মৃত্যুভয় সত্ত্বেও সভায় বারোটি দেশের মহিলা প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। আমেরিকা পাঠাইয়াছিলেন চল্লিশজন প্রতিনিধি; জার্ম্মাণী কেবল যে নিজের মহিলাগণকেই সভায় উপস্থিত হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন তাহা নহে, যাহাতে বেলজিয়ান নারীগণ যুদ্ধ-সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া সভায় যোগদান করিতে পারেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ছাড় পত্র দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য 'মহিলা আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের' উদ্বোধন এই ভাবেই হইয়াছিল। কুমারী জেন এ্যাডাম্‌স আমেরিকায় সমাজসেবীদের একজন অগ্রণী, ১৯৩২ সালে তিনি নোবেল পিস্‌ প্রাইজ (Nobel Peace Prize) লাভ করেন। মহিলাগণের আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের তিনিই ছিলেন সভানেত্রী। ১৯১৫সালে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ঐ সকল মহিলা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহার ফলে নূতন ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। যে সকল মহিলা ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই নারীর ভোট দিবার অধিকারকে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জ্জাতিক সংঘর্ষের মীমাংসার প্রস্তাবকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। যে সকল জাতি যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহারা যুদ্ধ বাধিলে মধ্যস্থ হইয়া যাহাতে বিবাদ মিটাইয়া দিতে পারে—তাহার পরিকল্পনাও ঐ সঙ্ঘের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল।

হেগ কনফারেন্স শেষ হইয়া গেলেই প্রতিনিধিগণ চৌদ্দটী দেশের গবর্ণমেণ্টের কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের কাছে কনফারেন্সএর কার্য্যের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। ঐ চৌদ্দটী দেশের কতকগুলি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল এবং কতকগুলি যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। যে সকল দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন সেখানকার রাজা, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র-সচিব প্রত্যেকেই অত্যন্ত ভদ্রতা, উদারতা এবং সহানুভূতির সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কুমারী এ্যাডামস্‌ স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎকালে তিনি প্রেসিডেণ্টের কাছে কন্‌ফারেন্স যে প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করেন তাহার

সহিত উইলসনের চতুর্দ্দশ নীতি এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের দলিলগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইহা অত্যন্তমজার কথা সন্দেহ নাই।

উনিশ বৎসর ধরিয়া 'মহিলা আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের' সদস্য এবং কর্ম্মচারীবৃন্দ শান্তি এবং স্বাধীনতার জন্য একত্র কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। বাণিজ্য, শিল্প, শুল্ক, অস্ত্রশস্ত্র, সীমান্তরেখা—ইহা ছাড়া আফিমের ব্যবসা, দাস-ব্যবসা, সাম্রাজ্যবাদ, স্বাদেশিকতা, সংখ্যালঘিষ্ঠগণের উপর রাজনৈতিক উৎপীড়ক, সম্প্রদায় এবং ধর্ম্মবিশেষের নরনারীগণের প্রতি অত্যাচার—এই সকল গুরুতর সমস্যা লইয়াও সঙ্ঘের নারীগণ অনলসভাবে গবেষণা করিয়াছেন। সভ্যগণ যখন কোন পন্থাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন তখন পরস্পরকে উহার কথা জানাইয়াছেন—নিজের নিজের দেশের শাখাগুলির সভ্যগণকেও সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছেন—যাহাতে অন্যায়ের এবং দুর্নীতির প্রতিকার হয় তাহার জন্য সংবাদপত্রাদির সাহায্যে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং আইন-সভার শরণাপন্ন হইয়াছেন। এই সঙ্ঘের সদস্যগণের সংখ্যা এখন ষাট হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ২৬টী দেশে এই সঙ্ঘের এখন সুপরিচালিত শাখা এবং এই ২৬টী দেশ ছাড়া আরও ২০টী দেশে ইহার দল আছে। যাঁহারা এই সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ আজ সারাজগতের জনসাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কতকগুলি দেশে তাঁহাদের প্রস্তাব আইনে পরিণত হইয়াছে।

অবশ্য ইহা সত্য নয় যে, আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সঙ্ঘের পরিকল্পনা কোথাও অবলম্বিত হইয়াছে। তবে ইহা সত্য যে, একদিন নারীগণ বহু অন্তরায়ের বিরুদ্ধে যে কতকগুলি সত্যকে নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—আজ জনসাধারণ ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছে যে, সেই ঘোষণার পিছনে ছিল সত্য এবং সারবত্তা। ভার্সাই সন্ধি-সর্ত্তের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা স্থায়ী শান্তির পক্ষে প্রবল অন্তরায়ের সৃষ্টি করিবে—এই কথা 'আন্তর্জ্জাতিক নারীসঙ্ঘই' প্রথম ঘোষণা করিয়াছিল। আজ সকলেই বুঝিতে পারিতেছে,—যেহেতু ভার্সাই-সন্ধি-সর্ত্ত-অনুসারে জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্র রাখিয়া অন্য দেশগুলি আপনাদিগকে অস্ত্রে-শস্ত্রে সুরক্ষিত রাখিয়াছে—এমন কি, সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র বাড়াইয়াছে সেই হেতু জার্ম্মাণীতে বিপ্লবের সৃষ্টি হইল।

মহিলা-সঙ্ঘ কেবল যে ভার্সাই সন্ধির ত্রুটির কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা নহে, নিরস্ত্রী-করণের কথা এবং অস্ত্র নির্ম্মাণের অবাধ অধিকারকে আইনের দ্বারা সঙ্কুচিত করার কথাও প্রথম ঘোষণা করে 'আন্তর্জ্জাতিক মহিলা-সঙ্ঘ'। উহার সতের বৎসর পরে বিশ্বের নিরস্ত্রীকরণ সভার অধিবেশন হয়। বাহিরের দিক দিয়া আদর্শগুলিকে বাস্তবে পরিণত করিতে না পারিলেও এই সঙ্ঘ যুদ্ধের স্থায়ী উচ্ছেদের অনুকূলে সারা জগতে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছে। শান্তির পথে কি কি অন্তরায়—সেগুলিও 'সঙ্ঘ' ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছে। জগতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে জনমত গ্রহণ করিবার জন্য নিরস্ত্রীকরণের অনুকূলে সারাজগতে ৮,০০০,০০০ লোকের স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। ৮,০০০,০০০, স্বাক্ষরের মধ্যে ৬,০০০,০০০ স্বাক্ষর সংগৃহীত হয় নারীদের সাহায্যে। এই স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন-পত্র মহাসমারোহে 'আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সম্মেলনে' উপস্থিত করা হয়। ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারীর, আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সঙ্ঘ, অধ্যাপক আইনষ্টাইন এবং মহাত্মা গান্ধীর মত প্রথিতযশা মানুষের স্বাক্ষরও সংগ্রহ করেন। জগতকে অস্ত্রহীন করিতে হইলে অস্ত্র নির্ম্মাণের কথা আসিয়া পড়িতে বাধ্য। ইহা সত্য যে, অস্ত্র যাহারা নির্ম্মাণ করে তাহারা যুদ্ধ বাধাইবার কার্য্যে উৎসাহী এবং যাহাতে যুদ্ধ বাধে তাহার জন্য প্রচার-কার্য্য করিয়া থাকে। এই অস্ত্র

নির্ম্মাণ ব্যাপারে আন্তর্জ্জাতিক নারী-সঙ্ঘ যে তদন্ত করেন, তাহাতে সুইডেন বলে—অস্ত্র নির্ম্মাণের অধিকার শুধু রাষ্ট্রের হাতে থাকাই সমীচীন। অস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলির রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যাহাতে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ করিতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক মহিলা-সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশনে বলা হয়, শান্তিস্থাপনের জন্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা উচিত। এক্ষণে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রের অগ্রণিগণ বলিতেছেন—ছেলেমেয়েদের ইতিহাস এমনভাবে পড়ানো উচিত যাহাতে ক্ষুদ্র স্বজাত্যাভিমান তাহাদের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন না করে, পরন্তু যাহাতে তাহারা—যাহা সত্য তাহাকেই জানিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে স্কুল পাঠ্য পুস্তকগুলির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। উরুগুয়ে, তুরস্ক এবং গ্রীস আন্তর্জ্জাতিক-মৈত্রী প্রতিষ্ঠানর উদ্দেশ্যে স্কুল পাঠ্য পুস্তকের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

পোল্যাণ্ড নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে বলে,—গোলা-বারুদ বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র, রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার এবং গ্রন্থের সাহায্যে যাহাতে জাতিবিদ্বেষ দাঁড়াইয়া না পড়ে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুর্নীতির প্রচার যাহাতে বন্ধ হইয়া যায় তাহার জন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটীতে ডাঃ মেরী উলী আছেন। ইনি আমেরিকার 'আন্তর্জ্জাতিক নারী-সঙ্ঘে'র একজন সদস্য।

আন্তর্জ্জাতিক নারী-সঙ্ঘের আমেরিকান শাখা ১৯২০ সালে সোভিয়েট রুসিয়ার গবর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইবার কথা প্রস্তাব করেন।—সোভিয়েট রুসিয়ার নীতিগুলিকে মানিয়া লইবার প্রস্তাব ছিল না। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য সুপ্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে যে-কারণে মানিয়া লওয়া হইয়াছে সেই কারণেই সোভিয়েট রুসিয়াকে মানিয়া লওয়া।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিলে রুসিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি হইতে পারে—এই আশাতেও প্রস্তাবটী উপস্থাপিত হইয়াছিল। সে দিন নারীসঙ্ঘকে এই জন্য কত প্রতিকূল সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। উহার তের বৎসর পর আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট রুসিয়ার গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিল—যাহার কথা তাহার দূরদর্শী কন্যাগণ বহুদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন।

এরূপ দুরূহ সমস্যাগুলি লইয়া যে প্রতিষ্ঠানকে ভাবিতে এবং কাজ করিতে হয়, তাহার পক্ষে একটী সঙ্ঘের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জুরিচে যে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়—তাহাতে সম্মেলনের সভ্যাগণ স্থায়ী নিয়মাবলী তৈয়ারী সঙ্ঘের বর্ত্তমান নামকরণ এবং জেনেভায় ইহার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। জেনেভায় ১২নং রু ডে ভিউ কলেজে এই আন্তর্জ্জাতিক সভার সম্পাদিকা শ্রীমতী ক্যামিলা ড্রিভেট সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের ছায়ায়। আফিসে বসিয়া এবং নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া সম্পাদিকা সেই সকল দেশে সঙ্ঘের শাখা স্থাপনের চেষ্টা করেন—যেখানে কোন শাখা পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোনও দেশে শান্তি স্থাপনের সমস্যা উঠিলে ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিবার ভারও সম্পাদিকার উপরন বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংখ্যায় যে ২৬টি বিভিন্ন শাখা আছে সেই শাখাগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখিবার জন্য একটী মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে ফ্রেঞ্চে, জার্ম্মাণে এবং ইংরাজীতে। এই কাগজ বাহির করিবার কাজ সম্পাদিকা করেন। কাগজে বিভিন্ন শাখাগুলির কার্য্যাবলী এবং নব উদ্যমের বৃত্তান্ত থাকে। উহার নাম 'প্যাক্স ইণ্টারন্যাশনাল'। ১৯২৬ সালে ডাবলিনে যে আন্তর্জ্জাতিক

সম্মেলন হয়, তাহাতে নারী সঙ্ঘ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই সঙ্ঘের বিভিন্ন জাতীয় শাখাগুলি কাজ করিবে—এইরূপ স্থির হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক নারী-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হইতেছে—"সকল দেশের সেই সকল দেশের সেই সকল নারীকে একত্রিত করা—যাহারা সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধের, শোষণের ও অত্যাচারের বিরোধী; যাহারা বিশ্বাস করে—নিরস্ত্রীকরণ এবং সংঘর্ষগুলির মীমাংসার পথ সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, শালিসী, জগদ্ব্যাপী সমবায় নীতি এবং সকলের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়া। এই সঙ্ঘের প্রথম সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী জিন এ্যাডামস্ এবং এখনও পর্য্যন্ত তিনিই আন্তর্জ্জাতিক সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিতা আছেন।

সঙ্ঘের উৎসাহে অনেকগুলি উন্নতিবিধায়ক আইন সমর্থিত হইয়াছে। সঙ্ঘের উদ্যোগে ৭টী আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে (হেগ ১৯১৫, জুরিচ ১৯১৯, ভিয়েনা ১৯২১, ওয়াশিংটন ১৯২৪, ডাবলিন ১৯২৬, প্রেগ ১৯২৯, গ্রীনোবল ১৯৩২) অধিবেশন হইয়াছে। শাখা-সম্মেলনের মধ্যে হনলুলুতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, ভিয়েনাতে এবং ফ্রাঙ্কফোর্টে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এবং মেক্সিকোতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যে অধিবেশন হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। তাহাছাড়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্যালজ বার্গে, চিকাগোতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, সুইজারল্যাণ্ডে ১৯২৬ এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, বুডাপেষ্টে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, বুলগেরিয়াতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এবং ক্যানাডায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিদাঘ বিদ্যালয়ের (Summer schools) কার্য্য চলিয়াছিল সঙ্ঘের উদ্যোগে।

যেখানে যেখানে যুদ্ধ বা অশান্তি আছে সেখানে সেখানে আন্তর্জ্জাতিক নারী-সঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করে, শান্তভাবে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য উৎসাহ দেয়—এবং সকলকে বুঝাইয়া দেয়—যুদ্ধের জন্য দায়ী কতকগুলি মানুষের অর্থলোভ এবং সেই অর্থলোভই যুদ্ধের অনল-শিখাকে প্রজ্বলিত রাখে।

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে ইহা পুনঃপুনঃ বলে, যতক্ষণ না অস্ত্রের ব্যবসায় এবং যুদ্ধের মালমসলা তৈয়ারী বন্ধ করিবার উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হয়—ততক্ষণ বৈঠক স্থগিত হইতে পারে না। সঙ্ঘের ফরাসী শাখা একশতের উপর টেলিগ্রামের দ্বারা জানান, দুইকোটী ফরাসী-কৃষক নিরস্ত্রীকরণের দাবী করিতেছে। পোলিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৩০ সালে ইউক্রেনিয়ানদের উপর যে অত্যাচার করে, তাহার তদন্ত করিবার জন্য সঙ্ঘ ১৯৩১ সালে একটী কমিশন প্রেরন করেন। ১৯৩২ সালে ম্যাডাম ব্রুগকে প্রেরণ করে প্যালেষ্টাইনে—সেখানে ইংরেজ, আরব ও ইহুদীদের সঙ্ঘর্ষের কারণ এবং 'হোলি ল্যাণ্ড' কাহার হাতে থাকা উচিত তাহা জানিবার জন্য।

সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীমতী এ্যাডাম্স্, ম্যাডাম ড্রিফেট এবং শ্রীমতী এডিথ পাই চীনে, জাপানে এবং ভারতবর্ষে গমন করেন—সেখানকার অবস্থা ভাল করিয়া জানিবার জন্য, সেখানকার অবস্থার আরও উন্নতি করিবার নিমিত্ত। চীন আক্রমণ করিয়া জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে লীগ জাপানের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করে। চীন এবং জাপানের সম্পর্ক যাহাতে ভাল হয়—যাহাতে যুদ্ধ হইতে তাহারা নিবৃত্ত হয় তাহার জন্য লীগ বিলাতে দুইশতেরও অধিক সভার অধিবেশন করে। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্ম্মাণী, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড সর্ব্বত্র সভার ব্যবস্থা হয়। আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ইহার জাপানী শাখার নিকট চীনদের অনুকূলে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। লীগের আমেরিকান শাখা চেষ্টা করে যাহাতে জাপানে অস্ত্র এবং টাকা না পৌছায়—গোপন চুক্তিগুলি অপসারিত করিবার জন্যও এই শাখা চেষ্টা করে।

একটী আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্ম আবিসিনিয়ায়—ক্রীতদাসের সাহায্যে কাজ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সঙ্ঘের আমেরিকান শাখা এই কার্য্য বন্ধ করিয়া দেয়। লাইবিরিয়ায় আর্থিক ব্যাপারে একজন আমেরিকান নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু লাইবিরিয়ার লোকেরা চাহিতেছিল একজন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানকে নিযুক্ত করিতে। লীগের চেষ্টায় আমেরিকান নিয়োগের পরিবর্ত্তে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানই নিযুক্ত হইল। নিকারাগুয়ায় আমেরিকান নৌ-সৈন্যের বিরুদ্ধে লীগের মহিলা সদস্যগণ তীব্র অভিযান পরিচালিত করেন—ফলে, নৌ-সৈন্যদের আমেরিকায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হাইতীর মহিলা সদস্যগণ আন্তর্জ্জাতিক মহিলা সঙ্ঘের নিকট—দ্বীপের অশান্ত অবস্থার কথা জানান। মহিলা সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি আমেরিকান শাখার উপরে ভারদেন—প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য। আমেরিকান শাখা একটী কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তদন্ত করেন। এই তদন্তের ফল 'অধিকৃত হাইতী' নামক বিরাট বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়। এই বিবরণীর মুখপত্রে শ্রীমতী গ্রীন সম্পাদিকা হিসাবে বলেন, হাইতীর দুঃখের কারণ—কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতার অপব্যবহার নয়—পরন্তু বিদেশীরা জোর করিয়া উক্ত দ্বীপ অধিকার করিয়াছে বলিয়াই দ্বীপবাসীর দুঃখ। কেমন করিয়া দ্বীপবাসীদিগকে সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্য না লইয়া অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করা যায়, সে সম্পর্কে কয়েকটী প্রস্তাব করা হয়—এবং ইহাও বলা হয়, আমেরিকার পক্ষ হইতে তদন্ত করিবার জন্য হাইতীতে একটী কমিশন প্রেরণ করা হউক।' এই কমিশন পরে প্রেরিত হইয়াছিল এবং কমিশনের বিবরণীতে লীগের কমিশনের রিপোর্টই সমর্থিত হয়।

আমেরিকার মহিলা-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সম্প্রতি যে অতি প্রয়োজনীয় কাজটী করা হইয়াছে, তাহা কিউবার সম্পর্কে। দ্বীপের নর-নারী প্রকাশ্যে বলিয়া থাকে—আন্তর্জ্জাতিক মহিলা-সঙ্ঘের প্রচার কার্য্যের জন্যই আমেরিকা কিউবা সম্পর্কে তাহার নীতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। ১৯৩০, ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে সঙ্ঘের মহিলা সভ্যাগণ দ্বীপে গিয়াছেন—দ্বীপের লোকজনের সঙ্গে সংবাদের আদান-প্রদান চালাইয়াছে। ১৯৩২ সালে ওয়াশিংটনে কিউবান ও আমেরিকান বক্তাদের লইয়া একটী সভা আহূত হয়। আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট এবং ম্যাকাডো গবর্ণমেণ্ট—উভয় গবর্ণমেণ্টকেই অনুরোধ করা হয় প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য। উভয়েই প্রতিনিধি পাঠাইতে অস্বীকার করে। সভার বিবরণী বিলাত ও অন্যান্য দেশের সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়—কিন্তু আমেরিকায় কিছুই ছাপা হয় নাই। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সংবাদ-পত্রগুলির উপর কড়া হুকুম জারী হয়।

সঙ্ঘের কার্য্যাবলীর কথা—দূরে নিকটে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। অবশেষে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় অক্ষরে কিউবার কথা প্রচারিত হইতে থাকে। কিউবার অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা আমেরিকার পক্ষে কলঙ্কের কথা হইয়া উঠিল। কিউবার ব্যাপারে আমেরিকার রাষ্ট্র অথবা ধনী সম্প্রদায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে—ইহা সঙ্ঘ একেই কামনা করে না। ইহা 'প্ল্যাটচুক্তি'র প্রত্যাহারেরও একান্ত পক্ষপাতী।

মুক্তি এবং শান্তির জন্য আন্তর্জ্জাতিক মহিলা-সঙ্ঘের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই সঙ্ঘের লক্ষ্য পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে ন্যায় বিচার এবং শান্তির প্রতিষ্ঠা করা—বিনা রক্তপাতে। সঙ্ঘের আমেরিকান শাখা বিবেচনা করে—আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী স্থাপনের জন্য যেমন চেষ্টা হইতেছে, তেমনি প্রত্যেক জাতির পক্ষে উচিত উহার সমাজের উন্নতি বিধান করা। সামাজিক উন্নতি ভিন্ন অপর আদর্শ সফল হইতে পারে না।

আন্তর্জ্জাতিক শান্তির পক্ষে অস্ত্র-শস্ত্রের অবাধ নির্ম্মাণ এবং যে কোন দেশে যে কোন সময়ে এবং যে

কোন মূল্যে ধনীদের দ্বারা উহাদের বিক্রয়ের অবাধ অধিকার সঙ্কুচিত করিবার জন্য উপায় অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই কথার উপর আন্তর্জ্জাতিক নারী-সঙ্ঘ বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। যুদ্ধ বাধাইয়া লাভ করিব, এই লোভের উন্মাদনা সংযত হইলে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্য সফল হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের নারীদের সাহায্য বিশেষ বাঞ্ছনীয়। জগতের অন্যান্য অংশে যাহারা শান্তিস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছে—ভারতবাসীদের সাহায্য তাহাদের কার্য্যে উৎসাহ দান করিবে। দেশ

শিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

শ্রীমতী নিরুপমা সেন, এম, এ, বি, টি।

আজকাল ছাত্র, ছাত্রী, তরুণ তরুণীদিগের মনোভাব লক্ষ্য করিবার একটি বিশেষ সময় আসিয়াছে।

ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতি বাপ-মাই উৎসুক দেখা যায়। শিক্ষা বিস্তার শুধু সহরেই সাফল্য লাভ করে নাই, সুদূর পল্লী-গ্রাম সমূহও এবিষয়ে অতি ব্যগ্র। অতি অল্প গ্রামই এখন দেখা যায় যেখানে ছেলে মেয়েদের জন্য একটিও প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। দেশের এ উদ্যমে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ইহা প্রশংশনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু এই ছোট "শিক্ষা" শব্দটির গুরুত্ব কতদুর এবং ইহার অর্থ কত ব্যাপক তাহাই ভাবিবার বিষয়। শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ সকলেই স্কুল কলেজে পড়া পুঁথিগত বিদ্যাকেই জানেন। বি, এ; এম, এ; পি, এইচ, ডি, ইত্যাদি ডিগ্রিধারী হইলেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এইরূপ একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকেই আমরা অতি সজ্জন বলিয়া মানিয়া থাকি।

অধুনা শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া যে শিক্ষা পরিণতি লাভ করিতেছে তাহার প্রভাবে দেশের তরুণ দলের মনের গতি আজ কোন্ পথে চলিয়াছে তাহাই ভাবিতে হইবে।

স্কুল ও বিদ্যালয়, সর্ব্বদা পরস্পরের সাহায্যকারী হইবে কিন্তু অধিকাংশ বাপ-মাই ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াই ভাবেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা করিয়াছেন তারপর দায় যত সব স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের। ছেলে মেয়েদের গৃহ-শিক্ষার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া কোন ধারণা অনেকেরই নাই, থাকিলেও কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে জানেন না। সন্তানের শিক্ষা যে তাহার ভুমিষ্ট হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে সে কথা বোধ হয় অনেক বাপ-মাই বিশ্বাস করিতেন না। শিশুর শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই যে বাপ-মা ও তাহার পরিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ইহাও বোধ হয় অনেকে জানেন না! জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনটাই যে "মহাশিক্ষা" একথা কল্পনাও করিতে পারেন না। চরিত্রগঠনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। শিক্ষা মানুষের মনোবৃত্তির উন্মেষ করে, চরিত্র নির্ম্মল করে জ্ঞান লাভের সহায়তা করে। প্রকৃত শিক্ষা পুরুষের পৌরুষ ও নারীর নারীত্ব বিকাশের সহায়তা করে, মানুষকে দেবতা করে। একটি শিশুকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে কতটা ত্যাগ স্বীকার দরকার তাহা লক (Locke), বেসডো (Basedow), পেষ্টালোজি (Pestlozzi), রুসু (Roussou) প্রভৃতি মনিষীগণের জীবনী পাঠে জানা যায়।

আজ কাল যে কোন মাসিক পত্রিকা খুলিলেই, শিশুশিক্ষা, সহশিক্ষা, নারীপ্রগতি প্রভৃতি বিষয়ে কোন না কোন প্রবন্ধ চোখে পড়ে। সহ-শিক্ষা লইয়া এদেশে বহু দিন হইতে সভা সমিতিতে বহু গবেষণা চলিতেছে। কতটা কার্য্যকরী হয় দেখিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ, প্রাথমিক স্কুল হইতে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সহ-শিক্ষার সুযোগ দিয়াছিলেন। ফলাফল পর্য্যবেক্ষণের ফলেই বোধ হয় স্কুলে ১০ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক বালিকার একত্র অধ্যয়ন এখন আর অনুমোদন করেন না।

আজকাল উচ্চ নিম্ন সকল স্কুলেরই বালক বালিকাদের মনোভাব লক্ষ্য করিলে দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশই অকালপক্কতা লাভ করিয়াছে, শিশুর সরলতা পবিত্রতা আর তাহাদের মধ্যে নাই। স্কুল ছাড়িয়া কলেজে তরুণ তরুণীদের মনোভাব লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ছাত্রজীবনের সংযম, উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আদর্শ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা ভ্রমে উচ্ছৃঙ্খলতাকে তাহারা বরণ করিয়া লইয়াছে। স্বাধীনতার নির্ম্মল আনন্দ কি উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে পাওয়া কখন সম্ভব। কলিকাতার দোকানে পথে, ট্রামে বাসে ছাত্র ছাত্রীদের চলা ফেরা, পোষাক পরিচ্ছদ, আলাপ অলোচনা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় কিরূপ অভাবনীয় একটা পরিবর্ত্তন ইহাদের মধ্যে আসিয়াছে, কালের স্রোতে ইহারা ভাসিয়া চলিয়াছে, ফিরিবার শক্তিও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফলে মনে হয় ছেলে মেয়ে উভয়েই নিজস্ব শক্তি হারাইতে বসিয়াছে। নারীর স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্যশীলতা ও কোমলতার পরিবর্ত্তে চপলতাকেই, তাহারা শ্রেয়ঃ মনে করে ফলে নারীর নিজস্ব সম্মান সর্ব্বত্রই ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

শিক্ষা গড়িয়া তোলে সুস্থ দেহে সুস্থ মন। শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কেহই অস্বীকার করিতেপারেন না। আজকাল অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীদেরই দেখা যায় ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল, যাহাদের শরীর ব্যাধিগ্রস্থ তাহাদের মনও সুস্থ থাকিতে পারে না। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রতি মানবেরই নাগরিক হিসাবে সমাজের প্রতি কিছু না কিছু কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং যোগ্য নাগরিক হইতে হইলে এমন শিক্ষা তাঁহার লাভ করা দরকার যাহাতে সবল সুস্থ দেহ মন লইয়া নাগরিকের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। গ্রীক দার্শনিক Plato (প্লেটোর) সময়ের শিক্ষাসম্বন্ধীয় ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সঙ্গীত শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য ইহা বাধ্যতামূলক ছিল। সেই সময় দুর্ব্বল ক্ষীণকায় ব্যক্তি নাগরিক গণ্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। গ্রীকদের বীরত্ব কাহিনী ইতিহাস প্রসিদ্ধ; সকলেই জানেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে অর্থকরী বিদ্যাই শিক্ষা দেয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক অতি অল্প বলিয়াই মনে হয়।

শিক্ষার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানব চরিত্রের উপযোগ্যতা (adaptability) সম্পাদন করা যারদ্বারা মানুষ সকল অবস্থাতেই অবস্থানুযায়ী নিজেকে চালিয়া নিতে পারে। দেশ, কাল পাত্র ভেদে শিক্ষারও তারতম্য হওয়া বিধেয়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে দেশের লোক এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে মনে হয় এ যেন প্রাণী জগতের নিম্নস্তরের সহজাত কাম্য বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর ন্যায় সবাই চলিয়াছে কলের মত একই পথে যুক্তিহীন ব্যক্তিত্বহীন ভাবে।

এ যেন ঘুমের ঘোরে কাজ করা, কি করিতেছে তার জ্ঞান নাই।

এযুগ পরিবর্ত্তনের যুগ। এই জাতীয়তার যুগে জাতীয় জীবনকে নানা অবস্থার সম্মুখীন করিতে গেলে, সৃষ্টি তন্ত্র শিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন; শুধু রসায়ন বা ভূত-বিদ্যা পড়িলে হইবে না—তাহার দ্বারা বর্ত্তমান

প্রতিযোগিতার যুগে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী আমরা কিছু সৃষ্টি করিতে পারি কিনা দেখা উচিৎ। ইতিহাসের তারিখ মুখস্থ করিয়া কোনও লাভ নাই, যদি ইতিহাস আমাদের জাতি গঠনে সাহায্য না করে অতীতের দুরভিজ্ঞতা হইতে যদি আমরা সাবধান হইতে না পারি এবং সেই সকল অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের জাতি সংরক্ষণের উপযোগী চরিত্র গঠিত না হয়।

আমাদের প্রত্যেক শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে দেখিতে হইবে আমাদের তা দিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতেছে কিনা। ভিতরের পাশব প্রবৃত্তি যদি শান্ত না হয় বুঝিতে হইবে শিক্ষার পরশ পাথরের সন্ধান আমরা এখনও পাই নাই। মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রথম লক্ষণ "বহু জনহিতায় বহুজন সুখায়" জীবনোৎসর্গের উৎসাহ হৃদয়ে বিবৃদ্ধি। দেহের প্রত্যেক অঙ্গ যেমন প্রত্যেক অঙ্গকে সাহায্য করে যথার্থ শিক্ষা তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমগ্র জাতির অঙ্গ স্বরূপ জ্ঞান করাইয়া দেয় এবং তাহার প্রত্যেক কর্ম্ম হয় নিজের ব্যক্তিত্বের প্রসারের সহিত সমষ্টির কল্যাণ বিধান।

বর্ত্তমানে যে শিক্ষা পদ্ধতিতে আমরা শিক্ষিত হইতেছি তাহা বিদেশীয়, বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ মাত্র। বহুদিন হইতে ভারত বিদেশী প্রভাবে প্রভাবান্বিত ফলে অধুনা বিদেশী শিক্ষার উপাদানে ভারত আজ নিজের উদ্দেশ্যের একতানতা হা'রাইতে বসিয়াছে।

বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন জলবায়ু বিশিষ্ট প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কথনও এক হওয়া সম্ভব নয় জাতির ও দেশের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ভেদেই শিক্ষাপদ্ধতিরও প্রভেদ হইয়া থাকে। শিক্ষাগুরুগণ আদর্শ ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ইহা কোন দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায় না।

যে দেশ আজ ভারতের শিক্ষাগুরুর পদ গ্রহণ করিয়াছে সে দেশ বিজ্ঞানের দেশ, আর ভারত ধর্ম্মের দেশ। জগৎ রঙ্গমঞ্চের সাজঘর, জগতের বৃহৎ শিক্ষালয় বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত শিক্ষার ফলে শিক্ষাতে অমৃতও যেমন উঠিতেছে, গরলও তেমি সমভাবে আত্মবিকাশ করিতেছে, বিমান ও বেতারবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর উপকরণও স্তুপীভূত হইতেছে। এখন এ বিষয়কে কণ্ঠস্থ করিয়া "জন" কে অমৃতের অধিকারী করাইতে পারে এমন সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ কোথায়? এ ত্যাগীকেই ভারত ধর্ম্ম বলিয়া জানে—এ ত্যাগী বিলাসবর্জ্জিত, সংযমী, সত্যের অন্ধসন্ধানী তপোভূষণ, সদা আত্মস্থ ও হিংসারহিত। ধর্ম্ম অর্থে মাত্র কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ড, অর্থহীন অনুষ্ঠান, নৃত্য-গীতাদি, কুসংস্কার, স্ত্রীআচার বা দেশাচার নয়, ধর্ম্ম অর্থে কতকগুলি উজ্জ্বল দৃশ্য ও রসের দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি নয়।

ভারতীয় ধর্ম্মের মূর্ত্তপ্রতীক বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—সেথায় দেখা যায় দেবত্বের পূর্ণ বিকাশ—পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বের নব জাগরণ। তাঁহাদের অস্থিতে যে ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মিত তার বেদীতে সচ্চিদানন্দ পুরুষ, তাঁর পদতল হইতে শক্তি গঙ্গা বিচ্ছুরিত হইয়া যুগে যুগে ধ্বংস হইতে জীবনকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে।

দেহের অতিরিক্ত যদি কোনও আত্মা না থাকিত—খাওয়া, পরা ও ধ্বংস বৃদ্ধিই যদি আত্মার একমাত্র স্বভাব হইত তা হইলে শিক্ষায় ধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল না বটে! যাহার স্বভাবে যা নাই তা হইতে তাহার উৎপত্তি সম্ভব নয়; তিল হইতে তেল হয়, বালি হইতে তেল পাওয়া যায় না ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। "বুদ্ধ চৈতন্যকে যখন দেহের কারাগার অতিক্রম করিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে তখন আত্মা ও আত্মার উত্তরোত্তর মহাশক্তির বিকাশ অবশ্য স্বীকার্য্য।" অধিকাংশ মানবই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে সেই জন্য সত্যবাদীকে যেমন আমরা মানব সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারি না সেইরূপ "যদি একজন রামকৃষ্ণ ও ঈশ্বর দর্শন করেন এবং তার প্রামাণ্যরূপে নিজের অদ্ভুত কামকাঞ্চন বিজয়ী চরিত্রের বিকাশ দেন তাহাও মনুষ্য সমাজের প্রনিধানযোগ্য নিশ্চিত।"

অসত্য হইতে সত্যে যাওয়াই ত্যাগ, অল্প সত্যের মোহ কাটাইয়া বৃহৎ সত্যকে ধরার নাম ত্যাগ, এই ত্যাগেরই অপর নাম ধর্ম্ম। ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করিয়া ব্যক্তি যখন সমষ্টির মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করে তখন তাহা ত্যাগ ধর্ম্ম। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যখন স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয় তখন তাহা ব্যবসা, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহান্ জগতের কল্যাণ চিন্তা করিয়া কিছু আবিষ্কার করেন তখন তাহা হয় সেবা—ত্যাগ ধর্ম্ম। কোন অসংযমী আত্মার কাছে বিজ্ঞানের উপকরণ সমূহ ধ্বংস ও স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ মাত্র। ন্যায়পরায়ণতা জীবন চক্রকে অচল করে তোলে যদি তাতে দয়া মসৃণতা সম্পাদন না করে; ঠিক তেমি ধর্ম্মহীন বা ত্যাগ তপস্যাহীন বা দয়া দাক্ষিণ্যহীন শিক্ষা মানুষকে মারিয়া একটা পশু সমাজের সৃষ্টি করে মাত্র।

সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে ধর্ম্ম অর্থে অন্তর্নিহিত সচ্চিদানন্দের বিকাশ। এই ধর্ম্মই শিক্ষার ভিতরকার সার বস্তু ও প্রেরণা আর শিক্ষার কার্য্য প্রত্যেক শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী এমন বীজ বপন কর, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা জগতের প্রতি কল্যাণ কার্য্যে উৎসাহিত হয় কারণ এই শিশুই কালের গণ্ডিতে ক্রমশঃ শিশু হইতে কিশোর; যুবক ও বৃদ্ধতে পরিণতি লাভ করিবে। মনুষ্য জীবনে যৌবন কালই তেজ বীর্য্যে পরিস্ফুট হইয়া সকল কর্ম্মে প্রেরণা আনিয়া দেয়. মনে আশা ও আকাঙ্খা জাগাইয়া তোলে এইজন্য সর্ব্বদেশে তরুণ দলই জাতির আশা ভরসা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সময় সর্ব্বদা উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষায় অগ্রসরই হওয়া আবশ্যক যাহাতে প্রত্যেকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া মাভৈঃ স্বরে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধিত" এই মহামন্ত্রে দেশবাসীকে উদ্বোধিত করিতে পারে। পরিপুষ্ট ফল পাইতে হইলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সুস্থ বীজ বপন আবশ্যক সেইরূপ সমাজে আকাঙ্খিত তরুণদল গড়িয়া তুলিতে হইলে উপযুক্ত মাতারও আবশ্যক। একজন ইংরেজ মণীষি বলিয়াছেন, যে হাত দোলনা দোলায় সেই হাত ত্রিভুবন সংসার শাসন করেন মহাবীর নেপোলিয়ানও বলিয়াছেন মাতাই জাতির জন্মদাত্রী। ইহা হইতে বুঝা যায় মাতার কর্ম্ম কত দায়িত্বপূর্ণ। আদর্শ মাতা পাইতে হইলে সমাজের কর্ত্তব্য কন্যাগণকে অনুরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। নর সৃজন করেন নারী পালন করিয়া থাকেন ইহাই চিরন্তন মানব ধর্ম্ম। সুস্থ জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে পুরুষ নারী উভয়েরই দায়িত্ব সমান। একের শক্তি ও মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া অন্যকে প্রাধান্য দিলে জাতির কল্যাণ হইতে পারে না এ যেন সুস্থ শরীরের এক অঙ্গ কাটিয়া পঙ্গু করিয়া ফেলা। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই ধর্ম্ম কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র সকল সময়ে একের ধর্ম্ম অন্যের আদর্শ হইতে পারে না। স্ব স্ব ধর্ম্ম পালনের জন্য তাহারা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত এবং আদর্শ পিতা স্বধর্ম্মে থাকিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সাহায্য করিবে। আদর্শকে খর্ব্ব না করিয়া মানুষের মনুষ্যপদ বাচ্য গুণ ও আদর্শ এবং নারীর নারীত্ব ও মহত্ব বজায় রাখিয়া সর্ব্বদা অগ্রসর হইতে হইবে। পথ, উপায়, অবলম্বন বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলে সাফল্য লাভ অবশ্য ঘটিবে। আদর্শ অক্ষুন্ন থাকিলে শুভ ফল অবশ্য ফলিবে।

ভারতীয় নারীত্বের আজ অতি বড় দায়িত্ব গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। লুপ্তপ্রায় জাতিকে পূর্ণ জীবন দান ও উহাকে জগৎ সভায় বরেণ্য ও অভিষিক্ত করিতে হইবে। কবি গাহিয়াছেন—

তুই না জাগিলে জাগিবে না ধরণী
জাগগো জাগগো জননী।

সুপ্ত শক্তিকে জাগাইতে হইলে আজ ভারত জননীকে দশভুজা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া পঞ্চভুজে পঞ্চরিপুর দমন ও অন্য পঞ্চভুজে শান্তি বর অভয় স্তন্য পীযুষ দান করিয়া রাজরাণীর বেশে আপন সিংহাসন অধিকার

করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের আদর্শে ভারত নারী আজ পুরুষের সমকক্ষতাকেই স্বাধীনতা ও পূর্ণতার চরম বলিয়া মনে করিতেছেন প্রতীচ্য রমণীকুল প্রতি পদবিক্ষেপে আজ পুরুষের সমাকক্ষা, তাঁহারা ওকালতি করেন জজিয়তি করেন, পার্লামেণ্টের সদস্য হন, তাঁহারা খেলা ধূলায় তাম্রকুট সেবনে পুরুষকেও পরাস্ত করিয়াছেন। এক কথায় পুরুষের সমকক্ষা হইতে তাঁহারা কোন কাজেই পশ্চাদপদ হন নাই কিন্তু তাঁহাদের এবম্বিধ জাগরণে ও সমকক্ষতায় স্বর্গ ধরণীতে নামিয়া আসে নাই। মুক্তি, স্বরাজ, স্বাধীনতা মানুষের নিজের হাতে। ইহাতে তাহার জন্মগত অধিকার কিন্তু মুক্তি লাভের জন্য, মুক্তির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নর-নারীকে প্রস্তুত হইতে হইবে। সাধনা ছাড়া, যোগ্যতা ব্যতিরেকে অসংযত মুক্তি উন্নত অশ্বের ন্যায় মানুষের দেহ রথকে উচ্ছন্নে লইয়া যায়।

ফরাসী ভাষায় একটী কথা আছে চলেছ কোথায়? (quo vadis) জীবনের মহাযাত্রায়, কোন উদ্দেশ্যে কোথায় চলিয়াছ? জীবের উদ্দেশ্য কি এই যে চিরদিনের প্রশ্ন ইহার একটা শাশ্বত উত্তর ঠিক করিয়া ভারতের নারীগণ যাহারা ভবিষ্য পুরুষের মাতা ও ভগিনীর স্থান অধিকার করিবেন, নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হউন। তাঁহাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে তাঁহাদের জীবনে কোন্‌টা আশীর্ব্বাদস্বরূপ, কোন্‌টা নারীসুলভ, কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা গরীয়সী। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা যাহা কিছু করিতেছে তাহাই সকল বিচার জলাঞ্জলি দিয়া অনুকরণ করা অনুচিত। তাঁহারা বিচার করিয়া নিজেদিগকে গড়িয়া তুলুন ও সেই ভাবে জীবন যাপন করুন। বানর সুলভ অনুকরণ, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। স্বীয় আদর্শ ঠিক করিয়া ভারতীয় নারীত্বের আজ উদ্বোধনের সময় আসিয়াছে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্‌ নিবোধত'

পিছল পথে

শ্রীসীতা দেবী

কুন্দমালার বিবাহ যে কোনোদিন দিয়া উঠিতে পারিবেন সে ভরসা আর কুন্দের মায়ের ছিল না। তবু কুন্দমালার বিবাহ হইয়াই গেল। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, বিবাহ তাহাদের যে হইতেই হইবে, তা যেমন মানুষের সঙ্গেই হোক।

তাই বলিয়া কুন্দমালার বর যে একেবারেই খুব খারাপ হইয়াছিল, তাহা নয়। রমাপতির পৈত্রিক জমিজমা ছিল, বাড়ীঘরও ছিল, যদিও পাকা বাড়ী নয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, লেখাপড়া কিছুত শিখিবেই, বেশী না হয় নাই হইল! সে সংস্কৃত শিখিয়াছিল চলনসই রকম, বাংলা ত জানিত-ই। পিতার অনেক যজমান ছিল, তাহার অর্দ্ধেকগুলি সে দখল করিতে পারিয়াছিল, বাকিগুলি জ্যাঠ্‌তুতো ভাই তারানাথ বেহাত করিয়া লইল, তাহাকে ঠকাইয়া। বুদ্ধিশুদ্ধি রমাপতির একটু কাঁচাই ছিল, কিন্তু মা জাহ্নবী ঠাকুরাণী তাহাকে ঠিক চালাইয়া লইতেন। জাহ্নবীর সম্মুখে রমাপতিকে বোকা বলিবার জো ছিল না, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়া যাইত।

রমাপতির বয়স কুড়িবছর হইল। জাহ্নবীর ইচ্ছা ছিল আরো অল্পবয়সেই তাহার বিবাহ দিয়া দিবার। সংসারে তাঁহার আপন বলিতে আর কেহ নাই, ঐ ছেলেটি ছাড়া। ছেলেরও তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। কাজেই বিবাহ দিয়া সকাল সকাল ছেলেকে সংসারী করিয়া বসাইয়া দিবার ইচ্ছাটা জাহ্নবীর খুবই স্বাভাবিক। তাঁহার ভালমন্দ কখন কি হয়, বলা যায় কি? তখন ছেলে যে একেবারে ভাসিয়া যাইবে? হাজার হৌক সে ছেলেমানুষ, এবং জ্ঞাতিশত্রু তাহার চারিধারে। সব দিক বুঝিয়া কি আর চলিতে পারিবে? সাংসারিক বুদ্ধি তাহার যে বড়ই কম! একটি বুদ্ধিমতী বউ ঘরে আনিতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! যদি বেশ মুরুব্বি গোছের শ্বশুরও একজন পাওয়া যায় তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা। সুতরাং রমাপতির বয়স ষোলো পার হইতে না হইতেই জাহ্নবী ছেলের জন্য কনে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

গ্রামে মেয়ের অভাব ছিল না, সুন্দরী বল, কর্ম্মিষ্ঠা বল, বড়ঘরের বল, সবরকম মেয়েই ছিল। কিন্তু জাহ্নবীর ইচ্ছা ছিল একটু দূরদেশ হইতে বৌ আনিবার। গ্রামের সব মানুষই তাঁহার ছেলেকে ছোটবেলা হইতে দেখিতেছে। তাহাকে "বোকা" এবং "পাগ্‌লা" বলিয়া না খ্যাপাইয়াছে এমন ছেলে বা মেয়ে গাঁয়ে একটিও নাই। এখন সেই সব মেয়ের মধ্য হইতেই যদি তিনি একটিকে বাছিয়া বৌ করিয়া আনেন, তাহা হইলে সেই বৌ কি ছেলেকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধাভক্তি করিতে পারিবে? বৌ ছেলেকে ভক্তি করিতেছে না, "পাগ্‌লা রমাই" ভাবিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে, এ দৃশ্য কল্পনা করিতেই জাহ্নবী ঠাকুরাণীর রক্ত গরম হইয়া উঠিত। কুটুম্ববাড়ীতেও তাঁহার হয়ত যথেষ্ট খাতির না হইতে পারে। এই সব সাতপাঁচ ভাবিয়া, তিনি ভিন্ গাঁয়ে বিবাহ দেওয়াই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

কিন্তু একলা বিধবা মানুষ, অন্য জায়গায় গিয়া ছেলের বিবাহ স্থির করাও ত শক্ত। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগুলি, কার্য্যতঃ সকলেই প্রায় তাঁহার শত্রু ছিল। বিবাহ স্থির করিয়া দেওয়ার বদলে বিবাহে ভাংচী দেওয়াতেই তাহারা বেশী ওস্তাদ। কাজেই রমাপতির বিবাহের সম্বন্ধ পছন্দ মত একটাও পাওয়া যাইতেছিল না।

কুন্দমালার মা বিধবা হইয়াছিলেন, অতি অল্প বয়সে। কুন্দ তখন মাত্র ছয় মাসের। শ্বশুরবাড়ীর কাহারও সঙ্গে তাঁহার বনিত না, স্বামীর সঙ্গেও যে খুব বেশী বনিত, তাহাও বলা যায় না। বিধবা হইবার পর, মেয়েটিকে কোলে করিয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসা ভিন্ন, তাঁহার আর কোনো গতি রহিল না। বাপের বাড়ীরও অবস্থা ভাল নয়, তাহারা এতবড় দায় একলা ঘাড়ে করিতে চাহিল না, খানিকটা অন্ততঃ সাহায্য পাইবার আশায় মেয়ের শ্বশুরকুলকে উত্যক্ত করিতে লাগিল।

ফলে শোনা গেল যে বিধবার স্বভাব চরিত্র নাকি ভাল নয়। দেবর বা ভাসুর কেহই এমন কুচরিত্রা বধুর ভরণপোষণের ভার লইতে পারিবেন না। শিশুকন্যাটিকেও তাঁহারা নিজেদের পালনীয়া বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নয়।

ইহার পর কেহ আর কথা বাড়াইল না, বরং সত্য নির্ণয়ের চেষ্টামাত্র না করিয়া কথা চাপা দিবার চেষ্টাই চলিতে লাগিল। কুন্দমালার মা খানিক গতর খাটাইয়া, খানিক বাপের বাড়ীর সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া দিনগুলি একটির পর একটি কাটাইয়া দিতে লাগিল। মেয়ে যতই বড় হইতে লাগিল, ততই যেন তাহার মায়ের বুকের রক্ত শুকাইয়া জল হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু খাওয়াইয়া পরাইয়া বড় করিলেই ত চলিবে না, মেয়ের বিবাহও ত দিতে হইবে? কিন্তু কুন্দকে বিবাহ করিবে কে? দেখিতে মেয়ে মন্দ নয়, স্বাস্থ্য ও ভাল। ঘর সংসারের কাজকর্ম্মও ইহারই মধ্যে বেশ শিখিয়াছে, কিন্তু দুইটি মারাত্মক ক্রটি যে তাহার বিবাহের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে? তাহার মায়ের টাকাও নাই, সুনামও নাই। কে এই মেয়েকে ঘরে লইবে? আত্মীয় স্বজনের কোনো দায় নাই, তাহারা মা এবং মেয়ে উভয়কেই ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। কুন্দর মা চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার এক বোনঝির বিবাহে যাইবার নিমন্ত্রণ আসিয়া পৌঁছিল। এই বোনঝিটি কুন্দমালার একই বয়সী, বরং দুচার মাসের ছোটও হইতে পারে। কুন্দর ত চৌদ্দ পুরিয়া গিয়াছে। মেয়েকে লইয়া যাইতেই বোন এবং ভগিনীপতি লিখিয়াছে, কিন্তু লইয়া যাইবেন কিনা তাহা কুন্দর মা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক লোকজন আসিবে, মেয়েকে দেখিয়া কাহারও পছন্দ হইয়াও যাইতে পারে। আবার এত বড় অবিবাহিতা মেয়ে দেখিয়া সবাই তাঁহাকে জ্বালাইয়া মারিবে, সে ভাবনাও ছিল। কি করা যায়?

কুন্দই তাঁহার সমস্যার সমাধান করিয়া দিল, বলিয়া বসিল, "আমি যাব মা।"

মা বলিলেন, "যাবি ত, তারপর হাজার কথার জবার দেবে কে ?"

মেয়ে বলিল, "তা বাড়ীতে আমি একলা থাকব নাকি ?'

তাহার মা বলিলেন "কেন মেজ বৌ ত থাক্‌বে, সে ত যাচ্ছে না।"

কুন্দ বলিল, "মেজমামী আমায় দুচোখে দেখতে পারে না, আমি তার ঘরে থাক্‌ব না।"

কথাটা সত্যই। দুবেলা দু'থালা ভাত যে মানুষ অনধিকার সত্ত্বেও পার করে, তাহাকে কেহ ভাল চোখে দেখেনা। কুন্দমালা বাড়ীর যে অতগুলি কাজ করিয়া দেয়, তাহা কেহ গণনার মধ্যেই ধরে না। কাজ যেমন করিয়া হউক হইয়াই যাইত। কিন্তু একটা মানুষের খোরাকীর খরচ কি কম ?

কুন্দর মা আবার খানিক ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তবে চল বাপু আমরাই সঙ্গে। কাপড় চোপড় সব গুছিয়ে নে।"

গুছাইবার সময়ের অভাব ছিল না, জিনিষেরই অভাব। কুন্দ মায়ের খান তিনেক থান ধুতি, আর রেশমের চাদরখানি গুছাইয়া লইল। নিজের যে কয়টি কাপড় জামা ছিল সবই লইল। বিবাহে বা উৎসবে পরিবার মত তাহার কোনও পরিচ্ছদই নাই। গহনার ত চিহ্নমাত্র নাই। তবু কুন্দ যাইতে ব্যগ্র। নিজে সাজিতে না পাক, অন্যকে সাজিতে দেখিয়াই সে সুখী হইবে।

পরিবারের আর কয়েকটি মানুষের সঙ্গে তাহারা পরদিন সকালে গরুর গাড়ী চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। বিবাহ বাড়ীতে পৌঁছিয়া তুমুল আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নিজের নিজের ব্যক্তিগত সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য কিছুক্ষণের মত ভুলিয়াই গেল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। আবার কুন্দর মায়ের মনে পড়িল, নিজের কপর্দ্দকহীন অবস্থা, নিজের অপযশ, নিজের গলার কাঁটা এত বড় কুমারী মেয়ে। কুন্দমালারও হাসি খানিক পরে অনেকটাই ম্লান হইয়া আসিল। তাহার বেনারসী শাড়ী নাই, একখানা চলনসই ঢাকাই কাপড় পর্য্যন্ত নাই। হাতে কাঁচের চুড়ি। তাহার চেয়ে ছোট ছোট সব মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা সব লাজরক্ত মুখে ফিশ্‌ ফিশ্‌ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বরের গল্প করিতেছে। তাহার মাকেও লোকে যেন ভাল চোখে দেখিতেছে না। মা কেন যে এ বাড়ীতে আসিল তাহা কে জানে ? নিজে যে সে জেদ করিয়া আসিয়াছে, তাহাও কুন্দ ভুলিয়া গেল।

দূর সম্পর্কের এক মামী ডাকিয়া বলিলেন, "ওলো আয় না এখানে, পান ক'টা সাজ। একলা এক কোণে গোঁজ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন ? কুন্দ আসিয়া পান সাজিতে বসিল। তাহারই বয়সী এবং তাহার চেয়ে ছোটও কয়েকটি মেয়ে একরাশ পান লইয়া বসিয়াছিল। কুন্দ একবার ভাবিতেছিল গিয়া তাহাদের দলে ভিড়িয়া যায়, আবার সঙ্কোচ কাটাইয়া যাইতে পারিতেছিল না। এখন মামী ডাকাতে সাহসে ভর করিয়া গিয়া মেয়েদের দলে বসিয়া গেল।

অল্প দূরেই তরকারি কাটা চলিতেছিল। এতগুলি মানুষ আসিয়া জুটিয়াছে, দুই বেলাই যজ্ঞির ব্যাপার। ঝুড়ি ঝুড়ি তরকারি কোটা, মাছ কোটা লাগিয়াই আছে।

জাহ্নবীও এই বিবাহে আসিয়াছিলেন ছেলেকে লইয়া। ইনিও ইহাদের সম্পর্কে জ্ঞাতি। রমাপতির যদি একটা ভাল সম্বন্ধ জোটাইতে পারেন, এই আশাতেই আসিয়াছিলেন, নহিলে ঘর দোর ফেলিয়া এত দূরে আসিয়া বসিয়া থাকার তাঁহার কোনো ইচ্ছা ছিল না। ইহারা তেমন কিছু নিকট আত্মীয়ও নয়, না আসিলে কিছু মনেও করিত না। কিন্তু নিকট আত্মীয়দের যে আবার গুণ অনেক, হাঁড়ির খবর লইতে তাহারা সদাই ব্যস্ত।

এ বাড়ীর কেহ রমাপতিকে ছেলেবেলায় দেখে নাই, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে কোনো খোঁজ ও রাখে না। সেইজন্য জাহ্নবী ভরসা করিয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। রমাপতির স্বাস্থ্য ভাল, চালচলন ও অভব্য নয়, কাহার ও পছন্দ হইলেও হইয়া যাইতে পারে। আর তাঁহার ঘরে খাইবার পরিবার অভাব হইবে না, তাহা সকলেই জানে।

তিনি কুন্দমালাকে একটু দূরে বসিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন। মন্দ নয় মেয়েটি, মুখখানি বেশ, পিঠে একেবারে একঢাল চুল। রং তত ফরশা নয় অবশ্য। তা তাঁহার ছেলে ও ত নিখুঁৎ নয় কিছু? মা ত দেখা যাইতেছে বিধবা, টাকা কড়িও কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না, মেয়েটার গায়ে ত সোনারূপার কুচিও একটা নাই। কুটুম্বের সুখ কিছু হইবে না। তবে বউটি ভাল হইলেই ঢের। এতদিন চেষ্টা করিয়া ও ত জাহ্নবী চলনসই রকমের ভাল মেয়েও একটা জুটাইতে পারিলেন না।

পাশের মহিলাটির দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা সেজ বৌ, ঐ মেয়েটি কার গা?"

সেজ বৌ এই বিবাহের কনের জ্যাঠাইমা। তিনি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ওমা, ও যে কুন্দ, আমাদের ছোট্‌কীর বোন্‌ঝি। আজ সকালে ওরা এল যে।"

"মেয়ে ডাগর হয়েছে ত বেশ, এখনও বিয়ে দেয়নি কেন?"

মেজ বৌ বলিলেন, "বিয়ে দিচ্ছে কে বল? বিধবা মায়ের মেয়ে। মামাদেরও অবস্থা ভাল না। বাপেরা বাড়ীর তারা খোঁজই নেয় না। তোমার পছন্দ নাকি?"

জাহ্নবী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "চোখে দেখে পছন্দ হলেই ত হয় না গা? আরো ঢের পছন্দ করবার আছে, সে সবের খোঁজ নিতে হয় ত?"

সেজ বৌ বলিলেন, "সেদিকে কিছু সুবিধা হবে না বাপু, তা আগে থেকে জেনেই রাখ। এক পয়সা দেবার মুরোদ ওদের নেই।

জাহ্নবী তখন আর কথা বলিলেন না। চুপচাপ কুমড়া কুচাইয়া চলিলেন। মনে মনে তাঁহার অবশ্য একটানা চিন্তার স্রোত বহিয়া চলিল। গরীবের মেয়ে, কাজ কর্ম্ম ভালই

জানে বোধ হয়। তাঁহার ত বুড়া হাড়ে আর পোষায় না, একটা সাহায্য করিবার লোক জুটিলে ভাল হইত। মেয়ের স্বাস্থ্য ত ভালই বোধ হয়। বুদ্ধি শুদ্ধি কেমন কে জানে? লেখা পড়া বেশী না জানিলেই জাহ্নবী খুসি, তাহা হইলে দেমাকের আবার সীমা থাকিবে না। ছেলের চেয়ে বৌয়ের বিদ্যা বেশী হোক, ইহা জাহ্নবী একেবারেই চান না। কিন্তু বোকা মেয়েও তিনি চান না। বেশ বুঝিয়া সুঝিয়া সংসার চালাইতে পারে, ঠক্ জোচ্চোরের দ্বারা প্রতারিত না হয়, রমাপতিকে ও সামলাইয়া চলিতে পারে এমন একটি বৌ তিনি চান। সঙ্গে সঙ্গে সেটি সুন্দরী এবং ধনীকন্যা হইলে খুবই ভাল হয়, কিন্তু সব ভাল ত আর জগতে পাওয়া যায় না? নিজেদের যাহাদের খুঁৎ নাই, অন্যের খুঁৎই বা তাহারা সহ্য করিবে কেন? একটু লুকাইয়া ছাপাইয়া বিবাহ দিলে রমাপতির বেশ ভাল বিবাহই হয়, কিন্তু সেটা করিবার ইচ্ছা জাহ্নবীর ছিল না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, মুখের জোরে যে কোনো বামুনের মেয়েকে ঢিট্ করিয়া রাখিতে পারিবেন, এ ভরসা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাহার পর ছেলেকে উঠিতে বসিতে মুখ নাড়া খাইতে হইবে ত? যা ছেলে তাঁহার, সাত চড়ে তাহার মুখে রা নাই। অমন কাঁটার ডাল তাহার জন্য তিনি নিজের উঠানে পুঁতিয়া রাখিয়া যাইবেন না। বরং গরীবের মেয়ে হয় কি সুন্দরী না হয় তাও ভাল। স্বভাব চরিত্র যদি ভাল হয়, স্বামীকে আদর যত্ন করে, তাহা হইলেই ঢের। রমাপতির সুখই তিনি চান, কুটুম্ব লইয়া জাঁক করিবার ইচ্ছা তাঁহার তত নাই।

পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যা হইতে না হইতে ঘরে খিল পড়ে। তবে উৎসবের বাড়ী বলিয়া তত তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া চুকিল না, লণ্ঠন গোটা কতক জ্বালাইয়া ছোট ছোট ছেলে-পিলের দল খাইতে বসিল।

জাহ্নবী দাঁড়াইয়া তাহাদের খাওয়া দেখিতেছিলেন। কুন্দমালা আর তিন চারটি মেয়ের সঙ্গে পরিবেশন করিতেছে। বেশ গুছাইয়া করিতেছে ত? মেয়ের কাজকর্ম্মের হাত ভাল, ফেলাছড়াও করিতেছে না, আবার কাহারও পাতে কমও কিছু পড়িতেছেনা! মেয়েটিকে সন্ধ্যার আলোয় আরো যেন ভাল দেখাইতেছে। এই মেয়েই ভালমত খাইতে মাখিতে পাইলে আরো ভাল দেখিতে হইবে। তাহাছাড়া সাজ পোষাক বিনা কি মানুষের চেহারা খোলে? আজকাল রূপ মানেই ত সাজপোষাকের ঘটা? কালো কালো প্যাঁচার মত বৌ ঝি সব, সাজ সজ্জার কল্যাণে যেন পটের বিবি হইয়া দেখা দেয়। এই মেয়েরই পরণে রেশমের শাড়ী গায়ে এক গা গহনা হোক। তখন ইহাকেই পরীর মত দেখাইবে। জাহ্নবীর শুইবার ঘরে বড় সিন্দুকটার ভিতর জিনিষপত্র নিতান্ত মন্দ নাই। আরো কিছু করাইয়া দিতেও তিনি নারাজ নন, বৌ যদি মনের মত হয়।

কুন্দমালার মা হরিমতি চালাক মানুষ। মেয়ে যে জাহ্নবীর চোখে পড়িয়াছে, তাহা তিনি

বেশ বুঝিতেই পারিয়াছিলেন। তাঁহার পাত্র পছন্দ অপছন্দ হওয়ার কোনো বালাই ছিলনা, যে কোনোরকম পাত্রই যদি মেয়েটিকে বিনাপণে বিবাহ করে তাহা হইলেই তিনি বর্ত্তিয়া যান। আর যে বাধাটা আছে, সেটা তিনি লুকাইয়া রাখিতে পারেন যদি তবেই। ভরসার কথা এই যে সে বহুকাল আগেকার কথা, অনেকেরই মন হইতে মুছিয়া গেছে। এ গাঁয়ে সে সব কথা কেহ জানেই না বোধহয়। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী গিয়া যদি খোঁজ না করে তাহা হইলে অত খবর কেহ জানিতে পারিবে না। লুকাইয়া রমাপতিকেও তিনি ভাল করিয়া বার দুই দেখিয়া আসিলেন। ছেলেটার স্বাস্থ্য ত ভাল, ঘরে দুপয়সা আছেও বোধহয়। তবে একটু যেন বুদ্ধিশুদ্ধি কম, তা হোক। তাঁহার মেয়েকে বিনাপয়সায় যে বিবাহ করিবে, তাহার সম্বন্ধে হরিমতির মনে ঔদার্য্যের সীমা নাই।

জাহ্নবীর সহিত দেখিতে দেখিতে তিনি ভাব জমাইয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন 'ঐ একটিই নাক তোমার দিদি?'

জাহ্নবী বলিলেন, 'ঐ একটি নিয়েই কপাল পুড়েছে ভাই। তোমারও ত দেখি তাই?'

হরিমতি মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৌ দেখ্‌ছি না? ছেলের বিয়ে হয়নি? এখনও পড়াশুনো করছে নাকি?'

জাহ্নবী হাত নাড়িয়া বলিলেন, 'না, বিয়ে এখনও দিইনি। ছেলের কি-ই বা বয়স? এখনও ছোট ছেলের মত প্রকৃতি, বিয়ের কথা ওর মাথাতেই আসে না। ঐত একটি, ওকে ছেড়ে থাকতেও পারিনা, তাই আর পড়াবার জন্যে সহরে পাঠাতে পারিনি। তা এইবার বিয়ে দেব ভাবছি।'

হরিমতি বলিলেন, 'আমার মেয়েকে দেখলেত ভাই? কেমন মনে হয়? ঘরে নাওত বিধবামানুষের বড় উপকার হয়। তোমাদের না বল্‌লে কাকে আর বল্‌ব বল?'

জাহ্নবী তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। ছ্যাব্‌লামী করিয়া নিজেকে খেলো করিতে তিনি চান না। বেশ ভারিক্কিভাবে বলিলেন, 'এক কথায় কি আর এর জবাব দেওয়া যায় বোন? কথাই আছে যে লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। তাছাড়া আত্মীয় স্বজন আরো পাঁচটা আছে ত? সবাইকে বল্‌তে হবে, মত করাতে হবে। তা ঠিকানাটা তোমার আমায় দিয়ে রেখো।'

ঠিকানা অদল বদল হইয়া গেল। হরিমতির মেয়ে এবং জাহ্নবীর ছেলেও অন্যের অলক্ষ্যে পরস্পরকে দেখিয়া লইল। তাহাদের দুজনের দুজনকে পছন্দ হইল কিনা তাহা অবশ্য কিছু জানা গেল না।

উৎসবান্তে যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া গেল। জাহ্নবীর সত্যই মেয়ে পছন্দ হইয়াছিল, বেয়ানকেও নিতান্ত অপছন্দ হয় নাই। হয়ত শাশুড়ী আসিয়া তাঁহার ছেলের ঘাড়ে চড়িবে, এ ভয় একটু হইল বটে, কিন্তু তাহা তিনি জোর করিয়া মন হইতে দূর করিয়া দিলেন। চড়েই যদি তাহাতেই বা কি? একলা বিধবা মানুষ কতই বা খাইবে? মানুষটার বুদ্ধি-

শুদ্ধি আছে বলিয়া বোধ হয়, রমাপতির ঘরে থাকিলে তাহার লাভ বই লোকসান নাই। মেয়ে জামাইয়ের ভাল বই মন্দ ত মানুষে করিবে না?

হরিমতি বিশেষ কোনো ভরসা লইয়া গেলেন না। তাঁহার মেয়ে যতই ভাল হোক, কে বিনা পয়সায় তাহাকে বিবাহ করিবে? শুধু যে তিনি পণ দিতে পারিবেন না, তাহা ও নয়, মেয়েকেও ত একেবারেই কিছু দিতে পারিবেন না? মামাদেরও এমন অবস্থা নয় যে তাহারা কিছু দিবে। থাকিলেও অবশ্য মামীরা দিতে দিত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু কুন্দমালার অদৃষ্টে এই সময় একটু সুখ লেখা ছিল বোধ হয়! জাহ্নবীর চিঠি আসিল, মেয়ে দেখিবার দিন স্থির হইল, মেয়ে দেখাও হইয়া গেল। পছন্দ হইল, বলাই বাহুল্য, কারণ যাহার পছন্দ করিবার তিনি আগেই করিয়া রাখিয়াছিলেন, এটা নিতান্ত লোক দেখান ব্যাপার মাত্র। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কিছু পাইবেন না তাহা জাহ্নবী জানিতেনই তাই বিশেষ কিছু দাবি করিলেন না। তবে একেবারে কিছু না চাহিলে কন্যাপক্ষের লোক ভাবিবে তাঁহার ছেলে নিতান্ত ফ্যালনা, বিবাহ তাহার বুঝি জুটিতে ছিল না তাই কন্যার জন্য কিছু গহনা তিনি চাহিলেন। হরিমতি নিজের অক্ষমতা জানাইয়া, অনুনয় বিনয় করিয়া চিঠি লেখার পর, তিনি আর এবিষয়ে জোর জবরদস্তি করিলেন না। এক রকম বিনাখরচেই কুন্দমালার বিবাহ হইয়া গেল। শস্তা লাল চেলি এবং ফুলের মালামাত্র পরিয়া কুন্দমালা মায়ের ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শাশুড়ী অবশ্য তাহাকে গা সাজাইয়া গহনা দিলেন, কাপড় চোপড়ও কিছু কিছু দিলেন। কুন্দমালা খুবই খুসি হইল, ইহাই তাহার কাছে ঐশ্বর্য্য। শাশুড়ী মানুষটিকে একটু বেশী কড়া বোধ হইল, তা কঠিন কথা শুনা কুন্দমালার অভ্যাস আছে, মামীদের কল্যাণে। এখানে তবু তাহার একটা অধিকার আছে, যেখানে ছিল, সেখানে যেন শূন্যে ঝুলিয়াছিল, পায়ের তলায় মাটি পাওয়া যাইত না।

কিন্তু বরের সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া তাহার সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম করিল। এ যে বড়ই বোকা, কথাবার্ত্তা বলিতেই জানে না। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কুন্দ, সখীদের কল্যাণে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। রমাপতিকে তাহার ভাল লাগিল না। শাশুড়ীর উপর সে চটিয়াই গেল। একেবারে একটা বোকা ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়া, বুড়ী তাহাদের আচ্ছা ঠকান ঠকাইয়া লইল। রমাপতি অত শত বুঝিল না, তাহার বউ বেশ পছন্দই হইল।

কুন্দ দিন সাত আট পরে মায়ের কাছে দিন কয়েকের জন্য বেড়াইতে আসিল। বেশী দিন তাহাকে রাখিবেন না তাহা শাশুড়ী বলিয়াই দিলেন। কুন্দ নিভৃতে মায়ের কাছে বসিয়া একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিল।

হরিমতি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে? শাশুড়ী গাল মন্দ দেয় নাকি?"

কুন্দ চোখ মুছিতে মুছিতে, মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহা দেয় না।

হরিমতি আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তবে আবার কি? ঘরে শুনছি বেশ দুপয়সা আছে, গালও দেয় না, ধরেও মারে না, তবে কাঁদছিস্ কেন? জামাই কিছু বলেছে?"

কুন্দ ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "বলতে জান্‌লে ত?"

হরিমতি হাসিয়া বলিলেন, "এই কথা? তা ছেলেটা চুপচাপ আছে, সে ভালই। বেশী ফাজিল ছেলে ভাল না।"

মায়ের কাছে কোন সহানুভূতি না পাইয়া কুন্দ রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। তাহার সখীরা খানিকবাদেই আসিয়া তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিবে, তখন তাহাদের কাছে বানাইয়া দু' কথা বলিতে হইবে ত? কুন্দ মনে মনে নানারকম রসাল গল্প বানাইতে লাগিল।

আটদিনের দিন শ্বশুরবাড়ী হইতে লোক আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। শাশুড়ী উচ্ছ্বাস করিবার মানুষ নয়, তবু সমাদর করিয়াই বধূকে গ্রহণ করিলেন। রমাপতি ও আনন্দে আটখানা, মায়ের সামনে শুদ্ধ সে তাহার মনোভাব লুকাইতে পারিল না। জাহ্নবী দেখিয়া খুসি হইলেন, ছেলের তাহা হইলে বৌকে বেশ মনে ধরিয়াছে। কিন্তু মেয়েটা মুখখানা অমন হাঁড়িপানা করিয়া আছে কেন? মায়ের জন্য মন কেমন করিতেছে বলিয়া কি? না এ বাড়ী পছন্দ হইতেছে না, রাজনন্দিনীর? কুন্দমালা সম্বন্ধে মনটা তাঁহার একটু বিরূপ হইয়া গেল।

রাত্রে রমাপতি বধূর কাছে আসিয়া ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "তোমার আনন্দ হচ্ছে না কুন্দ? আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগ্‌ছে।"

কুন্দ ঠোঁট উল্টাইয়া খানিকটা সরিয়া বসিল। ন্যাকা আর কি? কিবা ছিরি?

বাহিরে গোটা দুই মেয়ে আড়ি পাতিতেছিল, তাহারা রমাপতির প্রেমালাপের উপক্রমণিকাটুকু শুনিয়াই হি হি, করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমাপতি লজ্জিত হইয়া সরিয়া বসিল। কুন্দমালা রাগে আগুন হইয়া, চাদর মুড়ি দিয়া বিছানার এককোণে শুইয়া পড়িল, হাজার ডাকেও আর সাড়া দিলনা।

জাহ্নবী ক্রমে ব্যাপার বুঝিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। এই দুঃখেই না তিনি গ্রামের মেয়ে আনিলেন না? কুন্দর চেয়ে সুন্দরী মেয়েও তিনি পাইতে পারিতেন, টাকা নিশ্চয়ই পাইতেন। হা-ঘরের মেয়ের তেজ দেখনা? ঝাঁটা মারিয়া তেজ তিনি বাহির করিয়া দিবেন। লোকের পাত কুড়াইয়া খাইত ছুঁড়ি, এখন লাই পাইয়া মাথায় উঠিতে চায়। বধূকে সামান্য একটা ছুতা ধরিয়া তিনি প্রচণ্ডরকম বকুনি দিয়া দিলেন। বেয়ানের কাছেও খুব কড়া করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেন।

ফলটা অবশ্য যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহার উল্টাই হইল। বকুনি খাইয়া কেহ কোনোদিন একটা মানুষকে ভালবাসিয়া ফেলিতে পারে না, কুন্দও পারিল না। রমাপতিকে আগে সে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত, তাহাতে একটুখানি করুণা মিশ্রিত ছিল হয়ত, এখন তাহার উপর মর্ম্মান্তিক রকম চটিয়া গেল। শাশুড়ীর ভয়ে মুখে দিনের বেলা একটুখানি হাসির ছোপ লাগাইয়া রাখিত, রাত্রে ঘরে ঢুকিবামাত্র সে হাসি মিলাইয়া গিয়া মুখ একেবারে ঝড়ের আকাশের মত হইয়া উঠিত। রমাপতি তবু বুঝিত না। বিবাহ করিয়া যাহাকে লইয়া আসিয়াছে, সে বৌও যে আবার ভাল না বাসিতে পারে, তাহা বেচারার ধারণাতেই আসিত না। সে যতটা পারে ভাব জমাইবার, প্রেম নিবেদন করিবার চেষ্টা করিত। অবজ্ঞা আর বিরক্তিতে মুখখানা পঁ্যাচার মত করিয়া কুন্দমালা শাশুড়ীর ভয়ে নীরবে তাহার কথা শুনিয়া যাইত, নিতান্ত অসহ্য হইলে মুড়িসুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িত। নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে, দারুণ অবহেলাও অনাদরের মধ্যে যে মেয়ে বড় হইয়াছে, সেও ছেঁড়াকাঁথায় শুইয়া সুখস্বপ্ন কম দেখে নাই। বরের মুখটাই স্পষ্ট দেখে নাই, কিন্তু তাহার রসেভরা কথাবার্ত্তা, তাহার আদর এ যেন সে সত্যই কাণ দিয়া শুনিত, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিত। তাহার জীবনে এই কল্পনাটুকুই ছিল একমাত্র আনন্দের খোরাক! হিন্দুর মেয়ে যখন তখন বর তাহার আসিবেই, তখনই কুন্দমালার বুভুক্ষিত চিত্তের সম্মুখে নন্দনকাননের দ্বার খুলিয়া যাইবে। সখীরা তাহার এই কাল্পনিক কামনার আগুনে খালি ঘৃতাহুতি দিয়া আসিয়াছে। ইহাই ছিল কুন্দমালার জীবন, সারাটাদিন ভূতের মত খাটিত, সন্ধ্যায় গল্প করিত, রাত্রে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিত। লেখাপড়া সে শেখে নাই, যদিও নাটক নভেল পড়িবার ইচ্ছাটা তাহার ছিল। হরিমতি সামান্য বাঙ্‌লা লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু মেয়েকে তাহাও শেখান নাই। শ্বশুরবাড়ীতে লেখাপড়া জানা বউ বলিয়া তাঁহাকে অনেক ঠাট্টা সহিতে হইয়াছে। আর পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থঘরে লেখাপড়ার দরকারই বা কি? সারাদিন ত রাঁধিতে আর ধানভানিতেই কাটিয়া যাইবে? বই পড়িবে কখন? বই পড়ার ব্যাপারটাকে একটা সৌখীনতা ভিন্ন তাঁহারা কিছুই ভাবিতেন না।

কুন্দমালার ঘরে এখন খুব বেশী কাজ নাই। তিনটি মানুষের সংসার, শাশুড়ীও খুব কর্ম্মিষ্ঠা। বাহিরের কাজের জন্য একটা চাকরও আছে। সকালে খানিক রান্নাঘরে কাজ করিতে হয়, তাহারপর সারাটাদিন ছুটি। কুন্দে সময় আর কাটিতে চায়না। এখানে এখনও তাহার বেশী সখী জোটে নাই, শাশুড়ীর ভয়ে কেহ বিশেষ তাহার কাছে অগ্রসর হয় না। বরের সঙ্গে ভাব থাকিলে দুপুরটা গল্প গাছা করা যাইত, সেই উদ্দেশ্যেই বোধহয় শাশুড়ী সারা দুপুর নিজের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া থাকেন। কুন্দ কিন্তু নিজের শয়নকক্ষের ছায়াও মাড়ায় না, ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া এটা সেটা নাড়িয়া সময় কাটায়, কখনও বা অকারণেই চোখের জল ফেলে। রমাপতির সাড়া পাইলেই দুম্ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়।

সেদিনও দুপুরে ভাড়ার ঘরে বসিয়া সে সুপারি কাটিতেছে, এমন সময় জানালার কাছ হইতে মিহিসুরে কে যেন বলিয়া উঠিল, 'মুখ তুলে বউ কওনা কথা।'

কুন্দমালা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল পাড়ারই মেয়ে সরসী। তাহার চেয়ে বয়সে কিছু বড়, বিবাহও হইয়াছে, তবু বৎসরের ছয়মাস সে বাপের বাড়ীই কাটাইয়া দেয়। স্বামীও লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ গরজ দেখায়না, এইরকম একটা কথা কুন্দ শুনিয়াছিল।

সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, 'তা ঘরে এসে বোসো, নইলে কি আর রাস্তা থেকে কথা কইব ?'

সরসী বলিল, 'সদর দোরটা ত এঁটে দিয়ে বসে আছিস্, ঘরে ঢুকব কি করে ?

কুন্দ আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল, সরসী ভিতরে আসিয়া বসিল। এধার ওধার চাহিয়া নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর শাশুড়ী কোথায় রে ? কি করছে ?'

ইঙ্গিতে শাশুড়ীর ঘর দেখাইয়া কুন্দ বলিল, 'ঘুমিয়ে আছে বোধহয়।

সরসী বলিল, 'ভালই হল বাপু, ও মাগী আমায় আবার মোটে দেখতে পারে না।'

কুন্দ মুচ্কি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখতে পারেনা কেন ভাই ?'

সরসী হি হি করিয়া খানিক হাসিয়া বলিল, 'তুই শুন্লে চটে যাবি নিশ্চয়, হি হি হি।"

কুন্দ তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'আমর, শুধু শুধু হেসে মরছিস্ কেন ? চট্‌ব কেন ? কি এমন কথা ?'

সরসী কোনোমতে হাসি সাম্‌লাইয়া বলিল, "তোর বরকে ছোটবেলায় 'রমাই ক্ষ্যাপা' বলে খেপাতাম কিনা, তাই তোর শাশুড়ী আমায় দেখ্‌তে পারে না।"

কুন্দমালা মুখের হাসি মিলাইতে দিল না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। আহা কি চমৎকার বিবাহই তাহার হইয়াছে। গাঁয়ের পাগলের বউ, তাহার খাতির কত !

যাহা হোক্ সরসী কথা ঘুরাইয়া অন্য কথা পাড়িল। কুন্দও তাহার রসালাপে মজিয়া গিয়া খানিক পরে নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল।

বেলা পড়িবার উপক্রম করিতেই সরসী উঠিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু দেখা গেল জাহ্নবীর দরজা খোলা। কখন তিনি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়াছেন, তাহা দুই সখীতে টেরও পায় নাই।

সন্ধ্যার সময় জাহ্নবী বউকে ডাকিয়া বলিলেন, "সরসীর সঙ্গে অত ভাব কিসের শুনি ? ওত মেয়ে ভাল না ?"

কুন্দ মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিল, "আমি ত আর ওকে ডাকিনি ? ও নিজেই এসে বস্‌ল, তাই কথা কইলাম।"

জাহ্নবী বলিলেন, "ও ত নিজে আস্‌বেই। গাঁয়ের যত বৌ ঝি সব ওর মত হলে ওর খুব ভাল লাগে। তুমি ওর সঙ্গে মেশামিশি কোরোনা বাছা, এই আমি এক কথা বলে দিলাম।"

কুন্দ নীরবে শাশুড়ীর কথা শুনিয়া গেল। তাহা পালন করিবার কোনো মতলব তাহার ছিলনা অবশ্য। সরসীকে তাহার ভালই লাগিয়াছে, খুব হাসাইতে পারে মানুষকে। তা শাশুড়ী বাড়ীতে নাই বা সরসীকে আসিতে দিলেন, দেখা করিবার স্থানের তাহার অভাব নাই। গোয়ালবাড়ী আছে, পুকুর ঘাট আছে, কালীমন্দির আছে, মন্দিরের বাগান আছে। এসব জায়গাতেই সে যায়, শাশুড়ী কিছু সর্ব্বস্থানে তাহার পিছন পিছন যায় না। দেখিতে দেখিতে সরসীর সঙ্গে কুন্দমালার বেশ ভাব জমিয়া গেল।

রমাপতিও ক্রমে বুঝিল যে বৌয়ের তাহাকে পছন্দ হয় নাই। তাহারও সদা প্রফুল্ল মুখ শুখাইতে আরম্ভ করিল। জাহ্নবী ছেলের মুখ দেখিয়া যত চটিতে লাগিলেন, বৌয়ের উপর তর্জ্জন গর্জ্জনও তাঁহার তত বাড়িতে লাগিল। কিন্তু বৌ আজকাল বেশ মিট্‌মিটে শয়তান হইয়া উঠিয়াছে, বকুনি খাইয়া মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের চালচলনের কোনো পরিবর্ত্তনই করে না। মাঝে হরিমতি একবার মেয়েকে লইতে লোক পাঠাইলেন, জাহ্নবী কুন্দকে পাঠাইলেন না, লোক ফিরাইয়া দিলেন। হরিমতি সম্বন্ধে নানাকথা তাঁহার কাণে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে বউকে আর মায়ের কাছে পাঠাইবেন না। হতভাগী তাঁহাকে খুব চোখে ধূলা দিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া নিল। এখন রমাপতির অদৃষ্টে যা থাকে। তিনি ত চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু গাঁয়ের মেয়েগুলিও ত কম নয়? নানাকথা লাগাইয়া তাহারা বৌয়ের মন ভাঙ্গিয়া দিতেছে। জাহ্নবী যদি এক কুন্দকে তালাচাবি দিয়া রাখেন তাহা হইলে হয়, কিন্তু তাহা হইলে চারিদিকে নিন্দায় কাণ পাতা যাইবে তা, লোকে অ-কথা কুকথা বলিতে আরম্ভ করিবে। একটা ছেলেমেয়ে কিছু হইলে হতভাগীর মনটা ঘরে বসিয়া যায়, কিন্তু কৈ তাহারও ত কোন লক্ষণ নাই? ছয়মাস হইল বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এতদিনে হইতে পারিত ত? তাঁহার ছেলের স্বাস্থ্য বেশ ভাল, বৌ ত এখন দিব্য সুন্দর হইয়াছে খাইয়া দাইয়া।

জমিদারের পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গ্রামে যাত্রা হইতেছে। কুন্দর ভারি সখ একবার গিয়া দেখে, সরসী, রাধা, বকুল, সবাই যাইবে। কিন্তু যে রায়বাঘিনী শাশুড়ী ঘরে, যাইতে দিবে কি? সে নিজে বলিতে গেলে গাল খাইবে, সরসী ত জাহ্নবীর সম্মুখে বাহিরই হয় না তাঁহার রসনার ভয়ে। এক বকুলকে দিয়া বলাইলে হয়। তাহাকে শাশুড়ী সুনজরেই দেখেন।

কিন্তু বকুলও জাহ্নবীর কাছে হার মানিয়া গেল। জাহ্নবী মুখ কঠিন করিয়া বলিলেন, "না বাছা, বৌ-মানুষ রাতভোর যাত্রা শুনবে কি? ওসব আমি পছন্দ করিনা। একি সহরে বিবি, যে রাতদিন থিয়েটার দেখে বেড়াবে?"

কুন্দ শুনিয়া গেল। মনে মনে স্থির করিল সে যাইবেই, যাহা থাকে কপালে।

রমাপতিই তাহার সুবিধা করিয়া দিল। জাহ্নবীর ঘরে খিল বন্ধ হইতেই ফিশ্, ফিশ্,

করিয়া কুন্দকে বলিল, "আমি একটু যাই, দুটো গান শুনে আসি। আবার খানিক পরে ফিরে আসব, দরজায় টোকা দিলে দরজা খুলে দিও।"

কুন্দ হাসিভরা মুখে, আবদারের সুরে বলিল, "আমিও যাব। আমার বুঝি কিছু শুন্‌তে ইচ্ছা করে না ?

বৌয়ের মুখের হাসি দেখিয়া রমাপতির মাথা ঘুরিয়া গেল বটে, কিন্তু মায়ের ভয়টাও বড় প্রবল। সে বলিল, "মা জান্‌লে আর রক্ষে রাখবে না।"

কুন্দ বলিল, "মা জানবে কি করে ? আমরা ভোরের আগে ফিরে আসব না ?"

রমাপতি আর বাধা দিল না। নিজেরও যাইবার ইচ্ছা তাহার প্রবল, বউকে খুসি করিতে পারিলেও সে বর্ত্তিয়া যায়। কুন্দ সাজিয়া গুজিয়া স্বামীর সঙ্গে যাত্রা শুনিতে চলিয়া গেল।

সরসী তাহাকে চিম্‌টি কাটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওমা এত রাতে কার সঙ্গে এলিরে ?"

কুন্দ তাহার পিঠে কিল মারিয়া বলিল, "কার সঙ্গে আবার ? ঘরের মানুষের সঙ্গে।"

সরসী ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিয়া বলিল, "ও হরি, জমিয়ে নিয়েছিস্ তাহলে ?"

কুন্দ বলিল, "দূর। তাই বলে যাত্রাটা শুনব না নাকি ? দেখ, দেখ, অভিমন্যুর কি চমৎকার গলা, দেখতেও বেশ ত।

সরসী তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "তোর ঐরকম একটি বর হলে বেশ মানাত না ?"

"চুলোয় যা", বলিয়া কুন্দ তাহাকে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু কথাটা তাহার বেশ মনে লাগিল।

ভোররাত্রে তাহারা বাড়ী ফিরিয়া চলিল। বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল সদর দরজা খোলা।

রমাপতির বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল, সে পাংশুমুখে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া গেল। কুন্দ তাহাকে ঠেলা দিয়া বলিল "ভিতরে চল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব নাকি ? মা ত তোমায় খেয়ে ফেল্‌বে না ?"

রমাপতি পৌরুষের গর্ব্ব বজায় রাখিবার জন্য কোনো মতে পা বাড়াইল। কুন্দ ঘোমটা টানিয়া তাহার পিছন পিছন চলিল।

জাহ্নবী উঠানে গোবরজল ছড়া দিতেছিলেন। ছেলেকে দেখিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, 'রমা!'

রমাপতি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। জাহ্নবী একবার বধূর দিকে তাকাইলেন, আবার ছেলের দিকে তাকাইলেন। কি জানি ভাবিলেন। বকুনিটা মুলতুবি রাখিয়া বলিলেন, 'যা ঘরে। বোকা কোথাকার। হিম লেগে কারো অসুখ করে ত দেখ্‌বে ?'

রমাপতি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কুন্দমালা হাসি চাপিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া গেল। শাশুড়ী আচ্ছা বোকা যা হোক!

ডানোভন গার্লস হাইস্কুলের দুরবস্থা

মাদারীপুর ডানোভন গার্লস হাই স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। উহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা আবশ্যক। মাদারীপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ কে দের পত্নীর চেষ্টায় গত ২৮শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার রাত্রে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় সহরের বিশিষ্ট মহিলাদের এক বৈঠক হয়। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে, এই বিদ্যালয় রক্ষার উদ্দেশ্য এক কার্য্যসূচী স্থির করিবার জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শীঘ্রই মহিলাদের এক সাধারণ সভা হইবে।

হরিজন মেয়েরা ঘড়ায় করিয়া জল আনিতে পারিবে না

আমেদাবাদের জানুগ্রামের হরিজনগণ ঐ গ্রামের কতিপয় বর্ণ-হিন্দুর বিরুদ্ধে পুলিশের নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছে যে, বর্ণ-হিন্দুদের মেয়েরা যেমন তামার কলসীতে করিয়া নদী হইতে জল লইয়া যায়, হরিজন মেয়েরা ঐধরণের তামার কলসীতে করিয়া নদী হইতে জল লইয়া যাইবে, ইহা বর্ণ-হিন্দুগণ মোটেই পছন্দ করে না। উহারা বহু হরিজন নারীদের নিকট হইতে তামার কলসীগুলি কাড়িয়া লইয়াছে এবং হরিজন মেয়েরা আর কখনও তামার কলসীতে করিয়া জল আনিবে না এই প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্য্যন্ত কলসীগুলি ফিরাইয়া দিতে রাজী হইতেছে না। পুলিশ গ্রাম্য মোড়লের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া উক্ত কলসীগুলি উদ্ধার করিয়াছে ও তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পাঁচ লক্ষ মণ ঘৃত বিদেশে রপ্তানী

ভারতের দুগ্ধের অনটনের জন্য বৎসরে অর্দ্ধকোটী টাকার জমাট-দুগ্ধ (condensed milk) আমদানী হয়। কিন্তু এই দুগ্ধ-অনটনের দেশের দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন প্রায় পোনে পাঁচ লক্ষ মণ ঘৃত বৎসরে বিদেশে চলিয়া যায়।

মহৎ দান

প্রেসিডেন্সী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার পিতৃদেব স্বনামধন্য শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৭৭ বৎসর, শরীর অপটু, কিন্তু বিদ্যানুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

বোবার চিকিৎসা

লণ্ডনের একটী হাসপাতালে বোবা ছেলেদের কথা বলানর চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকের বয়স ২ বছর পার হয়ে গেছে। এখানে আঙুলের ডগার সাহায্যে কথা বলা শেখান হয়।

বাতায়ন

প্রতিভার অপচয়

টাঙ্গাইলের সংবাদে প্রকাশ, টাঙ্গাইলের এক উচ্চ ইংরেজী স্কুলের জনৈক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় সহজেই পাশ করিবার জন্য এক ইঞ্জিনীয়ারী বুদ্ধি খাটায়। পরীক্ষার পূর্ব্বে সে একটী ফাঁপা বাঁশের নল তাহার বসিবার আসনের নীচে মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া তাহার সহিত খণ্ড খণ্ড বাঁশ যোগ করিয়া দেয়; বাঁশের মধ্য দিয়া একটী তার চালাইয়া দেয়। বাঁশের শেষের মুখটি ছিল বোর্ডিংয়ের এক ছাত্রের ঘরে। প্রশ্নপত্র পাইবামাত্র সে উহা তারের একপ্রান্তে আটকাইয়া দিত এবং বোর্ডিংয়ের ছাত্রটি তার দিয়া উহা টানিয়া লইত। প্রশ্ন পত্রের উত্তর লিখিয়া বোর্ডিংয়ের ছাত্রটি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পরীক্ষার্থীর নিকট পাঠাইয়া দিত। এইরূপে পরীক্ষার সব প্রশ্নপত্রগুলিরই উত্তর লিখিয়া দেয়, কিন্তু পরীক্ষার শেষদিন তাহার এই কৌশল ধরা পড়িয়া যায়। তাহার প্রতি ৫৲ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

শেষ দিন ধরা পড়ায় না হয় পাঁচ টাকা জরিমানা দিল, কিন্তু operation successful হয়েছে বলতেই হবে। পাঁচ টাকা মাষ্টার মশাইরা জরিমানা করুন; কিন্তু ছাত্রটিকে বিশেষ বৃত্তি দিয়ে যে উচ্চ ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়া আসিবার জন্য ইউরোপে প্রেরণ করা উচিৎ, এতে সন্দেহ নেই। পুস্তক পাঠে সময় নষ্ট না করে—ইনঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা অনুশীলনে ছেলের যে উৎসাহ ও অধ্যবসায়, তাতে ভবিষ্যতে সে সুযোগ পেলে ভাল ইঞ্জিনিয়ার হবে।

সোনার বাংলা

বৃক্ষহীন দেশকে সবুজ বনে রূপান্তরিত করা হইবে

কাবুল হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আফগানিস্থানের কৃষি বিভাগ হইতে জনসাধারণের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান আফগান গবর্ণমেণ্ট বৃক্ষহীন দেশ সমূহকে সবুজ বনে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কারণ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তের সুলেমান পর্ব্বতশ্রেণী ভিন্ন কাফিরিস্তান (নুরীস্থান) এবং হিন্দুকুসের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ সম্পুর্ণ বৃক্ষহীন এবং উপত্যকা সমূহের যেখানে বন জঙ্গল ছিল সেখানে ফলের গাছ রহিয়াছে। গত ৫০ বৎসর যাবত আফগানীস্থানের বিভিন্ন অংশে এইরূপ বৃক্ষাদি রোপণ কার্য্য চলিতেছে।

কলিকাতার হাসপাতাল

অর্থের সুপারিশের জোর না থাকিলে কলিকাতার হাসপাতাল সমূহে—বিশেষ করিয়া—কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোন রোগীর পক্ষে ভর্ত্তি হওয়া সম্ভব নয়, ইহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। একদল অর্দ্ধমৃত রোগী সর্ব্বদা হাসপাতালের চারিদিকে পড়িয়া থাকিয়া ইহার প্রমাণ উপস্থিত করিয়া থাকে। দরিদ্র রোগীদিগের এই অসহায়তার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চিকিৎসা-বিভাগের ব্যয় বরাদ্দে মওলবী তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেব এক ছাটাই প্রস্তাব উপস্থিত করেন! গভীর পরিতাপের বিষয়, এরূপ একটী প্রস্তাবও ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যের ভোটে পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে।

মোহাম্মদী

বিহার হইতে বাঙালী বিতাড়ন

বিহার ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণমেণ্ট বিহার বাসীদের আশ্বস্ত করিয়া জানাইয়াছেন যে, সরকারী কাজে বিহারে আর কোন বাঙালীকে কণ্ট্রাক্টরের কাজ করিতে দেওয়া হইবে না, এবং কেরাণীর কাজেও তাহাদিগকে নিয়োগ করা হইবে না। অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙালী বিতাড়নের যে বিরাট ও ব্যাপক অভিযান চলিয়াছে ইহা তাহারই অংশ বিশেষ। একদিন যাহারা সকলকে আশ্রয় দিয়াছিল, সকলের জন্য বাংলার কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের বিতাড়নের আয়োজন না করিলে আর বিহারী ভেইয়াদের আক্রোশ মিটিতেছেনা। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সর্ব্বনাশা ভেদনীতির বিরুদ্ধে কাউন্সিল অথবা এসম্বলির সদস্যগণও কোন কথা বলিতেছেন না। বাঙালীকে কোণঠাসা করিয়া রাখিবার আয়োজন কিছুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এখন তাহা চরমে পৌঁছিয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশে বিহারী কুলী, মজুর, ব্যবসায়ী, হকার, চাকুরিয়া, কনেষ্টবল, গাড়োয়ান, চোর, বাটপাড়ে, ভরিয়া গিয়াছে, আর সেই বিহারবাসীই বিহার হইতে বাঙালী বিতাড়নে ব্যাকুল। বাংলার কংগ্রেস্ কি সরকারের এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য গ্রহণ করিতে পারেন না? নেতৃস্থানীয় বাঙালীগণ কি এই অবিচারের প্রতিকারকল্পে কোন সঙ্ঘ গঠন করিতে পারেন না! বাঙালী একদিন যাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে তাহারাই এখন তাহার বক্ষে কুঠার হানিতে অগ্রসর। আমাদের মনে হয় ইহার প্রতিকার কল্পে বাংলা ও বাংলার বাহিরের বাঙালীদের লইয়া অবিলম্বে সঙ্ঘ গঠিত করা প্রয়োজন! নবশক্তি

সাংবাদিকের আদর্শ

গত শনিবার ১৬ই মার্চ্চ কলিকাতা আলবার্ট হলে প্রবাসী ও Modern Review সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'সাংবাদিকের বৃত্তি' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ ও সুচিন্তিত বক্তৃতা দান করেন। শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ বাবু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে সংবাদপত্রের প্রভাব সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ বক্তা মহাশয় বলেন যে ইহা যে কোন দেশের ধর্ম্মোপদেশক ও ব্যবস্থাপকগণের ন্যায় সমান আদর্শ ও প্রেরণাদ্বারা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে। উপসংহারে তিনি যে কয়েকটী মূল্যবান কথা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকেরই উপযুক্ত হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

'নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া সংবাদপত্রে লেখা ভাল। সংবাদিক্‌কে সর্ব্বপ্রকার নেশা বর্জ্জন করিতে হইবে। সংবাদপত্রের ক্ষমতা, তেজস্বিতা ও দায়িত্ব— এই তিনটী বিষয় স্মরণ রাখিয়া সংবাদপত্র চালাইতে হইবে।' ভারত

পঞ্চাশমুখী চীনানারী

এক চীনানারী মুহূর্ত্তে মুখের চেহারা পঞ্চাশ রকম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। এই অদ্ভুত রমণীর পরিচয় সম্প্রতি নানা কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং আজ তাঁহার সহিত আপনাদের একটু পরিচয় করাইয়া দিতেছি। এক নিমেষের মধ্যেই তিনি সুগোল গণ্ডকে হাড় উঁচু গালে এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিকে তির্য্যক্ দৃষ্টিতে পরিণত করিতে পারেন।

কিছুক্ষণ পরেই হয় ত দেখিবেন, তাঁহার সে মুখাবয়ব পরিবর্ত্তিত হইয়া আফ্রিকার আদিম অধিবাসী বা অন্য কোন বহুদিন লুপ্ত জাতির মুখাবয়বের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

তার পরক্ষণেই চাহিয়া দেখুন, দেখিবেন, যে মুখ ছিল অক্ষত, নিখুঁত, তাহা ক্ষত চিহ্নে ভরপুর ও বিকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার চোখ পাল্টাইতে না পাল্টাইতে দেখিতে পাইবেন, অতি বৃদ্ধাসুলভ বদন, তরুণীর অনিন্দ্যসুন্দর প্রস্ফুটিত কমলাননে পরিণত হইয়াছে।

ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক কিম্বা ইন্দ্রজালিকগণ আজ পর্য্যন্ত তাঁহার এই অমানুষিক ও অস্বাভাবিক শক্তির কোন তথ্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

এই বহুরূপধারিণী রমণীর নাম মিসেস ই-এফ বুল্ক লেভেসালমের মোসলে রোডে তাঁহার বাস, শীঘ্রই তাঁহার দৈহিক গঠন প্রণালীর পরীক্ষা করা হইবে। সোনার বাংলা

বুলগেরিয়ায় ১৬২ জন শতবর্ষজীবী

বুলগেরিয়ার ৬০০০,০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে ১৬২ জন শতায়ু ব্যক্তির বিবরণ সরকারী ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জনসংখ্যার অনুপাতে পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা এই সংখ্যা উচ্চতর।

বুলগেরিয়ার শতবর্ষজীবিগণ সকলেই কৃষক। তাহাদের মধ্যে একজনও সহরবাসী নাই এবং তাহাদের অধিকাংশই পার্ব্বত্য অঞ্চলের মেষপালক। তাহারা প্রায় সকলেই অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিল এবং সকলেরই বহু সন্তান সন্ততি আছে। তাহাদের মধ্যে দশজন ছাড়া সকলেই নিরামিষাহারী বা খুব সামান্য মাংস আহার করে এবং প্রায় সকলেই মদ্য পান করে। কিন্তু তাহাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাত্র ধূমপান করে।

উপরিউক্ত ১৬২ জন শতায়ু ব্যক্তির মধ্যে ৮৫ জন স্ত্রীলোক, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি পুরুষ। সে একজন মেষপালক। তাহার নাম কোষ্টা ডিমিট্রিক এবং তাহার বয়স ১২১ বৎসর।

বাঙ্গালায় শিক্ষিত ভদ্র যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা কিরূপ নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর একটা প্রমাণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কতকগুলি চাকুরীর জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে পাওয়া গেল। ১০ জন হইতে ১৫ জন সুপারভাইজার এবং ৫০ জন হইতে ৮০ জন সহকারীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। চাকুরীগুলি মাত্র দুই মাসের জন্য, তাহাও আবার বিনা নোটীশে যে কোন মুহূর্ত্তে কাজ যাইতে পারে। উচ্চতর পদগুলির বেতন দৈনিক দশ টাকা এবং নিম্নতর পদগুলির বেতন দৈনিক দুই টাকা করিয়া। প্রকাশ, উচ্চতর ১০।১৫টী পদের জন্য প্রায় দশ হাজার আবেদন পাওয়া যায়। নিম্নতর পদের জন্য ৭নং হেয়ার ষ্ট্রীটে প্রার্থীদিগকে হাজির হইতে বলা হয়। এসে সকাল হইতে কাতারে কাতারে ঐ স্থানে লোক যাইতে থাকে। একটু বেলা হইলে স্থানটী লোকে লোকারণ্য হয় এবং ক্রমে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়, যানবাহন অচল হইয়া পড়ে। অবশেষে পুলিশ ডাকিয়া ভিড় সরাইতে হয়। প্রকাশ, এই ৫০।৬০।৮০ জন সহকারীর কাজের জন্যও দশ হাজারের উপর লোক জমিয়াছিল—ব্যাপারটী সত্যই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী; বাঙ্গালার ভদ্রযুবকেরা দুর্দ্দশার কত গভীরস্তরে গিয়া নামিয়াছে, তাহা ভাবিয়া মন নিরাশ হইয়া উঠে। প্রকাশ, প্রার্থীদের শতকরা ৯০ জনই ছিল হিন্দু। বিশেষ করিয়া হিন্দুযুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যার তীব্রতা ইহা হইতে উপলব্ধি করা যায়।

ভারতে মুক্তি ফৌজের প্রধান নায়িকার আগমন

মুক্তি-ফৌজের (Salvation Army) সর্ব্ব প্রধান নায়িকা জেনারল এভেঞ্জেলাইন বুথ অষ্ট্রীয়া ভ্রমণ পথে ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাইতে অভ্যর্থনার উত্তরে গভর্ণারকে বলেন যে স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম্ম ও দর্শন সাধনায় ভারত জগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে সেই জ্ঞানের জন্য তিনি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক জড় সভ্যতার মোহে ভগবৎ বিশ্বাস ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। শত শত শতাব্দী ব্যাপিয়া, ভারতের ধর্ম্মসাধনার শক্তি ভগবৎ বিশ্বাসে প্রগাঢ় অনুরাগে অদ্যাপি প্রবল আছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও মোহিত হইয়াছেন। ভারতে থাকিয়া

নানামুখী ধর্ম্ম, শাস্ত্র, ও দর্শন আলোচনা করিতে পাইলে সুখী ও কৃতার্থ হইবেন, এরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবানের প্রতি আপ্রাণ ভক্তি ও বিশ্বাস রাখাই সকল মানবের কর্ত্তব্য বলিয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।

এ প্রকার মহিলার ভারতে শুভাগমনে ভারতবাসীরা আনন্দিত।

বঙ্গলক্ষ্মী

বোম্বাইতে নারীশিক্ষার বিস্তার

বোম্বাইতে নারীজাতি শিক্ষায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মোট ৫৮৬টি ছাত্রী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল; ১৯৩৪ সালে সেই স্থলে ১৩০৬টি ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সংখ্যা এই:—১৯৩০—৫৮৭ জন, ১৯৩১—৮৯৬, ১৯৩২—৯৩৩, ১৯৩৩—১০৯৬ এবং ১৯৩৪—১৩০৬। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। গত পাঁচ বৎসরে যথাক্রমে ২০৭, ৪৮৭, ৩৯৬, ৪৮৬ এবং ৬২৫টি ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, চিকিৎসা বিদ্যার দিকেও মেয়েদের খুব ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসর ৪১টি ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে দুইটি মহিলা এম-ডি এবং একটি এম এস-সি হইয়াছেন। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরে কোনও ছাত্রীই ইঞ্জিনিয়ারিং ও কমার্স পরীক্ষা দেন নাই।

নয়াবাংলা

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ১৯৩৪ সালের যে হিসাব নিকাশ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে ব্যবসার দিক দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ ও পরিচালকবর্গ সকলেই ভারতবাসী। সুতরাং এই ব্যাঙ্কের সফলতা ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কারবারের পক্ষে গৌরব ও আনন্দ সূচনা করে। ইহার মূলধন প্রায় এক কোটি সত্তর লাখ টাকা, এবং আলোচ্য বৎসরের শেষ ছয় মাসের জন্য অংশীদারগণকে বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা হিসাবে মুনফা দেওয়া হইয়াছে। মোট কথা, এদেশে ব্যাঙ্কিং কারবার যে ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার এই হিসাব হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতীয় পরিচিত ব্যাঙ্কের বিল উত্থাপিত হইবে।

শ্রীহট্ট ছাত্রীর সংখ্যা ও নারী কলেজ

দশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগ আসামের নারীদের জন্য একটি কলেজ খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এক্ষণে শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজে ৩০ জন ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই কয়েক জন লইয়াই একটি কলেজ স্থাপন করা সম্ভব।

সঞ্জিবনী

চীনাদের বাসস্থান

চীনেরা কোথায় বাস করছে জানেন কি? দক্ষিণ এসিয়ার পঞ্চাশ লক্ষ—সাইবেরিয়া এবং সোভিয়েট রুশিয়ার আড়াই লক্ষ মাকাওতে এক লক্ষ উনিশ হাজার ন'শো। ফ্রান্সে সতেরো হাজার—হল্যাণ্ডে আট হাজার আমেরিকা যুক্তরাজ্যে পঁচাত্তর হাজার এবং বৃটেনে আট হাজার।

দীপালী

সংবাদের সুয়োরাণী

সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মারফতে ভারতসরকার যে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার সব টাকাই এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ পাইয়া থাকে। বিদেশী সংবাদ সরবরাহের জন্য সব টাকা পায় রয়টার। অথচ এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মালিক অভিন্ন এবং উহারা একই পরিচালক দ্বারা পরিচালিত। সে দিন ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ পালের প্রশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব সার হেন্‌রি ক্রেক বলিয়াছেন যে রয়টার এবং এসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া হইয়াছে ১২ হাজার ৫৩০ টাকা। ইহাদের মালিক ভারতীয় নহে। অল্পদিনের মধ্যে ইউনাইটেড্ প্রেস সমগ্রভারতের সংবাদসরবরাহে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াও সরকারী সুনজর পাইতেছে না। দেশীয় প্রতিষ্ঠান এবং দেশবাসীর প্রতিষ্ঠান বলিলে ইউনাইটেড্ প্রেসকেই বুঝায়। জনপ্রিয়তাই তাদের অপরাধ কিনা জানি না, কিন্তু দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে একেবারে বঞ্চিত করিয়া অপেক্ষাকৃত অর্থশালী প্রতিষ্ঠানকেই পুষ্ট করার নীতি বড়ই বিসদৃশ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইউনাইটেড্ প্রেস সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যাপারে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসী গৌরবান্বিত। সংবাদ সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষকে অর্থব্যয় করিতে হইলে ইউনাইটেড প্রেসের দাবীও উপেক্ষনীয় নহে। কিন্তু এই সাধারণ ব্যাপারেও 'সুয়োদুয়ো' নীতি অশোভন ও অপ্রীতিকর। নবশক্তি

বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও আনন্দবিধা'নের জন্য বিজ্ঞানের নব অবদান—কথা কওয়া অর্থাৎ সবাক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ তৈয়ার করিয়াছেন। ওয়েষ্টিংহি হাউস ল্যাম্প কোম্পানীর অধ্যক্ষ সামুয়েল সি, হিবেন। সবাক চিত্রের আদর্শে এ গ্রন্থ রচিত। ফনোগ্রাফের রেকর্ডের মত এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা তৈয়ারী—রেকর্ডগুলি পাতলা পাতের মত। হিবেন বলিতেছেন, অচিরে সাধারণ পুস্তকালয়ে এ গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থের মতই বিক্রয় হইবে। স্বায়ত্ত-শাসন

বাংলা কি সকলের জন্য ?

আসাম আসামীবাসীদের জন্য, বিহার বিহারবাসীদের জন্য—তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় পর্য্যন্ত এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় যদি কেহ সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলে—যে বাংলা বাঙ্গালীর জন্য, অমনি চারিদিক হইতে ছিঃ ছিঃ রব উঠে—জাতীয়তা গেল রসাতলে। আবার বলা হয় বিদেশে যে সকল বাঙ্গালী আছে, তাহাদের উপর তথাকার লোকেরা প্রতিশোধ লইবে। তবে বাংলা কি কাবুলী হইতে সুরু করিয়া কামস্কাটকার লোক সকলেরই শীকারের ক্ষেত্র হইয়াই চিরদিন থাকিবে? দেশের লোক না খাইয়া মরিবে, আর অন্য প্রদেশের লোক বোঁচকা বাঁধিয়া লইয়া যাইবে? এই কথা তুলিলেই অনেক বিশ্বপ্রেমিক বলিবেন—বাঙ্গালী অকর্ম্মণ্য; প্রতিযোগিতায় অন্য প্রদেশবাসীর সহিত পারে নাই বলিয়া মরে। কিন্তু এই কথা ত অন্য প্রদেশ সম্বন্ধেও খাটে—তবে সেখানে বিহারী-বাঙ্গালী, আসামী বাঙ্গালী এই প্রশ্ন উঠে কেন? মালসীগণ মালসা ভোগে ব্যস্ত, কর্পোরেশন বিশ্বপ্রেমিকদের স্থান—এই সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহাদের দৃষ্টি দিবার সময় নাই। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীতে স্থির হইয়াছিল কণ্ট্রাক্ট বাঙ্গালীকে দেওয়া হইবে, বাঙ্গালীর নিকট হইতে বাংলার জিনিষ ক্রয় করা হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানেও বিশ্বপ্রেমিকের উদয় হইয়াছে—তাঁহারা উক্ত প্রস্তাব নাকচ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশা করি, কমিশনারগণ তাঁহাদের কথায় ভুলিবেন না। আজকাল

নববর্ষের অভিনন্দন

জয়শ্রী বৈশাখে পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিল, আমরা সকলের নিকট তাহাদের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নববর্ষে তাহাদের সহানুভূতি আমরা বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করি।

জাতীয় সপ্তাহ

১৯২০ সালের জালিয়ান বাগ ঘটনা হইতে ভারতের রাজ-নৈতিক চেতনা অকস্মাৎ উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে। এর পরে স্বাধীনতা প্রয়াসীদের কার্য্য চলিয়াছে নানা পথে। পনের বৎসর ধরিয়া ৬ই এপ্রেল হইতে জাতীয় সপ্তাহ পালিত হইতেছে। দেশের অন্তরাত্মা এই সপ্তাহে সমস্ত আবিলতা হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে সত্যনির্দ্দেশ পায়, সেজন্যই প্রতিবৎসর এই ব্রত পালিত হইতেছে। পথে পথে কত বাঁক, কত বাধা, আন্দোলনের গতি কখনও ধীরে, কখনও দ্রুত চলিতেছে। লাভ ক্ষতি হিসাবের সময় আজ ও আসেনি কিন্তু এই পুণ্যসপ্তাহে সমস্ত দেশ একমনা হইয়া দেশমাতার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করুক, দেশ ভক্তের এই একমাত্র বাসনা।

স্ত্রী ভারস্বরূপ কিনা

এতদিন পথে প্রবাসে নারী ছিলেন ভার, তাই 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' ছিল। এই ছিল সাধারণ নীতি, সাধারণ নারীজাতির প্রতি। রাস্তায় চলিতে অনভ্যস্তা নারীকে সঙ্গে লইয়া নানা উপদ্রব সহ্য করিতে অনেকেই নারাজ ছিলেন। আজ কিন্তু 'সংসার পথে নারীকে বিবর্জ্জিতা' করিলে কতদূর সুবিধা অসুবিধা হয় তার হিসাব চলিতেছে, অমৃতবাজার পত্রিকায় অনেক পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে। "স্ত্রী কি স্বামীর ভার"? এই সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকাদিতে আলোচনা ও চলিতেছে। সকলেই এ তর্কে আনন্দ অনুভব করিতেছেন, সাগ্রহে যোগও দিতেছেন, কিন্তু সমস্তের অন্তরালে যে করুণ সুরটী ধ্বনিত হইতেছে, তাহার প্রতি কয়জনের দৃষ্টি পড়িয়াছে জানিনা।

কতখানি দুরবস্থা হইলে স্ত্রীপুত্রসংসারের ভারে গৃহস্বামী বিব্রত হইয়া পড়েন, তাহা দরিদ্র গৃহস্থ মাত্র জানেন, আজ সমগ্র দেশের সেই দুর্দ্দশা; শুধু ব্যক্তিগত নয়—জাতিহিসাবে দেশ এত নির্ধন, কর্ম্মহীন

হইয়া পড়িয়াছে যে নিজেকেই তাহার ভারস্বরূপ মনে হইতেছে। আমরা চরম দুঃখে পতিত যুবকের আত্ম-হত্যার কথাও শুনিতেছি, এক্ষেত্রেও যে স্ত্রী ভার-স্বরূপ বিবেচিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় কি?

শিশুদের উপযোগী সিনেমা চিত্র

শিশুপাঠ্য বইএর মত শিশুদের দেখার উপযোগী সিনেমার ছবি তুলিলে একটা সমস্যার মীমাংসা হয়। শিশুরাও নির্দ্দোষ চিত্র দেখিতে পায়। এ প্রস্তাবটী যদিও উপেক্ষনীয় নহে, তবে কার্য্যে পরিণত হইলে ব্যবসার লাভ হইবে কিনা তাহাই বিবেচ্য। দর্শকের পক্ষেও অসুবিধা হইতে পারে কারণ তখন ভাগাভাগি করিয়া আসিতে যাইতে দ্বিগুণ ব্যয় গিয়া না পড়ে।

শুশ্রূষাকারিণীর শিক্ষা

কলিকাতায় হাস্‌পাতালে নার্সদের শিক্ষার জন্য একটী প্রতিষ্ঠান আছে। উহা বর্ত্তমান বৎসরের ২৪০০০৲ সরকারী সাহায্য পাইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থিনীগণ অধিকাংশই ইয়োরোপীয়ান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। ভারতীয়া শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা অতি নগণ্য, ইহার কারণ এই যে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া থাকে, এবিষয়ে সম্যক বুৎপত্তিলাভ সাধারণ শিক্ষার্থিনীদের পক্ষে সহজ নহে। ভারতীয়া নারী যাহাতে বহুসংখ্যায় এই কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারে, সেজন্য শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন, এবং ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ভারতীয় নারীর অনুকূল হওয়া উচিত।

রজত জুবিলী উপলক্ষে সম্রাটের ইচ্ছা

ভারতসরকার সম্রাটের ইচ্ছানুসারে ঘোষণা করিয়াছেন যে সম্রাট এই উপলক্ষে কোন উপহার বা অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন না।

এই সম্পর্কে যে টাকা সংগৃহীত হইবে, উহা বৃথা আড়ম্বরে ব্যয়িত না হইয়া সদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে। একথা আনন্দের বটে।

ঢাকা জেলে অনশন

ঢাকার কতিপয় রাজবন্দী তাহাদের চাহিদা জেলের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হইতে দাবী করিয়া অনশন করিয়াছে। তাহাদের অভিযোগ এই যে তাহাদের রীতিমত ভাল খাওয়া, লিখিবার ও পড়িবার খাতা ও বই সরাবরাহ করা হয় না ও এমন কি লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত নাকি যথেষ্ট বস্ত্র ও পরিধানের দেওয়া হয় না।

তাহাদের এই অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে হোম মেম্বর মিঃ আর, এন্, রীড যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা একটু ভাবিয়া দেখিবারই বিষয় বটে। তিনি বলিয়াছিলেন যে মানুষ যেরূপ আনন্দ লাভের নিমিত্ত সখ করিয়া সুরা প্রভৃতি নেশার বশবর্ত্তী হয় সেইরূপ অনশন ব্রত ও একটা মানসিক আনন্দ প্রাপ্তির পন্থা বিশেষ। শুধু তাই নয় তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে তাহাদের চাহিদা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত এবং যতদিন পর্য্যন্ত না তাহারা তাহাদের অনশন ব্রত ত্যাগ করে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের অভিযোগের কোন তত্ত্বাবধান করা হইবে না একথাও জানাইতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সখ করিয়া এই বাস্তবজগতে একাদিক্রমে বহুদিন অনশন ব্রত পালন করিতে কখনও শুনা যায় নাই। সম্প্রতি ঢাকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের মধ্যস্থতায় তাহারা অনশন ভঙ্গ করিয়াছে, এখন এই বন্দীদের অভিযোগের যথাযথ তত্ত্বাবধান অবিলম্বে হওয়া দরকার।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া ডাঃ এ, সি, সেন, এল্-এম-এস্ দিল্লী "বাটোয়ারা বিরোধী" সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারাংশ পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ডাঃ এ, সি, সেন

দেশের কল্যাণ কামনার সময় সাম্প্রদায়িক দলাদলি জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক। ভারতবর্ষের ৩৩ কোটী লোকের ভিতর শুধু ভাষা ও ভাবেরই তারতম্য দৃষ্ট হয় না। ইহার জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বৈষম্য বিশেষ করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার বিষময় ফলের কথা কি কেহ ভাবিয়াও দেখিবে না। অধুনাতন শাসন যন্ত্রের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার সম্পর্কে এই দলগত ভাবের উন্মেষ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। ১৯০৬ সালে মহামান্য আগা খাঁ ও ১৯০৭ সালে আমীর আলির অধ্যবসায়ের ফলে মুসলমানদের ভোট প্রদানের বিভিন্ন দাবীকে স্বীকার করিয়াই সরলে স্কীমের খসরা প্রস্তুত করা হয়। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ পেক্ট ইহাকেই সমর্থন করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান সভ্য সংখ্যার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তারপর ১৯৩০ সালের সাইমন কমিশন এই সম্পর্কে নূতন কিছুর প্রস্তাব করে নাই। পরিশেষে দুই গোল টেবিল বৈঠকেই বাটোয়ারা নিষ্পত্তির পথ ধরিয়াই হঠাৎ যবনিকা পড়িয়াছিল। ১৯৩২ সালে মহাত্মাজীর অনশন ব্রত পালনের ফলে অবনত সম্প্রদায়কে উক্ত অধিকার দেওয়ার সর্ত্ত করিয়া পুণা পেক্ট এর সূচনা হয়। মানুষের চাওয়ার কোন সীমা নাই। তাই পাঞ্জাবের শিখ চায় শতকরা ৫০ ভাগ, বাংলার মুসলমান ৫৪ ভাগ ও হিন্দু ৫০ ভাগ ইত্যাদি। পরিণামে শতকরা ১০০এর কোঠাও ছাড়াইয়া যায়। যদিও মুসলমান ও অমুসলমান প্রতিনিধি নিজেদের দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্ব্বাচিত হয়। এইভাবে নিজেদের ক্ষুদ্রতম চাওয়া'কে বড় করিয়া দেখিলে জাতির চরম চাহিদা ভগবানও মিটাইতে পারিবেন না। ক্ষণকালের নিমিত্ত এই ক্ষুদ্রতম লোভকে সংবরণ করিয়া জাতির কল্যাণের নিমিত্ত মানুষ ছুটিয়া চলিবে কবে? নিজেদের ভিতর এইরূপ দলাদলি ভাবে অনুপ্রেরিত হইয়া নিজেদেরই শত্রু ভাবিলে দেশের বা দশের দাবী আদর্শ বলিয়াই পরিগণিত হইবে দেশবাসী সে দাবী পূরণ করিতে কখনও পারিবে না।

করাচী হত্যাকাণ্ড

পাঠকবর্গের হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে ইস্‌লামের অবমাননা করার নিমিত্ত আব্দুল খোরাম নামক এক মুসলমান যুবক নাথুরাম নামে জনৈক হিন্দু লেখককে প্রকাশ্য আদালতে হত্যা করে। ইহারই ফলে আজ কিছুদিন হইল তাঁহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ফাঁসীর পর তাহার মৃতদেহ সংকারের নিমিত্ত আত্মীয় স্বজনদের

নিকট জেল কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যর্পণ করেন এই সর্ত্তে যে কোনরূপ শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। নির্ব্বিঘ্নে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইল সত্য কিন্তু কিছুক্ষণ পর বহু সংখ্যক ধর্ম্মান্ধ অধিবাসী তাহার মৃতদেহ কবর হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিল ও বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সহরের ভিতর বাহির করিয়া আনিল। ইহাতে তাহাদের স্বজাতি বাৎসল্য কতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে বলিতে পারি না কিন্তু এই ধর্ম্মান্ধতার মূল্য দেশবাসীকে বহন করিতে হইল। উদ্ধত জনতার উপর শেষে গুলি চলিয়াছিল।

নিজেদের ধর্ম্মান্ধতা জাতির অনুভূতিকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। জনতার মূর্খতায় আজ যাহারা প্রাণ হারাইয়াছে তাহাদের নিমিত্ত দুঃখ করা বৃথা। কিন্তু এই ভয়বাহ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত দোষ দেওয়া যায় কাহাকে? প্রকাশ যে আবহাওয়ার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ গুলি চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করা সম্পর্কে দিল্লীতে ইহারই অনুরূপ দৃষ্টান্ত ও ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আত্মীয় স্বজনদের নিকট মৃতদেহ প্রদান না করিলে হয় তো এই শোচনীয় ব্যাপার ঘটিতে পারিত না।

এই ঘটনাকে অনুসরণ করিয়া এসেম্বলীতে তুমুল তর্ক চলিতেছে। মহম্মদ জিন্না প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ গরম গরম বাক্য ছাড়িতেছেন। কিন্তু সেগুলি ভাবিয়া দেখিবার কি দরকার, যাহারা প্রাণ হারাইয়াছে তাহারা আর দেশের আলো দেখিবার অবকাশ পাইবে না সত্য।

আহত ব্যথাতুর ও দুঃস্থ করাচীবাসীর কথা চিন্তা করিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাইতে শ্রীমতী অমৃত কাউর প্রভৃতি মহিলা মিলিত হইয়া 'করাচি হিতকারিণী' সমিতির নারীবিভাগের উদ্বোধন করিয়াছেন। তাহারা দেশবাসীর নিকট সাহায্যপ্রার্থিনী।

আমরা ইহার আরদ্ধ কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া দেশবাসীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিতে চাই।

রজত জুবিলীতে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে না

ভারতবাসীর আন্তরিকতার মূল্য যথেষ্ট। তাহাদের রাজার রাজ্যকাল দীর্ঘ হউক:—তাহার এই চাওয়ায় ঐকান্তিকতা আছে বলিয়াই দীর্ঘ যাত্রাপথে ইহা আসিয়া পঁচিশের কোঠায় ঠেকিল। দেশ ব্যাপিয়া রজত জুবিলীর অনুষ্ঠানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সম্রাটের সিংহাসনারোহণের সময় ভারতের ভাগ্যাকাশে অযাচিত আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। সবাই মিলিয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়াছিল। রজত জুবিলী উপলক্ষ্যে উহার অনুরূপ আশীর্ব্বাদ ভারতের ভাগ্যে জুটিবে বলিয়া সকলেই আশা করে। আন্যান্য ক্ষেত্রের কথা না ভাবিয়া তাহারা চায় যে অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত অবরুদ্ধ বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক যেরূপ রাজ্যাভিষেকের সময় দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শুধু প্রভেদ যে রাজবন্দীর অধিকাংশে জানে না তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কোথায়। তাই এই শুভ মুহূর্ত্তে তাহার এই চাওয়া বা দাবীর ভিতর অযৌক্তিকতা কিছুই নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে কর্ত্তৃপক্ষ একপ্রকার জানাইয়াই দিয়াছেন যে এইবার রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে না।

কিন্তু কেন?

এই বিপুল আনন্দোৎসবের দিনে রাজার করুণা লাভে কৃতার্থ হইয়া হয়ত বন্দীব্যক্তি চিরং রাজভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে পারে।

দার্জ্জিলিং প্রবেশে কড়াকড়ি

দার্জ্জিলিং এর ডেপুটী কমিশনার ১৯৩২ সালের বিপ্লবদমন আইন ও ১৯৩৪ সালের বিপ্লব দমন বিধানুযায়ী অনেক অনেকগুলি আদেশ জারী করিয়াছে। সে সর্ত্তগুলি পালন না করিয়া ১৪ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্ক কোন হিন্দু স্ত্রী অথবা পুরুষ দার্জ্জিলিং প্রবেশ করিতে বা অবস্থান করিতে পারিবে না বাঙ্গালীর ঘরের কাছে দার্জ্জিলিংই একমাত্র স্বাস্থ্য নিবাস। যাঁহারা সৌন্দর্য্য পিপাসু তাঁহারা ও অল্প খরচে হিমালয়ের চিরতুষারমণ্ডিত অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারেন, কিন্তু দফায় দফায় এত বিধি নিষেধ মানিয়া এবং সর্ব্বদা পুলিশের খরদৃষ্টি ও সন্দেহের পাত্ররূপে বিচরণ করার অস্বাচ্ছন্দ্য কেহ ইচ্ছা করিয়া নিশ্চয়ই বরণ করিবে না। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন যে ঐ নিয়ম কানুনগুলি দার্জ্জিলিং যাত্রী হিন্দু জনসাধারণের জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছে। তাহাদের তল্লাসী করিবার উপায় নাকি অপমানজনক এবং কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর কনেষ্টবল এই ব্যাপারে কর্ত্তা। শ্রীযুক্ত বসুর সমালোচনায় কর্ত্তৃপক্ষ কান দেন নাই। দার্জ্জিলিং এর ব্যবসায়ীদের ও অনেক ক্ষতি হইতেছে। দুই চারজনের অপরাধে দেশবাসী কঠোর লাঞ্ছনা কি কোনদিনই ঘুচিবে না? আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং অতি সত্বর এই বিধি নিষেধের ও ছাড়পত্রের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

Printed & Published by Bibhabati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

ব্যাধ

শ্রীইন্দুসুধা ঘোষ

পঞ্চম বর্ষ	আষাঢ়, ১৩৪২	তৃতীয় সংখ্যা

গান

শ্রীনলিনী শেঠ

ও মোর অচিন বঁধুরে—
আমি তোমার লাগি হলাম উদাসী
কোন্ নাম-না-জানা দেশে তুমি
বাজাও রে বাঁশী। (শুনে হলাম উদাসী)
আমার বুকের কোন্ গহনে বাঁধিলে বাসা
কানে কানে কী কথা কও বুঝিনে ভাষা। (বঁধু)
ওরে স্বপন হয়ে গভীর রাতে প্রাণ কাড় আসি—
আমার দুখে কাঁদো তুমি আমার সুখে হাসো
দরদী বঁধুরে আমার কতই ভালবাস, (বঁধু)
ওরে সেই সোহাগে বেদন ভুলি আনন্দে ভাসি—
সুখে হলাম উদাসী।

"ছোটগল্প"

(প্রবন্ধ)

শ্রীআশালতা সিংহ

সেদিন কোন একটা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আলস্যের উপর একটা হিন্দি কবিতা চোখে পড়িয়া গেল, তাহার প্রথম চরণটা,

আল্সী হুঁ ময় সদা হি
জৈস গগন-তীরে
নব্‌ল ধব্‌ল ধীম মেঘ
চলত ধীরে ধীরে।'

কবিতার ভাবটা নূতন লাগিল। আকাশের কিনারায় নূতন শুভ্রলঘুমেঘ যেমন ধীরমন্দ গতিতে যদৃচ্ছা ভাসিয়া বেড়ায় তেমনতরো মধুর আলস্য লইয়া কবিতা লেখা হয় সেকথাটা যেন এযুগে ভুলিতেই বসিয়াছিলাম এযুগে যে আলস্য লইয়া কবিত্ব করা অচল সেকথাটা আরো বেশি করিয়া মনে পড়িল ছোটগল্পের সম্পর্কে। সকলেই জানেন, ছোটগল্প আমাদের দেশে অনাদৃত। ছোটগল্পের পাঠক নাই, সমাদর নাই। ছোটগল্পের বই প্রকাশ করিতে প্রকাশকেরা নারাজ। তাহার কারণ কি ? ছোট গল্প লেখা অত্যন্ত দুরূহ। কোন জিনিষের বস্তু অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রাণের হিল্লোলটুকু সঞ্চারিত করিয়া দিতে একমাত্র ছোট গল্পই পারে। সকল প্রকার উদ্দেশ্য, সমস্যা সমাধান এ সব বাদে বাক্যের মজ্জায় মজ্জায় যে অহৈতুক প্রাণ লীলা যে অনন্ত ইঙ্গিতের সম্ভাবনা ; সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় আলস্যানন্দের যে মাদকতা আছে গীতি কবিতা এবং ছোটগল্পে তাহার পূর্ণ প্রকাশ। গীতি কবিতা যেমন নদী জলের উর্ম্মিমালার মত ক্ষণস্থায়ী ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য্যের প্রতীক অথচ সেইটুকুর মধ্যেই বিশ্বের প্রতিবিম্ব রাখিয়া যায়, ছোটগল্পের প্রাণ বস্তুও তাই। সকাল বেলায় শিউলি ফুলের বোঁটায় যে শিশির বিন্দুটুকু জ্বলে, বেলা হইলে রোদ উঠিলে শুকাইয়া যায় : ছোটগল্পের চিরন্তন ঐশ্বর্য্যও তাহাই। ভঙ্গুর এবং স্বল্প-আয়তনের মধ্যেই অসীমকে প্রত্যক্ষ করানো বড় বড় ধুরন্ধর সমালোচকের অতি বিশ্লেষণশীল সমালোচনার আঘাতে ঐ প্রভাতবেলার শিশির-বিন্দুর মতই ছোটগল্পের লাবণ্যটুকু শুকাইয়া উঠে নিমিষে ; অথচ ছোটগল্প হইতেছে আর্টের চরমোৎকর্ষ। ভালো উপন্যাস কিংবা ভালো নাটক লেখা যথেষ্ট শক্ত মানি। কিন্তু তাদের হাতে সময় আছে অনেক তাহাদের আছে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক কতো ধরণের সমস্যা এবং সংঘাত লইয়া নাড়াচাড়া করিবার অবকাশ। ছোটগল্পের আয়তন ছোট, তাহার পক্ষে বেশি স্থান জুড়িয়া থাকিলে চলিবেনা। কিন্তু যাহা যথার্থই ছোটগল্প তাহা ঐ একান্ত স্বল্পায়তনের মধ্যেই মনের মাঝে একটা আবেগ তুলিয়া দেয়, যে আবেগের দোলায় মানুষের মনকে

বিশ্বাভিমুখী করিয়া তোলে। গীতি কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের সাদৃশ্যতাই অনেক। উভয়েই কাব্যের বিস্তৃত মহাসমুদ্রে সৃষ্টির সুন্দর শতদল। অল্প একটুখানি আয়তনে, কিন্তু তাহারই মধ্যে ধরিয়াছে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রস্ফুটতা। গীতি কবিতা (Lyric)র সঙ্গে ছোটগল্পের এত মিল রহিয়াছে বলিয়াই যখন দেখি একা রবীন্দ্রনাথই বিশ্বসাহিত্যে একাধারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতি কবিতা সমূহ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লিখিয়াছেন, তখন বিস্মিত হইবার কিছুই থাকেনা।

শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প বলিতে কী বোঝায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পে রহিয়াছে। যে কথা হাজারটা প্রবন্ধ লেখা এবং গবেষণা করিয়াও বুঝিয়া ও বুঝাইয়া উঠিতে পারা যায় না রবীন্দ্রনাথের "পোষ্ট মাষ্টার" কিংবা "একরাত্রি" কিংবা "কাবুলিওয়ালার" মত গল্প অবহিত হইয়া পড়িলে অসংশয়ে সে সমস্ত বোঝা যায়। প্রথমে "পোষ্ট মাষ্টার" গল্পটির কথা ধরা যাক। তিন চার পাতায় সমাপ্ত এই ছোট গল্পটীর মধ্যে মহাকাব্যের মত একাধারে সঞ্চীয়মান বিচ্ছেদ কাতরতা ঘনীভূত করুণা এবং বৃহৎ বিষাদব্যাপ্ত বৈরাগ্য মাখানো রহিয়াছে। গল্পটি এমন যে বাংলা দেশের সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকারই তাহা জানা আছে। তথাপি গোড়াকার কথা কিছু বলিয়া রাখি, একখানি সামান্য গণ্ডগ্রামের পোষ্টমাষ্টার, তাঁহারই রান্নার জোগার করিয়া দিত, রুটি গড়িয়া দিত গ্রামের একটি বালিকা রতন। সেই গ্রামে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এবং আরও অন্যান্য নানা অসুবিধায় পোষ্ট মাষ্টার উত্যক্ত হইয়া সেখান হইতে বদলীর দরখাস্ত করিলেন। বদলী না-মঞ্জুর হইলে কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। দেশে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে রতনের কাছে বিদায় লইলেন। কিন্তু এই সামান্য একটুক্‌রা ঘরোয়া ঘটনার সহিত দূর দূরান্তের জল কল্লোলের মত কত গভীর ধ্বনি, কত করুণ, মধুর, উদাস স্বর আসিয়া মিশিয়াছে, "ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট-মাষ্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেট্‌রা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন। যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল,—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরনীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছল ছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্ম ব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড় বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদী প্রবাহের ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার!"

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইলনা। সে সেই পোষ্টআপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধকরি তাহার মনে ক্ষীণ আশা

জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে,—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিলনা। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচেনা. যুক্তি শাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে; প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়; অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ণ করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।'

(পোস্টমাস্টার)

রবীন্দ্রনাথের পরে আজকালকার যত ছোট গল্প পড়িয়াছি তাহার মধ্যে পথের পাঁচালি রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প পড়িয়া মন মুগ্ধ হয়। ইঁহারই ছোটগল্পে, রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও অনেকটা সেই ধরণের জীবনের তুচ্ছ ঘটনা রাজী লইয়া একটা লোকাতীত কালাতীত বর্ণ সম্পাত আছে। সম্প্রতি ইঁহার রচিত যাত্রাবদল নামক ছোটগল্পের বহির 'যাত্রাবদল' গল্পটি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। যাত্রাবদলের গল্পাংশ সামান্য। পল্লীগ্রামের একটি বধূ বহুদিন পিতৃগৃহে থাকিয়া এই প্রথমবার স্বামীর সহিত স্বামীর চাকুরীর জায়গায় যাইতেছিল। তাহার হার্টের দোষ ছিল, নৈহাটি জংসনের নিকট ষ্টেশনে সে হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মারা যায়। তাহার পরে অনেক চেষ্টায় টিকিট বাবুর সুপারিশে দুতিন জন মাতাল, পাঁউরুটি ভেণ্ডার, টিকিটবাবু ইত্যাদি মিলিয়া সেই শীতের রাত্রিতে বধূটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কোনরকমে শেষ হয়। সেইখানকার গুটি কয়েক লাইন, * *"রাত অনেক বেশী—বোধহয় এগারটা। হালি সহর জুটমিলের আলোর সারি নিবে গিয়েচে। প্রকাণ্ড একটা অশরীরী পাখী যেন জ্যোতির্ম্ময় পাখা মেলে গঙ্গার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে, এক একবার সেটা যেন জলের কাছাকাছি আসচে, স্নিগ্ধজ্যোঃতির বিশাল প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেচে গঙ্গার বুকে—আবার যখন দূরে চলে যাচ্ছে, তখন অল্প সময়ের জন্যে সে জায়গাটা অন্ধকার... আবার আলো ফুটে উঠল, আবার অন্ধকার। **

মনে কেমন একটা দুঃখ হোল। এই অভাগিনী পল্লীবধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সম্মান এখানে রক্ষিত হোলনা। মনে হোল ও এখানে কেন? এই জ্যোৎস্না প্লাবিত গঙ্গার উদ্দাম তরঙ্গ ভঙ্গ, এই হিমবর্ষী, নক্ষত্র-বিরল বিরাট আকাশ, এই অমঙ্গলময়ী মহানিশার মৃত্যু অভিযান—জীবনের নানা ছোটখাটো সাধ যাদের মেটেনি, এ রুদ্র আহ্বান তাদের বেলা আর কিছুদিন স্থগিত রাখলে বিশ্বকর্ম্মার কাজের কি ক্ষতিটাহোত?...ছোট্ট একটি গৃহস্থ বাড়ীর দাওয়ায় মেয়েটি খোকাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে, সবে সে নদীর ঘাট থেকে গা ধুয়ে এসেচে, পায়ে আল্‌তা, কপালে টিপ্, খোঁপাটি বাঁধা—ওকে মানায় জীবনের সেই শান্ত, পটভূমিতে—শ্মশানের মাতালের হুড়াহুড়ির মধ্যে ওকে এনে ফেলা যেমনি নিষ্ঠুর তেমনি অশ্লীল..." (যাত্রা বদল)

আজকাল যে বাংলা সাহিত্যে তেমন ভালো ছোটগল্প ক্বচিৎ পড়িতে পাওয়া যায়, তাহার একটা কারণ জন সাধারণ ছোটগল্প পড়িতে চায়না। কাজে কাজেই প্রকাশকেরা তাহা ছাপিতে

চাননা। এক কথায় দেশের মধ্যে ছোটগল্পের উৎসাহ সঞ্চারী হাওয়া একেবারে বহেনা। আমাদের মনে হয়, তাহার একটা কারণ ছোটগল্প সম্যক ভাবে বুঝিতে এবং তাহার রস গ্রহণ করিতে মনের যতটা শিক্ষা এবং সংস্কৃতি আবশ্যক আমাদের দেশের পাঠক সাধারণের এখনো ততটা হয় নাই। ছোটগল্প লেখা শক্ত, বোঝা শক্ত। প্লটের ডিটেক্‌টিভ্ রোমাঞ্চকরতা, পাতায় পাতায় রসালো ঘরকন্নার ছবি এ সকল যাঁহারা সুবৃহৎ উপন্যাসের কলেবর ব্যাপিয়া চাহেন, তাঁহারা নিটোল মুক্তার মত, একবিন্দু অশ্রুকণার মত করুণ সুন্দর সংক্ষিপ্ত ছোটগল্পের অসীম মাধুর্য্য এবং রস সম্ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তবে ক্রমশঃ আমাদের সাহিত্যের মাপকাঠি এবং সাহিত্যের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। ক্রমে রবীন্দ্রনাথের "গৃহপ্রবেশের" মত নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত নাটক যখন জনসাধারণের মনে আনন্দ দিতেছে; পূর্ব্বেকার পাতায় পাতায় নাচ গান এবং চটুল সঙ্গীতে ভরা নাটকের পরিবর্ত্তে "গৃহপ্রবেশের" নায়ক অসুস্থ যতীনের সমস্ত নাটকের অভিনয় সময়টা ইজিচেয়ারে চুপ করিয়া অর্দ্ধশয়ান ভাবে থাকিবার মত শান্ত দৃশ্যের মাঝেও তাহারা রসোপকরণ খুঁজিয়া পাইতেছে, তখন আশা হয় শীঘ্র ছোটগল্পের দিকেও জন সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। মন ঝুঁকিবে। ভালো ছোটগল্প যে কী অমূল্য বস্তু তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আধুনিক যুদ্ধোপকরণ।

শ্রীগৌরী দেবী।

মহাযুদ্ধের পর হইতে আজপর্য্যন্ত অস্ত্রহ্রাসের জন্য অনেক প্রস্তাব হইয়াছে। সকলেই যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে। অনেকে ইহাদ্বারা স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের রক্তাক্তস্মৃতি তাহাদের মন হইতে তখনও মুছিয়া যায় নাই। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং রাজনীতির কূটচক্রে আজকাল কোন জাতিই অপর জাতি অপেক্ষা বিশেষ হীন বল নহে, উপরন্তু তাহাকে পরাস্ত করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিতে হয়। এরূপ আর দু'একটি যুদ্ধ হইলেই য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলি শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। এক 'রুগ্নব্যক্তির' পর্য্যায়ে পড়িলে তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকা যে দাঁড়াইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু বৈদেশিক সাম্রাজ্য আছে। ঐ রাজ্যগুলি হাতছাড়া হইয়া গেলে তাহাদের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইবে।

পরস্পরের সাথে যদি তাহারা এইভাবে ভীষণ যুদ্ধে মাতিয়া ওঠে তাহাহইলে তাহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অধীনস্থ দেশগুলি স্বাধীন হইয়া পরিবে।

অনাগত দিনের নিজেদের এই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়া অনেকে তখন জাতিসঙ্ঘকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। সেই সাথে রণসম্ভার হ্রাসের গুরুত্বও উপলব্ধি করিলেন। অস্ত্রহ্রাসের ইচ্ছাটা এতটা উৎকট আকার ধারণ করিতনা যদি না জাপান পৃথিবীর একটী প্রধানতম শক্তিরূপে পরিগণিত হইত এবং 'Asia for the Asiatico' কথাটীকে সত্যে পরিণত করিতে জাপানে একটী প্রবল দলের সৃষ্টি না হইত।

যে কোন কারণের জন্যই হোক্‌না কেন বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এমন অনেক লোক আছেন যাহারা যুদ্ধোপকরণ হ্রাসের পক্ষপাতী।

আমরা যদিও অস্ত্রহীন তথাপি এবিষয়ে আলোচনা করিতে বাধা নাই। আমরা কেন বর্ত্তমান যুদ্ধোপকরণের বিপক্ষে তাহাই বলিতেছি।

প্রথমতঃ আর্থিক দিকের কথাই ধরা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটী স্বাধীনদেশ আয়ের অনেক টাকা সমরবিভাগে ব্যয় করে। শুধু স্বাধীন নয় ভারতের মত পরাধীন দেশও অজস্র অর্থ এইজন্য ব্যয় করে।

প্রত্যেক দেশেরই আয়ের একটী সীমা আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট আয় হইতে যখন অধিকাংশ টাকা সামরিককার্য্যে নিয়োজিত হয়, তখন অন্যান্য আবশ্যকীয় বিভাগে অর্থের যে অভাব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

একদেশ যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অপরিমেয় অর্থ এই কার্য্যে নিয়োজিত করে তবে বাধ্য হইয়া পারিপার্শ্বিক অন্য রাজ্যগুলিকেও আত্মরক্ষার জন্য ঐ ভাবে প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য করে। সুতরাং তাহাদের রাজ্যেওঐরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

সামরিক ব্যয়ের অধিকাংশই দুর্গ-যুদ্ধজাহাজ-এরোপ্লেন নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, রাস্তাঘাট, রেল প্রভৃতি নির্ম্মান করিতেই ব্যয় হয়।

পূর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সময়ে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে অনেক বেশী টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কামানের গোলার মুখে তাহা টিকে না। দুর্গ ধ্বংসের সাথে অপরিমিত অর্থও নষ্ট হয়।

তারপর যুদ্ধজাহাজ। ২০।২৫ বা ২৭ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া বিশাল যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিলেও ডুবোজাহাজের হাত হইতে সে নিস্তার পায় না—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার সলিল সমাধি হয়। অত্যল্পকাল মধ্যেই জাতির পুঞ্জীভূত সম্পদ সাগর তলে—অদৃশ্য হইয়া যায়।

এখানে অনেকে বলিবেন যদিও অল্প সময়ের মধ্যে বহু বর্ত্তমান যুদ্ধোপকরণে বহুটাকা নষ্ট হইতে পারে তথাপি বর্ত্তমানকালে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই কথাটি বিশেষ ভাবে বিচার করা দরকার।

যুদ্ধোপকরণের সৃষ্টি হইয়াছে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করিবার জন্য। শুধু কতকগুলি রাজ্য জয় করিয়া গেলেই বা অনেকগুলি যুদ্ধ জিতিলেই শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হওয়া যায় না।

যে যুদ্ধের দ্বারা জাতির ভাগ্যস্রোত নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আগত অনাগত যুগের উপর অক্ষয় ভাবে পরিবর্ত্তনের কথা লিখিয়া যাইতে পারে তাহাই ইতিহাসে অমর হইয়া থাকে। অপরগুলি বিদ্যুতের ক্ষণিক দীপ্তি লইয়া আসিয়া বিস্মৃতির আধাঁরে মিশিয়া যয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমরবিদ্‌দের কষ্টিপাথর decisive action. আলেকজেণ্ডার—সিজার-নেপোলিয়ানকে এই ভাবেই বিচার করা হয়।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে অস্ত্রাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা-কী decisive battle কম হইয়াছে না উহাতে বীরত্ব প্রকাশের পথ উন্মুক্ত ছিল না?

যখন মানুষ দাঁড় টানিয়া জাহাজ চালাইত বায়ুর সাহায্যে—দূরদিগন্তে সাগরে পরিচিত শত্রুর সন্ধানে তখন ঐ বায়ু চালিত অর্ণবযান দ্বারা যে সব যুদ্ধ হইয়াছে তাহাদের ফলটী বিংশশতাব্দীর উন্নততম যুদ্ধজাহাজদ্বারা সংঘটিত ফল অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান উপকরণ সাহায্যে descisive action বেশী হইতেছে না তথাপি অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখি বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান।

আমার মনে হয় এই অর্থগুলি শুধু শুধু নষ্ট হইতেছে! বার্ণহার্ডি অথবা ট্রিট্‌সকে প্রভৃতির মতে যুদ্ধদ্বারা মানব সভ্যতার উন্নতি হইতেছে এবং যুদ্ধের সময় মধ্যে মানবহৃদয়ের অনেক সদ্‌গুন বিকাশ হয়, ইহার মধ্যে বীরত্বই সর্ব্বপ্রধান।

সময় ও সুযোগ না পাইলে বীরত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে মেশিনগান প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রগুলির সম্মুখে দাঁড়ানই যায়না এক মিনিটও যদি দাঁড়াইবার সময় না পাওয়া যায় তবে কী-রূপে বীরত্ব প্রকাশিত হইবে?

একটী উদাহরণ দেই।

কতকগুলি সৈনিকের সম্মুখে বোমা-শেল পড়িল, হাতের রাইফেল হাতেই রহিল কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল—যে সমস্ত সৈনিক মরিল তাহারা কী—বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ পাইল? আমার মনে হয় আধুনিক যুদ্ধোপরণ সমূহ হইতে শুধু যে আর্থিক অনিষ্ট হইতেছে তাহা নহে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্ট হইতেছে যে মানুষ ক্রমশঃ মেশিনের অধীন হইয়া পড়িতেছে এবং তাহাতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে পূর্ব্বের মত বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে যুদ্ধ হয় মেশিনে মেশিনে, মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। ভবিষ্যতের যুদ্ধ সমূহে মানুষের প্রয়োজন আরও কম হইবে।

মানুষ যতদূর হইতে সরিয়া যাইয়া যুদ্ধ করিবে ততই ব্যক্তিগত বীর্য্যের প্রকাশ কম হইবে। যে কারণে হস্তনির্ম্মিত শিল্পে প্রতিভার পূর্ণপরিণতি সম্ভব হয়—মেশিনে হয় না—ঠিকসেই কারণেই বর্ত্তমান যুদ্ধোপকরণদ্বারা সৈনিকের স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভা বিকাশের পথরুদ্ধ হইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধোপকরণদ্বারা ধ্বংসের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায়। একথা স্বীকার করি যদিও তাহাদ্বারা decisive result পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় না।

বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক মরিতেছে, যে দেশে যুদ্ধ হয় তাহার ক্ষতির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হয়। মহাযুদ্ধে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা ক্ষতি পূরণের টাকা দ্বারাও পূর্ব্বের অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না।

ব্যয়ের পরিমাণ নানা কারণে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় যুদ্ধান্তে পরাজিতের অসহনীয় ক্ষতিপূরণ দিতে হয় ইহাতে অর্থনৈতিক জগতের স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটা নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে যে পরাজিত জাতিই লাঞ্ছিত হয় এমন নহে পৃথিবীর সবাইকে সেই তরঙ্গে আঘাত করে।

নেপোলিয়ানের যুদ্ধের পর দেখা গিয়াছিল যে ফরাসীরা আকৃতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়াছে।

মহাযুদ্ধের পর বেলজিয়ামের অবস্থাও এরূপ হইয়াছিল। কামান বন্দুকের ভীষণ গর্জ্জনে ও বিষাক্ত বাষ্পের ভীষণ প্রক্রিয়ায় ও অনিশ্চিত মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা ভীতভাবে দিন অতিবাহিত করায় মানসিক জগতে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল তাহাই ভবিষ্যৎ সম্প্রদায়ের দৈহিক ও মানসিক অবস্থাকে প্রভাবন্বিত করিয়াছে।

যাহারা মনে করেন যে আধুনিক উপায়ে যুদ্ধ করিলে পরাজিতের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহাদের কথায় ইতিহাস সায় দিবেনা। ইতিহাস বলে, যুদ্ধের পরাজয় দ্বারা কোন জাতি চিরদিনের জন্য হীন হইতে পারে না। ১৮৭০এর ফরাসী এবং ১৯১৮ পর জার্ম্মেণ জাতি ধ্বংসের মহাশ্মশানেই নবজীবনের বাণীর সন্ধান পাইয়াছে। জার্ম্মেণীকে হীন করিবার জন্য যথেষ্ঠ চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সব ব্যর্থ করিয়া বিষমার্কের জার্ম্মেণী নির্ভীকভাবে সঙ্কটের পথে চলিয়াছে, জার্ম্মেণী কলম্বসের চোখ লইয়া নিরুদ্দেশের যাত্রী হইয়াছে।

ইতিহাস বলে শুধু যুদ্ধদ্বারা কোন জাতির ধ্বংশ হয় না, যাহারা যুদ্ধকে অযত্নে ত্যাগ করিয়াছে তাহাদেরই অশেষ দুর্গতি হইয়াছে। সুতরাং উন্নত যুদ্ধোপকরণের সাহায্যে অপরকে ধ্বংসের চেষ্টা বৃথা।

পূর্ব্বের যুদ্ধে যে উন্মুক্ত, অকপট সবল জীবনের প্রতিচ্ছবি পড়িত আজ আর তাহা পড়ে না।

'রণধারা বহে' 'জয়গান গাহে' 'উন্মাদ কলরবে' যাহারা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত তীব্রবেগে বহিয়া যাইত আজ শত শতাব্দীর পরও তাহাদের যুদ্ধাশ্বের পদধ্বনি কানে বাজিতেছে, আজও বুঝি পার্ব্বত্য প্রদেশের গভীর স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে রাত্রির অন্ধকার শিহরিয়া উঠিতেছে সেই সব সৈনিক যাহাদের—

"দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্য মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল
বজ্রের মতন—রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি' অতর্কিত শিকারের' পরে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা—
হিংসা তীব্র সে আনন্দ সেদৃপ্ত গরিমা"

এই ভাব আজ শুধু কল্পনার—বাস্তব জগৎ হইতে তাহা বিদায় লইয়াছে।

শিল্প-সৌন্দর্য্যবোধ

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

(ওকাকুরা কাকুজোর Book of Tea নামক বইয়েয় ফরাসী অনুবাদ হইতে)

"বীণা বশীকরণ" বিষয়ে যে Taoist গল্প আছে, সেটি শুনেছ কি ?

বহু বহুকাল আগে Sungmen নামক এক গিরিসঙ্কটে একটি কিরি-বৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল, যাকে বাস্তবিক বনের রাজা বলা যেতে পারত। তার মাথা এত বেশি উঁচু ছিল যে, সে তারাদের সঙ্গে কথা কইতে পারত ; আর তার শিকড় মাটির নীচে এতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছিল যে, পাতালে সুপ্ত বাসুকির রৌপ্য কুণ্ডলীর সঙ্গে তার তাম্র কুণ্ডলীর জট পাকিয়ে যেত।

এখন এক শক্তিশালী যাদুকর এই গাছ থেকে একটি অপরূপ বীণাযন্ত্র তৈরী করলেন, যার উদ্দাম অন্তরাত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ভিন্ন অন্য কারো কাছে বশ মানত না। বহুদিন যাবৎ এই যন্ত্রটি চীন সম্রাটের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারভুক্ত ছিল, এবং কালক্রমে অনেকেই তার তন্ত্রী থেকে সুর টেনে বের করবার চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু কারো চেষ্টাই সফল হয়নি। তাদের প্রাণপণ প্রয়াসের উত্তরে সেই বীণা থেকে কেবলমাত্র এক অবজ্ঞাসূচক কর্কশ স্বর নির্গত হত ; বাজিয়ের অভিপ্রেত সুরের সঙ্গে যার কোনরূপ সঙ্গতি ছিলনা। সে বীণা কোন ওস্তাদেরই বশ্যতা স্বীকার করতে সম্মত হত না।

অবশেষে একদিন এলেন বীণকারশ্রেষ্ঠ Peiwoh। সুকুমার হস্তে তিনি বীণাকে আদর করলেন, ও সন্তর্পণে তার স্পর্শ করতে লাগলেন, যেমন করে লোকে তেজী ঘোড়াকে বাগ মানাবার চেষ্টা করে। তাঁর গানের বিষয় ছিল প্রকৃতি ও ঋতুর লীলা, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত এবং স্রোতস্বিনী নদী ; তা'তে করে গাছের সব পূর্ব্বস্মৃতি আবার জেগে উঠল। তার ডালের ভিতর দিয়ে

আবার বসন্তের মলয় পবন খেলে যেতে লাগ্‌ল। ঝরণাশিশুগুলি গিরিসঙ্কটে নাচতে নাচতে ফুলের কুঁড়ির দিকে চেয়ে হাসতে লাগ্‌ল। গ্রীষ্মকালের স্বপ্নময় ধ্বনিসকল আবার শোনা যেতে লাগ্‌ল—লক্ষ পতঙ্গের গুঞ্জন, বর্ষার মধুর ঝরঝর শব্দ, কোকিলের করুণ কুহুতান। ঐ শোন! একটি বাঘ গর্জ্জন করে উঠল, এবং উপত্যকার প্রতিধ্বনি তার সাড়া দিল। এখন শরৎকাল; তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ জনশূন্য রাত্রে, বরফপড়া ঘাসের উপর চাঁদের আলো ঝিক্‌মিক্‌ করছে। এবার শীতের রাজত্ব; নীহারসিক্ত বাতাস বলাকার ঘুর্ণনে আলোড়িত, শিলাবৃষ্টির অধীর আনন্দ আঘাতে বৃক্ষশাখা ঝঙ্কৃত।

তারপর Peiwoh সুর বদ্‌লে প্রেমের গান ধরলে। অরণ্য নত হয়ে পড়ছে, যেন তরুণ প্রেমিক আপন ভাবে বিভোর। ঐ দেখ, উচ্চ আকাশে একটি সুন্দর উজ্জ্বল মেঘ উড়ে চলেছে, যেন কোন্‌ উদ্ধত তরুণী; কিন্তু তার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মাটিতে দীর্ঘ ছায়া পড়ছে, যেন নিরাশার মত কালো। আবার সুর গেল বদ্‌লে; Peiwoh আরম্ভ করলে যুদ্ধের গান, তাতে ছিল অসির ঝন্‌ঝনানি এবং অশ্বের খুরধ্বনি। তারপর বীণায় Sungmenএর ঝড় উঠ্‌ল, অগ্নিবরণ নাগনাগিনী বিদ্যুৎবাহনে ছুটে বেরিয়ে পড়ল, বরফের চাপ বজ্রনির্ঘোষে পাহাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। দেবতুল্য চীন সম্রাট আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে Peiwohকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর জয়লাভের গূঢ় তাৎপর্য্য কি? তিনি উত্তর করলেন, "হে রাজন্‌! অপর সকলে হার মেনেছেন, কারণ তাঁরা গানে নিজেদেরই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আমি কিন্তু বীণাকেই স্বেচ্ছায় বিষয় নির্ব্বাচন করতে দিয়েছি; সত্য বলতে কি, বীণাই Peiwoh কিম্বা Peiwohই বীণা, সে কথা আমি বলতে পারিনে।"

এই গল্প থেকে বোঝা যায় যে, শিল্পসৌন্দর্য্যবোধ কি রহস্যময় বস্তু। যাকে বলি শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা, সেটি আমাদের হৃদয়তন্ত্রীর সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলির সম্মিলিত বাদন। Peiwoh হচ্ছে সত্যসুন্দর, এবং আমরা হচ্ছি Sungmenএর সেই বীণা। সৌন্দর্য্যের মোহিনী স্পর্শে আমাদের অন্তর্নিহিত গোপন তন্ত্রীরাজি জেগে ওঠে; তার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে আমরা কম্পিত হই, ধ্বনিত হই। যা' বলা হয়নি তাই আমরা শুনতে পাই, যা' অদৃশ্য তাই অবলোকন করি। শিল্পীর আঙুল টেনে বের করে স্বর,—কোথা থেকে, তা' আমরা জানিনে। অনেক দিনের ভুলেযাওয়া স্মৃতি নতুন অর্থসম্পদ নিয়ে আমাদের মনে উদয় হয়। যে সকল আশা ভয়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল, যে সকল ভালবাসার আবেগ আমরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই, সেগুলি নবীনতর লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। আমাদের চিত্তই সেই পটবস্ত্র, যার উপর শিল্পী তাঁর বর্ণবিন্যাস করেন; তার ভিন্ন ভিন্ন রঙ আমাদেরই মনোভাব, তার আলোছায়া আমাদেরই সুখদুঃখ দিয়ে রচিত। "আমি আমারি মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।" সেই পরম শিল্পকার্য্য আমাদের অন্তরে আছে, আর আমরা সেই শিল্পকার্য্যের অন্তরে আছি।

শিল্পসৌন্দর্য্যবোধের বিকাশের জন্য যে সমবেদনাপূর্ণ সংযোগ আবশ্যক, দু'পক্ষেরই কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকারে তার ভিত্তি স্থাপিত। যে দর্শক, তার মনকে শিল্পীর বাণী গ্রহণ করবার উপযুক্ত অবস্থায় আনবার চেষ্টা তাকে করতে হবে; আবার যে শিল্পী, তারও জানা চাই কেমন করে সে বাণী প্রকাশ করতে হয়। Kobori Enshiu নামক চায়ের আচার্য্য, যিনি নিজে রাজকুলে জন্মেছিলেন, তিনি এই স্মরণীয় বাক্যটি আমাদের দান করে গেছেন; 'একজন বড় রাজার কাছে যেমন করে যাও, সেই ভাবেই বড় চিত্রকরের নিকট যেও।' কোন একটি মহৎ শিল্পরচনা বুঝতে হলে তার কাছে প্রথমতঃ নীচু হয়ে প্রণাম কর, এবং নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে অপেক্ষা করে থাক, কতক্ষণে সে তোমার সঙ্গে কথা কইবে। Song যুগের একজন বিখ্যাত সমালোচক একদিন একটি চমৎকার স্বীকারোক্তি করেন। তিনি বলেন 'আমার যখন অল্প বয়স ছিল, তখন যার ছবি ভাল লাগত, সেই চিত্রকরের প্রশংসা করতুম; কিন্তু আমার বিচারবুদ্ধি পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকেই নিজে তারিফ করতে লাগলুম, এই মনে করে যে, মহাত্মা শিল্পীগণ আমার ভাল লাগবার জন্য যে-সব জিনিষ নির্ব্বাচন করে দিয়েছেন, সেই জিনিষকেই আমি ভালবাসি।' শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বিশেষ ভঙ্গী যে আমাদের মধ্যে এত কম লোকে প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝতে চেষ্টা করেন, সেটা বড়ই দুঃখের বিষয়। ভদ্রতার এই সাধারণ সম্মানটুকু আমরা স্বেচ্ছান্ধ অজ্ঞতাবশতঃ তাঁদের দিতে অস্বীকার করি; তার ফলে তাঁরা আমাদের চোখের সামনে সৌন্দর্য্যের যে মহার্ঘ ভোজ পরিবেশন করেন, তার রসাস্বাদনে আমরা বঞ্চিত হই। একজন শিল্পরাজের সর্ব্বদাই কিছু দান করবার থাকে; তবু যে আমরা অতৃপ্তভাবে তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসি, সে কেবল আমাদের রসগ্রাহিতার অভাবে।

অপরপক্ষে প্রকৃত শিল্পামোদীর কাছে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পরচনা যেন জীবন্ত সত্য হয়ে ওঠে, তার প্রতি যেন সৌহার্দ্দ্যসূত্রে তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। মহৎ শিল্পীগণ অমর, কারণ তাঁদের প্রেম ও বেদনা আমাদের মনের মধ্যে চিরকাল সঞ্জীবিত থাকে। হাতের কৃতিত্বের চেয়ে অন্তরের টানই বেশি; রচনাকৌশল অপেক্ষা মানুষের আকর্ষণই আমরা অধিক অনুভব করি; এবং এই আবেদনের পিছনে মনুষ্যত্ব যত বেশি থাকে, ততই গভীরভাবে আমাদের অন্তর সায় দেয়। শিল্পীপ্রবরের সঙ্গে আমাদের এই গোপন মনোমিলনবশতঃই আমরা উপন্যাস ও কাব্যের নায়ক নায়িকার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হই। আমাদের জাপানী শেক্সপীর চিকামাট্‌সু, জনসাধারণের প্রতীতি জন্মিয়ে দেওয়াকে মনে করতেন নাট্যরচনার একটি মূলমন্ত্র। তাঁর ছাত্রগণ একদিন তাঁকে যতগুলি নাটক দেখতে দেয়, তারমধ্যে একটিমাত্র তাঁর মনে ধরে। সে রচনাটির সঙ্গে শেক্সপীয়ের 'ভ্রমরঙ্গে'র কিছু সাদৃশ্য ছিল; তাতে দুই ভাই পরিচয় প্রমাদের দরুণ নানারূপ বিপদে পড়েছিলেন। চিকামাট্‌সু বল্লেন—'হাঁ, এতে আমি নাটকের যথার্থ প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে বলে বুঝতে পারছি, কারণ জনসাধারণের প্রতিও মন দেওয়া হয়েছে; অভিনেতাদের চেয়ে কিছু বেশিই

তাদের জানতে দেওয়া হয়েছে। তারা জানছে ভুল হবার কারণ কি; এবং রঙ্গমঞ্চের লোকেরা না জেনেবুঝে সরল মনে অদৃষ্টের ফাঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দেখে তাদের প্রতি করুণা বোধ করছে।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়দেশীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীই আভাসে ইঙ্গিতে দর্শকের মনে প্রত্যয় জন্মানোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ক্রটী করেননি। কোন একটি মহৎ শিল্পরচনা পর্য্যবেক্ষণকালে আমাদের চোখের সামনে যে চিন্তাধারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তার বিপুল বিস্তৃতিতে কে না অভিভূত হয়ে পড়ে? এমন কোন বড় শিল্পকার্য্য নেই, যা অন্তরঙ্গতা এবং সৌহার্দ্দ্যব্যঞ্জক নয়। অপরপক্ষে, বর্ত্তমান কালের প্রচলিত রচনাগুলি তুলনায় কি হিমবৎ প্রাণহীণ! একদিকে মনুষ্যহৃদয়ের উত্তপ্ত অভিব্যঞ্জনা; অপরদিকে বিধিবদ্ধ যান্ত্রিক ভঙ্গীমাত্র। আধুনিক শিল্পীগণ বিধিনিষেধের দাস, তাঁরা কদাচ নিজেকে অতিক্রম করে যেতে পারেন। Sungmen এর বীণায় ঝঙ্কার তুলতে যে সকল যন্ত্রী বৃথা চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদেরই মত এঁরা শুধু নিজের কথাই বলতে যান। হতে পারে এঁদের রচনা বেশি শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু নিঃসন্দেহ সেগুলি মনুষ্যহৃদয় হতে বহুদূরে অবস্থিত। একটি পুরাতন জাপানী প্রবাদবাক্য আছে যে, কোন মেয়ে কখনো কোন সত্যকার অহঙ্কারী ব্যক্তিকে ভালবাসতে পারে না, কারণ তার হৃদয়ে এমন ফাটল নেই যে-পথে প্রেম প্রবেশ করে হৃদয় পূর্ণ করতে পারে। শিল্পকলা ক্ষেত্রেও তেমনি অহঙ্কার সমবেদনার পক্ষে বিষম অন্তরায়,—সে শিল্পীর দিক থেকেই হোক্ বা সাধারণের দিক থেকেই হোক্।

সৌন্দর্য্যক্ষেত্রে সমধর্ম্মী প্রাণের মিলনের মত পবিত্র সম্বন্ধ আর কিছু আছে বলেত আমি জানিনে। এই মিলনলগ্নে সৌন্দর্য্যপ্রেমিক নিজেকে অতিক্রম করেন। তিনি আছেন, অথচ আপনাতে আপনি নেই। অনন্তের একটি কিরণরেখার ঈষৎ আভাস তাঁর চোখে পড়ে, কিন্তু আনন্দপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা তিনি খুঁজে পান না; কারণ চোখের ত কোন ভাষা নেই। জড় জগতের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে তাঁর অন্তরাত্মা বিশ্বছন্দে আন্দোলিত হতে থাকে। এইরূপেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ধর্ম্মের সাযুজ্য লাভ করে ও মনুষ্যজাতির উৎকর্ষ সাধন করে; এবং এই কারণেই একটি মহৎ শিল্পকার্য্য পুণ্য বলে পরিগণিত। পুরাকালে জাপানীগণ কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কারুকার্য্যকে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে ঘিরে রাখতেন। চায়ের আচার্য্যগণ তাঁদের মহার্ঘ দ্রব্যগুলি পূজার সামগ্রীর ন্যায়ই সযত্নে রক্ষা করতেন। সেই প্রাণের প্রাণস্বরূপ পদার্থটি যে রেশমী কোষের নরম ভাঁজে শায়িত থাক্‌ত, সেটি আবিষ্কার করতে অনেক সময় একটির পর একটি কত যে বাক্স খুলতে হত, তার ঠিক নেই। কেবলমাত্র দীক্ষিত সমঝদারদেরই তাঁরা সে-সব দেখাতেন, তাও খুব কম সময়।

যে-যুগে চা-ধর্ম্ম উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল, সে সময় তাইকোর সেনাপতিগণ যুদ্ধে জয়লাভ করলে পর তাঁদের বিস্তৃত ভূখণ্ড দান না করে, কোন মহামূল্য কারুকার্য্য পুরস্কারস্বরূপ দিলে তাঁরা বেশি সন্তোষ প্রকাশ করতেন। আমাদের অনেক জনপ্রিয় নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে কোন

একটি বিখ্যাত শিল্পকার্য্যের অপহরণ ও পুনরুদ্ধার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেখানে Sessonঅঙ্কিত 'ধরুমার' বিখ্যাত প্রতিকৃতি রক্ষিত, সেই সামন্ত হোসোকাওয়ার প্রাসাদে, তৎকালীন ক্ষত্রিয় রক্ষকের অনবধানতাবশতঃ একদিন হঠাৎ আগুন লেগে যায়। সেই মহার্ঘ চিত্রের উদ্ধারসাধনে সকলপ্রকার বিপদ বরণ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে, উক্ত রক্ষক সেই জ্বলন্ত পুরীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও সেই ছবি হস্তগত করে; কিন্তু পরে দেখে যে, অগ্নিকাণ্ডের দরুণ বেরবার সব পথ বন্ধ। তখন চিত্ররক্ষার প্রতিই একান্ত মনোনিবেশ করে' সে তলোয়ার দিয়ে নিজের শরীরের চারদিকে এক গভীর ক্ষত কাটে, জামার আস্তিন ছিঁড়ে সেই রেশমে-আঁকা ছবি তাতে জড়ায়, এবং সেই খাতের মধ্যে সবসুদ্ধ পূরে দেয়। অবশেষে যখন আগুণ নিভে গেল, তখন দেখা গেল ধুমায়মান অঙ্গারের মধ্যে অর্দ্ধদগ্ধ একটি মনুষ্যদেহ, যার ভিতর অগ্নিশিখার আক্রমণ হতে রক্ষিত সেই অমূল্য ধন সঞ্চিত। এ কাহিনী যতই লোমহর্ষক হোক-না কেন, এর থেকে একদিকে ক্ষত্রিয় রক্ষকের প্রভুভক্তি, অপরদিকে মহৎ শিল্পরচনাকে আমরা কিপ্রকার মর্য্যাদা দান করি, উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু একথা যেন আমরা ভুলে না যাই যে, যে-পরিমাণে কোন শিল্পরচনা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে, সেই পরিমাণেই তার মূল্য। তার ভাষা বিশ্বজনীন হতে পারে, যদি আমরা বিশ্বকে আপন মনে করতে শিখি। আমাদের সীমাবদ্ধ প্রকৃতি, পূর্ব্বসংস্কার ও সামাজিক প্রথার প্রভাব, উত্তরাধিকারলব্ধ মনোবৃত্তি,—এ সবই আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের আনন্দ উপভোগ করবার ক্ষমতাকে খর্ব্ব করে। আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও কিছুদূর পর্য্যন্ত আমাদের বোধশক্তির সীমা নির্দ্দেশ করে দেয়; এবং আমাদের সৌন্দর্য্যরসগ্রাহী অহং অতীতের শিল্পসৃষ্টিতে নিজ প্রকৃতি অনুকূল ভাবেরই অনুসন্ধান করে। অপরপক্ষে একথাও সত্য যে, অনুশীলন দ্বারা আমরা আমাদের শিল্পবোধের উন্নতি সাধন করতে পারি, ও দিন দিন সৌন্দর্য্যের এমন সকল নব প্রকাশভঙ্গী উপভোগ করতে পারি, যা ইতিপূর্ব্বে আমাদের মনে কোনরূপ সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়নি। তবে ভেবে দেখতে গেলে, বিশ্বজগতে আমরা কি নিজেদেরই মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখতে পাইনে? নিজের স্বভাব অনুসারেই কি আমরা 'যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগত' অবলোকন করিনে?—চায়ের আচার্য্যগণ কেবলমাত্র স্ব স্ব রুচির নিক্তির ওজনেই শিল্পদ্রব্যজাত সংগ্রহ করতেন।

এই সূত্রে Kobori Enshiu সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। তিনি শিল্পদ্রব্য সংগ্রহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়ে থাকেন বলে, প্রশংসাচ্ছলে তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে বল্লেন "প্রত্যেক জিনিষটি এত সুন্দর যে, মোহিত না হয়ে কেউ থাকতে পারে না। এর থেকে রিকিউ অপেক্ষা আপনার রুচির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়, কারণ হাজারে একজন মাত্র তাঁর শিল্পসংগ্রহের কদর বুঝতে পারে।" তার উত্তরে Enshiu বিষণ্ণভাবে বল্লেন যে—"এতেই ত আমার নিকৃষ্ট রুচির প্রমাণ হয়। আমাদের মহাত্মা রিকিউর কেবলমাত্র নিজের অভিরুচিসম্মত জিনিষ ভালবাসার স্পর্দ্ধা ছিল;

পরন্তু আমি অজ্ঞাতসারে অধিকাংশের পছন্দমত জিনিষই সরবরাহ করে থাকি। বস্তুতঃ চায়ের আচার্য্যদের মধ্যে হাজারে একজন রিকিউ পাওয়া যায়।"

সে যাই হোক, বড়ই আক্ষেপের বিষয় সম্প্রতি শিল্পকলা সম্বন্ধে যে মৌখিক উৎসাহবাণী আপাতশ্রুত হয়, তার অধিকাংশই কোন সত্য বা গভীর মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে জনসাধারণ যাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, সেই জিনিষেরই সকলে প্রশংসা করে থাকে, নিজের রুচির প্রতি লক্ষ্য না রেখে। যার দর বেশি তারই আদর বেশি, সূক্ষ্ম রুচিসঙ্গত জিনিষের নয়; যার চলন বেশি তারই মান বেশি সুন্দর জিনিষের নয়। আদিম ইতালীয় চিত্রকর অথবা আসিকাগা যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা দেখে জনসাধারণে মুগ্ধ হবার ভান করে বটে; কিন্তু যে-সব সচিত্র পত্রিকা তাদের নিজেদেরই ব্যবসাবুদ্ধির যোগ্য নিদর্শন, সেগুলির আলোচনায় তারা সৌন্দর্য্যবৃত্তির যে খোরাক পায়, তাই হজম করাই তাদের পক্ষে ঢের বেশি সহজ। শিল্পরচনার গুণাগুণ অপেক্ষা শিল্পীর নামেই তাদের প্রয়োজন বেশি। যেমন একজন চীন সমালোচক বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বলে গেছেন—"সাধারণ লোকে কান দিয়ে চিত্র সমালোচনা করে।" এই ব্যক্তিগত রুচি এবং স্বকীয় বিচারবুদ্ধির অভাববশতঃই আমরা আজকাল এই সব মেকিকুলীন লোমহর্ষক শিল্পদ্রব্য জাতের সাক্ষাৎ লাভ করি,—যেদিকেই চোখ ফেরাই না কেন।

আর একটি ভুল ধারণাও চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে দেখতে পাই,—সেটি হচ্ছে শিল্পকলা এবং প্রত্নতত্ত্বকে অভিন্ন মনে করা। প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা মনুষ্যচরিত্রের একটি মহত্তম প্রবৃত্তি, যার অধিকতর প্রসার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যৎ উন্নতির পথপ্রদর্শকরূপে পূর্ব্বতন শিল্পীগণ শ্রদ্ধালাভের সম্পূর্ণ অধিকারী, এবং সমালোচনার এতগুলি শতাব্দী অক্ষত দেহে পার হয়ে এসে আজও যে তাঁরা এমন মহিমামণ্ডিত অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁচেছেন, শুধু সেই এক কারণেই তাঁরা সম্মানযোগ্য। কিন্তু কেবল বয়ঃক্রম অনুসারে তাঁদের প্রচেষ্টার মূল্য নিরূপণ করতে যাওয়া বস্তুতঃ বাতুলতামাত্র। তৎসত্ত্বেও আমরা আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির দিকনির্ণয়ের ভার ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। যখন শিল্পী সমাধির শান্তিময় ক্রোড়ে শায়িত, তখন আমরা তাঁকে স্তুতির নৈবেদ্য অর্পণ করি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবর্ত্তনবাদের সূত্রপাত হয়, তবুও আমরা ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কোন বিশেষ শ্রেণী বা যুগের নমুনা সংগ্রহ করবার জন্যই সংগ্রাহকের সব চেয়ে বেশি মাথাব্যথা হয়; এবং সে ভুলে যায় যে, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট যুগ বা শ্রেণীর বহুসংখ্যক মাঝারিগোছ শিল্পরচনার চেয়ে একটিমাত্র অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন আমাদের অন্তরকে ঢের বেশি স্পর্শ করে। আমরা অতিমাত্রায় শ্রেণীবিভাগ করি, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ উপভোগ করিনে। শিল্পদ্রব্যকে সৌন্দর্য্য হিসেবে না সাজিয়ে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে প্রদর্শন করতে গিয়ে অনেক শিল্পাগার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

এক কথায় বলতে গেলে, জীবন সম্বন্ধে জীবন্ত কোন নক্সা আঁকতে হলে সমসাময়িক শিল্পকলার স্বত্ব সাব্যস্ত না করলে চলবেনা। বর্ত্তমান কালের শিল্পসৃষ্টিই প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজস্ব; সেইটেই আমাদের নিজেদের প্রতিবিম্ব। তাকে মন্দ বলা মানে নিজেদেরই মন্দবলা। সম্প্রতি একটা কথা চলিত হয়েছে যে, একালে শিল্পকলা বলে কোন জিনিষই নেই; তা' যদি হয় ত, তার জন্য দায়ী কে? এটা কি লজ্জার বিষয় নয় যে, প্রাচীনদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েও নিজেদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা এতই উদাসীন? তথাপি এমন শিল্পী আজও বর্ত্তমান, যাঁরা সংগ্রাম করে চলেছেন; এমন লোক এখনো রয়েছে, যারা ক্লান্ত অন্তরে উপেক্ষার হিমশীতল ছায়ায় দিন দিন মুমূর্ষু হয়ে পড়ছে। আমাদের এই আত্মসর্ব্বস্ব যুগে আমরা তাদের কি প্রেরণা দিতে পারি? আমাদের সভ্যতার দৈন্য দেখে অতীতকালের লোকদের অনুকম্পা হওয়াই সম্ভব; আমাদের শিল্পকলার বন্ধ্যত্ব ভবিষ্যতকালের লোকদের হাস্য উদ্রেক করবে বলেই বোধ হয়। জীবনের চারুতা নষ্ট করে আমরা চারুশিল্পকেই নষ্ট করেছি। সেই শক্তিশালী যাদুকর কি কোনদিন আসবেন, যিনি আধুনিক সমাজের কাণ্ড থেকে এমন এক মহতী বীণা তৈরী করবেন, যার তন্ত্রীগুলি একদিন প্রতিভার অঙ্গুলীস্পর্শে বেজে উঠবে?

কাব্যী ছন্দী হাস্যী তর্কী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সখী: ট্রোকের দৃষ্টান্তটি বেশ হয়েছে ঠাকুরপো। কিন্তু এ-ধরণের ছন্দ কি একটু শক্ত হবে না সাধার—অনেকের কাছে?—অর্থাৎ ইংরিজি ছন্দের ঝোঁক—

রসিক: না। খুব সহজ বৌদি, খুবই সহজ। কারণ ট্রোকের ঝোঁক পড়ে যে পর্ব্বের প্রথমেই। এই ধরো না কেন, সপ্তাহ দুই আগে নিশিকান্ত একটি কবিতা পাঠিয়েছে অবিকল সার ফিলিপ সিডনির ট্রোকের প্রস্বনে। শোনো (খাতা খুলিয়া):

Niggard | Time threats | if we | miss

This large | offer | of our | bliss

(হাতে Nig, Time প্রভৃতি long স্বরে তাল দিলেন): এবার শোনো। কবিতাটির নাম "নীলবরণ" সত্যি নীল রঙে যেন ভরা!

(১)

নীল্‌ব | রণ্ ও | নীল্ ব | রণ্!

আজ্‌কে | চাই তো | মার্ শ | রণ্;

মন্ ভো | লাও এ- | মন্ ভো | লাও,

নীল্ দো | লায়্ আ | মায়্ দো | লাও

নীল পালক পাখীর পাখায়

নীল আলোর দীপন জাগায়;

নীল ফুলের কাঁপন লাগায় বাঁধন খোলাও:

নীল দোলায় আমায় দোলাও।

(থামিয়া): কী সহজ ছন্দ বলো তো—অথচ সিডনি সাহেবের ও-কবিতাটি নিশিকান্ত কখনো শোনেনেই নি—আমায় দিলীপ লিখেছে। অর্থাৎ এ ধরণের (— ⌣) long short এর—

সখী: পড়ো, পড়ো—বড় রসভঙ্গ করো তুমি।

রসিক (আবৃত্তির সুরে হাতে তালি দিয়া): শেলির Death কবিতাটা মনে পড়ে—তারও ছন্দ অবিকল এই—

×		×		×		×
Death is	|	here and	|	death is	|	there
Death is	|	bu - sy	|	eve - ry	|	where
All a	|	round wi	|	thin be	|	neath —

সখী (ধমক দিয়া): ফে—র রসভঙ্গ করবে? উঠে যাব।

রসিক (নিশিকান্তের কবিতার খাতা খুলিয়া): আচ্ছা আচ্ছা শোনো:

২

নীলগিরির চূড়ায় চূড়ায়
উচ্চশির কেতন উড়ায় ...
মন আমার সে-ঊর্দ্ধে যাক,
নীল-অচল-কায়ায় মিলাক।

পুঞ্জ পুঞ্জ নীল দেয়ায়
নীল শোভন সুনীল খেয়ায়
ডাকছে ঐ কে: "আয় রে আয়"
শোনাও সে ডাক,
মন আমার সে-ঊর্দ্ধে যাক।

৩

দিগ্বধূর সুনীল কপোল
নীল গগন চুম্বন-বিভোল!
সেই চুমায় আমায় ডোবাও,
সেই সুদূর শোভায় শোভাও।

নীল সাগর উছল আকুল...
মন লভুক সে-নীল অকূল,
যাক আমার আশার দুকূল
অতল মিলাও,
নীল লীলায় আমায় লীলাও

৪

নীল যুগল চোখের তারায়
নিষ্পলক দিঠির ধারায়,
নীল আখর চিঠির লেখায়
নীল তুলির রেখায় রেখায়—

নীল রূপের ছবির মতন—
আজ আমার পরাণ রতন
দীপ্ত হোক সে-উদ্বোধন
আলোক-শিখায়,
নীল কবির গভীর লিখায়।

৫

নীল শ্যামল! হে মনমোহন!
কই তোমার তমাল কানন?
নীল সোহাগ-উছল পিছল
কই সুনীল কালিন্দী জল?

চিত্ত-রাই যে চায় তোমায়,
নিত্য তাই স্বপন জমায়,
নীল রাতের গহীন অমায়
সে হয় উতল!
কই সুনীল কালিন্দী জল?

সখী (হাততালি দিয়া) ঃ চমৎকার কবিতাটিও কিন্তু—সত্যিই বোঝা যায়—একটা নতুন প্রেরণা পেয়েছেন তিনি ওখানে।

রসিক ঃ তা বটেই তো। আর এমন একটা নতুন ঢঙ পাই আমি নিশিকান্তের কবিতায়—যে, যে কী বলব ?—

সখী ঃ তোমার কিছু ব'লে কাজ নেই ঠাকুর পো—তবে এ-কবিতায় একটা জিনিষ ভারি চমৎকার লাগল আমাকে দেবে বলতে ?

রসিক (হাসিয়া) ঃ সর্ব্বনাশ—তোমরা একটু ছাড়া দাও বলেই না বলি দুটো কথা বেচারী আমরা। যাক কী বলছিলে ?

সখী ঃ ভারি ভালো লাগল নিশিকান্তের এ কবিতায় শোভাও ও লীলাও কথা দুটি ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহার দেখে। এ রকমভাবে শোভা ও লীলাকে ক্রিয়াপদ হিসেবে এত সুন্দর করে ব্যবহার করা—

রসিক ঃ কিন্তু করলে হবে কি বৌদি ? ধনুর্দ্ধর প্রতাপ, দোর্দ্দণ্ড মহান্, মরীয়াবিক্রম বাবুরা নবাই বলবেনই বলবেন এরকম ব্যবহারের নজির নেই, অতএব এ নামঞ্জুর।

পবিত্র ঃ ফে—র কটাক্ষ ত্রিটিকদের ওপর ?

রসিক ঃ তাদের গদার পরিবর্ত্তে সামান্য একটু কটাক্ষও করতে পাব না কেন বৌদি বলো তো ? বিশেষত যখন—এ কটাক্ষ—অতি নিরীহ কটাক্ষ—না মারে ভাতে, না প্রাণে ?

সখী ঃ তাহ'লে আয়াম্বিকের পালা আরম্ভ হবে না ব'লে। আর মনে রেখো যে, সে-পালা সুরু না হ'লে তোমায় প্রস্বনী ছন্দের প্রথম অধ্যায়েই আসতে পারবে না।

পবিত্র ঃ হেতু ?

রসিক ঃ যে-হেতু ট্রোকে বাস্তবিকই প্রস্বনীর উপক্রমণিকা। কেন না আমার করাল দুরভিসন্ধি তা হচ্ছে অ-চলতির চল করা। ট্রোকের কদম সবাই মেনে নেবে। ড্যাক্টিলেরও অর্থাৎ বন্দন। সঙ্গীত গুঞ্জন ছন্দিত—ইত্যাদি কেন না এদের ঝোঁক পর্ব্বের প্রথম ধ্বনিতেই।

পবিত্র ঃ তোর মহদুদ্দেশ্য তাহ'লে সাধিত হবে—

রসিক ঃ আয়াম্বিক, অ্যামফিব্রাখ, অ্যানাপেস্ট্, সেকেণ্ড থার্ড ও ফোর্থ পিয়ান—এছাড়া—

সখী ঃ রোসো রোসো বাপু, অত ছুটলে প্রথম থেকেই—রইল তোমার চা আর কেক।

রসিক (হাসিয়া) ঃ আচ্ছা আচ্ছা বৌদি। আমার ভুল হয় কী জানো ?

সখী (হাসিয়া) ঃ জানি—অত্যাধিক উৎসাহ—তাইতো লোকের তোমার ওপর হাড়ের রাগ। বলে তারা পোপের ভাষায় যে তোমাদের মতন উৎসাহীরা—

Fire in each eye, and papers in each hand,
They rave, recite, and madden roound the land.

এর অনুবাদ করেছি আমি এই ব'লে (সুর করিয়া) ঃ

ঠিকরে আগুন প্রতি চোখে—উড়িয়ে হাতে কাগজ—কে হৈ হৈ

করছে ওরা দাপাদাপি ? ভুল ব'কে ? দিন দুনিয়াতে রৈ রৈ !

রসিক ঃ (অট্টহাস্যের পর) বেশ নিয়েছ একহাত বৈ কি বৌদি। সত্যি, আমি প্রায়ই ভুলে যাই যে, এ জগতে সবচেয়ে সন্দেহের চোখে দেখে মানুষ যার নামে এমার্সন উচ্ছ্বসিত অর্থাৎ ঐ এন্থুসিয়াস্‌মে। কিন্তু ছন্দচর্চ্চা ক'রে যখন এ-উৎসাহ বেচারা ঝুপ ক'রে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তখন গাল খেতেই হবে—নাচার। যাক্ এখন থেকে সবরকম উৎসাহ বাদ আলো বঙ্কিমগ্রাব ক্রিটিক "মন্দ-নয়-তবে-ভালো-হ'ত-আরো-ভালো-হ'লে" টোনেই কথা ক'বার চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি। পাড়ি আগে আমার আয়াম্বিক গবেষণা। (সুইনবর্ণ খুলিয়া) ঃ আমার হঠাৎ এ-প্রশ্নটা এসে যায়—এই আয়াম্বিকের— এই অসামান্য ছন্দজ্ঞ কবির ছন্দ-চর্চ্চা করতে করতেই। এই শোনো (Adieux Mariea Stuart কবিতা হইতে আবৃত্তির সুরে) ঃ

Though all | things breathe | or sound | of tight
That yet | make up | your spell
To bid you were to bid the light
Fare-well.

সখী ঃ এর শেষটা বড় সুন্দর, না ?

রসিক ঃ হ্যাঁ সেই জন্যেই বোধহয় ফীলিং এসে গেল। আগে আমার ইংরিজি অনুবাদটাই শোনো। পরে মূল বাংলা। আমি হুবহু এই মডেলই রেখেছি—দেখাতে যে, ইংরিজি আয়াম্বিকের অ্যাকসেণ্ট বাংলার ধাতে চমৎকার সয়।

সখী ঃ ফের দৃষ্টান্তের আগে করে ব্যাখ্যা ?

রসিক ঃ (হাসিয়া) স্বভাব না যায় ম'লে বৌদি, "নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" ?—গীতার ভাষায় যাক্ শোনো (পড়িলেন পাশাপাশি) ঃ

THE TOUCHSTONE

My heart would chant Thy name for aye:
My mind disowns the hymn!
I chase Thy footfalls...why do they
Dislimn?

My voice Thy paean thrilling sings,
Who puts the strain to flight?
Snn-widowed gloom o'er dawn-burst flings
The night!

নিকষ

ও-নামটি প্রাণ তো জপতে চায় ঃ
না চায় এ-মন কেন ?
চরণটি ধরতে ধাই—মিলায়
হেন ?

এ-কণ্ঠ সাধতে চায় ও-সুর ঃ
কে দেয় যে তায় বাধা !—
ঊষায় মিলায় তপন-বিধুর
আঁধা !

My anklets dance to Thy joy-glow
In worship of that lilt:
Who comes to choke its bubbling flow
With silt?

উছল নূপুর তো নাচতে চায়
ও-ছন্দ-বন্দনে!
কে থম্‌কে দেয় সে-তাল মায়ায়
মনে?

Love still would woo its skiey dream:
Rude waking comes too soon!
What dark hordes slay the laughing team
Of the moon?

প্রণয় তো চায় স্বপন-আকাশ:
জাগর আড়াল করে!
কে কৃষ্ণা দণ্ডে শুক্লাহাস
হরে!

Wilt Thou test Heaven on Earth's touch-stone
Ringing our life with bars
That Thy kiss may on earth enthrone
The high stars?

রচিস্‌ স্বরগ-নিকষ—ধরায়,
বাঁধিস তো তাই ছলে
ধূলাও যে তোর চুমায় তারায়
ফলে!

পবিত্র: (তাহার খাতার দিকে চাহিয়া) রোস্‌ রোস্‌—এর মাথাই বা কোনখানে আর আর মুণ্ডুই বা কোন্‌ চুলোয়?

রসিক: এই যে—

ও নাম্‌ | টি প্রাণ্‌ | তো জপ্‌ | তে চায়্‌
না চায়্‌ এ মন্‌ কে ন

My heart would chant thy name for aye
My mind dis-owns the hymn

দেখছ বৌদি? নয় এ আয়াম্বিক? বলো ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে?

Give the devil his due—

সখী: অর্থাৎ রসিক ঠাকুরপোকে তার প্রাপ্য দিতে হবে, এই না? দিচ্ছি। কেবল একটা প্রশ্ন আছে।

রসিক: শয়তান উৎকর্ণ।

সখী: আমার জিজ্ঞাস্যটা এই যে, এ তো হ'ল সহজ আয়াম্বিক। আয়াম্বিকে যখন মডুলেশন আনা হয় তখন তো আর সে এমন সহজ থাকে না। তার বেলায় কী?

পবিত্র: মডুলেশন আবার কী চীজ্‌ সখী?

রসিক: (উত্যক্ত হইয়াও জোর করিয়া শান্ত সুরে) আঃ—মডুলেশনও জানিস্‌ নে ছাই? শোন্‌ তবে। এবছরেরই জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষে বেরিয়েছে শ্রীঅরবিন্দের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন—

দিলীপের লঘুগুরু ছন্দে লেখা "অতীন্দ্রিয়" কবিতার পাদটীকায়। তাতে বুঝতে পারা যাবে ওদের আয়াম্বিকে—দাও তো বৌদি ঐখানে আছে ভারতবর্ষটা—না না ঐ ১৩৪০ এর জ্যৈষ্ঠ—ধন্যবাদ চিরসদয়া সুশীলে! (পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে): আমার মনে হয় ইংরিজি ছন্দের ছন্দোগত বৈচিত্র্য—বাংলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হ'লেও এইখানে তার আছে একটা অসামান্য সম্পদ—যাকে ওরা বলে এই মডুলেশন। কিন্তু এ-বস্তু বাংলায়ও আসতে পারে অনেকখানি আমি দেখাচ্ছি সেটা—যদিও ঠিক এভাবে নয়—অর্থাৎ যাকে বলে এত plastic movement এর সঙ্গে নয়। এই দেখো (দাগ দিয়া):

All, eye	has seen,	all that	the ear	has heard
Is a pale	i llu	sion by	that grea	ter voice
That migh	tier vi	sion. Not	the sweet	est bird,
Nor the	thrilled hues	that make	the heart	rejoice
Can e	qual those	divi	ner ecs	tasies.

এখানে মাত্র এই কয়টি লাইনের মধ্যে ইংরেজি আয়াম্বিকের প্রায় সব রকম মডুলেশনই মিলল চমৎকার—বাংলা ভাষায় যাকে বলে "বাদামের খোলার মধ্যে"। এই হ'ল—

সখী (দেখিতে দেখিতে): দাঁড়াও বাপু—অত দৌড়ো না—এই All eye, আর thrilled hues তো হ'ল স্পণ্ডে পর্ব্ব। All that টা হ'ল ট্রোকে—কিন্তু রোসো গোড়ার পর্ব্বেই আয়াম্বিকে অনেক সময়েই থাকে না কি ট্রোকের পর্ব্ব সেটা কই?

রসিক (প্রীত): হ্যাঁ—সেটা এখানে নেই বটে।

পবিত্র: সেটা কী রে? কী রে?

সখী: যেমন ধরো শেক্ষপীয়রের King John-এ

Life is | as te | dious as | a twice- | told tale
Vex ing the dull ear of a drowsy man

এখানে iambic base এ প্রথম পর্ব্বে ট্রোকের মডুলেশন। ট্রোকে সব চেয়ে বেশি আসে আয়াম্বিকে—এই ভাবেই সচরাচর এই প্রথম পর্ব্বে।

পবিত্র: আয়াম্বিক বে-স্? সে আবার কী পেল্লায় কাণ্ড?

রসিক (উষ্ণ): আঃ, বে-সও জানিস না ছাই?—না না রাগ করিস নে ভাই—ভুলে ভুলে। বেস্ হ'ল যাকে বলে পর্ব্বের সাধারণ বাঁধুনি। সাধারণতঃ শেষের পর্ব্বেই এটা দেখা দেয় ইংরিজিতে যেমন আয়াম্বিকে শেষের পর্ব্ব থাকে আয়াম্বিক, ট্রোকে তে—ট্রোকে, অ্যানাপেস্টে—অ্যানাপেস্ট।

সখী (পবিত্রকে) ঃ কেবল—ইংরিজি অমিত্রাক্ষর আয়াম্বিকে শেষ পর্ব্বে অনেক সময়েই আসে যাকে ওরা আরো বলত feminine ending, এখন বলে amphibrach অর্থাৎ short—long—short (পবিত্রকে) ঃ যেমন ধরো শেক্ষপীয়রের রোমিও জুলিয়েটে

One pain | is les | son'd by | a no | ther's anguish |

এখানে শেষ পর্ব্বটা হ'ল অ্যাম্ফিব্র্যাখ। বুঝলে ?

পবিত্র (মাথা চুলকাইয়া করুণ স্বরে) ঃ বুঝেছি।

রসিক (আরও প্রীত) ঃ আর এখানে দেখ, শ্রীঅরবিন্দের আয়াম্বিকে

Is a pale হচ্ছে অ্যানাপেস্‌ট্‌ tier vi— এ-ও।

আবার sion. Not তথা nor the হ'ল পিরিক্‌।

সখী ঃ বলবে কি ঠাকুরপো যে এত রকম বৈচিত্র্য বাংলা প্রস্বনী আয়াম্বিকেও মডুলেশন হিসেবে আসতে পারে ?

রসিক (একটু ভাবিয়া) ঃ কিন্তু আমি যে-প্রস্বনী ছন্দের প্রবর্ত্তন চাইছি—বা যেটা হঠাৎ আমার মাথায় বিজ্‌লির মতন ঝিলিক দিয়েছে সেটা তো আস্ত ইংরিজি অ্যাকসেন্টের মাছিমারা অনুকরণ নয় বৌদি। তাই তার এ ধরণের আয়াম্বিক বা অ্যানাপেসটিক বেস সব সময়ে না-ও থাকতে পারে। তাই মডুলেশন বলতে ইংরিজি কাব্যে যা বোঝায়—

সখী ঃ দৃষ্টান্ত ঠাকুরপো, দৃষ্টান্ত। এসব ব্যাপারে পুনরুক্তি twice-told tale-এর মতন টীডিয়াস হয় না—এখানে বাহুল্যই হ'ল আর্ট—সেরা আর্ট। মনে নেই clive Bell-এর কথা—ঐ যে তোমার শেলফেই রয়েছে তাঁর Civilization বইখানা। (টানিয়া লইয়া পাতা উলটাইতে উলটাইতে) ঃ বেল্‌ সাহেব বলেছেন খাঁটি কথা—যারা পুনরুক্তি-বিরোধী তাদের ঠেশ দিয়ে এই যে—(পড়িলেন) ঃ "Because I wish to be understood . . . . I shall repeat myself . . . to say the same thing over and over again is the only way to convince." (থামিয়া সব্যঙ্গ হাস্যে) ব'লে সাহেব সিনিক ঢঙে বলছেন ঃ "when I was younger, being rather silly about my fellow-creatures, I used to believe that to convey to them one's meaning one had only to state it clearly and once." না, একথা না মেনে আর্টিস্টদের ঢঙে ভান করো তুমিও যে, প্রতি পাঠকরাই বুদ্ধিমানের শিরোমণি, কাজেই একটি কথা একবার ছেড়ে দেড়বারও বলা মারাত্মক অপরাধ ?

রসিক (হাসিয়া) ঃ না বৌদি, বলি না। বলি রসিক যে শুধু নির্জ্জলা আর্টিস্ট এ-অপবাদ তার অতি বড় শত্রুও তার নামে রটায় না—I am an unabashed propargandist ; বার্ণার্ডশ তাঁর সেদিনকার নাটক "On the Rocks"এর ভূমিকায় যা লিখেছেন তার সঙ্গে আমার পূর্ণ সায় আছে ঃ যে, "All great Art and literature is propaganda" তফাৎ এই যে

গড়পড়তা প্রপাগাণ্ডিষ্টরা জানে না প্রচারের গুহ্য তত্ত্বটি—যেখানে শিল্পী প্রচারকরা জানেন। তাছাড়া আমার মধ্যে কবি গাইয়ে ছন্দী রঙ্গী ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক আছে ব'লেই যে কেন শুধু প্রপাগাণ্ডিষ্টকেই আর্টের দোহাইয়ে গলা টিপে মারব তা আমি ভেবেই পাই নে। তাই পুনরুক্তিতে আমি ডরাই নে। এমন কি পুনরুক্তিতে আমার ধমনীতে রক্তস্রোত বেশি দ্রুত বয়—ঐ উৎসাহেরই দাপটে। তাই চিন্তাশীল হোমস্ সাহেবের কথায় সায় দিয়ে আমি হরদমই ব'লে থাকি:

কথা আমার নয় তো রে ভাই ডাক টিকিটের পারা:
একটি বারের বেশি ব্যভার করলে যে যায় মারা।
পুনরুক্তি করতে যেজন শিখল না হায় হেথা:
বেচারী সে-ই—হয় নি আজো দুরন্ত তার কেতা।
সত্য ব'লে মানি যাদের—বন্ধু তারা—সাথী:
রং তুলি রয় শিল্পী-সহায় যেমন দিবারাতি।
একবার এদের আঁকতে না হয় হ'লই ব্যবহার:
তা ব'লে কি সে সব কাজে লাগবে না কো আর?
গল্পালাপের পুনরুক্তি নয় ভালো—তা মানি,
কিন্তু কোনো ভাব বারবার তুলবই বাখানি,—
শতোক্তিরও পরে যদি দেয় দেখা সে-পথিক
নবীন পথের নতুন ছোঁয়াচ বিলিয়ে—রঙীন, রসিক।*

সখী (হাসিয়া): বেশ বলেছেন হোম্‌স্ সাহেব। কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে কি ঠাকুরপো! দৃষ্টান্ত বার করো প্রচুর তবে তো লোকে মানবে। শুধু ব্যাখ্যা না—হাতে কলমে ক'রে দেখাও আরো, তবে তো।

---

* You don't suppose that my remarks are like so many postage-stamps, do you, each to be only once uttered? If yon do, you are mistaken. He must be a poor creature that does not often repeat himself…why, the truths a man carries about with him are his tools; and do you think a carpenter is bound to use the same plane but once to smooth a knotty board with, or to hang up his hammer after it has driven its first nail?, I shall never repeat a conversation, but an idea often… A thought is often original though you have uttered it a hundred times. It has come to you over a new route, by a new and express train of associations....O. W. HOLMES.

রসিক: দেখাচ্ছি বৌদি। সুবিধে হয়ে গেছে এই যে, পয়লা নম্বর: রসিককে প্রস্বনী ছন্দে কবিতায় যোগান দিচ্ছেন: বীনাপাণি, দোসরা: নিশিকান্ত ও তেসরা: দিলীপ। কাজেই তোমাদেয় যদি ধৈর্য্য থাকে তবে আমার দৃষ্টান্তর না খাটো হবে বহর, না সংখ্যা।

পবিত্র: আচ্ছা আচ্ছা বক্তিমে ঢের শুনেছি, দেরি হয়ে যাচ্ছে, বার কর্ তোদের থ্রি মাস্কেটিয়ারের প্রস্বনী রোমান্স।

রসিক (হাসিয়া): বেশ বলেছিস। কেবল ধৈর্য্য ধরে শোন্ এখন। (খাতা খুলিয়া) মনে রেখো যুগ্মধ্বনি হল প্রস্বনিত—যাকে ইংরাজিতে বলে long আর অযুগ্ম-ধ্বনি হল অপ্রস্বনিত বা unstressed যাকে ইংরিজিতে বলে short এবার শোনো। নিশিকান্তের ট্রোকে ড্যাক্টিল আমফিব্র্যাক মডুলেটেড কবিতা:

জল্ উ | চল্ তটি | নীর্ প্রাণে,
কুল্ আ কুল্ কুলু কুল্ গানে,

মধুর্ কি | সুর্ আনে,
শ ত উ | তল্ তানে।

কোন্ কনক আভরণ লভি
লোক আলোক অপলক রবি
গগন মগন কবি
আঁকে সোনার ছবি!

কোন্ প্রপাত পুলকের সাথে
আজ প্রভাত কী খেলায় মাতে!
কিরণ-লিখন-পাতে
নব-বিকাশ গাঁথে!

দোল দোদোল সমীরণ দোলে,
ঘুম কুসুম ঢুনয়ন খোলে,
সুবাস উছাস তোলে
ভোলে আপন ভোলে!

আজ আমার নিশি শেষ ক'রে
সব আঁধার কে যে লয় হ'রে
জাগর সাগর ভ'রে
শত লহর ধ'রে।

সখী: কী ভাবে ঠিক পড়তে হবে একে? এর বেস বুঝি নেই বলছিলে?

রসিক: না নেই। তাই এছন্দে ইংরিজি কবিতা—দস্তুরমতন—বা-কায়দা—হয় না। কিন্তু তবু হয় মানে অবশ্য প্রতিভার হাতে

সখী: যথা? তুমি নিজে? (ব্যঙ্গ হাস্য)

রসিক: বাপ্ রে—এছন্দে ইংরেজি কবিতা লিখব আমি—যাকে স্বয়ং শ্রীঅরবি বলছেনন্দ বলছেন "কঠিন"—এছন্দে কবিতা রচনা করবার সময়ে?

সখী (উৎসুক): এছন্দে তিনি রচনা করেছেন নাকি কিছু? দেখি দেখি?

রসিক (খাতা খুলিয়া): এই দেখ। হুবহু:

যদিও মিল নেই। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন দিলীপকে যে এছন্দে সমিল কবিতাও একটি রচনা করেছেন। কিন্তু সে যাক্ এটাই শোনো তো আগে মন দিয়ে:

Winged with | dangerous | deity,
Passion | swift and im | placable
Arose and | storm-footed
In the dim | hearts of him,
Ran, in | satiate, | conquering,
Worlds de | vouring and | hearts of men
Then perished | broken by
The irre | sistible
Occult | masters of | destiny,—
They who | sit in the | secrecy
And watch un | moved ever
Unto the | end of all.

কিন্তু এর চেয়েও একটা ভালো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—প্রস্বনী ছন্দের অ্যাকসেণ্ট কি রকম হুবহু মিলতে পারে ইংরিজি অ্যাকসেণ্টের সঙ্গে। নিশিকান্তের একটি ছন্দ থেকে দিলীপ একটি একটি সনেট লেখে ;—নিশিকান্ত ঃ

"রক্তরাগ্ | সন্ধ্যার্ | তনু | মঞ্জরা"

এইছন্দে একটি কবিতা লেখে। দিলীপ তার অনুকরণে একটি সনেট লেখে ঃ

বন্ধহীন্! | অম্বর্ | তব | চাই মহান্!
শক্তিদাও অন্তর্ তাহে র ঞ্জিতে
ব্যাপ্তিময়! ডঙ্কের তব চাই নিশান
কণ্ঠে মোর মূর্চ্ছন তারি ঝ ঙ্কৃতে
গন্ধাধিপ! | উৎপল | ত ব | নীল উছল
বিশ্বমন রংহীন— তারি রূপ সুবাস
আজবিছাও.........স্পর্শের তব মন্ত্রবল
আজ জাগাক পঙ্গুর বুকে দীপ্রাকাশ।
ছন্দরাজ! শিঞ্জন তব ছন্দিব ঃ

তাল শিখাও— নৃত্যের বরে খণ্ডিয়া
শৃঙ্খলের যন্ত্রণ যত— মন্দ্রিব
সিন্ধুলার মন্ত্রণ অভিনন্দিয়া।
সুরবিহীন জর্জ্জর তমো-লুপ্তি চাই ঃ
নিদ্রালীন মন্থর প্রেম-মুক্তি চাই। (× দাগ দিলেন)

সখী ঃ এখানে তাল দাও বুঝি × মাত্রার ওপরে ? কিন্তু সব লাইনে দাও দাগ আগে।

সসিক ঃ এই যে (দাগ দিলেন ×) যুখধ্বনির 'পরে বরাবর ঃ

× × × × × ×

বন্ধহীন্ | অম্ বর্ | তব | চাই মহান্

এই ঝোঁকটা মনে রাখলে শ্রীঅরবিন্দের Thought the Paracleteএর ছন্দটার সঙ্গে এর সাদৃশ্য—হুবহু নাহোক্ অনেকখানি বুঝবে যথা ঃ

Past the long | green crests | of the | seas of life
Flew my thought | self-lost | in the | vasts of God

এই দাগগুলো দেখ—(আবার সমগ্র কবিতাটি পড়িলেন) ঃ

THOUGHT THE PARACLETE

As some bright archangel in vision flies
Plunged in dream-caught spirit immensities,
Past the long green crests of the seas of life,
Past the orange skies of the mystic mind
Flew— my thought self-lost in the vasts of God.
Sleepless wide great glimmering wings of wind
Bore the the gold-red seeking of feet that trod
Space and Time's mute vanishing ends. The face
Lustred, pale-blue-lined of the hippogriff,
Eremite, sole daring the bourneless ways,
Over world-bare summits of timeless being
Gleamed ; the deep twilights of the world-abyss
Failed below. Sun-realms of supernal seeing,

Crimson-white mooned oceans of pauseless bliss
Drew its vague heart-yearning with voices sweet.
Hungering large-souled to surprise the unconned
Secrets white-fire-veiled of the last Beyond,
Crossing power-swept silences rapture-stunned,
Climbing high far ethers eternal sunned,
Thought the great-winged wanderer paraclete
Disappeared slow-singing a flame-word rune.
Self was left lone, limitless, nude, immune.

—Sri Aurobindo

সখী : কী সুন্দর মিল সত্যি, বাংলা ও ইংরাজী ছন্দ দুটোয় !

পবিত্র : আর তার চেয়েও আশ্চর্য্য কিন্তু এই বাংলা ছন্দ থেকে ইংরাজী ছন্দটা সৃষ্টি করা।

রসিক : সত্যি। আর এথেকে প্রসঙ্গত একটা কথা বলি বৌদি। যাঁরা বলেন কোনো বিশেষ ছন্দে কবিতা লিখব ব'লে বললে তা কবিতা হয় না তাঁরা প্রমাণ করেন শুধু একটি কথা।

সখী : কী ?

রসিক : যে, তাঁদের সে-প্রতিভা নেই।

পবিত্র : মানে !

রসিক : মানে যাঁর প্রতিভা সত্য তিনি এ পারেন। শ্রীঅরবিন্দের মতন এত বড় প্রতিভার কথা বলছি না—তাঁর চেয়ে ঢের ছোট প্রতিভারও এ পারে—কেবল প্রতিভা হওয়া চাই।

(আর দুই সংখ্যায় সমাপ্য)

অস্পৃশ্যতা কাজে মালাবার ভ্রমণ

শ্রীউর্ম্মিলা দেবী

৫

রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না। গরমে বেশ কষ্ট হ'ল। সকালে উঠে মোটর ক'রে কালিকাট সহর ঘুরে আসা হ'ল। ছোট সহর দেখার বিশেষ কিছু নেই। মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অনেক বিষয়ে বড্ড পেছিয়ে আছে। শ্যামজী ভাই প্রতিষ্ঠিত খাদি ভাণ্ডার প্রদর্শন ক'রে সাগর তীরে বেড়াতে যাওয়া হ'ল। ভাল লাগল না। কালিকাট একটি বন্দর। মালের আমদানী ও রপ্তানী ব্যাপারে সাগর তীর বড় নোংড়া। সে সময়ে যাতায়ত বেশী নেই। তবে আরব্য মহাসাগর দেখা গেল এই যা। বেলা ৪টার সময় আমরা ভেলাঞ্চেরী (velanchari) রওনা হ'লাম। ৫০ মাইল রাস্তা দুঘণ্টায় অতিক্রম ক'রে ছ'টার সময় সভা স্থানে উপস্থিত হ'লাম। এই রাস্তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রবল বৃষ্টির জন্য তেমন উপভোগ করা গেলনা। মাধবন নায়ারের মুখে শুনে ছিলাম এই স্থানটি সবর্ণদের দুর্গ। ভয় ছিল হয়তো সভা জমবেনা বা কোন বিরুদ্ধ আচরণ অনুষ্ঠিত হ'বে। কিন্তু সভায় অনেক লোক সমবেত হ'য়েছিলেন। একজন নাম্বুদ্রি (ব্রাহ্মণ) ভদ্রলোক সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রলেন। গ্রাম বাসীদের তরফ থেকে একটা অভিনন্দনও পেলাম। যেখানে গালাগালির আশা করে ছিলাম সেখানে অভিনন্দন। মন্দ কি; আমিত আমার সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে তাদের প্রাণ স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম। আমার বক্তব্য শেষ হ'লে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করলাম। কারু মুখে বিরক্তি বা বিদ্রূপের চিহ্ন না দেখে মনটা শান্ত হ'ল। মাধবন নায়ার এসে বল্লেন "আপনার কথা গুলী এরা বেশ ভাল ভাবেই নিয়েছেন।' (your speech has been very well received") আমরা নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে ট্রেণ ধরে রাত্রি ১০টায় কালিকাটে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে শ্রীযুক্তা কস্তুর বাইয়ের পৌছবার কথা। তাঁকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করার আয়োজন হ'চ্ছিল। এবার আমিও তাদের একজন। শ্যামজী ভাই জিজ্ঞাসা ক'রলেন "আপনি ষ্টেশনে যাবেন তো?" আমি বল্লাম "নিশ্চয়"। একটু শ্রান্ত হয়েছিলাম—মহাত্মাজীর নিকট পত্রে সমস্ত দিনের কাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ ক'রে শয্যায় গা ঢেলে দিলাম। সকালে মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দু" কাগজের রিপোর্টার দেখা ক'রতে এলেন। তার উপর আদেশ হয়েছিল প্রত্যহ সমস্ত সংবাদ বিস্তারিত ভাবে রিপোর্ট করার জন্য। আমি তাঁকে অনুরোধ জানালাম আমার কথা গুলী যেন আমাকে একবার দেখিয়ে পাঠান হয়। সংবাদ পত্রের রিপোর্টারদের আমি বেশ জানি। আগামাথা কেটে একটা কিম্ভুত কিমাকার কিছু তেরি ক'রে পাঠাবে। তারপর এর কৈফিয়ত দিতে দিতে হয় তো আমার প্রাণ যাবে। তিনি প্রতিশ্রুত হয়ে বিদায় নিলেন। আমার টাউন হলের বক্তৃতা জিতেন সংক্ষেপে লিখে দিল।

বেলা ১১টায় আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত থেকে শ্রীযুক্তা কস্তুর বাইকে অভ্যর্থনা করে বাড়ী নিয়ে এলাম। সেই দিন বিকেলে Women's Indian association (ভারতীয় নারী সভা) থেকে অভিনন্দন গ্রহণ করার জন্য আমাদের উভয়ের নিমন্ত্রণ ছিল। শ্রীযুক্তা কস্তুর বাইকে ও আমাকে হিন্দী ভাষায় লেখা অভিনন্দন দেওয়া হল। আমরা উভয়ে যথারীতি তার উত্তর দিলাম। প্রারম্ভে ছোট ছোট একদল মেয়ে 'মালায়লম' ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গাইল। এবং সভা শেষ হ'ল আমাদের বাঙ্গলা দেশের গৌরব রবি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দেমাতরম্' গান দিয়ে। এই সুবিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত এখন আর বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব নহে। সমস্ত ভারতবর্ষময় এখন এই গীত লোক মুখে ধ্বনিত হ'চ্ছে।

২. ১১. ৩২

আজ সকালে বিশ্রাম। বিকেলে এখানকার একটি কংগ্রেস কর্ম্মী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হাসপাতাল দেখতে যাওয়া হ'ল। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে আঘাত প্রাপ্ত স্বেচ্ছা সেবকদের জন্য একটি ভদ্রলোক একান্ত চেষ্টায় ও উদ্যমে এটি স্থাপন করেছিলেন এবং প্রায় একার চেষ্টায়, ভিক্ষা দ্বারা এটি পরিচালন করছিলেন। স্থানীয় লোকেরা কিছু কিছু অসুধ পত্র দিয়ে সাহায্য করেন বটে, কিন্তু দ্বারে দ্বারে নিত্য ভিক্ষাই এর প্রধান সম্বল। ছোট্ট একতলা একটী বাড়ী তিনটি ঘরে ৯টী কি ১০টী বেড়া। ভদ্রলোকটি দিন রাত্রি এখানে পড়ে থেকে রোগীর সেবা করছেন। আমরা যখন দেখতে যাই তখনও ৩।৪ টি রোগী সেখানে ছিল। অধুনা নিষ্প্রয়োজনে এটি উঠে গেছে। সেখান থেকে সমুদ্রতীরে একটু বেড়িয়ে আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। এটাও মহাত্মাজীর অন্যতম আদেশ। সম্ভবমত প্রতিদিন কর্ম্ম অবসানে একটু বেড়ান শরীর রক্ষার্থে। বাড়ী এসে জিনিষ পত্র গোছ গাছ ক'রে রেখে আমরা শুয়ে পড়লাম। প্রত্যুষে গুরু বায়ুর অভিমুখে রওনা হওয়া ঠিক ছিল।

২. ১২. ৩২ ৬

খুব ভোরে উঠে রওনা হ'লাম। শ্রীযুক্তা কস্তুর বাই, তাঁর সঙ্গিনী বেলাবেন, ও আশ্রম বাসী বালক শ্রীমান চাল, আমি, জিতেন, শ্রীযুক্ত গোপাল মেনন ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী নারায়নী, শ্রীযুক্ত শ্যামজী সুন্দর ভাই ও তাঁর ভগ্নী, শ্রীযুক্ত মাধবন নায়ার ও ৩.৫ জন কর্ম্মী। ম্যাঙ্গালোর থেকে কর্ণাটক নেতা শ্রীযুক্ত সদাশিব রাও প্রভৃতি ১৩।১৪ জন যাত্রী আমরা গুরু বায়ুর বিজয় অভিজানে প্রবৃত্ত হ'লাম। কালিকাট থেকে ট্রেণে পাট্টাম্বি নামক স্টেশন পর্য্যন্ত গিয়ে, নৌকায় খাল পার হ'য়ে গুরুবায়ুর গ্রামে যেতে হয়। কালিকাট ছাড়িয়ে প্রত্যেক স্টেশনে পুষ্প চন্দন ও নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য নিয়ে বিপুল জনতা আমাদের অভ্যর্থনা ক'রতে এল। ফুলে ও খাবারে ট্রেণের কামরা বোঝাই হয়ে গেল—শব্দে কানে তালা ধরে গেল। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে কোন একটা ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী হলেই হৃদকম্প উপস্থিত হ'তে লাগল। কিন্তু উপায় কি? এ সব ভিখারী নয় যে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেব। দূর দুরান্তর থেকে এরা এসেছে আমাদেরই প্রীতি ভিক্ষা দিতে।

কাজেই সহ্য করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিলনা। তার পর এক মাস প্রতিদিন সহ্য ক'রে ক'রে অভ্যাসও হয়ে গেল। আর তেমন কষ্ট হ'ত না। শ্রীযুক্তা কস্তুর বাই এর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার একদিন খুব তর্ক হ'ল। আমি তাঁকে বল্লাম "এরা আপনাকেই দেখতে আসে। আপনি আবার আমায় জড়ান কেন? আমি আবার একটা কি, যে লোক আমায় দেখতে আসবে?" তিনি তা মোটেই মানতে রাজী হ'ল না। শেষে শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী মীমাংসা ক'রে দিলেন। তিনি বল্লেন "আপনাদের দুজনকেই দেখতে আসে। ৺দেশবন্ধুর নাম মাদ্রাজ প্রদেশের ঘরে ঘরে পূজিত। আপনি তাঁর বোন, সুদূর বাঙ্গলা দেশ থেকে কষ্টক'রে এসেছেন এদের মধ্যে কাজ ক'রতে। এরা সে জন্য আপনাকে দর্শন করতে আসে"। আমি ভাবলাম হবে ও বা। সেই অবধি যেখানে যত সম্মান, যত অভ্যর্থনা, যত অভিনন্দন পেয়েছি সবই আমার ৺পূজনীয় অগ্রজের চরণে মনে মনে নিবেদন ক'রেছি। মনটা হালকা হ'য়ে গেছে।

পাট্টাম্বি ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানীয়স্কুল গৃহে ছোট সভার আয়োজন হয়ে ছিল। সময় সংক্ষেপ ব'লে অভিনন্দন ও বক্তৃতার পালা যথাসম্ভব শীঘ্র সেরে নেওয়া গেল। ছোট খেয়া নৌকায় ২।৩ বারে খাল পার হ'য়ে মোটরে উঠে বসলাম। একখানা মোটর ও একখানা মোটরবাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী পাট্টাম্বি ষ্টেশনে আমাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ছিলেন। তিনি, কস্তুর বাই, আমি ও নারায়নী মোটরে, ও অন্যান্য সকলে বাসে রওনা হ'লাম। দীর্ঘ পথ-প্রায় ৪।৫ টি গ্রাম অতিক্রম ক'রতে হ'ল। প্রত্যেক গ্রামেই একবার ক'রে গাড়ী থামিয়ে মালা চন্দন গ্রহণ ক'রতে হ'ল। অনেক জায়গায়ই জনতা দেখলাম কিন্তু সব জায়গায় গাড়ী থামান হ'ল না। তারা জয়ধ্বনি দিয়েই তাদের হৃদয়ের অভিনন্দন আমাদের জানিয়ে দিল। এই সব দৃশ্য দেখে স্বতঃই মনে হ'ত অস্পৃশ্যতা ব্যাপার নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছে। নইলে আমরা এত দিনের একটা বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে কাজ করতে এসেছি—ওরা কি এমন ভাবে আমাদের গ্রহণ করতে পারত?

একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম এটা প্রায় খ্রীষ্টানদেরই গ্রাম। অনেক দূর বিস্তৃত এই বসতি। প্রায় ১৫০ ঘর হবে। এরা নাকি নিজেদের সিরিয়ান কৃশ্চান (syrian christians) বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু এদের চেহারা দেখলেই বেশ বোঝা যায় এরা syria থেকে মোটেই আসেনি। এরা প্রকৃত পক্ষে মালাবারের অস্পৃশ্য জাতি। সামাজিক অত্যাচারে হিন্দু সমাজ থেকে ছিট্‌কে বেড়িয়ে গেছে। এরা নাকি প্রায়ই ২।৩ পুরুষে খ্রীষ্টান। মালাবারের মোপলাদের মধ্যেও অনুসন্ধান ক'রলে জানা যায় তাদের অনেকের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন।

এই সব নানা কথা চিন্তা ক'রতে ক'রতে কেমন যেন তন্ময় হ'য়ে পথ চলেছি। সহসা একটা বিকট আওয়াজ কাণে এল। সচকিত হ'য়ে উঠতেই শুনলাম নারায়নী বলছে "এই যে একজন নায়াডি যাচ্ছে"। আমি উৎসুক হ'য়ে চেয়ে দেখি একটা মাঠের পাশ দিয়ে মোটর চলছে—নিকটে কোনও মনুষ্য বসাবাস

চিহ্ন নেই। সেই মাঠের মধ্যদিয়ে অনেক দূরে একটি মানুষ দুই হাত উঁচু করে মুখে একটা বিকট শব্দ ক'রতে ক'রতে চলেছে। জটা পাকান চুল গুলা পিঠে এসে পড়েছে, সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় রোম, কাদা মাটি মাখা অঙ্গে বসনের বালাই নেই বললেই হয়। হঠাৎ দেখে বনমানুষ ব'লে ভ্রম হয়। আমার মনটা ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। নারায়নীর হাত চেপে ধরে বলে উঠলাম "মোটর থামাও" কিন্তু বাধাহীন খোলা রাস্তা পেয়ে তখন মোটর ঘণ্টায় ৪০ মাইল চলেছে। আমার কথার অর্থ ওরা বুঝতে না বুঝতে মোটর সেই নিদারুণ দৃশ্য অদৃশ্য হ'য়ে গেল! এখনও সেই দৃশ্য আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে আছে! আমার ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বলি, "বন্ধু! তুমি পশু নও-তুমি আমাদেরই মত মানুষ! তুমি অমন করে নিজকে ছোট কোর না। এই ভারতবর্ষে আজ একজন মহাপুরুষ জন্মেছেন। তাঁর হৃদয় তোমাদের জন্য প্রতি নিয়ত কাঁদছে। ভয় নেই বন্ধু! তোমাদের আর ভয় নেই। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা মানুষের অধিকার পাবে। আর মুখ ঢেকে, নিজেকে লুকিয়ে জীবন পথে চলতে হবে না।" কিন্তু ইচ্ছা কাজে পরিণত হ'ল না। মনে আছে মনটা বিষাদে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। গুরুবায়ুর পৌঁছা পর্য্যন্ত আর কিছু ভাল লাগেনি।

বেলা ১১টার সময় আমরা গুরুবায়ুর গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামটি ছোট, কিন্তু মন্দির অত্যন্ত বিখ্যাত—দেবতা বড় জাগ্রত। সমস্ত মাদ্রাজ প্রদেশে এর প্রভাব। বহুদূর, দুরান্তর থেকে এখানে যাত্রী আসে পূজা দিতে। শান্তি, স্বস্ত্যয়ণ, বিবাহের মঙ্গলাচরণ, পুত্রের অন্নপ্রাশণ ইত্যাদি উপলক্ষ ক'রে নিত্য বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এই মন্দিরে অবর্ণদের প্রবেশাধিকার নিয়ে বর্ত্তমানে আন্দোলন চলছিল। আমরা মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী এক গৃহস্থের গৃহে অতিথি হ'লাম। গুরুবায়ুর মন্দির দর্শন ক'রে যাওয়ার কথা মহাত্মাজী ব'লে দিয়েছিলেন। এখানে আমাদের তিন দিন থাকার কথা—কাজেই তাড়া কিছু ছিলনা আহারাদির পর বিশ্রাম আর হ'লনা।

সমস্ত দিন দলে দলে স্থানীয় নারীরা দেখা ক'রতে এলেন। বেলা তিনটের সময় সংবাদ এল, গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে অনেক মেয়ে জমা হয়েছেন-তাঁদের নিয়ে ছোট সভা করতে হবে। যদিও সন্ধ্যায় বৃহতী সভার আয়োজন ছিল, কিন্তু একাজে এখানকার মাতৃ জাতির মন বিশেষ ক'রে স্পর্শ ক'রতে হবে। তাই অনুরোধ অবহেলা করা গেল না। এই সভায় নারায়নী আমার অনুবাদ কারিণীর কাজ ক'রে দিল। সভাশেষে শ্রোতাদের মুখ ভাব বড়ই আশাপ্রদ বলে মনে হ'ল। কারু কারু চোখে জলও দেখলাম। মালাবার বাসীদের মনগুলি সহজ সরল-হৃদয়গুলি করুণারসে, প্রেমে প্রীতিতে ভরপুর। কিন্তু অস্পৃশ্যতার আকার সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এখানেই সব চেয়ে বেশী ভয়াবহ। এই অসামঞ্জস্য কথা ভেবে প্রথম প্রথম আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতাম। কিন্তু পরে এর মীমাংসা আমি মনের মধ্যে পেয়েছিলাম। মাদ্রাজ প্রদেশে ধর্ম্মভাব বড় প্রবল অন্ততঃ ধর্ম্মের বাহিরের প্রকাশ খুব বেশী। কোন দেবমন্দিরের ২।৩ মাইল রেডিয়াসের মধ্যে বাস করেন,

এইরূপ নর নারী প্রায় তিন ভাগ প্রত্যহ দেব দর্শনে যান। শাস্ত্র বচন নির্ব্বিচারে পালন করেন জীবনের প্রত্যেক খুঁটি নাটি বিষয়ে। এদেশে 'আগম' শাস্ত্র প্রচলিত। মন্দিরগুলি পর্য্যন্ত শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। মন্দিরগুলি এক একটি দুর্গ বিশেষ। দেওয়ালগুলি আকাশ চুম্বী। এরকম আটটি দেওয়াল বিশিষ্ট 'প্রাকারম্' দ্বারা দেবতা সংরক্ষিত। দেবতার শুচিতা রক্ষার এই আয়োজন দেখলে অবাক হ'তে হয়। সর্ব্বশেষ প্রাকারের মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতের প্রবেশ নিষিদ্ধ। গর্ভগৃহে বিশেষ শ্রেণীর পূজারী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণেরও প্রবেশাধিকার নেই। অবর্ণদের মন্দির সংলগ্ন রাজপথ দিয়ে চলারও অধিকার নেই।

এই শাস্ত্রানুসরণের মধ্যে যে কোন রকম হৃদয় হীণতা আছে তা এরা কল্পনাও করে না। সময়ে সময়ে যারা মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে তারাই সমাজ ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়েছে প্রতিকারের উপায় করতে না পেরে। সেইজন্য মালবারে মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সংখ্যা এত বেশী; এতে যে হিন্দু সমাজের কি ক্ষতি হ'য়েছে, দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে দিন দিন যে কি হীন বল হ'য়ে পড়ছে সে কল্পনা করার শক্তি এদের নেই। শাস্ত্র নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছে সুতরাং নির্ব্বিচারে এক শ্রেণী এই অত্যাচার করছে ও অন্য শ্রেণী তা মাথা পেতে নিয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করছে। এ সমস্ত দেখেই এ ধারণা বদ্ধমুল হয় যে আমাদের এই সহনশীলতাই আমাদের সমস্ত দুর্দ্দশার মূল কারণ। তাই আমরা আজ ঘৃণিত পদ দলিত দাস জাতি।

মহাত্মাজী প্রথম মালবার ভ্রমণের সময়ই এদের মনে খটকা লাগিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। তাই আজ সবর্ণরা এ বিষয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন অবর্ণদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ক্রমশঃ

সত্য না মিথ্যা

শ্রীমানকুমারী সান্যাল

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রু বলিল—"এখন কেমন আছ, বৌদি?"

ত্যক্তকণ্ঠে সরমা উত্তর দিল,—"ভাল না, কতবার করে বোল্‌বো?"

অপ্রতিভভাবে অশ্রু, বৌদির শিয়রে বসিয়া পাখা নাড়িতে লাগিল। দীর্ঘরোগ শয্যায় শায়িতচিত্ত যখন একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া ওঠে, তখন সে শুধু কুশলপ্রশ্নে ক্ষেপিয়া যায়। অশ্রু তাহা বুঝিয়া ও সংযত হইতে পারে না।

"ঠাকুর ঝি?"

"কী বৌদি" বলিয়া অশ্রু মুখখানা ঝুঁকাইতেই সরমা বলিল, "রাগ করলি ভাই?" অল্প হাসিয়া, অশ্রু মুখ তুলিয়া বলিল, "বারে! রাগ কর্‌তে যাব কেন শুধু-শুধু? মলিন ঠোঁটে একটু সুমিষ্ট হাসিভরিয়া সরমা বলিল—"এই, আমরা তোর বিয়ে দিচ্ছি না বলে?" অশ্রু নীরবে হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সরমা পুনরায় বলিল—"সত্যি ভাই! বল্‌তো কোন্‌ পাপে এমনকরে আজ ভুগে মর্‌ছি? সেই যে যতু হবার পর বিছানা নিয়েছি,—সেতো আজ দু'বছরের ওপর হোয়ে গেল—তবু সারবার নামটী নেই।" তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল—"যত খারাপ অবস্থাই আজ আমাদের হোক্‌না—আমি যদি সুস্থ থাক্‌তাম, তাহ'লে তো আমাদের সুখের সংসার। তোর মত ননদ নিয়ে ত সুখের ঘর পাত্‌তুম রে?"

অশ্রু সরমার কথার সূত্র ধরিয়া ভাবিতেছিল, সেই তিনবছর আগেকার হারাণো স্মৃতি। তখন ছিল কলিকাতায় প্রকাণ্ড ভাড়া বাড়ী, স্কুল, স্নেহময় পিতা, কল্যাণময়ী জননী ও ভ্রাতৃজায়া। হঠাৎ যেন দম্‌কা ঝড়ে সব কোথায় কী উড়িয়া গেল। পিতার সহসা মৃত্যুর সঙ্গে—সঙ্গে চলিয়া গেল, অফুরন্ত খরচের হাত। কলিকাতার এই ক্ষুদ্র বাড়ীখানি ভিন্ন, আর কিছুই তিনি রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাহা কিছু ছিল—এক বছরের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। সৌভাগ্যবতী জননী হাসিতে হাসিতে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মিলাইয়া গেল দাদার বিলাত যাওয়ার স্বপ্ন, ঘুচিয়া গেল তাহার লেখাপড়ার আশা। তাহার উপর দৈবের চরম পরিহাসে যতু হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদি পড়িল এই কঠিন অসুখে। দাদা কলেজ ছাড়িয়া, কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া লইয়া, ভাড়া বাড়ী ছাড়িয়া, নিজের ছোট বাড়ীতে আসিল। এক কথায় চাকা গেল ঘুরিয়া! সঙ্গে সঙ্গে দাদার মুখের হাসি ও চিত্তের শান্তিটুকুও হরণ করিয়া, কোন অদৃশ্য হস্ত পলায়ন করিল। তাহার পর হইতে চলিয়াছে এই দারিদ্র্যময়

সংসারের কঠোরতা! নিঃশ্বাস ফেলিয়া অশ্রু উঠিয়া পড়িল—"তোমার দুধটুকু নিয়ে আসি বৌদি ?" সরমা বলিল—"আচ্ছা সু! দাদা তোর মাইনে তো পায় তিরিশটী টাকা—তাও তিনি নিজেই সব কিনে কেটে দেন, তবু তুই রোজ দুধ পাস' কোথেকে বল্‌তো ?"

দুষ্টুমীমাখা অল্প একটু হাসিয়া অশ্রু বলিল—"অত কথা তোমায় বল্‌তে আমার দায় পড়েছে—" বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

রান্নাঘরে ঢুকিয়া অশ্রু কড়া হইতে এক পোয়া আন্দাজ দুধ ঢালিয়া লইয়া বৌদির কক্ষে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। সরমার অসুখ যে কী, তাহা হয়তো বড় ডাক্তারে দেখিলে বলিতে পারিত। কিন্তু ডাক্তার দেখাইবার মত সামর্থ্য আজ আর ইহাদের নাই। অশ্রু যদিও মুখে কিছুই প্রকাশ করে না, তবু তাহার বুকের মধ্যে দুর দুর করিয়া, কেবল যেন মনে হয় বৌদির 'থাইসিস্‌ই' দাঁড়াইয়াছে। অমন ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, তাহার উপর কাশি! কিন্তু বলিবার আছেই বা কে, আর বলিয়া লাভই বা কী?

কষ্টে উঠিয়া বসিয়া, দুধটুকু খাইয়া সরমা বলিল—"সু, তোরা খেয়েছিস ?"

"না—এই যাই—" বলিয়া অশ্রু বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিল—"যতু ব'লে টু!"

কিন্তু প্রত্যহের এ সঙ্কেতে আজ কোনও উত্তর না পাইয়া সে বাহিরের ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া, সুউচ্চ—স্বরে বলিয়া উঠিল—"ওমা, ওরে পাজী! এম্‌নি করে সে কালিটুকু মেখেছ ? আঃ—কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে—ঠিক্ ভুত্‌—" বলিয়া অপরাধভীত অবোধ ভ্রাতুষ্পুত্রের কোমল গণ্ডে, কালি বাঁচাইয়া একটা চুম্বন করিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। "বৌদি! দেখ, দেখ একবার তোমার ছেলের কীর্ত্তিকলাপ।"

সরমা পুত্রের গোলাপ পাপড়ীর মত হাতে ও পুষ্প-পেলব অঙ্গে ঘন কালির প্রলেপ দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ওকি মেখেছিস রে যতি ?"

যতী ওরফে যতীন্দ্র সমঝদার ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"তালি!"

"হ্যাঁ, তা অমন করে মেখেছ কেন ?"

যতী এবার একবার মা ও একবার পিসীমার মুখ ভাব দেখিয়া হাসিহাসিমুখে বলিল—"মেতেচি—"

"বেশ কোরেচ—" বলিয়া অশ্রু তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে কলতলায় লইয়া গেল। জল দেখিয়া যতী মহাখুশী হইয়া তড়বড় করিয়া কোল হইতে নামিয়া পড়িল,—এমন সময় বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দে অশ্রু বিস্মিত হইয়া বাহিরের ঘরের ভিতরে আসিল এবং আবার কড়া নড়িতেই বিপন্ন ও নিরুপায় ভাবে জান্‌লার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কে ?"

সাড়া পাইয়া পিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল। অশ্রু চিঠিটা হাতে লইয়া বলিল—"কোন চিঠি থাক্‌লে কড়া না নেড়ে জান্‌লা দিয়ে এখানে দিয়ে যেও।"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া পিওন পিছন ফিরিতেই, অশ্রু চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল। সহপাঠিনী কুন্তি লিখিয়াছে। একদিন আসিবে। অশ্রুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। অত ধনীকন্যা কুন্তীকে সে কী করিয়া অভ্যর্থনা করিবে? তাহার উপর দাদা হয় তো এ সংবাদে চটিয়া উঠিবে। সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু চিঠিটা সেমিজের ভিতর রাখিয়া দিল।

যতী মনের সুখে জল ঘাঁটিতেছিল,— অশ্রু তাড়াতাড়ি আসিয়া যতীকে স্নান করাইয়া দিয়া তাহাকে লইয়া খাইতে বসিল। আহারান্তে যতীকে বুকের উপর ফেলিয়া সে ঘরের দুয়ারের কাছে বসিল। মিস্ট বাতাস আসিতেছিল, এবং তাঁহার সহিত অশ্রুর সুমিস্ট কণ্ঠের গুন্ গুন্ গানে যতী শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। বৌদিও ওদিকে ঘুমাইয়াছে। সন্তর্পণে যতীকে বিছানায় শোয়াইয়া অশ্রু তাহার শিয়রে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা তাহার মনে উঁকি মারিতে লাগিল। অশ্রু ভাবিতেছিল—সেই কুন্তী! কত ভালবাসা দুজনের ছিল—ছিল কেন আজও তা আছে। কুন্তী এই দুবছরে কিছুই বদলায়নি। কাল সে আস্‌বে। যদি দাদা তখন বাড়ী থাকেন? কিন্তু দাদা বিরক্ত হোলেই বা উপায় কি। কুন্তীকে তো তার আস্‌তে বারণ করা যায় না?'

চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া অশ্রু উঠিয়া পড়িল। এঘর, ওঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া একটা বড় সাদা বাক্স হাতে লইয়া ছাতে উঠিল।

যে পাশের রোদটা সরিয়া গিয়াছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া, পাশের দোতালা বাড়ীর দিকে চাহিয়া, মৃদু-কণ্ঠে অশ্রু ডাকিল—'সই?' ডাকের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুরই সমবয়স্কা ১৭।১৮ বৎসরের একটী বধু বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই অশ্রুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—এই যে, সই, এতো দেরী?

মৃদুহাস্যে উত্তর না দিয়া অশ্রু বাক্সটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'এই নেও ভাই, তোমার সেলাই।'

বধুর নাম বিমলা। হাসিমুখে সে বাক্সটী খুলিয়া চারটী ছোট ছোট ইজের ও আট্‌টী পেনিফ্রক্ বাহির করিল এবং বলিল, "খুব সুন্দর হোয়েছে, সই।"

অশ্রু হাসিয়া বলিল—"তোমার সইয়ের তো সবই সুন্দর।"

"নিশ্চয়! তাকি একবার? দাঁড়াও"—বলিয়া বিমলা ঘরে ঢুকিয়া গেল এবং দু'মিনিট পরে বার আনা পয়সা আনিয়া অশ্রুর হাতে দিল। এ উপার্জ্জনের পন্থা বিমলাই অশ্রুকে শিখাইয়াছে। নিজেই সে নানা বাড়ী হইতে সেলাই চাহিয়া লইয়া অশ্রুর উপার্জ্জনের সাহায্যও করে। ছোট সেলায়ে এক আনা ও বড় সেলায়ে দু' আনা পারিশ্রমিক বিমলা ধার্য্য করিয়া দিয়াছে। এ খবর বিমলা ও অশ্রু ভিন্ন কেহই জানেনা। সরমাকেও অশ্রু জানায় নাই। তাহার চোখের অন্তরালে বসিয়াই সে এ কার্য্য সমাধা করিত।

বিমলা অশ্রুকে সত্যই ভাল বাসিয়াছিল। প্রথমদিন বিমলা অশ্রুকে ছাদে দেখিয়া, নিজেই ডাকিয়া ভাব করিয়াছিল ও 'সই' পাতাইয়াছিল এবং অশ্রুদের বাড়ী আসিয়া তাহাদের সাংসারিক অবস্থা কতকটা বুঝিয়া সাহায্য করিতেও চাহিয়াছিল কিন্তু তাহাতে অশ্রু বিস্মিতভাবে এমন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, যাহাতে বিমলা সেই দৃষ্টির ভিতর অশ্রুর লুকানো আভিজাত্যটুকু ধরিয়া ফেলিয়া, সে কথা আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করে নাই। পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া সেলায়ের পথ্‌টা ঠিক করিয়া অশ্রুকে বলিয়াছিল। কিন্তু সেলাই করিতে রাজি হইলেও পয়সা লইতে অশ্রু প্রথমে সম্মত হয় নাই। শেষে বিমলা যখন চোখের জল ফেলিয়া অভিমানভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল—'পয়সাই যদি না নেবে তা হলে শুধু শুধু সেলাই করে কী হবে আমার?' তখন অশ্রু হার মানিয়াছিল। কোন যুক্তিতেই অশ্রু টলে না কিন্তু যে তাহাকে ভালবাসিয়া তাহারই জন্য কাঁদে সে অশ্রুজল অশ্রু কিছুতেই সহিতে পারে না। চোখের অশ্রুতে মানবী অশ্রুর এই বিষম দুর্ব্বলতা।

বিমলার হাত দিয়াই অশ্রু তাহার পুরণো দুল জোড়া বিক্রয় করিয়া ১৫টি টাকা হাতে পাইয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত তাহাতেই সে সরমার জন্য প্রত্যহ আধসের দুধ যোগাইয়া আসিতেছে। সে টাকাও প্রায় ফুরাইয়া আসিল।

সেলাই করিয়া ৫টী টাকা জমিয়াছে। অশ্রুর ইচ্ছা ১৫টী টাকা করিয়া দাদাকে বলিয়া বৌদিকে ডাক্তার দেখাইবে।

বিমলা ধনীর পত্নী। নিজস্ব বাটীও কলিকাতায় চারখানা। বিমলার স্বামী মহেন্দ্র প্রফেসর। বিমলা যেদিন দুল দুটি দেখাইয়া বিক্রয়ের কথা বলিল—সেদিন মহেন্দ্র বলিলেন, "কার ঝুঁকি ঘাড়ে নিচ্ছ বলত? শেষে গোলমালে পড়লে মজা টের পাবে।" তবু বিমলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহা ফেরৎ দেওয়ার কথা তুলিতে পারেন নাই। বিমলা প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "ওগো তুমি জাননা সে কত ভাল, তার মত মেয়ে দুর্ল্লভ!" হাসিতে হাসিতে মহেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "একটী তো সামনেই রয়েছেন। দুর্ল্লভ আর কোথায়?"

খানিকক্ষণ গল্প করিয়া অশ্রু বলিল, "দুটো বাজলো বোধহয়,—আজ যাই ভাই?"

বিমলা বাধা দিয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "বাবা—বাবা অত তাড়া কিসের শুনি?" হাসিয়া অশ্রু বলিল—"না তাড়া বিশেষ নেই। রাত্রের রুটী তরকারীও ভাতের উনুনেই করে রেখেছি। দাদা এসেই খেয়ে নেন্ কিনা! তবে এখন নীচে গিয়ে চুল বাঁধ্‌বো, বৌদির সঙ্গে একটু গল্প কর্‌বো।"

বিমলা সহাস্যে বলিল—"তারপর?" "তারপর? তারপর আর কী? যতুকে নিয়ে একটু খেল্‌বো। তারপর গা ধোব। এমনি করে সন্ধ্যা হবে, আর খাওয়া সেরে শুয়ে পড়বো। সেলাই থাক্‌লে ওই সন্ধ্যেটা বেশ কাটে। বৌদি জেগে থাক্‌লে তাও হয় না।"

বিমলা বলিল—"দিদি কেমন আছেন ?" "বিশেষ ভাল নয় ভাই" বলিয়া অশ্রু কাণ পাতিয়া কী শুনিল, তারপর বলিল, "বৌদি উঠেছে। আজ যাই সই—আবার কাল।"

বিমলা অনুযোগ পূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"দেরী কোরনা কিন্তু। আমিতো সারাদিন হাপিত্তেশ করে থাকি, এই সময়টার জন্যে।"

"হরি বলো। অত সাধে কাঁচকলা তোমার, কাল রবিবার।" বলিয়া অশ্রু হাসিতে হাসিতে নামিয়া গেল। বিমলাও ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

নীচে নামিয়া আসিয়া অশ্রু দেখিল, সরমা অস্থির ভাবে এপাশ, ওপাশ করিতেছে। যতী জাগিয়া উঠিয়া, অবোধ চোখে কোন একদিকে যেন চাহিয়া আছে।

সরমার ললাটে হাত রাখিয়া অশ্রু দেখিল—খুব জ্বর আসিয়াছে। নিরুপায় ভাবে তাহার শিয়রে বসিয়া, অশ্রু ধীরে ধীরে সরমার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সহসা খটাখট্ করিয়া কড়া নড়িয়া উঠিতে অশ্রু বিস্মিত হইয়া অবাঁধা চুলগুলি বাঁ হাতে সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে দুয়ারের নিকট আসিল। খুলিবে কিনা একটু ইতঃস্তত করিতেছে, এমন সময় শীতল ডাকিয়া উঠিল—"যতী!"

আশ্বস্ত হইয়া অশ্রু দোর খুলিতেই, শীতল ব্যস্তভাবে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—"চট্ করে এক কাপ চা করে দিতে পারবি ?" "দিই" বলিয়া অশ্রু দুয়ার অর্গলরুদ্ধ করিয়া শীতলের পিছনে ভিতরে আসিল। "এতো তাড়াতাড়ি কেন দাদা ? কোথাও যাবে নাকি ?"

শীতল জামা খুলিতে খুলিতে বলিল, "হ্যাঁ—অফিস থেকে ফিরছি, পথে নবীনের সঙ্গে দেখা! ওরা সব এক জায়গায় মাছ ধরতে যাচ্ছে। সোমবার ভোরে ফিরবে। আমায়ও ধরেছে যাবার জন্যে। কাল রবিবার আছে।" বলিয়া সে কলতলায় হাত-মুখ ধুইতে গেল।

অশ্রু তখন উনুনে আগুন দিবার জোগাড় করিতে করিতে, মনে-মনে ভাবিতেছে—মাগো! আজ শনিবার তা একদম ভুলে গেছি। সইকে বল্‌লাম কাল রবিবার, আর এদিকে—'

শীতল বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"ওরে থাক্-থাক্; চা ওদের ওখানেই খাবো তখন। হ্যাঁ তোর বৌদি কেমন আছে আজ ?"

ম্লান-স্বরে অশ্রু বলিল—"ভাল না দাদা, আবার খুব জ্বর এসেছে।"

"জ্বালিয়ে মারলে—" বলিয়া শীতল ঘরে ঢুকিয়া গেল।

অশ্রুর শান্তনেত্রে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া সে যতীকে কোলে তুলিয়া লইল।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে, শীতল বাহির হইবার সময় বলিল— "খুব সাবধানে থাকিস্। বাজার তো যা আছে, তোর তাতে খুব চলে যাবে। মাছ নেই যদিও,—তা সে সোমবার আন্‌বো। একদিন নিরিমিষ তোর খুব চল্‌বে, কেমন ?"

দীর্ঘচ্ছন্দে ঘাড় নাড়িয়া অশ্রু দুয়ার বন্ধ করিল। শীতল যেন আজ কোন বাধাই মানিবে না, এই ভাবে ঝড়েরবেগে বাহির হইয়া গেল।

অশ্রু ভিতরে আসিয়া চুল বাঁধিল। বাঁধা শেষে, সুগঠিত, ছোট-ছোট কান দুটী নিবিড় ভাবে ঢাকা দিয়া মনে মনে ভাবিল—'বৌদি, আজ পর্য্যন্ত, ষ্টাইলের আড়ালে দুল-দুটী না দেখিয়া হাঁফাইয়া ওঠে নাই।'

গা ধুইতে গিয়া, জামা খুলিবার সময়—কুন্তীর চিঠিখানা বাহির হইয়া পড়িতেই, সহসা আনন্দে অশ্রুর মন ভরিয়া উঠিল। কাল দাদা থাকিবেন না, কাল যেন ঠিক আসে!

সরমা সমানে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। অশ্রু আসিয়া তাহার মাথায় আবার হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেলে সরমা চোখ চাহিল। শীতলের বাহিরে যাওয়ার কথা শুনিয়া বলিল, "আঃ, ভালই হোল—মনটা তাঁর একটু ভালো হবে'খন; যে রকম আপিস আর রুগী নিয়ে কাহিল হোয়ে পড়েছেন।"

অশ্রু চুপ করিয়া রহিল। সরমা একটু পরে তার স্বভাব-সিদ্ধ মিষ্ট হাসিতে মুখখানি স্নিগ্ধ করিয়া বলিল—"বাঃ—আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে, ভাই! লালপাড় শাড়ীটা পরে তোকে দেখাচ্ছে, ঠিক ঈদের চাঁদ।"

অবাক হইয়া অশ্রু বলিল—"সে আবার কী বৌদি?"

সরমা কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে, পুরাতন একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায়, স্মৃতির কাননে বিমনা হইয়া ডুবিয়া গেল।

অশ্রু বলিল "কুন্তী চিঠি লিখেছে বৌদি, কাল আসবে বোধহয়!"

খুশী হইয়া সরমা, চোখ তুলিয়া বলিল, "বেশতো উনিও টিক্ টিক্ করতে বাড়ী থাকবেন না—ভালই হোল।" একটু পরে আবার হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা ঠাকুর-ঝি! তুই তো এত সহ্যশীলা কোন দিন ছিলি না? এবাড়ী আসা থেকে, তোর দাদার এত বকুনী কি করে নিঃশব্দে হজম করিস্?"

"তোমার যে চেঁচামেচিতে কষ্ট হয় ভাই?" সরমা ছল ছল আঁখি দুটি বন্ধ করিয়া ফেলিয়া অশ্রুর সেবাপরায়ণ হাতখানি নিজের শীর্ণ হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

ক্রমশঃ
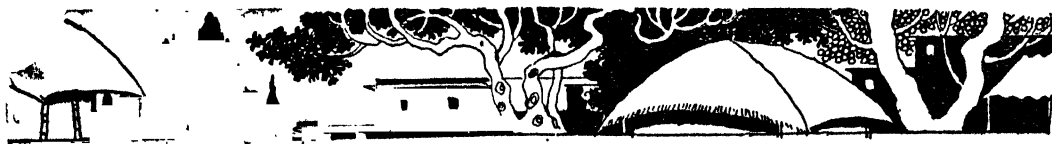
নিউইয়র্কে পুষ্প-প্রদর্শনী

(International Flower-show)

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

যুক্তরাজ্যে সব অনুষ্ঠানই যেমন মহাসমারোহে আরম্ভ ও নির্ব্বাহ হয়ে থাকে, এবারকার নিউইয়র্কের ফুলের প্রদর্শনী ও সেইরকম ভাবে মহাধূমধামে শেষ হ'ল। এরকম প্রদর্শনী প্রতি বৎসরই নিউইয়র্কের (এবং যুক্তরাজ্যের অন্যান্য সমস্ত বড় সহরগুলিতে ও হয়) গ্র্যাণ্ড্ সেণ্ট্রাল প্যালেস্‌এ (Grand Central Palace) হ'য়ে থাকে ; কিন্তু এবার প্রদর্শনীতে যেমন নানা দেশ বিদেশের (International Flower-show) ফুল কখনও সেরকম হয় নি। প্রতি বৎসরই এরকম ফুল প্রদর্শনীতে ঐদেশের ফুলের সৌন্দর্য্য ও উন্নতি সাধারণকে দেখান হয় ; এ বছরেও সে আড়ম্বরটা কিছু কম হয়নি, বরং আমার মনে হয় এবার একটু বেশীরকম বিরাট আকার ধারণ করেছিল। কাগজে পড়লাম যে এতবড় পুষ্প-প্রদর্শনী ইতিপূর্ব্বে কেউ আর কোথাও কখনও দেখেনি।

অদ্ভুত এই আমেরিকা দেশটী। তারমধ্যে নিউইয়র্ক সহর হ'ল অদ্ভুততর। বার মাসে তের হুজুগ লেগেই আছে। এই ফুল প্রদর্শনীটীও মস্ত বড় একটী হুজুক হ'লেও এটাকে একটী বিশেষ শিক্ষনীয় হুজুগ বলা যেতে পারে। জনসাধারণকে ফুল চিনাবার জন্য, ফুল ভালবাস্‌বার জন্য, ফুল কিন্‌বার জন্য, বা বাগানের উন্নতি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার জন্যই প্রতিবৎসর এই রকম প্রদর্শনী করে দেশবাসীকে উৎসাহিত করা হয়। আমেরিকার বহু বিখ্যাত ধনীরাও এই প্রদর্শনীতে তাদের বাগানের নক্‌সা এঁকে নিজেদের বাগানের ফুল প্রদর্শন করে থাকেন। যিনি যাঁর ফুলের যত উন্নতি দেখাতে পারেন, তিনি সেইরূপ সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন। তাছাড়া, এই প্রদর্শনীতে পুষ্প উৎপন্নকারীদের এসোসিয়েশন,(Flower growers' Association ও Horticulture societies)' 'হরটী কাল্‌চার সোসাইটীজ' ইত্যাদি বহুবিধ ফুলভক্ত সোসাইটী ও জনসাধারণ নিজেদের প্রিয় ফুল প্রদর্শন করে থাকেন। বাগানের নমুনা নক্‌সা এঁকে দেখান হয়, কি রকম ভাবের বাড়ীতে কি নক্‌সা করলে বাড়ীর শ্রীবৃদ্ধি করা যায় এবং তাহা অভিজ্ঞ লোকে দর্শকদের সাদরে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়া থাকেন।

গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করতে হলে, একমাত্র ফুলেরদ্বারাই তা সহজে সম্ভব। যারা এই ফুল প্রদর্শনীতে আসে তারাই এটা শিখে যায়। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের নক্‌সা ও নূতন ফুলের আবির্ভাব ও আমদানী সর্ব্বত্রই সচরাচর দেখা যায়। বাগানের নক্‌সা তৈরী করা এদেশের

একটী মস্ত বড় শিল্প; এবং এই শিল্প শিক্ষা করার জন্য প্রতিবৎসর এদেশের বহু বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ বাগান শিল্পী প্রতিবৎসর নানা দেশ বিদেশ ঘুরে বাগান রচনা শিক্ষা করে আসে। এবিষয়ে জাপানীরাই বিশ্ববিখ্যাত। এই প্রদর্শনীতেও জাপানী প্রভাব অনেকখানি দেখ্‌তে পেলাম।

চূড়ান্ত হুজুগের সহর হল এই নিউইয়র্ক। সকালে ৭৫ সেণ্ট ও রাত্রে এক ডলার (এক ডলার মানে তিন টাকা) প্রদর্শনীর প্রবেশাধিকারের মূল্য দিয়ে দু'সপ্তাহ লোকের যে রকম ভীড় হয়েছিল, তা দেখে মনে হয়েছিল, এরা সত্যিই ফুল বড় ভালবাসে। অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে সাজানো মনমাতানো সুগন্ধযুক্ত ফুল দেখবার জন্য এখানকার লোকের কি আগ্রহ ও উৎসাহ। আর প্রদর্শনীটি প্রকৃতই একটী দেখবার জিনিষ ছিল বটে। গ্রামের ছোট্ট গরীবের বাড়ীর বাগান থেকে আরম্ভ করে কোটীপতিদের বাড়ীর বাগান কেমন তার নমুনা দেখে অবাক্ না হয়ে পারিনি।

বোধহয় সব দেশেই গোলাপই হ'ল ফুলরাজ্যের রাণী। রূপে ও গন্ধে তার আর তুলনা নাই। আমেরিকায় এক জাতীয় গোলাপ ফুলের নাম 'আমেরিকান বিউটি', অর্থাৎ আকারে খুব বড় ও টকটকে লাল, দেখলে প্রাণ জুড়ায়। তবে আমার মনে হয়, সুগন্ধে বোধহয় আমাদের গোলাপই শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই প্রদর্শনীতে কত রকম ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গোলাপ দেখলাম যা ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। গন্ধরাজের রাজত্ব ও আজকাল এদেশে খুব বেড়েছে। সুন্দর সাদা ধব্‌ধবে গন্ধরাজের সুবাসে এদেশের লোক মুগ্ধ ও পাগল। গত কয়েক বছর আগে আমেরিকায় এই ফুলটীর অস্তিত্ব অনেকে বড় জান্‌তনা। বর্ত্তমানে এই ফুলের প্রচার ও প্রসারতা এত বেড়েছে যে ২৫।৩৫ সেণ্ট দিলেই যে কোন ফুলের দোকানে বা রাস্তায় ইহা কিন্‌তে পারা যায়। অবশ্য এত সস্তা পাওয়া যায় যখন গন্ধরাজ ফুল ফোটার সময় হয় (Season); অসময়ে পাওয়া মুস্কিল না হলেও অতিরিক্ত দাম (৫০।৭৫ সেণ্ট) দিয়া কিন্‌তে হয়। তবুও লোকে কেনে, কিনে প'রে ও প'রে আনন্দ পায়। অনেক বিখ্যাত বড় দোকানে দেঁখেছি এক একটী orchard ফুল লোকে তিন ডলার দিয়েও কিনে কোটের বোতাম ঘরে পরেছে।

নিউইয়র্কের একটী বিখ্যাত ডিপার্টমেণ্ট্ ষ্টোরে (R. H. Macy & Co.) গন্ধরাজ গাছ কুঁড়ি ও ফুল শুদ্ধ টবে বিক্রি হয়। আমি একবার একটী গাছ কিনে ঘরে এনেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় এক রকম পোকা জন্মে তা অতি অল্প দিনেই ঝ'রে পড়ে গেল। আমি যখনই সে দোকানে যাই একবার সেই ফুল বিক্রীর জায়গাটায় ঘুরে আসি। সুন্দর চিত্তামোদী গন্ধরাজ ফুলগুলি গাছে ফুটতে দেখে কেবলই মনে হয়, আজন্মের পরিচিত এই ফুলগুলি, এ আমার নিতান্ত আপনার, বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি; কাজেই আমারও তাতে দাবী আছে, কয়েকবার গন্ধশুঁকে, কয়েকবার গাছগুলোকে ছুঁয়ে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখি তারপর স্থানান্তর চলে যাই। একবার ফুল কিন্‌বার সময় ঐ ডিপার্টমেণ্টের একটি মেয়েকে বলেছিলাম, "এদোকানে সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে তোমার

ফুল বিক্রীর কাজই বোধহয় সবচেয়ে সুখের ও আনন্দের। মেয়েটি তার উত্তরে বল্লে, "তা ঠিক, কিন্তু আমরা কোনও ডিপার্টমেণ্টেই স্থায়ী হয়ে অধিককাল কাজ করিনা। ফুলের জীবনের মতই আমাদের ফুল বিক্রীও ক্ষণস্থায়ী। দু'দিন বাদেই এই সুন্দর ফুল বিক্রীর কাজ ছেড়ে আমি হয়ত' বাসন বিক্রীর ডিপার্টমেণ্টে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে যাব; এবং অন্য মেয়ে আমার স্থান অধিকার করে বস্‌বে।" আমার গন্ধরাজের প্রতিটান দেখে সে হয়ত মনে মনে হেসে বল্‌ছিল......"আরো যায় চেয়ে, ঐ যায় ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।"

ফুলের প্রতি মমতা বোধ হয় মানুষমাত্রেরই আছে। ছোট, বড়, সকল রকমের ফুলের মধ্যে গন্ধ কম বা এমন কি না থাকিলেও কোন্ ফুল কে কবে অসুন্দর দেখেছে? ফুলের কোমলতা ও অদ্ভুত, অপূর্ব্বরঙ্গের সমাবেশে সততই চিত্তাকর্ষণ করে। বাংলাদেশের নীল আকাশের গা ঘেঁষে এমন কি লালপলাশ ফুল যখন লজ্জায় রক্তিম হয়ে ফুটে উঠে, তখন সমস্ত পৃথিবীটাকেই যেন রঙ্গীন দেখায়। সে লাল পলাশফুলটী ও উর্দ্ধমুখী হয়ে যেন নীরবে জানায়, "সুগন্ধ আমার না থাকলেও আমিও অসুন্দর নই বরং সব ফুলের মতই কোমল ও সুন্দর, এবং সুন্দর বলেই আমিও এই পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী।"

"Say it with flowers" এই সুন্দর কথা ক'টী এদেশের সকল ফুলের দোকানের সাম্‌নের কাঁচের উপর লেখা দেখতে পাওয়া যায়। এটী হোল এদেশের ফুল ব্যবসায়ীদের "শ্লোগ্যান" (Slogan)। যদি কেউ কারো জন্ম দিনে, বিবাহ বাসরে, কোন আনন্দোৎসবে, বা অসুখের সময়ে সশরীরে উপস্থিত হ'তে অসমর্থ হয়, তবে সেজন্য কিছু ফুল পাঠান এদেশের সাধারণ রীতি। যে কোন ফুল ব্যবসায়ীকে ফুলের নাম ও পরিমাণে বলে দিলে সে যুক্তরাজ্যের যে কোন সহরে বা গ্রামে টেলিগ্রাম করে ফুল পাঠাতে পারে। সেখানকার স্থানীয় দোকানদার টেলিগ্রাম পেয়ে তৎক্ষণাৎ অর্ডার মত ফুল পাঠিয়ে দেয়। ব্যবসাবুদ্ধি এদের প্রখর এবং সর্ব্বদাই সকলের সুখ সুবিধার জন্য বিরাট আয়োজন করে বসে আছে। কোথাও এতটুকু ঠকাবার চেষ্টা করেনা। কেননা তাহ'লে ভবিষ্যতে আর কেউ বিশ্বাস করবেনা। ফুল সকল বয়সের সকল লোককেই ভক্তি শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ দেওয়া চলে বলে এদেশে ফুলের এত প্রচলন। মৃত্যুর পরেও গাড়ী বোঝাই করে মৃতের "কফিন" ফুলে ঢেকে দেয় (অবশ্য আমার মতে সেটা নিতান্ত অপব্যয় এবং লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়)। এদেশের লোকেরা যেমন ফুল ভালবাসে আমরা যে তার চেয়ে কিছু কম বাসি তা মনে হয় না। বাগানের সদ্যফোটা ফুলটী বাসি হবার আগেই দেবতার চরণে অঞ্জলি দিয়ে হিন্দু নারী প্রার্থনা করে—'এই ফুলটীর মতই ঠাকুর আমার এজীবন নির্ম্মল, সুন্দর ও সুগন্ধপূর্ণ কর।' ফুলের মালা তৈরী করে গলায় পরি ও আপন জনকে উপহার দিয়া অপার আনন্দ বোধ করি। বিয়ের সময় ফুলের মালা বদল না করলে হিন্দুর বিয়ে হয়না এবং এই মালা বিনিময়েই চির অপরিচিত পুরুষ ও নারী নিতান্ত আপন হয়ে যায়। এক কথায় হিন্দুর

'বার মাসে তের পর্ব্বণ' ও সকল শুভ কাজেই ফুল দরকার। অথচ আমরা এই চিত্তামোদী সুন্দর ও পবিত্র জিনিষটীর চর্চ্চা বা চাষ তেমন করিনা। তফাৎ এইখানে। পাশ্চাত্য দেশে ফুল ভালবাসে ব'লে ফুলের রীতিমত চাষ ও চর্চ্চা করে ; আর আমরা মাত্র দুটী বীজ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেই ক্ষান্ত হই। চর্চ্চার বড় একটী ধারধারিনা। বাড়ীর শ্রীবৃদ্ধি করতে হ'লে একটু খানি ফুলের বাগান দিতে যেমন সহজে হয়, তেমন বোধহয় আর কিছুতেই হয় না। গুটি কয়েক ফুল ঘরে ও বাইরে সাজিয়ে রাখ্‌লে দামী আস্‌বাব পত্রের আবর্জ্জনা ও আর দরকার হয়না। প্রকৃতির এই শ্রেষ্ট দান, ধনী দরিদ্র, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিজস্ব জিনিষ ; অথচ খরচও তেমন কিছু নাই। বাংলা দেশের পথের ধূলা ও বৃষ্টির জলই যথেষ্ট। তবু আমরা সেদিকে বড় একটা নজর দিইনা। যা মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে তাই কোন রকমে চালিয়ে নিচ্ছি। নূতন করে, সুন্দর করে তুল্‌তে আর চেষ্টা করিনা।

শীতপ্রধান দেশ বলে এদেশের বহুস্থানে ফুলের বাগান কাঁচের ঘরের (hot-house) মধ্যে উৎপন্ন করা হয়। এই কাঁচের ঘরে উত্তাপযন্ত্র দিয়ে সব সময় একই রকম উত্তাপ রাখা হয়। বাইরে ঠাণ্ডা যত বেশীই হোক না কেন কাঁচের ঘরের ভিতরকার উত্তাপ সব সময় গাছের উপযোগী সমান থাকে। সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে এই সব ফুল তৈরী করতে হয়, কাজেই এদেশে গ্রীষ্মকাল ক্ষণস্থায়ী হলেও সব সময়েই প্রায় সব ফুলই শীত গ্রীষ্মে সমান পাওয়া যায়। কারণ এই কাঁচের ঘরে (hot house এ) বছরের সব সময়ই উপযুক্ত চাষ আবাদ করে সব রকম ফুলই ফোটান সম্ভব হয়। এই দেখে মনে হয় এরা বাস্তবিকই প্রকৃতির সঙ্গে রীতিমত লড়াই করে সকল জিনিষ উৎপন্ন করে। আর আমরা "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং" এর দেশে বসে সকল অগ্রাহ্য ক'রে বেকার অবস্থায় হাহাকার করছি!

বাংলার কাগজ

ঢাকা জেলার আড়িয়ল, ধাইরপাড়া, তুলিহাটা, কুরমিয়া, নাগের পাড়, দিবীরপাড় প্রভৃতি গ্রামে পূর্ব্ব হইতে কাগজ প্রস্তুত হইত। বহু পরিবার কাগজ প্রস্তুত করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মিলের কাগজ প্রচলিত হওয়ায় হাতে তৈয়ারী কাগজ প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে পারে নাই। বাংলার কাগজ ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা কাগজ প্রস্তুত করিত এখনও তাহাদের বংশধরগণ সাধারণের নিকট 'কাগজী' পরিচিত। বংশানুক্রমিক ব্যবসায় নষ্ট হওয়ায় কাগজীরা এখন দপ্তরী, দরজী, নৌকার মাঝি, চাষের কাজ করিয়া দিন কাটাইতেছে। ধাইরপাড়া গ্রামে ৭৫০টি পরিবার বংশানুক্রমিক ব্যবসায় বজায় রাখিয়াছে এবং বৎসরে ৬০০।৭০০৲ টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়া থাকে। ঢাকার কয়েকটি মনোহারী দোকানে ইহাদের কাগজ পাওয়া যায়। কাগজ ও পাটের মণ্ড ঢেঁকিতে কুটিয়া কাগজ প্রস্তুত করা হইত শারীরিক পরিশ্রম, অভ্যাস ও কৌশল বলে নিরক্ষর কাগজীরা বাংলার কাগজ ব্যবসায় অনেক দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। পাঁচজন লোক একদিনে এক রিম কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে। সাধারণতঃ একরিম কাগজ দুই টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। খরচ বাদ দিয়া কাগজীদের সামান্যই লাভ থাকে। শুধু ঢাকা নহে, বাখরগঞ্জ জিলায় এখনও তাহাদের বংশধর আছে কিন্তু ব্যবসায় নাই। এক সময় তাহারা ধনী ছিল আজ নিঃস্ব। পল্লীশিল্প উদ্ধার করিতে হইলে ইহাও উদ্ধার করা উচিত।

আজ-কাল

মেরুদেশের ফুল

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ সুধীবৃন্দ উত্তরমেরু প্রদেশস্থ ফল-ফুল সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া পলনিন অঞ্চলে দেখিয়াছেন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ল্যাপল্যাণ্ডের উত্তরাংশে মৃত্তিকাহীন তুষারময় প্রদেশে তারা "বেতুয়ালা ওডোরাটা" নামে একরূপ চারা গাছ দেখিয়াছেন—এ গাছের মূল তুষারে নিহিত; মূল দিয়া তুষার ভেদ করিয়া জলরাশিতে এ চারা গাছের জীবনীধারা সঞ্চালিত হয়। এ চারা গাছে বিচিত্র বর্ণে ফুল ফোটে—সে ফুলের গন্ধ চমৎকার। মৃত্তিকাহীন প্রদেশে গাছ গজায় এ তথ্য সম্পূর্ণ অভাবনীয়, অভিনব।

স্বাবলম্বী ভারত

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়সম্বন্ধীয় এক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে:—

"ইটালীতে কয়লা ও লৌহ হয় না, ফ্রান্সে তৈল হয় না, ইংলণ্ডকে ৯০ দিনের খোরাক বাদে বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য অন্য দেশ হইতে আনিতে হয়। টিন, রেশম, নিকেল, রবার এবং অন্যান্য দ্রব্যের জন্য আমেরিকাকে অন্য দেশের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হয়; ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হইতে আমেরিকায় মোটর টায়ারের রবার ক্রয় করা হয়। কানাডা হইতে কাগজের উপাদান আসিলে আমেরিকায় কাগজ প্রস্তুত হয়। টেলিফোনের রিসিভার এবং ইলেকট্রিক্ বাল্‌বও আমেরিকায় তৈয়ারী হয় না, অন্য দেশ হইতে আনিতে হয়। আমেরিকা ব্যবহারের উপযোগী ৫০ রকমের দ্রব্য ৫০টি বিভিন্ন দেশ হইতে পাইয়া থাকে। কানাডা হইতে নিকেল, পেরুর এণ্ডিজ পর্ব্বত হইতে গাড়ীর সরঞ্জাম, ককেশাস হইতে লৌহদ্রব্য, নিউ ক্যেলেডিনিয়া হইতে ক্রোম আমেরিকায় আসিয়া থাকে।"

আমাদের ভারতবর্ষে খাদ্যদ্রব্য, উন্নতধরণের লৌহদ্রব্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, অভ্র, কয়লা, তৈল এবং অন্যান্য খনিজ দ্রব্য ও ধাতু এবং মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। কেবল ভারতবর্ষই অন্য দেশ ও জাতির সাহায্য ব্যতীত বাঁচিতে পারে। কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষ আর্থিক বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পরাধীন। ভারতের এই অর্থ-নৈতিক পরমুখাপেক্ষিতার প্রতিকারের পন্থা কি, তাহা আবিষ্কার করাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য। বণিক

বিলাতে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, বিদেশী লোক নৃত্য দর্শন

বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস কয়েক মাসের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। এইবার বিলাতে যে ইউরোপীয় লোক-নৃত্য প্রদর্শিত হইবে, তাহা দর্শন করাই তাঁহার মুখ্যতম উদ্দেশ্য। এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় বাংলায় গ্রাম্য নৃত্য-কলার পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রতী হইয়াছেন।

'এভারেষ্ট অভিযান'

আবার এভারেষ্ট অভিযানের আয়োজন চলিয়াছে। গত বারের দুর্ঘটনা এখনও কাহারও মন হইতে পুঁছিয়া যায় নাই। আর সেই দুর্ঘটনাভোগী দলের অন্যতম মিঃ সিপ্টনই এই দলের নেতা। তাঁহারা চম্বক উপত্যকার কিছু পূর্ব্ব রাস্তা ধরিয়া অভিযান করিবেন। ১৯৩৬ সালে এই অভিযান আরম্ভ হইবে। প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষণের জন্য ২৪শে মে তারিখে যাত্রা করিয়া নূতন দল ৪ মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া নূতন অভিযানের বন্দোবস্ত করিবেন। ভারতবর্ষীয় "হিমালয়ান ক্লাবে"র এই দলে যোগদান করিবার কথা উঠিয়াছিল, তাহা মিথ্যা গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ অসমসাহসিক কার্য্যের ফলাফল যাহাই হউক, প্রকৃতির বিজয়ধ্বজা জয় করিবার দৃঢ়সঙ্কল্পে বারংবার পরাজিত হইয়াও এই নব নব প্রচেষ্টায় আর কিছু না থাক—মানুষের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে মানুষ মাত্রেই গর্ব্বিত। ভারত

পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত

'ম্যাক্সিম গোর্কি' নামক বিমানখানি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বিমান ছিল। গত ১৮ই মে মস্কো বিমান বন্দরে ক্ষুদ্রতর একখানি বিমানের সহিত সংঘর্ষের ফলে এই বিমানখানি ধ্বংস হইয়াছে এবং ৪৮জন লোক নিহত হইয়াছে।

রেল দুর্ঘটনা

ভারতীয় রেল দুর্ঘটনায় ১৯৩২-৩৩ সালে ২৩১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে ২৩২ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৩২-৩৩ সালের আহত ব্যক্তির সংখ্যা ৮৪৩ জন, ১৯৩৩-৩৪ সালে ৯৬৪ জন রেল দুর্ঘটনায় আহত হয়। রেল দুর্ঘটনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে এরূপ হইবার কারণ কি? লোকের জীবনের কি মূল্য নাই?

মূক বালিকার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাওয়া

ব্রিসবেনে উনিশ বৎসর বয়স্কা একটি মূক বালিকা সম্প্রতি অতি আশ্চর্য্যভাবে তাহার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। একখানি মোটরগাড়ীতে চড়িয়া যাইবার সময় মোটরটি ধাক্কা লাগিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়,—কিন্তু উক্ত বালিকা কোনপ্রকারে বাঁচিয়া যায়। ধ্বংসস্তূপ হইতে বাহির হইবার সময় সে হঠাৎ তাহার নিজের মুখের স্বর ও ভাষা শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য—গল্প ও নাটক

পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্য—আসীরিয় পৌরাণিক উপাখ্যান। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম গল্প—'অনানা' নামক লেখকের রচিত ইজিপ্টের ফ্যারাও-দের সময়ের ছোট গল্প। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটক—'মৃচ্ছকটিক।

কমলা লেবুর আকার

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কমলালেবু প্রথমে অতি ক্ষুদ্র ছিল। ইহা ৭ হাজার বৎসর ধরিয়া বাড়িয়া এত বড় হইয়াছে।

বাতায়ন

নারীর দান

ঢাকার নবাব বংশের নবাব-জাদী আক্তার বানু বেগম ঢাকার নবাব মারফত জানাইয়াছেন যে তিনি সার আসানুল্লা মেমোরিয়াল জুবিলী হাসপাতাল নামে নারীদের জন্য ৬টি বেডসহ একটি হাসপাতালের জন্য দান করিবেন। এই জন্য তিনি তাঁহার বাগান বাড়ী দান করিয়াছেন, ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল নির্ম্মাণ করাইতেছেন। ঐ হাসপাতালের আউট ডোর বিভাগে নর নারী উভয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। ইহা ব্যতীত তিনি মাসিক ৫ শত টাকা ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দান করিবেন। নারীর এরূপ বিরাট দান অতি অল্পই বঙ্গদেশে দেখা যায়।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান নিউজিল্যাণ্ড। সেখানে পুরুষদের গড়ে আয়ু ৬২ বৎসর, আর মেয়েদের ৬৫। ইংরাজের দেশে পুরুষের গড়ে আয়ু ৫৬, মেয়েদের ৬০।

তুরস্কে নারী প্রগতি

তুর্ক নারীদের অবরোধ মুক্ত হইয়াছে এবং তাহাদের বহু বিবাহ লুপ্ত হইয়াছে। তথাকার বালিকাদের, শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে এবং আফিসে কারখানায়, দোকানে নারীদিগকে কাজ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তুর্ক নারীরা ব্যবস্থাপকসভায় যোগ দিতে পারেন কি না এবং ঐ সকল কাজের জন্য নির্ব্বাচন

প্রার্থী হইতে পারেন কিনা—তাহা স্থির করিবার জন্য তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কমিটি বিশেষ বিবেচনার পর গবর্ণমেণ্টকে সুপারিশ করিয়াছেন যে, নারীদিগকে পুরুষের সঙ্গে সমান সর্ত্তে এই অধিকার দেওয়া উচিত।

শিখ মহিলাদের মরণ-পণ

শিখ জাতীর জাতীয় জীবনে এক ঘোর দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছে। যে শিখ-সমাজ একদিন অকাতরে জীবন বলিদান করিয়া শিখ জাতিকে একটি শক্তিশালী সংঘে পরিণত করিয়াছিল, সেই শিখ-সম্প্রদায় আজ বহুধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন; বহুদলের দলপতিগণ ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধির লোভে অনাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। এই সমস্ত কৃত্রিম নেতাদের অপসারণ ও আত্মকলহের অবসান উদ্দেশ্যে বোম্বাইএর বিখ্যাত শিখ-নেত্রী শ্রীযুক্তা অমৃত কাউরের নেতৃত্বে একদল শিখ-নারী আপনাদের জীবন বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীমতী অমৃত কাউর এ সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—"এই সমস্ত কৃত্রিম নেতাদিগকে অপসারণ এবং এই আত্মকলহের অবসানের উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহে দিল্লীর নিকটে সমবেত শিখ মহিলাগণ আপনাদের রক্তদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভারতমাতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য এখনও তাঁহার এই সাহসী সম্প্রদায়ের আবশ্যক আছে। শিখ মহিলাদের এই সঙ্কল্প নূতন নহে। তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ত্যাগ বংশপরম্পরাগত। এ বিষয়ে যেন কেহ উদ্বিগ্ন না হন। এই সাহসী নিঃস্বার্থপরায়ণ নারী-বাহিনীর নেতৃরূপে আমার দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর তাহা উপলব্ধি করিয়া আমি আমাদের মহান গুরুর সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছি। এই নারী-বাহিনী জয়লাভ করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। কেহ যেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা না করেন। একবার অনশন আরম্ভ করিলে তাঁহারা আর উহা হইতে নিবৃত্তি হইবেন না, দলে দলে মৃত্যুবরণ করিবেন। আমি ইতঃপূর্ব্বে আসাম ও বাঙ্গালায় সমাজ-সেবামূলক কার্য্যে এইরূপ পণ করিয়াছিলাম। আমি আমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিয়াছি—পাঞ্জাবের কোনও নির্জ্জন অংশে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করা হইবে। মাত্র কয়েকজন লোক ঐ স্থানের বিষয় জানিবেন। একটি করিয়া মৃতদেহ শিখ-সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান হইবে। কে প্রথম প্রয়োপবেশন করিবেন, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। আমি আশা করি, ঐ মহীয়সী মহিলাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের নেত্রীরূপে আমাকেই ঐ সম্মান প্রদান করিবেন।"

আগামী মাস হইতে অনশন আরম্ভ হইবে। অন্যান্য বার যেমন শ্রীমতী অমৃত কাউরের জীবন অবসানের প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহার মনের দৃঢ়তা এবং ব্রত উদ্‌যাপনের সাহস ও অটল সঙ্কল্প দৃষ্টে দেশে যে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগে, তাহার ফলে শ্রীমতী কাউরের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়; আমরা আশা করি এইবারও তেমনিভাবে শিখ-সম্প্রদায়ের নেতাদিগের দৃষ্টি উন্মোচিত হইবে এবং এই ত্যাগী বীর রমণীর আত্মাহুতির প্রয়োজন হইবে না।

শিখযুবকদের প্রচেষ্টায় অনশন পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেশ

ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর মাদকদ্রব্যাদিতে ও সিনেমা প্রভৃতিতে ব্যয়

ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর তামাকে প্রায় ১২০,০০০,০০০ পাউণ্ড, সৌন্দর্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করণে ও ব্যবহারে ৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড, সিনেমা দেখায় ৪৩,০০০,০০০ মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করে। সেখানে ২৫০,০০০ খাবারের দোকান আছে এবং অতগুলি দোকানে ৭৫০,০০০ লোক কাজ করে।

কবির প্রতি মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস

গ্রাম্য শিল্পকলা ও কুটীর শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লিখিয়াছেন তৎসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক বাণী তিনি সাদরে গ্রহণ করিবেন। মহাত্মা গান্ধীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে কবির সহযোগিতা পাইলে ভারতের প্রাচীন কুটির শিল্পের প্রতি জনসাধারণের উদাসীনতা লোপ পাইবে।

কবে পুনরায় মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবেন প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছেন যে উক্ত বিষয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করাই সঙ্গত, কারণ তিনি নিজে কিছুই বলিতে পারেন না।

আফগানিস্থানের আর্থিক উন্নতি

কাবুলের এক সংবাদে প্রকাশ, আফগানবর্ষ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আফগানিস্থানের মন্ত্রীগণ জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ, সামরিক এবং অসামরিক রাজকর্ম্মচারীগণ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিগণ এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নাগরিকবৃন্দ কাষ্টমস্ অফিসে সমবেত হইয়া আফগনিস্থানের অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিপুল সম্বর্দ্ধনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার মহম্মদ হাসিম খান বলেন যে, ১৩১৩ সাল (যে সাল ইংরাজী ১৯৩৫ শালের ২২ শে মার্চ্চ শেষ হইয়াছে) দেশের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। মরহুম রাজা নাদিরশা যে সমস্ত আইন কানুন তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন ঐ সমস্ত নিয়ম কানুনের ফলে এবং বর্ত্তমান রাজার উৎসাহ প্রদানের ফলে অবস্থার এত উন্নতি হইয়াছে। আমদানী এবং রপ্তানি শুল্ক হইতে সরকারের আয় বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বাণিজ্য বিভাগের এবং চেম্বার অব কমার্সের বিশেষ প্রশংসা করেন ঐ শুল্কই আফগানিস্থানের প্রধান আয়ের পথ। সীমান্ত রক্ষা এবং অবৈধ ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সমরবিভাগের কার্য্যের ভূয়সীপ্রশংসা করেন। নয়াবাংলা

নারী প্রগতি

শাসন সংস্কার সম্পর্কে আলোচনায় পার্লামেন্টে স্থিরহইয়াছে যে ভবিষ্যতে কাউন্সিল অফ ষ্টেটে বোম্বাই, বাঙ্গলা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি ৬টী প্রদেশ হইতে ৬ জন নারীকে সদস্য লওয়া হইবে।

অশিক্ষিতের সংখ্যা

১৯৩১ সালের সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে শতকরা ৯২ জন অশিক্ষিত। কিন্তু যাহাদের নিগ্রো বলিয়া অবজ্ঞা করা হয় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮৪ জন শিক্ষিত। অথচ ১৮৬৫ সালে তাহাদের বর্ণমালাও ছিল না। বুকারটি ওয়াশিংটনের মত ত্যাগী কর্ম্মীর আবির্ভাবে নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ ও সুবিধা হইয়াছিল। বাংলা দেশে বুকরটি ওয়াশিংটনের মত কর্ম্মীর অভাব আছে। দেশের গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে কতকটা উদাসীন। জনশক্তি

দেশের সমস্যা

কেহ কেহ বলেন দেশের প্রধান সমস্যা দেশের আর্থিক দুরবস্থা। আবার কেহ কেহ বলেন, দেশের প্রধান সমস্যা দেশের পরাধীনতা। শেষোক্ত মতাবলম্বী দেশবাসীর সংখ্যাই অবশ্য বেশী। আমাদের মনে হয় সমস্যা দুইটি পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আর্থিক দুরবস্থা বর্ত্তমান থাকায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ যেরূপ

সম্ভবপর হইতেছে না—আবার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ ব্যতীত আর্থিক দুরবস্থা দূর করাও সম্ভবপর হইতেছে না। কাজেই দুইটি সমস্যা পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা চলে না এবং তাহাতে কোনটিরই সমাধান হইবে না।—

ত্রিস্রোতা

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের নিকট হইতেই রেলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হয়। অথচ ইহাদের সুখদুঃখের প্রতি রেল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি নাই। প্রথমশ্রেণীর যাত্রীদের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হয়, তাহাতে রেলের আয় না হইয়া লোকসানই হয়। এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া এইবার রেল বাজেটের সময় ব্যবস্থাপরিষদে খুব তীব্র আলোচনা হয়। আলোচনার ফলে যে তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখদুর্দ্দশার কিঞ্চিমাত্রও লাঘব হইবে এরূপ সম্ভাবনা কম। তবে শুনা যাইতেছে যে জি, আই, পি রেলের কর্ত্তৃপক্ষ নাকি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য নূতন ধরণের কামরা প্রস্তুত করিতেছেন। এই কামরাগুলিতে ১১৪ জনের পরিবর্ত্তে ৯৬ জনের বসিবার স্থান থাকিবে ও প্রত্যেক কামড়া পাঁচভাগের পরিবর্ত্তে ছয় ভাগে বিভক্ত হইবে। কামরাগুলিতে রাত্রে শয়নের জন্যও কি ব্যবস্থা থাকিবে, অবশ্য রেল কর্ত্তৃপক্ষ সকল যাত্রীর পক্ষে শয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর বলিয়া বর্ত্তমানে মনে করেন না। শৌচাদি স্নানের ব্যবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইবে বলিয়া গাড়ী নির্ম্মাতারা মনে করেন। এই উন্নত ধরণের গাড়ী শীঘ্রই দিল্লীতে প্রদর্শিত হইবে। এই সামান্য উন্নতি মন্দের ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের টিকিট কিনিবার ব্যবস্থা, যাত্রাকালীন পান আহারাদির অসুবিধা, গাড়ীতে অতিরিক্ত লোকের অবস্থান হেতু অত্যধিক ভীড় প্রভৃতিতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ এই প্রকার পশু অপেক্ষা অধম ব্যবহার পাইয়া থাকে। সে সম্বন্ধে যতদিন পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত এই সমস্ত সামান্য সুব্যবস্থার প্রয়াস ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায়ই নিরর্থক। তথাপি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সম্বন্ধে সামান্য একটু চিন্তা করিবার অবকাশ যে কোনও এক কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের হইয়াছে, সেজন্য আমরা জি, আই, পির কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রাসবিহারী ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোসিপ

দেশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায় এবং অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্রকে ১৯৩৫-৩৬ সালের জন্য রাসবিহারী ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোসিপ বৃত্তি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই তিন জনকে এই বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এইবার দুই জনকে দেওয়া হইয়াছে, তৃতীয় ব্যক্তিকে বৃত্তি দেওয়া স্থগিত রাখা হইয়াছে।

নবশক্তি

হাতীর দ্বারা চাষ

উত্তর আসামের মাকুম জংগল বনবিভাগের একমাত্র আসিষ্টাণ্ট কমিশনার মৌলবী হবিবুল্লা হাতী দ্বারা চাষ করা যায় কিনা তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। ৯ ফিট পরিধির এক বৃহৎ বৃক্ষ তুলিয়া তাহার গোড়ার ৬ ফিট রাখা হয় ও বড় বড় শিকড়গুলি লাঙ্গলের ফলকের মত করিয়া হাতীকে টানিতে দেওয়া হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে উক্ত প্রণালীতে হাতীর দ্বারা ভূমি কর্ষণে চা বাগিচা ও বন্য বিভাগে ভূমিকর্ষণের ব্যয় অল্প পড়িবে।

অব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্যবসা

আমাদের দেশে আমরা মাঠা তোলা দুগ্ধ ফেলিয়া দিয়া থাকি কারণ ইহার ব্যবহার জানি না। দুগ্ধ হইতে ননী ও মাখন তুলিয়া যে অবশিষ্টাংশ থাকে তদ্দারা অনেক শিল্পকার্য্য সম্ভব। ভারতের মাখনের কারখানায়

দুগ্ধ হইতে যন্ত্র দ্বারা মাখন তোলা হয়। মাখন তুলিয়া অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দেওয়া হয় অথবা সস্তায় বিক্রয় করা হয়। কিন্তু জার্মাণী আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এই অব্যহার্য্য দুগ্ধবিশিষ্ট দ্বারা আয় করা হইয়া থাকে। সেই সকল দেশে এই অব্যবহার্য্য দুগ্ধ হইতে renenet acin দ্বারা কেসিন (casien) প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফ্রান্সে ঐ অব্যবহার্য্য দুগ্ধ বিদ্যুতের দ্বারা দধিতে পরিণত করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া শুষ্ক করা হয় তাহাতেই কেসিন প্রস্তুত হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে জল থাকে তাহাও কার্য্যে লাগান হয়। উহা আস্তে আস্তে উত্তপ্ত করিয়া এলবুমেন বাহির করা হয়। বাষ্প দ্বারা জল বাহির করিয়া সুগার অফ মিল্ক প্রস্তুত হয়। এই সুগার অফ মিল্ক সেবনে অম্লের দরুণ গাঁজিয়া উঠে না তজ্জন্য যাহাদের হজম শক্তি দুর্ব্বল তাহাদের উপকার হয়। সুগার অফ মিল্কে মিশ্রিত ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া হয়। প্রসিদ্ধ 'স্যানাটোজেন' ঔষধে ৯৫ ভাগ কেসিন ও ৫ ভাগ সোডিয়াম গ্লিসারফস্ফেট। ইহা এক গুপ্ত প্রক্রিয়া দ্বারা মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়। এই কেসিন দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ করিয়া উক্ত কোম্পানী প্রচুর লাভ করিতেছে। আর আমরা আমাদের দেশে ঐ দ্রব্য ফেলিয়া দিয়া বিদেশে প্রস্তুত ঐ কেসিন মিশ্রিত ঔষধ ক্রয় করি।

রঞ্জিত করিবার সুবিধার জন্য কেসিন দ্বারা সূতা ও রেশম নরম করা হয়। ইহা সুতার বস্ত্রে ছাপ দিতে ব্যবহৃত হয়। তাহার জন্য নানা সুদৃশ্য চিত্রে ও স্থায়ী রঙ্গে বস্ত্র চিত্রিত হয়। ইহার দ্বারা কাগজ বার্ণিস কৃত্রিম শিং ও হাতীর দন্ত ও হাড়, বোতাম, ছাতা ও ছড়ির হাতল, ছবির ফ্রেম, নকল প্রবাল, ফাউন্টেন পেন কলম, হেয়ারক্লিপ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ভারতে বড় বড় মাখন ও দুগ্ধের কারখানা যদি বৃহৎ সহরে স্থাপিত হয় তবে এই সকলের কারখানাও গঠিত হইতে পারে। ইহাতে সহস্র সহস্র যুবকের জীবনোপায় হইতে পারিবে।

চিঠির বাক্স

ব্যষ্টি ও সমষ্টি

(১)

"জয়শ্রী"তে প্রকাশিত তোমার চিঠিখানি দেখলাম—বেশ ভাল লাগল। সুন্দর ঝরঝরে, পরিষ্কার লেখা—এবং নিজস্ব চিন্তার পরিচয় আছে। তোমার সকলের শেষ কথাটি আমার বিশেষ ভাল লেগেছে। আমাদের দেশে ঐ সহজ সত্যটী সহজে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিনা—সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বা শাসনকে আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের, ব্যক্তিগত মর্য্যাদার হানিকর মনে করি এবং আমাদের চেষ্টা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্ব স্ব প্রধান হ'য়ে উঠতে। পাশ্চাত্য যে এতখানি শক্তিমান হয়েছে এবং প্রাচ্যে এক জাপানই যে সেই রকম, তার প্রধান হেতু এই ওরা সকল রকম সমবেত প্রচেষ্টায় প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রয়োজনমত দাবিয়ে বা সরিয়ে রাখবার অভ্যাস ও শিক্ষা লাভ করেছে। যা হোক্, এ হ'ল কতকটা প্রাসঙ্গিক কথা। তুমি মূল সমস্যার যে মীমাংসা দিয়েছ তা বেশ যুক্তিযুক্ত। তবে সেখানে কয়েকটা প্রশ্ন উঠতে পারে—আমি সেগুলি উত্থাপন করছি।

ব্যষ্টির ও সমষ্টির "স্বার্থ" ("স্বার্থ" কথাটায় আমার আপত্তি হয়—তবে ওটাকে একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে চলতে পারে) দুইই চাই, তবে দরকার দুইয়ের মিলন ও সামঞ্জস্য। কিন্তু কি রকমে তা সম্ভব, কোন তত্ত্বকে আশ্রয় করে ও দুটির সমন্বয় করতে হবে? তুমি সূত্র দিয়েছ যে যেখানে দেখা যাবে ওদের সংঘর্ষ, তখনই বুঝতে হবে ওরা নিজের নিজের যথাযোগ্য সীমা অতিক্রম ক'রে অপরটির রাজ্য আত্মসাৎ করতে চলেছে এবং এই ভাবে অকল্যাণের কারণ হ'য়ে উঠেছে। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে কথাটী নেহাৎ মন্দ শুনায় না—কিন্তু কার্য্যতঃ প্রয়োগকালে ওতে মুস্কিলের কিছু আসান হয় কি? বস্তুতঃ তোমার মীমাংসা সমস্যাটির পুনরুক্তি, বড়জোর বিশদ ব্যাখ্যা মাত্র। উপযুক্ত সীমা অর্থই ত হ'ল যতক্ষণ বা যতদূর পর্য্যন্ত সংঘর্ষ না হয়। কিন্তু সমস্যাটিত ঠিক এই—কোথায় কতদূর পর্য্যন্ত—কে তা ঠিক করবে, কি রকমে ঠিক হবে? তোমার কথায় মনে হয় তুমি বলছ যে দুটিই বাড়তে থাকুক, বাড়তে বাড়তে যেই সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা যাবে অমনি থেমে যেতে হবে। তা হলে সংঘর্ষের পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্ত ঠিক পাওয়া যাবে না যে সংঘর্ষের দিকে চলেছি (কি না চলেছি)—সংঘর্ষ হওয়ার মুখে বুঝবো এই সীমা? কিন্তু সেটিত dangerous line—সব সময়ে কি ঠেকিয়ে রাখা যাবে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটিকে? ঝোঁকের ফলেও একটী অন্যটির ঘাড়ের উপর এসে পড়তে পারে। কিন্তু এ রকমে কল্পনা করা হচ্ছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি যেন দুটি ভাই বোন—মিলে মিশে থাকবে, কিন্তু যেই ঝগড়া করতে যাবে, অমনি মা এসে থামিয়ে দেবে—কিন্তু এ ক্ষেত্রে মা কোথায় পাই?

ইউরোপে আধুনিক যুগে যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঢেউ প্রথম দেখা দিল, তখন একটা সূত্র দেওয়া হয়েছিল—যা খুসী তুমি করতে পার ও করবার তোমার অধিকার আছে, যদি অপরকেও ঠিক এই অধিকার দিতে তুমি প্রস্তুত থাক। আমি আগেই বলেছি এ মন্ত্র শুনতে শুনায় বটে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু

কার্য্যতঃ এর প্রয়োগ তেমন সহজ নয়। চোরে যদি বলে—"আমি চুরী করবো, তোমাকেও চুরী করবার অধিকার দিলাম—আমার জিনিষ পর্য্যন্ত?" এ বিধানের অনুরূপ হ'ল "জোর যার মুলুক তার" এই মন্ত্র। কতখানি স্বাতন্ত্র্য সমীচীন আর কতখানি অসমীচীন—তা শুধু যদি ফল দিয়ে পরীক্ষা করতে হয়, তবে মীমাংসা ত কিছু হল না—ওতে সংঘর্ষেরই পথ খোলা থাকে।

তুমি যেন বলতে চাও ব্যষ্টি ও সমষ্টির মিলনটাই সহজ ও স্বাভাবিক—অমিলটাই অস্বাভাবিক। অমিলের যথেষ্ট ও ন্যায্য হেতু যেন নাই। তাই কি সত্যই? আমি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করবো। সমাজের দাবী বড় না ব্যক্তির দাবী বড়, এই দুটি আদর্শ নিয়ে সময় সময় দেখা যায় ব্যক্তি বিশেষের চেতনায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে—তখন সমস্যাটির জটিলতা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

শ্রীরামচন্দ্র নিজের স্বার্থকে বলি দিলেন (নিজের হৃদয়ের সার্থকতা, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ প্রভৃতি) সীতাকে বনবাস দিয়া প্রজারঞ্জনের, সমষ্টির স্বার্থের জন্য। কই, ব্যষ্টির ও সমষ্টির স্বার্থে তিনি সমন্বয় কর্‌তে পারলেন? গ্রীকদের মহাজ্ঞানী Socrates এথেন্স সহরের যুবকমণ্ডলীকে কুশিক্ষাদীক্ষা দিয়ে নষ্ট করছেন এই অভিযোগে যখন কারারুদ্ধ ও শেষ দণ্ডের অপেক্ষায় আছেন, তখন ভক্ত শিষ্যেরা কয়েকজন তার পালাবার বন্দোবস্ত করতে অনুমতি চাইল—তার মত এমন অমূল্য জীবন এমন ভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, তারা বললে। Socrates কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়া করালেন রাষ্ট্রের দাবী, citizen এর কর্ত্তব্য—আইন মেনে চলা। এ সব ক্ষেত্রে দেখছি ব্যষ্টিকে সমষ্টির কাছে বলি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকটাও আছে। ভিক্তর হিউগো তার Les Miserables উপন্যাসে দেখিয়েছেন একজন দাগী কয়েদী নাম ভাঁড়িয়ে (অবশ্য স্বভাবের পরিবর্ত্তনের ফলে।) একজন গণ্যমান্য ধনীপদস্থ পরোপকারী কোন সহরের Mayor হয়েছেন। কিন্তু একজন অতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ কর্ম্মচারীর সন্দেহ হয়েছে—এ জুয়াচুরী আবিষ্কার করেছেন ব'লে তার বিশ্বাস হয়েছে। এক সঙ্কটের মুহূর্ত্ত উপস্থিত, Monseier Madeleine স্বীকার করবেন কি করবেন না তিনিই Jean Valgean. যদি স্বীকার করেন তবে যে সমস্ত কাজ তিনি গড়ে তুলেছেন সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়; স্বীকার যদি না করেন তবে সত্যের অপলাপ, নিজের কাছে নিজে ছোট হওয়া অপরাধী হওয়া ব্যক্তিগত মর্য্যাদার ও মূল্যের হ্রাস। শেষে তিনি সমষ্টিকেই বলি দিলেন নিজের অন্তরাত্মার দাবী অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে। আজকাল যাঁহাদের বলা হয় Conscientious objecter বা civil resister তারাও চলেন এই পথে,—তাঁরা বলেন "সমষ্টি যে নিয়ম করে দেয় তা আমি যদি অন্যায় মনে করি আমার ব্যক্তিগত আদর্শ বা নীতির মানদণ্ড অনুসারে, তবে সে নিয়ম পালন করতে আমি বাধ্য নই, তা অমান্য করবার পূর্ণ অধিকার আমার আছে।" সমষ্টির দিক হ'তে অনেক সময় সাধুসন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ আনা হয় যে তাঁরা স্বার্থপর, —তাদের সিদ্ধি, মুক্তি প্রভৃতি একান্ত ব্যক্তিগত সার্থকতা বা স্বার্থের আদর্শ।

উদাহরণগুলি দিয়ে আমি এই কথাটি বুঝাতে চেয়েছি যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব যেখানে হয়েছে সেখানেই দেখি একটিকে আর একটির কাছে বলি দেওয়া হয়েছে—কে কোনটি বলি দিয়েছে নির্ভর করে তার মতিগতির উপর। এ দুটির সামঞ্জস্য একটা আদর্শমাত্র হয়ত—কিন্তু কার্য্যতঃ দেখতে পাই না, সেটি কি ভাবে সম্ভব হয়েছে বা হ'তে পারে। কোন কোন নীতিকার তাই এই রকম ব্যবস্থা দিয়েছেন যে

ব্যক্তির উপরে পরিবার, পরিবারের উপরে দেশ বা সমাজ ও সমাজের উপরে মানব জাতি, মানব জাতির উপরে ভগবান—এ সকলের মধ্যে যদি সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তবে সর্ব্বদা বড়টি বা উপরটির কাছে ছোটটি বা নীচেরটিকে বলি দিবে। সাধারণ জীবনে এ সকলের মিলনদ্বন্দ্বের প্রশ্ন উঠে না—সে প্রশ্ন উঠে মানুষ যখন চায় সজ্ঞান সজীব একাগ্র জীবন যাপন করতে। সাধারণ জীবনে হয়তো একটি মোটামুটি রকমের মিল র'য়ে গিয়েছে—কিন্তু তীব্রতর (intense) জীবনে সে মিলের কাঠামো ভেঙ্গে যায়।

অবশ্য আমার সব কথা বলা হয় নি—তোমার বক্তব্য শুনে তবে বলতে চেষ্টা করব।

ইতি

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(২)

আপনার চিঠি পেলাম, আমি 'জয়শ্রী'তে সমাজনীতি ও অর্থনীতির দিক থেকে লিখেছিলাম, লেখার সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমার মনে হয়েছিল যে Theory হিসাবে এ মীমাংসা সম্ভব হতে পারিলেও practically এর অনুসরণ সর্ব্বত্র সম্ভব নয়, তবে প্রশ্নকারিণীর প্রশ্নের ভাব বেশী গভীর ছিলনা, তাই ঐতেই চলবে বলে মনে করেছিলাম, কারণ আমি সাধারণ জীবন ও স্থূল স্বার্থ নিয়েই আলোচনা করতে চেয়েছিলাম আমি লিখেছিলাম সামাজিক ও অর্থনৈতিক point of view থেকে। সে নীতি মানুষের কল্যাণ কামনায় কাজ করলে ও তার লক্ষ্য বাইরের গতিবিধির দিকে। ধনসম্পদ, আর্থিক সুখসুবিধা, বাহ্যিক উন্নতি অবনতিকে কেন্দ্র করেই তার চলা ফেরা।

এই Point থেকে লিখলেও আমার মীমাংসা কার্য্যকরী হবার পক্ষে অনেক বাধা আছে। প্রথম এবং প্রধান বাধাই হোল, আমার মতে, মানব চরিত্রের ত্রুটি।

'উপযুক্ত সীমা' বলতে আমি একথা বলতে চাইনি! যে 'দুটিই বাড়তে থাকুক, বাড়তে বাড়তে যেই সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা যাবে অমনি থেমে যেতে হবে, আমি Prevention এর পক্ষপাতী, আমি বলতে চেয়েছি যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েই নিজের বিকাশ পথে চলবার সময় সচেতন থাকবে যাতে একে অন্যকে বিনাশ না করতে চায়। বিকাশ ও স্ফীতির পার্থক্য তাদের মনে রাখতে হবে, তারা যদি ভাইবোন হয় তবে তাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন থাকবে কলহ স্পৃহার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। আমার মনে হয় এভাবে বিকাশ ও স্ফীতির মধ্যে পার্থক্য বুঝে চললে তারা 'চোরের' মত যুক্তি দিতে চাবে না, মানুষ অনেক ক্ষেত্রে চোরের মত যুক্তি দেয় সত্য,কিন্তু তখন মানুষ ঐ যুক্তির ছদ্মবেশে নিজের লোভ বা ক্ষমতাপ্রিয়তা বা ঐ ধরণের কোন একটা মনোবৃত্তিকে চাপা দিতে চায় বলে আমার মনে হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে ও মীমাংসার পথে বাধা দেয় এই মানুষের আচ্ছন্ন মন। সাধারণ বিষয়ে ও স্থূল স্বার্থের Point থেকে ধরলেও আমার মনে হয় এই Practical difficulty প্রত্যেক theoryর পক্ষেই একটা মস্ত বাধা, (তাবলে অবশ্য আমাকে Cynic বলে মনে করবেন না)।

এখন আপনার দৃষ্টান্তগুলিতে আসা যাক, এ সব ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থে একটা সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য আছে। আপনার দৃষ্টান্তগুলি বাইরের বিষয় ছেড়ে অন্তরে প্রবেশ করছে তাই এখন আমি স্বার্থ কথাটিকেও সূক্ষ্ম করে দেখতে চাই, এখানে আমি স্বার্থ কথাটির অর্থ ধরবো স্ব-অর্থ অর্থাৎ নিজের অন্তরাত্মার প্রেরণা ও তারই সার্থকতা, সাধারণের ব্যক্তিগত সার্থকতা ও যে মানুষ আপনার মধ্যে একটা বিশেষ প্রেরণা নিয়ে

পৃথিবীতে এসেছে তার ব্যক্তিগত সার্থকতা, এক মাপ কাঠিতে মাপা যেতে পারে না, কাজেই এখানে ৩৬ ইঞ্চিতে এক গজ হয় তো হতে পারে কিন্তু গজ কাঠির চেহারা উপাদান চাই আলাদা, তাই এখানে স্বার্থ কাঠিরও উপাদান বদলে যাওয়া চাই, এখন এই মাপের আলোতে আপনার উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির আলোচনা করতে চাই।

শ্রীরামচন্দ্র সমষ্টির সন্তোষের জন্য সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন, এতে তাঁর ব্যক্তিগত হৃদয়ের সার্থকতা, জীবনের সুখ প্রভৃতি ব্যর্থ হয়েছিল সে ঠিক, কিন্তু সে স্থূলভাবে দেখ্‌তে গেলে। সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে এখানে এত বিরোধের মধ্য দিয়েও ব্যষ্টির ও সমষ্টির একটা সূক্ষ্ম সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয়। মানুষের স্বার্থ শুধু দৃষ্টিগোচর হয়, এরকম প্রেম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের মনের যা প্রকৃতরূপ তার অনুসরণ ও স্বার্থের প্রধান রূপ, এই হিসাবে সীতার বনবাসে শ্রীরামচন্দ্র যত দুঃখই পান, তাঁর অন্তরের স্বার্থ এতে ব্যহত হয় নাই। এ সমস্যা তাঁর জীবনে না আসলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু আসার পরেও তিনি যদি সমষ্টির স্বার্থকে উপেক্ষা করে সীতাকে বনবাসে না দিতেন তবে তিনি নিজের মনকেই এতটা অশান্তিময় করে তুলতেন, যে রকম দুঃখ বা অশান্তি সীতার বনবাসে ও তিনি পান নি। সীতার বনবাসের দুঃখ বেদনায় তাঁকে চূর্ণ করতে পারে কিন্তু অশান্তিতে পীড়িত করে নি। রাজা তিনি, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শক্তিমান শাসক, তিনি অনায়াসেই লোকমত উপেক্ষা বা বাহ্যতঃ দমন করে নিজের সুখভোগ বজায় রাখতে পারতেন, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সে সুখ ভোগ তৃপ্তিদায়ক হোলেও তাঁর নিজের মনের বিশিষ্ট জাতিই তাঁকে শান্তি দিত না, তিনি নিজেই এই সুখ সহ্য করতে পারতেন না, সীতা তাঁর বাহুপাশে থাকলেও আলিঙ্গন যেতো শিথিল হয়ে, রাজ-কর্ত্তব্য সম্পাদনের শক্তি ও দুর্ব্বল হোতো, একাজের বিনিময়ে হারাতে হতো, তাঁর অন্তরের প্রেরণা, নিজের নিজস্ব সত্তা; তাই সীতা নির্ব্বাসনের মধ্যেও আছে সমষ্টির স্বার্থ ও নিজের সূক্ষ্ম স্বার্থ-রক্ষার একটা অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি মহৎ সামঞ্জস্য।

Socrates যদি শিষ্যদের পরামর্শ মত পালিয়ে যেতেন, তবে মনের যে বিশিষ্টতায় তিনি আজ বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় সেই বিশিষ্টতার খর্ব্বতা ঘটতো। Socrates মহাজ্ঞানী, তিনি নিজেকে চিনতেন, তাই অন্তরাত্মাকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। রাষ্ট্রের দাবীরক্ষা তাঁর এই মনোভাবের ভাষা মাত্র, অনুভূতি ছিল আরও অনেক বেশী গভীর ও সত্য। যদি তিনি পালাতেন, তবে গ্লানিতে তাঁর নিজেরই অন্তর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠিত, শক্তি হারাতো, নিজেকে ফাঁকি দিতো। ব্যষ্টি সমষ্টির কাছে নিজেকে বলি দিয়েছে কারণ বাইরে সেটি বলির রূপ ধরলেও তাতেই সে আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশকে রক্ষা করতে পেরেছে, এ না করলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুইই আহত হোতো।

Les miserables থেকে যে ঘটনাটী দিয়েছেন সে ও ঐ এক জিনিষেরই পৃথক দিক, পার্থক্য শুধু এই যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আগের দৃষ্টান্তগুলিতে ক্ষতি দেখা যায় ব্যষ্টির পক্ষে, আর এতে ক্ষতি পড়েছে সমষ্টির উপরে। Jean valgean যদি সমষ্টির দিকে তাকিয়ে নিজের প্রকৃত রূপ গোপন রাখতেন, তবে মনের যে প্রেরণা তাকে দাগী চোর থেকে জনকল্যাণকামী করে তুলেছিল, অন্তরাত্মার যে উদ্বোধন শক্তি তাকে সমাজহিতে সক্ষম করেছিল, সেই শক্তিই যেত চূর্ণ হয়ে, এসব ক্ষেত্রেই যা ঘটেছে সেই হয়েছে প্রকৃত কল্যাণ, ব্যষ্টির পক্ষেও সমষ্টির পক্ষে ও ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থসামঞ্জস্য বলতে আমি একথা বলতে চাইনি যে দুদিকই আয়তনে সমান হবে। লক্ষ্য হওয়া উচিত কল্যাণ স্থান বিশেষের অবস্থা বিশেষের হিসাবে যে ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব বৃহত্তম কল্যাণ।

ইতি

শ্রীলতিকা গুপ্ত

তোমার প্রত্যুত্তরটী পেলাম। যে পথ দিয়ে গেলে আমার উহ্য কথাগুলি ধরা যাবে ও আমার মীমাংসায় পৌছান যাবে, আশা করছিলেম তুমি সেই দিক দিয়ে যাবে—তা তুমি ঠিকই গিয়েছ দেখে সুখী হলাম।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ তুমি আর্থিক হিসাবে দেখ, আর পারমার্থিক হিসাবে দেখ উভয় ক্ষেত্রে শেষে একই নিয়মে গিয়ে পৌছতে হয়। কারণ তুমি ত বলেছ গোলমালের গোড়া হল মানুষের চরিত্র বা প্রকৃতি। ব্যষ্টি বা সমষ্টির সমন্বয় হতে পারে—আর্থিক ও পারমার্থিক উভয় হিসাবে—ব্যষ্টির স্বভাবের শুদ্ধি উন্নতি রূপান্তর ঘটলে। মানুষের ভিতরের স্বভাব যতদিন দ্বন্দ্বময়, ততদিন তার ব্যক্তিগত রীতিনীতি ক্রিয়াকর্ম্ম এবং সমষ্টির ব্যবস্থাও হবে দ্বন্দ্বময়। ব্যষ্টির চেতনা যত গভীর যত উচ্চ হবে, তার কর্ম্ম যত গভীরের ঊর্দ্ধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হবে, তার জীবনে,—তার নিজের মধ্যে নিজের সাথে পারিপার্শ্বিকের সাথে, তার ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে—ততই এক নিগূঢ় সর্ব্বতোমুখী সমন্বয় ফুটে উঠবে। অবশ্য স্থূল দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তার ব্যক্তিগত অধিকার এখানে খর্ব্ব হয়েছে, তার সমষ্টিগত দায় ওখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিন্তু সত্য ত তা নয় তার মধ্যে উভয়েই সার্থকতা পেয়েছে। সুতরাং আমি যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়েছি, তা যে কেবল একদিককার সার্থকতার দৃষ্টান্ত তা নয়, সে সকলের মধ্যে উভয়দিককার সার্থকতার সূক্ষ্মসূত্র রয়ে গেছে—তোমার একথা আমি স্বীকার করি। তবে আমি বলব যে শ্রীরামচন্দ্র বা সক্রেটীস্ বা জীন ভলজীন যদি বিপরীত কাজটীই করতেন (অর্থাৎ তদনুরূপ চেতনা নিয়ে—অবশ্য তুমি বলতে পার যে বিপরীত কাজটী করবার মত চেতনা যদি তাঁদের থাকত তবে তাঁরা রাম বা সক্রেটীস বা জীন ভলজীন হতেন না, হতেন অন্য মানুষ) তবুও তাঁদের কর্ম্মের মধ্যে ঐ সামঞ্জস্যই ফুটে উঠতে পারত যে না তা নয়। আমি বলতে চাই এই যে বাইরের কাজকর্ম্ম আচার বিচার দিয়ে ভিতরের সার্থকতার বা "স্বার্থকতা"র—পরিচয় পাওয়া যায় না। ঠিকই গভীরের "স্ব"এর মধ্যে সে যত প্রবেশ করেছে—তার সত্তা পরের মধ্যেও ততখানি প্রসারিত হয়ে গিয়েছে। ভগবানের মধ্যে যার ব্যষ্টি "স্ব"ত্ব ডুবে গিয়েছে, বিশ্বসমষ্টির সাথে সেই একাত্ম হয়েছে। যদিও এ রকমের গভীরের সুদূরের সূক্ষ্মসামঞ্জস্য মানুষের সাধারণ বুদ্ধির ধরা না পড়বার খুবই সম্ভাবনা, মানুষের মধ্যে যে আদর্শের দ্বন্দ্ব ঘটে তার মূল কারণই এই যে মানুষ মনোময় জীব—আর মানস চেতনার ধর্ম্মই হোল দুটি বস্তুকে এক সাথে ধারণ করবার অসামর্থ্য। ভেদ, বৈপরীত্য, সংঘট আসে যতক্ষণ আমরা মনের গড়া আদর্শ নিয়ে চলি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মনকে ছাড়িয়ে আর কিছু বৃহত্তর ঊর্দ্ধতর গভীরতর চেতনার আলোক পাই, তখন দেখি অসামঞ্জস্যই অস্বাভাবিক সৃষ্টির স্বাভাবিক ধর্ম্ম হল সামঞ্জস্য। তবে প্রয়োজন এই মানসোত্তর চেতনা সত্যসত্যই লাভ করা।

ইতি

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

"ভানু চৌধুরীর ডায়েরী"

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

তেইশে জ্যৈষ্ঠ.......................

গরীবের ভাঙ্গা ইঁটবারকরা, চূণবালিখসা ছোট্ট বাগানে, রোজ সকাল ও সাঁজে, কত নব কিশলয় জাগে, বাতাসকে গন্ধ, ভোমরাকে মধু বিলিয়ে, আবার নিশঃব্দে ঝরে যায় পথের ধুলায়, কে তার খোঁজ রাখে? সেই অতি জীর্ণ বাগানের এক কোণে এক করবী গাছ ছিল। সহসা একদিন ভোরে দেখলাম, একটী সুন্দর অপরাজিতা লতিকা তাকে বেষ্টন করে নূতন আবির্ভাব হয়েছে।...................নিস্তব্ধ দুপুর বেলা নিজের ঘরে বসে সেতারটা একটু প্র্যাকটিস করছিলাম, দিনটা ছিল মেঘলা—এমন দিন কারই বা মাটী করে দিতে ইচ্ছে করে অলসের মত ঘুমিয়ে? এক সময় ঘরে ঢুকলেন মা, সঙ্গে একটী অপরিচিতা রমণী। মা বললেন, "ভানু, ইনি তোর মাসীমা হন প্রণাম কর্" আমি প্রণাম করে মাথা তুলতেই মাসীমা নীরবে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, "সই ভানু তোমার বড় ভালো ছেলে, সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর বরপুত্র" আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম মার চিরম্লান মুখখানি, আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "আমার ত ভাই মনে হয় ওর চেয়ে দুষ্ট ছেলে আর নেই। হ্যাঁ সই অলিকে দেখতে পাচ্ছিনে, সে কোথায়?" মাসীমার আহ্বানে অলি আমার ঘরে এল, পল্লীগ্রামের সতেজ সবল শ্যামল, দেবদারু বীথির মতই নবশ্রীমণ্ডিতা অলি—চাঁপাফুল রংএর খদ্দরের শাড়ীখানা ওকে বেশ মানিয়েছে, কালো কোঁকড়া চুলের দিকে ওর চাইলে চোখ ফেরানো যায় না। যাবার সময় মাসীমা বললেন, "তোমাদের বাড়ীর খুব কাছে আমরা এসেছি, ভানু, মাঝে মাঝে গিয়ে অলিকে একটু বাজনা দেখিয়ে দিও।" মা বল্লেন, "নিশ্চয়, রোজই যাবে সই" অলি চলে গেল—কিন্তু আমার মনোরাজ্যে সে চির মুর্ত্তিমতী হয়ে রইল.................................।

সাতাশে জ্যৈষ্ঠ.......................

সজল ছায়ায় ঘেরা, একটী শান্ত সন্ধ্যা। পশ্চিম দিকের খোলা বারান্দায় বসে, আমি অলিকে সেতার শেখাচ্ছিলাম! সম্মিলনীতে এতদিন সে এস্রাজ শিখত, আজ একমাস হ'ল সেতার নিয়েছে। মনের দিক দিয়ে এখনও সে ভীষণ শিশু, অতি চঞ্চলা। এখনও সেতার ধরতেই শিখলনা, যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, অমনি কাঁধের ওপর সেতারটা হেলান দিয়ে রেখে বাজাতে সুরু করে দিয়েছে, আমি চাইতেই খিলখিল করে হেসে উঠে, বিশেষ কারণে মনটা তেমন ভালো ছিল না—উঠে দাঁড়িয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললাম, "সেতার শেখা তোমার কাজ নয় অলি, আমি চললাম"—পলকে তার মুখের ভাব বদলে গেল ছলছল চোখে আমার কাছে

এসে বললে, "রাগ করলে ভানুদা" ? আমি একটু কৌতুক করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। কপট রাগের ছলে নীরব হইলাম। সে আবার বললে, "এবারের মত মাপ কর ভানুদা, আর কখনও এমন হবেনা"—আমি হেসে ফেলে বললাম, "কিন্তু একটা সর্ত্তে রাজী আছ ত" ? আঁচলে মুখটা মুছে সে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার পানে চেয়ে রইল। আমি বললাম, "একটা গান শোনাতে হবে" প্রতিবাদ না করে শান্ত মেয়ের মত সে অর্গ্যানে গিয়ে বসল। কয়েক মিনিট বাজিয়ে গাইল :—

"আজি যত তারা তব আকাশে,
সব মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে,"

আঃ, কি অপূর্ব্ব সুরের সমাবেশ। যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি সুন্দর গাইবার ভঙ্গী। সমস্ত রাগরাগিনী যেন ওর হাতের খেলার পুতুল। তখন সে গাইছিল :—

"নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া
মোর মাঝে আজি পড়েছে লুটিয়া
তব নিকুঞ্জে মঞ্জরী যত, আমার অঙ্গে বিকাশে"

এই কটা লাইন আমার মনের মাঝে ভীষণ ভাবে দাগ কেটেছিল, তাই ডায়েরীর বুকে টুকে রাখলাম..................।

উনত্রিংশে জ্যৈষ্ঠ..........................

আজ সকাল থেকে বৃষ্টি পড়েছে, কখনও জোরে কখনও ধীরে। ঝড়ো বাতাস আমাদের ফুল বাগানে ভীষণ ভাবে মাতামাতি কর্ছে। মনে হয় ঠিক যেন বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে লড়্ছে। জানলার ধারে বসেছিলাম। আমি কবিও নই লেখকও নই, তবু কেন জানিনা, সেই কাজল মেঘভরা সজল আকাশ, বর্ষাসিক্ত শ্যামলা ধরণীকে দেখতে বড় ভালো লাগছিল, আর মনে পড়ছিল কেবল, বর্ষার কবিকে। নিজের মনে আওড়াচ্ছিলাম "আজি আসিয়াছে ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলোচুল, চরণে জড়ায়ে বনফুল"—সহসা আমার কবিতার সুর গেল ছিড়ে। পিছন থেকে কে যেন ডাকলে "ভানুদা"। আমি পিছন ফিরতেই দেখি অলি। বলিলাম "এই বৃষ্টিতে কোথায় বেরোন হয়েছিল ? সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে বাঁকা হাসিতে ঠোঁট দুখানা রাঙ্গিয়ে তুলে অলি বললে, "আকাশের দিকে অনিমেষে চেয়ে, কার ধ্যানে বিভোর হয়ে তাকে কবিতা শোনাচ্ছিলে ? আমি ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। এরকম প্রশ্ন, আমায় কেউ কোনও দিন করেনি। কি জবাব দেব ভাবছি, এমন সময় আবার সেই বাঁকা প্রশ্ন, "নামটা শুনতেও কি বাধা আছে" ? আমি কিছু না ভেবে হঠাৎ বলে ফেল্লাম, "অলি তোমার হাতে ওটা কিসের চিঠি" ? ও উঠে দাঁড়াল মুখখানা অত্যন্ত অপ্রসন্ন করে বললে, "ওঃ, তোমায় বলতেই ভুলেছি, খোকার উপনয়ন, যেও কিন্তু—

আমায় এখনও অনেক বাড়ী নিমন্ত্রণ কর্তে যেতে হবে, নীচে মা অপেক্ষা করছেন, আচ্ছা আজ তবে চলি”—ওর মুখ দেখে এটা বেশ বুঝতে পারলাম যে আমার ব্যবহারে সে মনে কিছু দুঃখ পেয়েছে। একবার ইচ্ছে হল ওকে ফিরিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলি—ও যা শুনতে চায় তা আমি বুঝি, খুব ভালো করেই বুঝি, কিন্তু কেন আজ আমার মনটা মানুষের সঙ্গ কিছুতেই চাইছিল না। হয়ত চাইছিল, নির্জ্জনতার মাঝে একটা শান্ত সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করে, নিজেকে নিয়ে শুধু সেখানে মেতে থাকতে। মনটা যে আমার সত্যিকারের কি চাইছিল তা আমি নিজেই জানিনা—সে চাওয়ার না আছে সীমা না আছে শেষ? হাতের কাছের জিনিষ অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে দিয়ে দূরের জিনিষকে আয়ত্ত্বাধীন করবার একি বিপুল ব্যগ্রতা...........................

পাঁচুই আষাঢ়.............. ....

উৎসব মুখরিত উপনয়ন প্রাঙ্গনে হোম জ্বলছে। তাতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন মেসোমশাই। তাঁর পাশে বসে আছে মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়া বাস, হাতে ভিক্ষাঝুলি, ও বংশদণ্ড নিয়ে খোকা। কি স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র মূর্ত্তি। আমায় কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়ান হলনা, নীচে মাসীমা ডাকলেন পরিবেশন করতে। মেসোমশাইর এক বিশেষ বন্ধুর ছেলে, সিতাংশুর সাথে আমার আলাপ হল। সিতাংশু বড় লোকের ছেলে, তারই ছাপ কথায় হাসিতে পরিস্ফুট। সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রিত আত্মীয় বন্ধুতে গৃহ ভরপুর হযে উঠলো। হাতে কিছু কাজ ছিলনা চলে গেলাম বাগানে। উন্মুক্ত আকাশেব তলে দাঁড়িয়ে খোলা মাঠের হাওয়ায় মনটা ভীষণ হালকা বোধ হল। মনে পড়ল অলির কথা, আজ সারা দিন সে একবারও আমার সাথে কথা বলেনি। ওকি—ওই কামিনী ঝাড়ের পাশ থেকে কার শাড়ী দেখা যাচ্ছে? আর ওই যে রিষ্টওয়াচপরা হাত? মনের ভেতর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল। আশ্চর্য্য—হ্যাঁ আশ্চর্য্যই বল্তে হবে। মানুষের মনের রহস্য বোঝা ভার—কাল স্বেচ্ছায় যার সঙ্গ ত্যাগ করলাম, আজ সে মুখ ফিরিয়ে আছে বলে, তারই সঙ্গে একটী কথা বলার জন্য অন্তর লালায়িত। ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম, এখন লিখতে বসে মনে হচ্ছে, আমার তখন না যাওয়াই ছিল ভাল; আমি চেয়েছিলাম অলির মন নিতে, আর সে চেয়েছিল মৌখিক দুটো আমার কাছে ভালোবাসার বুলি শুন্তে। সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পেয়ে সে আমার কাছ থেকে সরে গেছে। সিতাংশু কামনা করেছিল ওকে তাই ও তার মাঝেই করলে নিজের প্রেমপ্রতিষ্ঠা। উঃ, ভগবান এযে আর সইতে পারিনা ঠাকুর··· অলি, অলি আঃ কি মিষ্টি নামটী তোমার অলি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও, সিতাংশুর প্রেমে নিজেকে ধন্য করো...

তেইশে আষাঢ়......

অলির একখানি চিঠি পেয়েছি আজকের ডাকে—অনেক দিন ওদের বাড়ী যাইনি, মার

ভীষণ অসুখ—মনটা বড় খারাপ—অলিকে বোধহয় আমি একটু ভালোবাসি, তা নাহলে, ওর চিঠি পেয়ে এতদুঃখের মাঝেও আনন্দ আসে কোত্থেকে ? ওর ছোট্ট চিঠিটুকু ডায়রীতে টুকে রাখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। "অনেক দিন তোমার সাথে দেখা হয়নি, এপথ কি একেবারে ভুলে গেছ ? তোমার মত মানুষের কাছে বিস্মৃতি অতি সহজেই ধরা দেয় সে কথা মানি, কিন্তু যাদের এত কাছে এসেছিলে তাদেরও কি ? তোমার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম। তারজন্য—তারজন্য ভানুদা আমায় ক্ষমা করবে কি ? তোমার কাছ থেকে চাইবার অধিকারও আমি হারিয়েছি—আজ তুমি আমার কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে দূরে নিয়ে গেছ, কিন্তু তারই ফলে ভানুদা, তুমি হয়েছ আমার ধ্যানজ্ঞানসর্ব্বস্ব। হয়ত তুমি হাসবে আমার এ চিঠি পড়ে মনে মনে বলবে, 'কি দরকার ছিল এ মেয়ের আমার কাছে এত কথা বলার ? কিন্তু আজ তোমার উপহাস সইতে আমি প্রস্তুত, ভানুদা—আমায় সিতাংশুর বাড়ী যেতে হবে, তার বেশী দেরী নেই, তার আগে যদি তুমি একবার আস তাহলে দিন পিছিয়ে, এমন কি বদলেও যেতে পারে—একবার আসবে কি ?"......অলি তুমি আমায় ডেকেছ, আমি যাব যতশীঘ্র পারি যাব।

পোনেরই শ্রাবণ......

......মৃত্যু মৃত্যু তুমি এত নিষ্ঠুর কেন ? কিসের জন্য তুমি চির মমতাময়ী মাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে ? কি অপরাধ করেছিলাম আমি ? বল অকরুণ বল, কোন পাপে তুমি আমার স্নেহ বঞ্চিত মাতৃহারা কর্‌লে ? আমি যে একা ওগো আমি যে বড় একা—মা, মাগো কার হাতে আমায় দিয়ে গেলে মা ? কাল অলির বিয়ে হয়ে গেল, মা নিজে হাতে তার উপহার কিনে রেখেছিলেন দেওয়া হলনা—আমায় একবার যেতেই হবে আমি যাব, তবে কাল নয়, তাহলে আমার এ ভাঙ্গাবুক একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে। বাদাম গাছের মাথায় চাঁদটা অমন হাসছে কেন ? আমার ষোল কলা সুখ দেখে ওর তাই কি হাসি উপচে পড়ছে ? আমি কাঁদছি আর ও হাসছে, কেন কিসের জন্য তা সহ্য কোর্‌ব ? জানালাটা বন্ধ করে দোব—এবার দেখি ও কার কান্না দেখে অত হাসে ?......

চব্বিশে শ্রাবণ......

হাসপাতালে শুয়ে আছি—আশে পাশে আমারই মত কত অভাগা যাদের দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজল জীবনের প্রধান বন্ধু। হায় ! শেষে আমার অদৃষ্টে এই ছিল ? অলিদের বাড়ী গিয়েছিলাম (তার স্বামীর বাড়ী) তার বিবাহের উপহার নিয়ে। সে কাঁদলে, আমায় দেখে অনেকক্ষণ কাঁদলে—আমি পলকহারা চোখে চেয়েছিলাম তার পানে—শ্রাবণ মাসে যেমন আকাশ ভরা কালো মেঘ গলে গলে ধরণীকে সিক্ত করে, ঠিক তেমন ভাবে তার সঞ্চিত বেদনা বর্ষিত হচ্ছিল। অলি ঠিক বলেছে, আমার মন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন—না পারলাম তাকে দুটো মিষ্ট বাণী উপহার দিয়ে সান্ত্বনা দিতে, না পারলাম নিজের ক্ষতবিক্ষত মনটা তার কাছে উন্মুক্ত করে ধরে, কিছু হালকা করে নিতে, কিছুই না—অলি বললে, "ভানুদা তুমি আর এসনা এখানে, ওর মেজাজ খুব

ভালো নয় যদি কখনও দরকার হয় এ অভাগিনীকে স্মরণ কোরো।" কিছুক্ষণ থেমে আবার বললে, "তুমি আমায় ভুল বুঝনা, ভেবোনা যে অলি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে, বলা যায় না ত স্বামীর মনে যদি বিষ ঢোকে, আমরা মেয়ে মানুষ তাহলে কি নিয়ে থাকবো ? আর ভেবে দেখ, তুমিই আমাকে তোমার মন থেকে সামান্য দোষে নির্ব্বাসন দিয়েছিল তারই ফলে আজ'—আমি বাধা দিয়ে বললাম, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন অলি, মানুষ যখন যে অবস্থায় থাক, সে সুখেরই হোক আর দুঃখেরই হোক, তাকে সুখ বলে মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই সবচেয়ে শ্রেয়ঃ। যদিও জানি সে পথে চলা খুব সহজ নয়, তবুও আমাদের চেষ্টা করা কি উচিৎ নয় ? অতীতের জের টেনে এনে বৃথা মন ভারী করে তোলা, বৃথা কষ্ট পাওয়া—সহসা আমার মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন কবিতার তৃতীয় পরিচ্ছেদটী

"ফুরায় যা দেরে ফুরাতে
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাসনেকো কুড়াতে
বুঝি নাই যাহা চাই না বুঝিতে
জুটিলনা যাহা চাইনা খুঁজিতে
পূরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পূরাতে
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস ফুরাতে…

আমি থামতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অলি বলে উঠল, "ধন্য তুমি ভানুদা, আর ধন্য তোমার মহত্ত্ব, আশীর্ব্বাদ করো দাদা, তোমার এই মহত্ত্ব অনুসরণ করে আমি যেন সংসারে আদর্শ রেখে যেতে পারি—"নত হয়ে সে আমার পায়ে প্রণাম করলে। যেই আমি হাত ধরে ওকে তুলেছি, ঠিক সেই সময় সহসা একটী পাথর সজোরে এসে লাগল আমার নাকে, চশমা গেল গুঁড়িয়ে, যন্ত্রণায় আমি বসে পড়লাম মাটীতে। সঙ্গে সঙ্গে টলতে টলতে ঘরে ঢুকল সিতাংশু—একটী অতি বিশ্রী গন্ধে ঘরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠল। আমার শরীরের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল—তারপর আর মনে নেই সেদিনের কথা……

শুনিলাম আজ পাঁচদিন পর আমার জ্ঞান হয়েছে। শরীর ভীষণ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, বেশ বুঝতে পাচ্ছি। জীবন বাতির তেল. ফুরিয়ে এসেছে, সলতেটাকে হাজার নাড়াচাড়া কর বেশীক্ষণ আর সে জ্বলবে না, প্রায় নিবে এল—সকালে এসেছিল, অলি ও সিতাংশু। আমায় তাদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে, কিন্তু সামান্য পাশ ফেরাও ডাক্তারের কঠিন নিষেধ। সজল

চোখে সিতাংশু আমার কাছে ক্ষমা চাইলে—বললে "ভানুদা তোমার প্রধান শত্রুকে ক্ষমা কর ভাই—তোমার জীবনের সকল অশান্তির মূল হচ্ছি আমি—তোমার নির্ম্মল ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে, মুখের গ্রাস কেড়ে নিলাম, সে হচ্ছে তোমার চির স্নেহের অলি"—অসীম পুলকে আমার সারা দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে এল, আঃ ভগবান মরণের পূর্ব্বে আমার অদৃষ্টে তুমি এত সুখ লিখেছিলে? এ সংসারে এখনও দু একজনের বুকেও আমার জন্য করুণা সঞ্চিত তবে আছে? আমি চলে গেলে তবে দুফোঁটা চোখের জল পড়বে? সিতাংশু তখন বলছিল, তারপর হিংস্র জন্তুর মত তোমায় নিজ হাতে ঠেলে দিলাম মরণের পথে— তাকে থামিয়ে আমি বললাম, ভুল বন্ধু ভুল তোমার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল—ধনীর মালঞ্চে গোলাপ জাগে, তার অসামান্যরূপে গন্ধে, কত পথিক মুগ্ধ হয়ে আদরে তাকে আপন বক্ষে ঠাঁই দিতে চায়, কিন্তু সে ফুলের অধিকারী একজন। ভ্রান্ত পথিক সে কথা বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয় না —আর তুমি যে বলছ আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী তুমি, এ ধারণাত তোমার ভুল সিতাংশু—কারণ সে দিনের সে রাত্রে তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেনা। তাই তোমার সে অপরাধ অপরাধ নয়—উঃ, বড় কস্ট আর লিখতে পাচ্ছিনা—এই বোধহয় আমার শেষ ডায়েরী লেখা, মৃত্যু, মৃত্যু এস এস—দ্রুত আরও দ্রুত এস বন্ধু—না হলে দেরী হয়ে যাবে, আমার গভীর ধ্যান ভেঙ্গে যাবে—তোমার তুহীন পরশ আমি অনুভব করছি সর্ব্বাঙ্গে—এস বন্ধু দ্রুত এস……

* * * * * *

বেনারস এক্সপ্রেসে একটী রিজার্ভ কামরায় দুইটী যাত্রী। ডায়েরী খানা বন্ধ করে রেখে, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মলয় শুধালে, 'মা এ কার ডায়েরী? বাবা আমাকে যত বই দিয়েছিলেন যাবার আগের দিন, তার মধ্যে ছিল। উঃ কি বুক ভাঙ্গা করুণ কাহিনী'—মলয়ের বিধবা জননী তখন অনিমেষে ডায়েরী খানার পানে চেয়েছিলেন, সে কি সৃষ্টিছাড়া চাহনি, পাগলকেও হার মানিয়ে দেয়—চোখের জলও বুঝি তার শুকিয়ে গেছে—এককালে সামান্য অভিমানে যে নদীর সৃষ্টি করত আজ সময় বুঝে সেও ছুটী নিয়েছে।

মেয়েদের শিক্ষা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

বর্ত্তমানে মেয়েদের শিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত, কি রকম শিক্ষা দিলে মেয়েরা সত্যই উন্নতি লাভ করবে, এনিয়ে দেশের উন্নতিকামী মনীষিবৃন্দ এ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা করেছেন।

মেয়েদের বর্ত্তমান শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করে আজ অনেকেই ভাবছেন এ পর্য্যন্ত যে ধারায় মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া চলেছে হয় তো, সে ব্যবস্থা সকল মেয়ের পক্ষে সমান উপযুক্ত হয়নি। একই জিনিস সকলের পক্ষে খাটে না। শিক্ষা সেইরকম ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান ভাবে চলতে পারে না একদল লোক মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলেছেন।

পুরুষ এবং মেয়ের কর্ম্মক্ষেত্র এক হলেও চলার পথ আলাদা। একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই কেন্দ্রে পৌঁছাতে তারা যাত্রা করলেও যেতে হবে আলাদা পথ দিয়ে। এ কথা সত্য একই পথে চলতে আগে পৌঁছানোর দিকে লক্ষ্য থাকে। এবং এইজন্যই ঝগড়া ঠেলাঠেলি চলে। মেয়েরা অনেক সময় প্রতিযোগিতায় সমান হলে ও তাদের এই প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য নষ্ট যায় এবং সে স্বাস্থ্যের, পুনরুদ্ধার জীবনকালে সম্ভব হয় না।

আজ যদি কেউ বলেন মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া ভালো নয়, এতে সমাজে বিশৃঙ্খলতা আসে, মেয়েরা চিরাচরিত প্রথা এবং তাদের স্বভাবগত কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র পুরুষদের পেছনে কেবল এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাই করে এ কথা বলা এবং মেনে নেওয়ার আগে মেয়েদের শিক্ষাধারা পরিবর্ত্তিত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। এ কথা বলতে পারি—পুরুষ ও মেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা একই সমান হওয়ায়, চলার পথ একই হওয়ায় প্রতিযোগিতোবৃত্তি মনে জাগার সম্ভাবনাই বেশী রকম—এজন্য তো চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

কেউ কেউ বলে থাকেন, মেয়েদের অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকাই উচিত ছিল। এঁরা চান এঁদের পিতামহী প্রপিতামহী প্রভৃতি যে ভাবে অন্তঃপুরে বদ্ধ হয়ে থাকতেন, বর্ত্তমানেও মেয়েদের তেমনই ভাবে থাকা দরকার। এ সম্বন্ধে তাঁরা বড় বড় পণ্ডিতদের নজির দিয়ে থাকেন, শাস্ত্র হতে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখান আধুনিক শিক্ষা মেয়েদের কোথায় নিয়ে এসেছে। এ শিক্ষায় গৃহের মাধুর্য্য নষ্ট হয়েছে,—মেয়েরা কেমলতা হারিয়েছে, স্বাস্থ্যও বিসর্জ্জন দিয়েছে, তাদের রুচি পর্য্যন্ত বিকৃত হয়ে গেছে।

আধুনিক শিক্ষার মধ্যে যে দোষ নাই একথা আমরা বলব না, কিন্তু সে দোষ কার,—কেবল কি মেয়েদেরই? বাংলাদেশে অনেক দিন স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে এবং এদেশের

মেয়েরাও অনেক দিন হতে শিক্ষালাভ করছে। গলদ কোথায় তা অনেককাল আগেই জানা গেছে এতদিন, এ শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তন করা উচিত ছিল।

আজ যদি বহুপূর্ব্ব যুগে আমাদের কোন মেয়ে কতখানি স্বাধীনতা পেয়েছিলেন, কতখানি উন্নতি লাভ করতে পেরেছিলেন, বলে মনকে সান্ত্বনা দিতে যাই, সেইটাই হবে আমাদের বোকামী কেন না সেই প্রাচীন আলোপূর্ণ যুগ ও পরের অন্ধকারময় যুগের পানে তাকালে এবং তুলনা কর্‌লে ঠকব আমরাই।

প্রথম যুগে আমরা পেয়েছিলুম স্বাস্থ্যবতী ও শিক্ষিতা মেয়েদের যাঁরা সত্যই জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে জাতির পথপ্রদর্শিতারূপে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর এসেছিল অধীনতার যুগ— যখন বাইরের লোলুপদৃষ্টি হতে মেয়েদের রক্ষা করবার সহজ উপায়স্বরূপ আবিষ্কৃত হয়েছিল অন্তঃপুর, বাইরের আলো বাতাস যেখানে সহজে যাতায়াত করতে পারেনি। এ দেশের ছেলে ও মেয়েরা প্রথম মানুষ হয়েছে সেই অন্ধকারময় বদ্ধ অন্তঃপুরে, প্রাথমিক শিক্ষালাভও করেছে তারা সেইখানে।

সেদিন যা হয় তো কেবল আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল আজ তাই হয়েছে প্রথা। মেয়েদের আজ অবরোধের বাইরে আসা কেউ কেউ তাই দোষাবহ বলে স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন।

এঁরা গোড়ায় গলদ দেখতে ভুলে গেছেন, দেখছেন কেবল অবরোধ প্রথার বাইরে আসা এবং আধুনিক শিক্ষার ফলে মেয়েদের কতখানি অবনতি ঘটেছে। অবরোধ প্রথা মেয়েদের কেবল দেহই নয় মনকে পর্য্যন্ত জড় করে ফেলেচে। একটা পাখীকে খাঁচায় বদ্ধ করে রাখার প্রত্যক্ষ ফল আমরা দেখতে পাই, জড়তা তার এমন মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায়, শেষ পর্য্যন্ত তাকে ছাড়লেও সে আর উড়ে যায় না, বন্দীত্ব জীবনটাই সে তখন পছন্দ করে এবং এই অবস্থাতেই মরে যায়। মেয়েদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম, এরাও অমনিভাবে অনেকগুলি রোগের সৃষ্টি করে নিজেদের দেহের মধ্যে তার মধ্যে যক্ষ্মা বা থাইসিসই সর্ব্ব প্রথম। নিজেরাই মরে যে সব ছুটি দিকে যায় তা নয়, এমন কয়েকটী সন্তানও রেখে যায় যারা চিররুগ্ন, যাদের ছাড়া দেশের সমাজের বা স্বদেশের কোন উপকার পাওয়া সম্ভবপর নয়।

অবরোধ ও চিরচলিত কতকগুলি সংস্কার এমনই করে জাতিকে নির্জ্জীব করে দিয়েছে, শিক্ষা না দেওয়ায় সংস্কারের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। এ দেশে মেয়েদের এবং শিশুদের মৃতুসংখ্যা সকল দেশের চেয়ে বেশী তার প্রধান কারণ অবরোধ, কুসংস্কার শিক্ষাহীনতা।

এই সব লক্ষ্য করেই মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া এবং অবরোধের বাইরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হয়েছিল। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কর্‌তে হবে এবং সেজন্য অন্তঃপুরের সংস্কৃতির

আবশ্যকতা এ দেশের চিন্তাশীল লোকেরা অনেক দিন আগে হতে বুঝতে পেরেছেন। তবে শিক্ষা যে কি রকমভাবে দিতে হবে, মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে এ চিন্তা তাঁরা পূর্ব্ব হতে করেন নি তাই মেয়েরা এপর্য্যন্ত ছেলেদের মত বিদ্যার্জ্জনই করে গেছে, সংসার যে তারাই সৃষ্ট করবে, মাধুর্য্যময় করবে, সেজন্য সংসারের খুঁটিনাটি তথ্য সব কিছুই যে জেনে রাখা দরকার সে কথাটা তারা তেমন ভাবে নি, যাঁরা তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা পূর্ব্বাবধি করেছেন তাঁরাও ভাবেন নি।

এমনই ভাবে চলতে চলতে আজ সমস্ত জাতিই এসে দাঁড়িয়েছে সন্ধিস্থলে, এখন দরকার হয়ে পড়েছে কি রকম শিক্ষা মেয়েদের পক্ষে সুষ্ঠু ও সুন্দর হতে পারে।

ইউরোপ বা আমেরিকার দৃষ্টান্ত নিয়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ফলে এ দেশের মেয়েদের বিশেষ কোন উন্নতি হবে না বলেই মনে করি। পাশ্চাত্যের শিক্ষার ধারা এদেশ এত দিন নিয়েচে কিন্তু বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যার দিকে তাকিয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক জাতি হতে পৃথক, প্রত্যেক দেশের শিক্ষার প্রণালী কতকটা এক হলেও প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ঠ্য যে শিক্ষার মুলে থাকে। এ দেশ নিজের বৈশিষ্ঠ্য হারিয়ে যদি পাশ্চাত্যের শিক্ষা সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে, যদি ওদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলে, সেটা এদেশের পক্ষে অনিষ্ঠকর হবে বলেই মনে হয়।

এদেশের মেয়েরা স্বভাবতঃই দুর্ব্বলা, শারীরিক শক্তির চর্চ্চা, খেলাধুলা প্রভৃতি তাঁরা তাঁদের জীবন হতে বর্জ্জন করেছে বললেই চলে,, তারপর অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে তারা নিজেদের এত বেশী ক্ষীণ করে ফেলে যাতে অন্য কোন কাজ করা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। পরবর্ত্তী জীবনে এই সব মেয়েরা নিজেদের ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে নিজেরাই অত্যধিক বিব্রত হয়ে পড়ে, যাতে আর কোন দিকে তাকানোর সময় পর্য্যন্ত পায় না।

তাই মনে হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হারিয়ে গেছে, শিক্ষায় যতটা সুফল পাওয়ার আশা করা গিয়েছিল ততটা পাওয়া যায় নি।

আমাদের এদেশের শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত পথ খুঁজে পায়নি। শিক্ষার পরিমাণ পুরুষ ও মেয়ের সমান হলেও যে নিয়মে পুরুষদের গড়ে তোলা যায় মেয়েদের সে নিয়মে ঠিক গড়া যায় না। পুরুষদের কাজ বাহির নিয়ে, মেয়েদের কাজ ভিতর নিয়ে। মেয়েদের কাজ গড়ে তোলা, এরই জন্য তাদের সংসার পাততে হয়, সে সংসার সাজাতে হয়, স্ত্রী ও মা হতে হয়। দেশ ও সমাজ, স্ত্রী ও মায়ের কাছ হতে উপযুক্ত স্বামী, উপযুক্ত সন্তান পাওয়ার আশা রাখে, দাবি ও করে তাই।

যে শিক্ষা পদ্ধতি এতদিন চলে আসছে আর কিছু কিছু সংস্কৃত হওয়া দরকার। একদিন যে আত্মনিষ্ঠা এদেশের মেয়েদের মজ্জাগত ছিল, বাইরে প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াতে, অবাধ সংমিশ্রণেও সে মর্য্যাদা তাঁদের ক্ষুণ্ণ হয় নি, আজ মেয়েদের সে পথ হতে এতটুকু সরে যাওয়াও প্রাণে বেদনা

দেয়। মেয়েদের শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করা দরকার, তার উপরে যত বড় ইমারতই গড়ে তোলা যাক, সে অটুট থাকবে, ঝড়বৃষ্টিতেও তার ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। এই ভিত্তি সংযম ও আদর্শের উপর গাঁথা হয়নি বলিয়া আমেরিকা আজ ভেসে চলেছে, ইউরোপ ভাস্‌তে বসেছে। পাশ্চাত্য দূরের পানে চায় নি, চেয়েছে বর্ত্তমান; সেখানকার নরনারী একই শিক্ষা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করেছে, অবাধ স্বাধীনতা লাভ করেছে ও একই পথে তারা পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলে অগ্রগমনের চেষ্টা করেছে। এর ফলে সেখানে জেগেছে অসংযম, এসেছে বাধা বিবেক শূন্য উচ্ছৃঙ্খলতা।

এ রকম শিক্ষা কোনদিনই মানুষকে মানুষ করে গড়তে পারে না। যে দেশ সম্পূর্ণ পরাধীন, অভাব অনটন যেখানকার লোকের চিরসাথী, দুর্ভিক্ষ মহামারী নিত্য যেখানে তাদের লীলাপ্রকট করছে সেখানে চাই গড়ার চেষ্টা পুরুষ ও মেয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা না থেকে সহযোগিতা স্থাপন করা, স্বাস্থ্যপূর্ণ সন্তান গঠন করা। মেয়েরা বাইরে আস্‌বে, শিক্ষালাভ করবে নিজেকে কেবল নিজের জন্যই ভাববেনা, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য নিজের আবশ্যকতা বুঝবে। কেবলমাত্র উচ্চ ডিগ্রি পাওয়াই জীবনের পরম উদ্দেশ্য নয়, পরম ও চরম উদ্দেশ্য জাতিকে গড়ে তোলা। শিক্ষা জীবনের সহায়তাকারী, জীবনকে সুন্দর ও রমনীয় করতে, গৃহকে মাধুর্য্যময় করে তুলতে, বন্ধুর পথ সহজ ও সরল করতে, বাইরের জগতের, সঙ্গে আদানপ্রদান কর্‌তে চাই শিক্ষা।

যে সব মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পেয়ে দশের ও দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, সকলকে মানুষ করে গড়ে তোলার ভার যাঁরা হাতে নিয়েছেন, শিক্ষার সংস্কৃতি কর্‌তে পারবেন তাঁরাই। মেয়েদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ঠিক করে দেওয়ার সময় এসেছে, যে ধারায় শিক্ষা দেওয়া চলছে, এর কতক বদলে দেওয়া দরকার—তাঁরা তা বুঝে ব্যবস্থা করবেন এ আশা করা যেতে পারে।

যাঁরা কেবলমাত্র মেয়েদের শিক্ষার উপরে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হন, তাঁদেরও উচিত মেয়েদের বাল্য হইতে সংযম শিক্ষা দিতে হয়,—শিক্ষা বলতে কেবল পুঁথিগত শিক্ষাই বুঝায় না।

সব দিক দিয়ে আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে যত ক্লেদ জমেছে, মুছে যাবে এবং ভবিষ্যতে ক্লেদ জমতে পারবে না। এদেশের বুকে আবার জাগবে মেয়েদের প্রতি পুরুষের আন্তরিক সম্মান যা তারা হারাতে বসেছে। এ দেশের বুকে আবার জাগবে বিশ্ববারা, উভয়ভারতী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী ও গার্গী মৈত্রেয়ী আবার তর্কসভায় দেখ্‌তে পাওয়া যাবে মেয়েদের দৃপ্তমুখ,—চক্ষুতে অলৌকিক প্রতিভা।

সেই ভবিষ্যতের জন্য এ দেশের মেয়েরা শিক্ষা পাবে—ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের পাথেয় সঞ্চয় করবে; বর্ত্তমানকেই সার বলে জানবে না।

তালতলা পাব্‌লিক লাইব্রেরী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

(১)

সন্তান-নিরোধ বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য কিনা?

অধ্যাপক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ

সাংখ্যকার বলিয়াছেন, দুঃখং ত্রিবিধং—আধ্যাত্মিকং, আধিভৌতিকং, আধিদৈবিকং। বর্ত্তমান ভারতে বিশেষতঃ বাংলাদেশে সেই তিন দুঃখ নূতন রূপ নিয়াছে ; যথা, অন্নং, বস্ত্রং বহুসন্তানঞ্চ, অন্ন ও বস্ত্রসমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু এই বহুজনন-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কোনও আলোচনা দেখিতে পাই না। এ দুঃখের প্রতিকার না হইলে অন্নবস্ত্রের সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে।

Thomas Hardy তাঁর Jude the Obscure-এ কথাটা তুলিয়াছেন। জুড্ ও তাঁর প্রণয়িনী মনের আনন্দে ঘরকন্না করিত and allowed the nature to take its own course. তার পরিণাম হইল—প্রতি বৎসর একটি করিয়া সন্তান লাভ। অর্থাভাব ঘটিল, মাথা গুঁজিবার স্থান মেলে না। তখন বড় ছেলেটি ছোট দুইটি ভাইকে মারিয়া নিজে আত্মহত্যা করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গেল,—We have killed ourselves because we are too many! বহুসন্তান যে পরিবারের কি অশান্তি লইয়া আসে তা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন।

শাস্ত্রী মহাশয়েরা অবশ্য এসব কথার খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন এবং বিদেশী শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। শোনা যায়, বিভীষণ যখন রামের নিকট আসেন, তখন তিনি একটা দিব্য করেন যে—"যদি মিথ্যা বলি বা শঠতা করি, যেন কলিতে শতসন্তানের পিতা হই।" লক্ষ্মণ হাসিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, "লক্ষ্মণ! বিভীষণ ঠিক কথাই বলিয়াছে। কলিতে বহুসন্তানের পিতার ন্যায় দুঃখী আর কেউ নাই।" বাল্মীকি কবি ঋষি, বড় খাঁটি কথা বলিয়াছেন। তবে শাস্ত্রী মহাশয়েরা তাঁহাদের স্মৃতির বচন ত ভুলিবেন না। যাক্, নবজাগ্রত ভারত আজ আর স্মৃতির সূতায় বাঁধা নয়, মনুকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু মানব-শাস্ত্রকেই মানিয়া চলে।

খবরের কাগজে পড়িয়াছি, কাশীতে ৮৪ বৎসর বয়সে এক বৃদ্ধা দেহত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, প্রপৌত্র ও প্রদৌহিত্রের একখানা গ্রুপ্ ছবি তোলা হয়; লোক সংখ্যা মাত্র ৯০। বাঙ্গালী বড় prolific জাত। কিন্তু এই ভাবে Geometrical progression-এ আমরা যদি বৃদ্ধি পাই,

আমাদের অন্নের সমস্যা সমাধান হইবে কি করিয়া? ইহার উত্তর হইবে, "ভয় কি, বাংলার ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, অর্দ্ধাহার, অল্পাহার কচুরিপানা, কলেরা বসন্ত বাঁচিয়া থাক, সব ঠিক হইয়া যাইবে।' কিন্তু কুইনিন, এ্যান্টিমনি, কমিশন যে Equilibrium এ বাধা দিতে চায়! নূতন জমি তৈরী হইতেছে না, জমির উৎপাদিকা শক্তির একটা সীমা আছে, সীমা নাই কেবল প্রজাবৃদ্ধির। যুদ্ধ, মড়ক, দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও এদেশে প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে! কাজেই সময় আসিয়াছে আজ এ কথা ভাবিয়া দেখিবার।

চোখের সামনে দেখিতেছি, ডেপুটি, মুন্সেফ, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার মাষ্টার ২৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতেছেন ১৫ বছরের মেয়ে। ৩৫ বছরে স্বামী হইলেন অর্দ্ধ-ডজন সন্তানের পিতা! এবং দশ বছরে ৬টি সন্তানের জন্ম দিয়া পত্নী হইলেন স্বর্গগতা! পিতা তখন দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে মনোনিবেশ করিতেছেন। এ রকম কেন হয়? কারণ আমাদের দেশে শিক্ষিত মানুষেরা ভাবে না। এমন গতানুগতিকত', গড্ডালিকা-প্রবাহ বিশ্বে দুর্লভ! কোন দুর্ঘটনা ঘটিলেই "ত্বয়া হৃষীকেশ" বলিয়া সান্ত্বনা পাই, অদৃষ্টের দোষ দেই এবং সজোরে কোষ্ঠি আলোচনা করিতে বসিয়া যাই। এটা বুঝি না যে, God helps those who help themselves, প্রকৃতি পশু হইতে আমাদের পৃথক করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? বিচার-বুদ্ধি দিলেন কেন? এ 'কেন'র উত্তর কে দিবে? তাই বলি, আমাদের শিক্ষিত সমাজেও এত Phenomenal ignorance রহিয়াছে যে শঙ্কিত হইয়া উঠিতে হয়। চীনদেশে একটা কথা আছে—"As foolish as a scholar." অনেক সময় তাই দেখি যে, পয়লা নম্বরের মূর্খ একজন পয়লা নম্বরের এম-এ!

একবার এক হিন্দুধর্ম্মের গৌরব সভায় এক শাস্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতা শুনি। কোন এক অভাজন বলিলেন, অল্প বয়সে সন্তানের জননী হইয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়, জননীকে অচিরেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়। শাস্ত্রীমহাশয় হস্ত-পদ-শির-সঞ্চালনে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "তাতে ক্ষতি কি? কর্কটী সন্তান প্রসবের পরই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। নারীও যদি সন্তানের জন্ম দিয়া স্বামীর কোলে স্বর্গলাভ করে—সেত' গৌরবের কথা।' এই কাঁকড়ার যুক্তিতে চারিদিকে করতালি পড়িয়া গেল। এই ত আমাদের দেশ!

আর একটা ঘটনা মনে পড়ে। কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন বধূকে প্রসবের জন্য হাসপাতালে আনা হইল। Abdomen open করিয়া সন্তান প্রসব করানোর পর Sister দয়াপরবশ হইয়া সেই বধূর শিক্ষিত স্বামীকে বলিলেন, "আপনার দু'টি সন্তান হয়েছে। পুনরায় সন্তান হলে আপনার স্ত্রীকে বাঁচানো যাবে না। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে ভবিষ্যত যাতে সন্তান না হয় তার উপায় আমরা ক'রে দিতে পারি।" তখন সেই সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত মহাপুরুষ বলিলেন, "আমার স্ত্রী যদি মারাই যায়, কি কোরব। আবার বিবাহ করা যাবে। কিন্তু তা বলে সন্তান-নিরোধ করা যেতে পারে না।" ঠিকই ত, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—ভার্য্যার আর ত' কোনও প্রয়োজন নাই। কামাল পাশা হইলে এমন লোককে প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করিয়া হত্যা করিতেন; এবং সেটাই হইত ন্যায্য বিচার। এমন হৃদয়হীন পুরুষ বাংলার পথে-ঘাটে মেলে। অথচ আমাদের শাস্ত্রেই বলে, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।" আমেরিকার একজন পণ্ডিত Dr. Bloomfield হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্ম বুঝিয়া লিখিয়াছেন, "Fluidity in principle, rigidity in practice" অর্থাৎ মুখে বলিব—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," কাজে কিন্তু নমঃশূদ্রের ছায়া মাড়াইলে গঙ্গাস্নান করিব। ভণ্ডামি এ জাতের অস্থিমজ্জায়। খ্রীষ্টান ভায়াদের মত মুখে সব মানুষই এক ভগবানের সন্তান, কিন্তু সাদা কালোর গোরস্থান পর্য্যন্ত আলাদা!

যাক্, অনেক অবান্তর কথা বলিতে হইল, এই প্রজা-সমস্যার সমাধান ফরাসী জাতি করিয়াছে। কয়েকটা Census-এ দেখা গিয়াছে, ফরাসী জনসংখ্যা প্রায় সমান রাখা হইয়াছে। মজুর ও চাষাদের বহুসন্তান এখনও হইতেছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজে সর্ব্বত্র সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত। কোনও পিতা-মাতার তিনটির বেশী সন্তান নাই। সন্তান পাঁচ বছরের হইলে তবে তাঁহারা দ্বিতীয় সন্তান পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইউরোপে যে এত সবল সুস্থ মানুষ দেখি, তাব কারণ, শুধু জল-বায়ু ও স্বাধীনতা নয়; সেখানকার মানুষ জড় নয়, তাহারা সর্ব্বদা জাগ্রত, প্রত্যেক ব্যাধির প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট। ত্রিশ বৎসর বয়সে জরাজীর্ণ দেহে, চোখে চশমা দিয়া যে আমরা ভাগবত পাঠে মনোনিবেশ করি, ইহা অতি সত্য কথা। ওদের দেশে যাট বছরে Gladstone মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। সত্তর বছর বয়সে Morley এমন বক্তৃতা দেন যে, লোক অবাক্ হইয়া যায়।

আমাদের জীবনে উপভোগের সময়ই পাই না। ২৪ হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুল-কলেজের তাড়ায় অস্থির, তারপর চাকুরির তাড়া! (অনেকের ভাগ্যে তাও জোটে না)। নববধূ আসিয়া জীবনের ফুল ফোটায়। কিন্তু সে ক'দিন! এক বছর পরেই সন্তান আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিল - ডাক্তার, কাঁথা, বোতল বোতল Horlicks milk, কান্না, রাত্রে অনিদ্রা, Dyspepsia,—প্রাণকণ্ঠাগত! স্বামী বেচারী আশ্রয় নিলেন তাসের আড্ডায় বা ক্লাবে। কিন্তু পত্নীর ত' পরিত্রাণ নাই! সে বেচারী নিজেই অশিক্ষিতা বা অল্প শিক্ষিতা, না আছে তার অভিজ্ঞতা, না আছে সহিষ্ণুতা। আছে কেবল অপরিসীম স্নেহ। কাজেই দিন, রাত্রি সন্তানপালনের দায়িত্ববহন, সামান্য ত্রুটিতেই স্বামীর নিকট তিরস্কার, বৎসর পরেই পুনরায় সন্তান লাভ! হয় সন্তান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল নয় পত্নীকে লইয়া চেঞ্জে যাইতে হইল পুরীতে। তার পরেই সব শেষ! আবার নূতন পত্নী আসিল, আবার সেই পূর্ব্বকার জীবনের পুনরাবৃত্তি—এই হইল মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর stereotyped জীবন-কথা!

বিবাহের পর অন্ততঃ পাঁচ বৎসর সন্তান নিরোধ একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সমাজে পুরুষের বিবাহ হয় পঁচিশে, মেয়েদের পনর'য়। কাজেই পুরুষের বয়স যখন তিরিশ, নারীর বয়স তখন কুড়ি। পিতা-মাতা হইবার উহাই উপযুক্ত বয়স। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহের পর কিছুকাল পতি পত্নীগত এবং পত্নী পতিগত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। দায়িত্বহীন জীবনের মধ্যে একটা মাধুর্য্য আছে, সেটা বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। পাঁচ বৎসরে স্বামী স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া মনের মানুষ করিয়া তুলিতে পারেন। এই সময় জননীর দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু শিক্ষালাভও প্রয়োজন। উপযুক্ত বয়সে সন্তান জন্মিলে শিশু সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্য লইয়া জন্মিতে পারে। শিক্ষিতা মাতার তত্ত্বাবধানে শিশুর মানুষ হওয়া সহজ হইয়া উঠে। শিশু যখন পাঁচ বৎসরের বালক, তখন প্রয়োজন হইলে আবার সন্তান আবাহন করা যাইতে পারে।

একটি ছেলেকে শিক্ষা দিতে মাসিক কুড়ি টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকার প্রয়োজন। একটি মেয়েকে শিক্ষা দিয়া বিবাহ দিতে চারপাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের আয় মাসিক একশ হইতে দুইশত টাকা। এই সামান্য আয়ে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে মানুষ করাই কঠিন। কাজেই, কোন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীই দুই তিনটি সন্তানের বেশী ভার নিতে পারেন না। সন্তানের পিতা হওয়া খুবই সহজ, কিন্তু তাহাদের ভরণপোষণ এবং শিক্ষা দেওয়া মোটেই সহজ নয়। কাজেই, সন্তান-নিরোধ আমাদের আত্যন্তিকী দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়।

চোখের সম্মুখে নিত্য নিয়ত দেখিতে পাইতেছি, রুগ্না মাতা পাঁচ ছয়টি সন্তানকে কোলে কাঁখে করিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম করিতেছেন। কি দুঃখ, কি যন্ত্রণা, কি অশান্তিপূর্ণ সেই ছবি! অথচ নির্ব্বোধ পিতার এ সম্বন্ধে কোন খেয়াল নাই। এই দুঃখ যে তার নিজের সৃষ্টি সে একবারও তাহা ভাবিয়া দেখে না। তার আয় বাড়ে না, কিন্তু প্রতি বছর ব্যয় বাড়িয়াই চলে! ডাক্তারের আগমন নিত্য, মৃত্যুর দূত মাঝে মাঝে হানা দিয়া যায়, অভাবের তাড়নায় শুষ্ক, নিষ্পেষিত হইয়া জীবনে ধিক্কার দিতেছে অথচ—
"দোষ কারও নয় গো শ্যামা, আমি স্ব-খাত সলিলে ডুবে মরি।"

সন্তান-নিরোধ দ্বারা আমরা অনেক অশান্তি, অনেক অভাব, অনেক দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি। প্রত্যেক বিবাহিত মানুষের হাতে একখানা করিয়া Dr. Marie Stopes এর Married Love এবং Wise Parent-hood থাকা উচিত এবং বিবাহের সময় এই এর চেয়ে প্রয়োজনীয় প্রীতি-উপহার আর কিছু হইতে পারে না। লোকে হয়তো বলিবে, বিবাহ একটা স্বপ্ন, সেখানে এমন বাস্তবের ধাক্কা দেওয়া উচিত নয়। মিথ্যা কথা। বিবাহটা একটা খাঁটি সত্য, সৃষ্টি রহস্যের সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্র। তাই বলি—Ignorance is never a bliss. দায়িত্বপূর্ণ জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহার সকল দিক বিচার করিয়া দেখা দরকার। আগে ফাঁসি পরে বিচার—বড়ই হাস্যরসাত্মক!

বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবন দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীবনের ধারা কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ব্যক্তির জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে শান্তি চাই। শৃঙ্খলা চাই, অবসর চাই, আনন্দ চাই। বহুসন্তান ইহার অন্তরায়! শৃগালী শত সন্তান প্রসব করে—সিংহী এক সন্তানের জননী। একশ্চন্দ্র তমঃ হন্তি, ন চ তারা গণৈরপি। শিশুর কলহাস্য-মুখরিত সংসার—স্বর্গ; কিন্তু অভাব-পিষ্ট, রোগযন্ত্রণা-কাতর বহুসন্তান পীড়িত সংসার নরক মাত্র। কাজেই আমাদের সাবধান হইতে হইবে। নতুবা দিন দিন ব্যক্তির জীবন পঙ্গু হইয়া যাইবে, ব্যক্তির জীবন পঙ্গু হইলে জাতীয় জীবনে কোনও উন্নতি হইতে পারে না।

পূর্ব্বাচল

(২)

জনতার মধ্যে মেয়েদের লইয়া যাইবার নির্ব্বুদ্ধিতা

তামাসা দেখিতে বা অন্য কোন কারণে যেখানে স্ত্রী পুরুষের অত্যন্ত বেশী ভিড় হয়, সেখানে যে নানাপ্রকারের দুষ্ট লোক নিজেদের অসদভিপ্রায় সাধনের সুযোগের সন্ধানে আসিবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কাজেই, এইরূপ স্থানে যে স্ত্রীলোকদের নানাবিধ লাঞ্ছনা ও অপমান ঘটিবে তাহা কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত নহে। কলিকাতায় যে সকল নারী জুবিলি উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে নানাভাবে লাঞ্ছিতা হইয়াছেন, কিন্তু দিল্লীর মিনাবাজারের ব্যাপারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষণীয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত আসফ্ আলির বিবৃতি অনুসারে এখানে সহস্র সহস্র দর্শকের চক্ষের সম্মুখে নারীরা লাঞ্ছিতা হইয়াছিলেন এবং অনেকের নিতান্ত অসহায় অবস্থা হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। পল্লী অঞ্চলেও নানা উৎসব বিশেষ করিয়া মেলা প্রভৃতি উপলক্ষে যেখানে বহুসংখ্যক নারী ও পুরুষের একত্র সমাবেশ হয় এমন অনেক স্থানেই, মেয়েদের নানাবিধ লাঞ্ছনা হয় এবং অনেক সময় অপহরণ ইত্যাদিরও সংবাদ পাওয়া গিয়া থাকে। তীর্থ ক্ষেত্রে, মন্দিরে এবং যোগাদির সময়ও এই প্রকারের অনেক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিপক্ষে, মেয়েদের বাহিরে গমনাগমন আদৌ পছন্দ করেন না, খুবই ভদ্রভাবে এবং ভদ্রবেশে তাঁহারা বাহিরে চলাফেরা খেলাধূলা বা কাজকর্ম্ম করেন তাহার পক্ষপাতী যাঁহারা নহেন; যাঁহারা আজীবন ইহাদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া, আত্মরক্ষায় অক্ষম ও জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা রক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া এই অসহায় ও বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে মেয়েদের লইয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করেন না এবং দেখিয়া বা ঠেকিয়াও তাঁহাদের শিক্ষা হয় না। ইহা একদিকে আমাদের কাপুরুষতা ও অন্যদিকে আমাদের বিবেচনা ও সম্ভ্রমজ্ঞানের অভাবের সূচনা করে।

সাধারণ সময়ে যদি আমাদের মেয়েদের বাহিরে চলাফেরা করার অভ্যাস থাকিত তবে কতক পরিমাণে তাঁহাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকিত, বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকিত এবং সাধারণ লোকেরও মেয়েদের বাহিরে দেখিবার অভ্যাস থাকিত। তাহার ফলে, এই প্রকার সঙ্কট ঘটিবার আশঙ্কা অনেক কমিয়া যাইত।

তবুও, যেখানে সম্ভ্রমহানি বা বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে এমন স্থানে রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া পুরুষের গমনও যেমন কেহ সুবুদ্ধির কার্য্য বলিবেন না, তেমনই স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মেয়েদের সম্বন্ধেও সে কথাটা মনে রাখিবার প্রয়োজন থাকিবে।

বোধ হয় পুরুষদের সহিত ভ্রমণ আমাদের সমাজে কতকটা নিন্দনীয় বলিয়া পর্দ্দানসীন মেয়েরা যখন বাহিরে যান তখন সাধারণতঃ তাঁহাদের ৮।১০ জনের রক্ষার জন্য ২।১টি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মাত্র তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। * * * * * *

আমাদের নীতিজ্ঞানের একটি দিক

জাতিহিসাবে মেয়েদের উপর আমরা খুব শ্রদ্ধাশীল বলিয়া মনে মনে আমরা গৌরব অনুভব করিয়া থাকি, যদিও আমাদের অবরোধ প্রথা ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করে। ইহার দুই দিকে দুইটি কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। একদিকে যে সকল নারীকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি এবং স্নেহ করি, তাহাদেরও পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে চাই এবং অন্যদিকে একথা বলিতে চাই যে, সুযোগ সুবিধা পাইলেই আমাদের পুরুষেরা নারীদের অপমান করিতে পারেন। আমাদের নিজেদের দুর্ব্বলতা এবং আত্মচরিত্রের উপর বিশ্বাসের অভাবজনিত শঙ্কা হইতে ইহার প্রথমাংশের উদ্ভব হইয়াছে। আর লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে সমাজের নৈতিক আদর্শের কথা বিচার করিলে, ইহার দ্বিতীয়াংশকে অনেকটা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ আমাদের সমাজের সাধারণ নীতি অনুসারে কোন পুরুষ নারীকে অপমান করিলে সমাজে অপেক্ষাকৃত অনেক কম নিন্দিত হন। অপেক্ষাকৃত এইজন্য বলিলাম যে, কোন নারী যখন কোন প্রকারে অপমানিত হন তখন তাহাতে তাঁহার কোন হাত না থাকায় তাঁহার কোন নৈতিক অপরাধ বা ত্রুটি হয় না, এবং তাহার জন্য তাঁহার নিন্দিত হইবার বা শাস্তি পাইবার কোন সঙ্গত কারণ থাকে না। তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা ইহাতে বিশেষ লজ্জা এবং গ্লানি অনুভব করিয়া অথচ, কোন পুরুষ সুযোগ পাইয়া যদি কোন নারীকে অপমান করে তবে নীতি ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়া ইহার সমস্ত অপরাধ ও দায়িত্ব তাহার। কিন্তু, পূর্ব্বকথিত নিরাপরাধা নারীর তুলনায় সামাজিকভাবে তাহাকে অনেক কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে ও লজ্জা পাইতে হয়।

নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাকে যে আমরা কতটা দাম দিই, ইহাতে তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইবে। * * * * *

হিন্দুনারীদের স্বাধীনতা ও শিক্ষা

ভৌগলিক ভারতবর্ষ এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর বাহির হইতে এবারকার হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাহিরের হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংযোগের পথ কার্য্যতঃ যেমন কতকটা প্রশস্ত হইল, তেমনই অস্পৃশ্যতা, মেয়েদের অবরোধ প্রভৃতি যে সকল কুসংস্কার ও কদাচার ভারতের হিন্দু সমাজকে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের লোকের সংস্পর্শে, উপদেশ ও চেষ্টায় তাহা দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা বাড়িল। হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা ও অবরোধ প্রথার উচ্ছেদের জন্য বর্ত্তমান সভাপতি তাঁহার সাধ্যমত সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু হিন্দুসভার অন্যতম সম্পাদক ভাই পরমানন্দ, হিন্দুরা অধিকতর শক্তি অর্জ্জন করিয়া নারীরক্ষায় সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত নারীদিগকে স্বাধীনতা বা শিক্ষা দান করিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি পূর্ব্বেও একবার এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হিন্দুরা যে নারীরক্ষার জন্য যথেষ্ট উদ্যম ও শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুরা, তাহা তাঁহাদের পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্কের কথা। তবে, আমরা একথা মনে করি নারীরা যদি স্বাধীনা ও শিক্ষিতা হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা আত্মরক্ষায় অধিকতর পটু হইতে পারিতেন। একথা যদি সত্য নাও হইত, তবুও আমরা চাহিতাম না যে, হিন্দুরা বা অন্যেরা কোন প্রকার ভয়ে ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়িয়া দিয়া বা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া নিজেদের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখুন। এই নীতি অবলম্বন করিলে হিন্দুসভা বা অন্য কোন প্রকার প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন ছিল না। অত্যাচারীর ভয়ে যাহারা নিজেদের অধিকারের সঙ্কোচসাধন করিয়া অত্যাচারীকে পথ ছাড়িয়া দিতে পারে, তাহাদের নিরাপদে থাকিবার পক্ষে বাধা হইবে না বটে, কিন্তু বুঝিতে হইবে তাহাদের মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার দিন ফুরাইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া মনুষ্যত্বের মূল্যে আমরা নিরাপদ অবস্থা ক্রয় করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এই কাপুরুষতা ও দুর্গতি।

আজ কেহ ভয় দেখাইয়া রাস্তা চলিতে নিষেধ করিলে, আমরা রাস্তায় চলা বন্ধ করিব, কা'ল কেহ ঘরের বাহির হইতে নিষেধ করিলে, ঘরের বাহির হইব না এবং এইরূপে আত্মরক্ষা করিতে থাকিব, কোন লোকের নিকট হইতেই এই প্রকার উপদেশ আমরা শুনিতে চাহি না।

নিজেদের অধিকারের সঙ্কোচসাধন করিয়া নয়, নিজেদের সর্ব্বপ্রকার অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখিয়া যাহাতে সকলে নিরাপদ থাকিতে পারে তাহাই সকল ব্যক্তির এবং সকল সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রকার অধিকার রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিবার মত লোকের অভাব যখন কোন সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে হয় তখন মনে করিতে হইবে যে তাহাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। * * * *

আমাদের নীতিজ্ঞানের আর একটা দিক

কোন প্রকার নৈতিক স্খলন সমান স্তরের স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান দূষনীয়। সাধারণ ছোট খাট ব্যাপার, যেমন মিথ্যা কথা বলা কাহাকেও ঠকান প্রভৃতি, উভয়ের পক্ষেই সমান নিন্দনীয় বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি।

কিন্তু চরিত্রগত নৈতিক স্খলন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পক্ষে সমান দোষের বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত হইলেও, কার্য্যতঃ সমাজে এবং সাধারণের চক্ষে তাহা হয় না। সমাজস্থ স্ত্রীলোকের সহিত যেখানে সংশ্রব নাই (সমাজস্থ স্ত্রীলোক জড়িত থাকিলে স্ত্রীলোকটির জন্যই ব্যাপারটাকে আমরা দোষের ধরিয়া থাকি) এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষের নৈতিক বিচ্যুতি সমাজে অল্পই নিন্দিত হইয়া থাকে। যাঁহার এইরূপ কোন দোষ আছে বলিয়া লোকে জানে, তাঁহার সম্মান বা পদ মর্য্যাদা ভোগ করিবার পক্ষে কোন বাধা ঘটে না।

যাঁহারা পুরুষদের এই প্রকার দোষ উপেক্ষা করিয়া থাকেন বা ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকদের অনুরূপ দোষ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব এবং ব্যবহার সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। ইহার মধ্যে এই কথাটা খুব স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে যে, আমাদের নৈতিক বুদ্ধি প্রকৃত পক্ষে সজাগ নহে। স্ত্রীলোকদের বেলায় আমাদের স্বার্থবুদ্ধি এবং প্রভুত্বের স্পৃহা ধর্ম্মবুদ্ধির ছদ্মবেশে দেখা দেয় মাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই সমান কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে যেমন একদিকে অপক্ষপাত নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইবে, অন্যদিকে পুরুষদের নৈতিক জ্ঞান উন্নত এবং ব্যবহার অধিকতর সংযত হইলে, স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অপরাধ-প্রবণতাও কিছু কমিবে আশা করা যাইতে পারে।

গ্রন্থ-পরিচয়

মৌন ও মুখর—শ্রীমমতা মিত্র প্রণীত, কবিহিসাবে শ্রীমতী মমতা মিত্রের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তাঁহার লেখায় একটা স্নিগ্ধ:সজল সুরের মুর্চ্ছনা আমরা শুনি। সে সুর সজীব, আমাদের বুকে বেদনা জাগায়, দোলা দেয়। প্রত্যেকটী কবিতা যদিও বিভিন্ন প্রকারের তবুও বেদনার চিরন্তন গান ফল্গুধারার ন্যায় অন্তঃসলিলা, প্রত্যেকটি কবিতাকে একই সূত্রে মালা গাঁথিয়াছে। মোটের উপর বইখানা আমাদের ভাল লাগিয়াছে ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ বেশ ভাল।

গায়ে কাঁটা—শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক—বইখানি শিশু পাঠ্য। সহজ সরল ভাষায় ছোট একটী ছেলের বীরত্বের কাহিনী। বীরত্বের আতিশয্যে আফ্রিকা, ইউরোপ যাইতে হয় নাই। নেহাৎ বাংলার বুকে পদ্মাপারের কাহিনী। বলিবার ভঙ্গী ও ভাষা চমৎকার। কোথাও জড়তা বা অতিরিক্ত কল্পনার ছড়াছড়ি নাই। যাহা বলিবার তাহা সোজা কথায় অল্প একটুখানি আবেষ্টনের মধ্যেই ফুটিয়াছে খুবই স্পষ্টভাবে।

আমাদের দেশে শিশু পাঠ্যের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু এই শ্রেণীর বই যদি আরও দ্রুত গতিতে বাহির হইতে থাকে তবে সেই অভাব দূর হইবে বলিয়াই ভরসা। আমরা লেখকের নিকটে আরও পাইব বলিয়া আশা করি। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ বেশ ভাল।

মানবত্ব কি?—প্রকাশক শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য ১৷৽

এখানা একখানি ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ, লেখকের কোন বক্তৃতার বিষয় অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বাদি লইয়া যাহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা বইখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন, বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মালোচনায় অনেকেই নারাজ, সুতরাং সাধারণের নিকট বেশী সমাদৃত হইবার আশা নাই। যদিও সাধারণ নানা প্রচলিত কুসংস্কারে অসারতা গ্রন্থকার যুক্তির সাহায্যে বিস্তারিত বুঝাইয়া দিয়াছেন। উপন্যাস প্লাবিত যুগে এরূপ গ্রন্থের প্রচার বেশী হইবে না কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধীগণ ইহাতে মনের অনেক খোরাক পাইবেন, ইহাই লেখকের একমাত্র সান্ত্বনা। ভাষা আরও সুমধুর ও প্রাঞ্জল হইলে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইত।

লীলারহস্য বা বিশ্ব-প্রহেলিকা—ধরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত (বি এস্ সি) প্রণীত ও প্রকাশিত, অতি উচ্চাঙ্গের তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনোপায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। পড়িলে মানবমনের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারিবে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই।

প্রাপ্তি-স্বীকার—নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি, বারান্তরে উহার সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

ক্ষণিকের অতিথি—শ্রীযুক্তা সীতাদেবী, **দুহিতা**—শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী, **অদ্ভুত রহস্য বা মায়া প্রহেলিকা**—শ্রীধরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত (বি, এস-সি), **হোমশিখা**—শ্রীরঘুনাথ মাইতি, কাব্যতীর্থ বৈদ্যশাস্ত্রী, **আপদ**—শ্রীদিলীপ কুমার রায়, **ওগো কল্পময়ী**—শ্রীদিলীপ দাসগুপ্ত।

রাজবন্দী দিবস ও সংবাদপত্র

প্রেস ও বক্তৃতার স্বাধীনতা অন্যতম পৌরাধিকার কিন্তু ভারতবর্ষ সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত। ইতি পূর্ব্বে বহু প্রকারে সংবাদপত্রের ও দেশবাসীর কণ্ঠরোধ করিবার আয়োজন হইয়াছে।

বিগত ১৯ মে সোমবার নিখিলভারত রাজবন্দী দিবস বলিয়া ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার এক ঘোষণা জারী করিয়াছিলেন যে এতৎসম্পর্কে কোন সংবাদাদি সংবাদ পত্রে বাহির হইতে পারিবেনা। এই উপলক্ষে যে সকল সভাসমিতির অধিবেশন হইবে। সংবাদপত্রে তাহাদের কোনও রূপ উল্লেখ ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। সরকারের উপরোক্ত আদেশের প্রতিবাদ স্বরূপে সংবাদপত্রসমূহ একদিন বন্ধ ছিল।

সরকারের আশঙ্কা ছিল যে ইহাতে বিপ্লববাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কিন্তু দেশের সংবাদপত্র সমূহ ও জনসাধারণ বিপ্লববাদের পোষকতা না করিয়া সর্ব্বদা বিরুদ্ধ মতই প্রকাশ করিতেছেন, এ শুধু মানবতার দিকদিয়া চেষ্টা; এই রাজবন্দীদের সম্বন্ধে দেশবাসী বিশেষরূপ আলোচনা করিবার ও তাহার প্রকাশের স্বাধীনতা দিলে সরকারের মর্য্যাদা বাড়িত, তাহার ন্যায়পরায়ণতার উপর সকলের শ্রদ্ধা জন্মিত।

কোয়েটার প্রলয়কর ভূমিকম্প

নটরাজের প্রলয়নাচের আর বিরাম নাই। এইতো সেদিন বিহার ভূমিকম্পের নিদারুণ আঘাতে দেশ মুহ্যমান সে অশ্রু না শুকাইতেই কোয়েটার সংবাদ নূতন ক্ষতের সৃজন করিল।

বিগত ৩১শে মে অনুমান রাত্রি তিনঘটিকার সময় কোয়েটায় যে ভূমিকম্প হইয়াছে ভীষণতায় তাহা বিহারের ভূমিকম্পকেও হার মানাইয়াছে।

২৬০০০ প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আহত ও হত ব্যক্তির স্বজনের আর্ত্তনাদে কোয়েটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে লোক স্থান ত্যাগ করিয়াছে। ধ্বংস স্তূপ হইতে দেহ উদ্ধার করা ভীষণ কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

অর্থ ও জন সাহায্যের কার্পণ্য হইবে না আশা হয়। কোয়েটায় সৈন্যদের ব্যারাক আছে সুতরাং গবর্ণমেন্টের সযত্ন দৃষ্টিও এদিকে পড়িয়াছে। দৈবের মার, মানুষের প্রতিকারের উপায় নাই। তবুও পীড়িতের সেবার অধিকার তাহারই।

শিক্ষিত শ্রমিক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনিক বার আনা রোজে কয়েকজন শিক্ষিত ছাত্র পুস্তক বহনের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে এম্, এ বি টি ও একজন ছিলেন। এজন্য সংবাদপত্রে অনেক আলোচনাদি হইয়া গিয়াছে। তিনটী কারণে ব্যাপারটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে প্রথমতঃ ভদ্রলোক কুলী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, দ্বিতীয়ঃ অতি অল্প মাহিনা, তৃতীয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহারা শিক্ষা পাইয়াছেন, সেখানেই তাহাদের এরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়াছে।

শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের পক্ষে কুলীকাজ করা অমর্য্যাদাকর হওয়া উচিত নয়, কায়িক পরিশ্রমে লজ্জার বিষয় ও কিছু নাই, আমরা শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু বি, এ পাশ করিতে মাসিক যে ব্যয় পড়ে তাহার অর্দ্ধেক ও যদি পরীক্ষা পাশ করিয়া না পাইতে পারে, তবে এরূপ দুর্বহ ব্যয়ভার বহন করিবার অভিভাবকগণের সার্থকতা কি ? এরূপ পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটিয়া সকলের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাহাতে শিক্ষারব্যয় অল্প হয় ও শিক্ষা কার্য্যকরী হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীধারীদের এঅবস্থা দেখিয়া শিক্ষার প্রতিই সকলের বীতশ্রদ্ধা হইতেছে। মেয়েদের শিক্ষার মূল্য ও যাহাতে এই শোচনীয় হারে হ্রাস না পায়, সেজন্য সতর্ক হওয়ার দিন আসিয়াছে।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ

৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পরিকল্পনায় কবিরাজ শিরোমণি শ্যামদাসবাচস্পতি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ স্থাপিত হয়। তিলকস্বরাজ্য ভাণ্ডার হইতে ইহার জন্য বিশেষ অর্থসাহায্য পাওয়ার আশা ছিল কিন্তু দেশবন্ধুর অকাল তিরোধানে সে আশাপূর্ণ হয় নি। বাচস্পতি মহাশয় চৌদ্দবৎসর যাবৎ স্বীয় আয়েও ইহার ব্যয় ভার চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে নানাবিভাগ খুলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহার উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে, এজন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। কলিকাতা কর্পোরেশন দুইলক্ষাধিক টাকা সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু আরও সাহায্যের দরকার রহিয়াছে, দেশবাসী মুক্তহস্তে এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানটীর আনুকূল্য করিলে আমাদের পরম গৌরবের প্রতিষ্ঠানটী দেশের স্থায়ীসম্পদে পরিণত হইবে।

মেয়েদের পৃথক স্নানের ঘাট

"প্রকাশ্যস্থানে স্নান না কর', সভ্যতা ও রুচিসঙ্গত। এই কথা সকলের পক্ষে সত্য হইলেও, মেয়েদের পক্ষে বিশেষভাবে সত্য। কিন্তু এই রীতির প্রচলন ও তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা দেশের শিক্ষা রুচি ও অবস্থার উন্নতি না হইলে হয়ত সম্ভব হইবে না। পল্লী অঞ্চলে তবুও প্রায় সকলের সহিত অনেকটা জানাশুনা থাকে, কাজেই, সেখানে ভদ্রতা ও শালীনতা আংশিকভাবে রক্ষা করিয়া চলা কতকটা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সহর অঞ্চলে মেয়েদের প্রকাশ্যস্থানে বিশেষ করিয়া পুরুষদের সহিত একই ঘাটে এক সঙ্গে স্নান করা বর্ব্বরতার নামান্তর। যে সকল সহরে বা গঞ্জে স্নানের উপযুক্ত নদী আছে, তাহার সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কোন মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে নদী থাকিলে সেই মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত মেয়েদের স্নানের জন্য পৃথক ঘেরা ঘাটের ব্যবস্থা করা। স্নানান্তে স্নানের ঘাটে বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন করা অথবা আর্দ্রবস্ত্রে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা প্রভৃতি রীতি, আমাদের রুচি ও শালীনতা যে কত নিম্ন তাহারই পরিচয় প্রদান করে।"

'বিচিত্রা' হইতে আমরা উপরিলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বিষয়টী যথার্থই ভাবিবার মত। সাধারণের সম্মুখে নদনদীতে ও প্রকাশ্য খাল বিলে সম্ভ্রান্ত বংশের স্নানার্থিনীর সংখ্যা কম নাই, কিন্তু সেজন্য এপর্য্যন্ত পৃথক স্নানের ঘাটের কথা কেহ বড় ভাবিয়া দেখে না। আমাদের দেশে শালীনতা বোধের দিকে আজকাল একটু দৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং এই আবশ্যকীয় দিকে সংস্কারসাধনের চেষ্টা চলিতে পারে। আমরা আর ও কিছু অগ্রসর হইতে চাই, বাড়ীনির্ম্মাণকালেও মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিবাড়ীতে স্নানাগারের ও যেন ব্যবস্থা থাকে এবিষয়ে বিশেষ একটা নিয়ম ও করিতে পারেন।

ঢাকায় মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা

ঢাকায় মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার সম্যক সুবিধা নাই। স্থানীয় ইডেন ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ছাত্রীগণ আই, এ পড়িতে পারে কিন্তু যে ছাত্রী আই, এস, সি লইতে ইচ্ছুক, তাহাকে কলিকাতায় আসিয়া পড়িতে হয়। জগন্নাথ কলেজ বা ঢাকা কলেজে সহশিক্ষারও কোন সুবিধা নাই, সুতরাং বহু বিজ্ঞান শিক্ষার্থিনীকেই নিরাশ হইতে হয়। কামরুন্নেসা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ গত দুই বৎসর যাবৎ খোলা হইয়াছে। ইহাতেও মেয়েরা আর্টস্ পড়িতে পাবে, কিন্তু বিজ্ঞানশিক্ষার্থিনীদের জন্য ইহারাও কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই, অবশ্য নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরূপ সুবিধা দেওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জন্য সর্ব্বদিকের দ্বারই উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় ইডেন কলেজে অনায়াসে একটী আই, এস্ সি ক্লাস খোলা যাইতে পারে। কিছুদিন হইল ইডেন কলেজে ছাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা হইলে কলেজের ছাত্রীসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষার্থিনীগণেরও প্রভূত উপকার হইবে। যদি ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া আপাততঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নূতন ক্লাস খোলা সম্ভব না হয়, জগন্নাথ ও ঢাকা কলেজের সহযোগিতায় ও বিজ্ঞান শ্রেণীর অধ্যাপনা চলিতে পারে। ঢাকার জনসাধারণ এবিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে পারেন ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হইতে পারেন।

মেয়র ফণ্ড বন্ধ করা হইয়াছিল

কলিকাতার মেয়র ফজলুল হক্ এক বিবৃতিতে জানাইয়াছিলেন যে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সেবাকার্য্যে, কোয়েটা প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই সেজন্য মেয়র ফণ্ডে আর অর্থ সংগৃহীত হইবে না, উক্ত ফণ্ড বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এ সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন উহা সঙ্গতই হইয়াছে। যাঁহারা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত সেবাকার্য্যে ব্যয় করা সমর্থন করেন তাহাদের পক্ষে মেয়র ফণ্ডের টাকা ভাইসরয় ফণ্ডে দেওয়ার আপত্তি হইতে পারে, যাহারা সরকারী প্রতিষ্ঠানেই অর্থ প্রদানের ইচ্ছা করেন, তাহারা সরাসরি উক্ত ভাণ্ডারে পাঠাইতে পারেন সেজন্য অন্য ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন নাই। এঅবস্থায় বড়লাটের ফণ্ডে অর্থ সংগ্রহে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া মেয়র ফণ্ডের সার্থকতা ও নাই। অনুমোদিত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিকে শুধু সেবাকার্য্যে কোয়েটা প্রবেশ করিতে দিলে সেবাকার্য্য আরও দ্রুত ও সুষ্ঠু চলিত আমাদের বিশ্বাস। বিহার ভূমিকম্পেও এরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই।

চলচ্চিত্রে মহিলা অভিনেত্রী

আজকাল জীবিকার্জ্জনের জন্য নারীদের বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে, তাঁহাদের অর্থার্জ্জনের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, সেজন্য যদি কোন দিকে তাহাদের পথ নিমুক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের আনন্দের কথা। চলচ্চিত্রের দিকে মহিলাদের একটু দৃষ্টি গিয়াছে। বর্ত্তমানে পতিতাশ্রেণী হইতেই পেশাদার অভিনেত্রী আসিয়া

থাকে। মহিলাগণের পক্ষে ইহার আবহাওয়া এখনও বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে নাই। সেজন্য বর্ত্তমানে কাহারও পক্ষে এই বৃত্তি গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মতামত আমরা 'দীপালী' হইতে তুলিয়া দিলাম, যদিও আমাদের আশা আছে ভবিষ্যতে চলচ্চিত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এত অনাবিল ও পরিশুদ্ধ হইবে যে আমাদের দুঃস্থা ও শিল্পী ভগিনীগণ ইহা অবলম্বনে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। "আজকাল কোন কোন মহিলা চলচ্চিত্রক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন। আমার কোন কোন বন্ধু ও বান্ধবী মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, মহিলাদের ছবিতে অভিনয় করা উচিত কিনা? আমি বলি, না। বর্ত্তমানে বাংলা চলচ্চিত্রালয়ের অবস্থা যে—রকম, তাতে—ক'রে সেখানে মহিলাদের আবির্ভাব বাঞ্ছনীয় নয়।

মাস চারেক আগে দুটি মহিলা মাতা ও দুহিতা কলকাতার কোন বিখ্যাত 'ষ্টুডিও'য় কাজের খোঁজে এসেছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে কথা কইবার ভার আমার উপরেই অর্পণ করলেন। আমি তাঁদের অনেক ক'রে বুঝিয়ে বললুম যে, কোন (ভদ্র) মহিলারই অভিনেত্রী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাঁরা কোন-মতেই বোধ মানলেন না। তারপর বয়সে বড় মহিলাটি (যিনি মাতা) যখন বললেন যে, "আপনারা আমাদের ছবিতে অভিনয় করতে দিতে রাজী নন। তা'হ'লে কি এইটি আপনাদের মনের ইচ্ছা হয় আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে হোয়ে ও পেটের দায়ে কুপথে নামতে বাধ্য হব?" আমি তখন আর স্থির থাক্‌তে পারলাম না, রুক্ষ ভাষাতেই বললুম, "যে সব ভদ্রলোকের মেয়ে ছবিতে অভিনয় করতে না পারলেই কুপথে যেতে বাধ্য হন, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের কোনই কর্ত্তব্য নেই।" এর আগেই আরো দুই মহিলা (মাতা ও দুহিতা) স্বামীর সংসার ত্যাগ ক'রে ছবিতে দেখা দিয়েছিলেন এবং ফলে তাঁদের ভদ্রতা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। আমার একজন নৃত্যগীতে সুনিপুণা, বিদুষী ও সুন্দরী বান্ধবী চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমার কথা শুনে তিনি আর ও-পথ মাড়ান নি।

যদি কোন চিত্রাভিনয়ে প্রত্যেক নারী ভূমিকাতেই (ভদ্র) মহিলাদের পাওয়া যায়, তা'হ'লে অবশ্য মহিলাদের চলচ্চিত্রক্ষেত্রে আবির্ভাবের বিরুদ্ধে এতটা আপত্তির কারণ থাকে না। চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা"র অভিনয় হয়েছিল যে শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে, সে রকম কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহস্থের মেয়েরা অভিনয় করতে চাইলে কোন প্রতিবাদই করব না। কিন্তু সে-রকম কোন সম্প্রদায় বাংলা দেশে নেই। 'ষ্টুডিও' হচ্ছে বারোয়ারি আখড়ার মত। কত রকমের কত চরিত্রের পেশাদারী লোক নিয়ে সেখানকার কাজ চলে এবং সেই জনতার মধ্যে সীতা-সাবিত্রীর যে একান্ত অভাব তা আর না বললেও চলে। এ স্থান মহিলাদের পক্ষে অগম্য স্থান। অন্ততঃ আমার এই বিশ্বাস।"

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্সের লিঃ

আমরা ওরিয়েণ্টেল বীমা কোম্পানীর ১৯৩৪ সনের কার্য্য বিবরণী পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। এ কোম্পানীর ১৯৩৪ সনের বার্ষিক আয় ৩,১৪,০১,৯৭০ টাকা ও নূতন পলিসির পরিমাণ ৭,৬২,৪২,৭৬১ টাকা। গত বৎসর ১৬,২৯,৮৮,৮১৪ টাকা দাবী মিটান হইয়াছে। উল্লিখিত কার্য্য বিবরণী পাঠ করিয়া আমরা এই কোম্পানীর সুদৃঢ়ভিত্তি ও জনপ্রিয়তার পরিচয় পাই। বাঙ্গালীর বীমা ব্যবসায় নৈপুণ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাইলে, কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় না আনন্দে পূর্ণ হয়। যে সততা কর্ম্মকুশলতা এবং অধ্যবসায় সাহায্যে ক্রমোন্নতির সুদৃঢ় পথে চলিতেছে তাহাতেই এ বীমা কোম্পানী জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উদ্রেক করিতে পারিতেছে। আমরা এই কোম্পানীর উন্নতি কামনা করি।

যাত্রী

শ্রীসুধা সেন

পঞ্চম বর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৪২	চতুর্থ সংখ্যা

"নববধূ"

(উপন্যাস)

শ্রীআশালতা সিংহ

১

বকুল গাছের তলায় প্রকাণ্ড এক দীঘি। তাই লোকে বলিত বকুল দীঘি। পুকুরের জল কাঁচের মত পরিষ্কার, টলটল করিতেছে। গ্রামের জমিদার বাবুরা গ্রামেই থাকেন, এখনো বিদেশে যান নাই কিংবা সপরিজনে কলিকাতাবাসী হ'ন নাই। তাই গ্রামের শ্রী আছে। পুকুরে পানার চেয়ে জল বেশি। রাস্তা বাঁধানো। এবং বকুল দীঘির অনতিদূরে জমিদারবাবুদের সুবিস্তৃত সুসজ্জিত বাগান তখন অস্ত সূর্য্যের আলোতে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

কমলা তাহার সখীদের সহিত দীঘিতে গা ধুইতে আসিয়াছে। অন্য দিন ঘন পল্লবের অন্তরালে স্নিগ্ধ শীতল জলে সে আলস্যে গা মেলিয়া দেয়। এতটুকু ত্বরা নাই। সখীদের সঙ্গে গল্প করিতে সাঁতার কাটিতে বকুল ফুল কুড়াইতে তাহার সমান উৎসাহ। কিন্তু আজ তাহার ভাবখানা কিছু ব্যস্ত গোছের। তাহার সহিত দেখন হাসি পাতাইয়াছে সেই মেয়েটি কহিল, "কমলা, আজ এত তাড়া কিসের? বড় বৌরাণীর কাছে চুল বাঁধতেও গেলিনে

কমলা স্নান সমাপন করিয়া তীরে উঠিতে উঠিতে কহিল, "না ভাই সই আজ আমার দেরী করবার যো নেই। গরমের ছুটিতে দাদারা কাল রাত্রির ট্রেনে বাড়ী এসেচে কলকাতা থেকে। আমি নইলে তাদের চা তৈরী করা আর কারো পছন্দ হয় না। উনুনে আঁচ দিয়ে জল বসিয়ে দিয়ে আমি এসেচি। এখনই ফিরতে হবে।"

মালতী কহিল, "আমিও তোর সঙ্গে যাই চল কমল। বড়দা, নদা, রাঙাদাকে প্রণাম করে আসিগে। যে ক'দিন ওঁরা থাকেন তোর ভারি আনন্দ হয়, নয় রে? তাঁরা কত রকম গল্প বলেন, নিয়ে আসেন তোর জন্যে কত রকম বই।"

কমলা সগর্ব্বে তাহার সখীদের পানে একবার চাহিয়া কহিল, 'হ্যাঁ, আমাকে নইলে তাঁদের একদণ্ড চলে না। যে ক'টা দিন থাকেন আমার কি এক মুহূর্ত্ত অবসর রয়েচে মনে করিস। যত কাজের বোঝা সব এই কমলের ঘাড়ে।"—কথার সুরে সে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতে চাহিল তাহাকে এমন অন্যায় করিয়া অপরিমিত খাটাইয়া লইবার জন্য। কিন্তু তাহার মুখের উচ্ছল হাসি এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রবহমান উদ্বেলিত আনন্দের বন্যা ইহার সহিত মিলিল না। বরঞ্চ ইহারই একান্ত কৃত্রিমতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া ধরাইয়া দিল।

মালতী বলিল, "তা হোক। না হয় দু'দিন খাটতে হোল। ক'টা দিনই বা আর তাঁরা থাকেন। ছুটি ফুরোবে, কলেজ খুলবে আর তাঁরাও যাবেন চলে। তখন আর তোর কী কাজটা থাকবে। কিন্তু তখন সমস্তই কেমন খালি খালি লাগে বল দেখি। যতই বল কমলা, তোকে আমার মাঝে মাঝে হিংসে হয়। এমন দাদা কারো হয় না।"

সে কথা সত্য। কমলা তাহার পাঁচ দাদার একটি মাত্র ছোট বোন বলিয়া দাদাদের কাছে তাহার আদরের সীমা পরিসীমা নাই। কমলার বাবা নিত্যনারায়ণ বাবু একজন পণ্ডিত লোক। ইংরেজী তেমন জানেন না, বা কলেজে তেমন পাশটাশ করেন নাই কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান অসীম। যুবক বয়সে বর্দ্ধমানরাজে সভা পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু চাকরির প্রতি অনাস্থা থাকায় ছাড়িয়া দেন। সংসারে নাই তেমন আসক্তি। পূজা আহ্নিক পঠন পাঠন এই সকল লইয়া থাকিতে ভালোবাসেন। এমন কি বাড়ীতেও একসঙ্গে অধিক দিন থাকিতে পারেন না। নানা দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। পৈতৃক জমিদারী আছে, কলিয়ারির কিছু আয় আছে। খুব বড়লোক না হইলেও পয়সার কোন অসচ্ছলতা নাই, তাই উপার্জ্জনের দিকে কোনপ্রকার মনোযোগ না দিলেও তাঁহার সংসার এক রকম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। অথচ সাত্বিক প্রকৃতি সংসারে নিস্পৃহ এমন জ্ঞানী স্বামীর স্ত্রী হইয়াও প্রমীলাদেবীর প্রকৃতি তাঁহা হইতে একেবারে পৃথক। অজিনাসনে বসা বা ফলমূল খাওয়া কোনটাকেই তিনি জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে পছন্দ করিতেন না। অশন বসনের আড়ম্বরকে তুচ্ছ করিয়া জ্ঞান রাজ্যের গভীরে যেখানে তাঁহার স্বামীর মন তলাইয়া গিয়াছিল সেখানে যে কী রস থাকিতে

পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বরঞ্চ এ সকল বিষয়ে দেবর সত্যনারায়ণের সহিত তাঁহার সর্ব্বাংশে মিল ছিল। পৈতৃক বিষয় সমান ভাবে পাইয়াও সত্যনারায়ণের ত্রিতল বসত বাটির চূড়াটা আজ আকাশে ঠেকিতেছে। বিষয় সম্পত্তির প্রতি তাঁহার কী মমতা! কত যত্ন। নিজে ক্ষেত খামার দেখেন। কলিয়ারির হিসাব তাঁহার নখ দর্পণে। একটি পয়সা কেহ ফাঁকি দেয় এমন জো কি রহিয়াছে। তা ছাড়া সুদ বন্ধকী কারবার করিয়া তিনি যে কত টাকা করিয়াছেন তাহা এ অঞ্চলে একটা জনশ্রুতির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রমীলা মনে মনে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করেন প্রকাশ্যে অবশ্য কলহ যে দু' চার বার হয় না এমন নহে। তবে তাঁহার এই এক গর্ব্ব যে তাঁহার ছেলেরা কলিকাতায় কলেজে কেহ বি, এ, কেহ আই, এ, পড়িতেছে। বড় ছেলে এইবার এম, এ পাশ করিয়া ল পড়িবে ঠিক করিয়াছে। আর ঠাকুর পোর একটা মাত্র ছেলে, তা তাহারও লেখা পড়া কিছুই হইল না। গ্রামের হাই-স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া সে বাড়ীতেই বসিয়া আছে। জ্যেঠার কাছে সংস্কৃত পড়ে। ওই জ্যেঠার জন্যই তাহার লেখাপড়া হইল না। জ্যেঠার কথা যেন তাহার কাছে বেদবাক্য। তা তিনিও তো কলেজে পড়িতে বারণ করেন নাই। কিন্তু ছেলেটার কি যে মতিগতি। আসলে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয় কম। নেহাৎ পারিবে না আগে হইতে কল্পনা করিয়াই বোধ করি সে কলেজে ঢুকে নাই। প্রমীলার ছেলেরা কলেজে পড়ে, হইলনা হইলনা করিয়া শেষকালে একটি মেয়েও হইয়াছে। শুধু মেয়ে নয়, কমলার মত এমন সুন্দরী মেয়ে সারা গ্রামে আর একটি নাই। ছোট বৌয়েরও মেয়ে নাই। বড় ছোট এই দুই তরফের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে কমলা। তাই বাড়ীর সকলের চোখের মণি সে। তাহার একটা কথাও কখন সে বাড়ীতে উপেক্ষিত হয় না। খুড়িমা কমলার চুল বাঁধিয়া দেন নিজের হাতে। সে যেদিন সঙ্গে বসিয়া না খায় সেদিন তাঁহার খাওয়া হয় না। নিজের দাদারা পূজার ছুটি গ্রীষ্মের ছুটি বড়দিনের বন্ধে যখন কলিকাতা হইতে বাড়ী আসেন রাজ্যের জিনিষ লইয়া আসেন কমলার জন্য। আর খুড়তুত যে দাদা বাড়ীতে থাকেন তিনি বেণী ধরিয়া টানিয়া দুইবেলা কমলাকে সাধ্যসাধনা করেন তাঁহার কাছে একটু সংস্কৃত পড়িতে। কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ফুলটিতে পাখীটিতে কমলার যত ঝোঁক, পুকুরে সাঁতার কাটিতে, বকুলফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথিতে, ক্যাটালগ দেখিয়া কাণের নূতন প্যাটার্ণের এয়ারিং ব্রোচ, নূতন নূতন কেশতৈল, কার্পেট, উল কলিকাতায় দাদাদের কাছে ফরমায়েস করিতে যত আগ্রহ লেখাপড়ায় তত নয়। বিশেষ করিয়া সংস্কৃত শব্দরূপের বিসর্গ অনুস্বার এবং রেফ্‌গুলা যেন সঙ্গীন উঁচাইয়া তাহাকে মারিতে আসে। সেখান হইতে পালাইয়া আসিয়া পুকুরের জলে সে মনের আনন্দে সাঁতার কাটে। বকুল গাছের শাখার আড়ালে যেখানে কোকিল ডাকিয়া সারা হইতেছে, টুপ টাপ করিয়া শ্যাম শষ্পাবৃত প্রান্তরে ফুলগুলি ঝরিয়া

পড়িতেছে সেখানে সাথীদের সঙ্গে পাল্লাদিয়া ফুল কুড়ায়। অপরাহ্ণের উদ্ভাসিত আলো তাহার এলোচুলে তাহার প্রাণের আভায় আনন্দময় মুখের উপর আসিয়া পড়ে।

পুকুর ঘাট হইতে কমলা আর তাহার সই মালতী যখন বাড়ীতে পা দিল তখন কমলার দাদারা রোয়াকে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। কমলাকে দেখিয়া তাঁহারা সমস্বরে কহিলেন, "কমল এত দেরী কেন? আমাদের চায়ের আশায় বসিয়ে দিয়ে নিজে বুঝি আমগাছের তলায় কাঁচমিঠে আম খুঁজে বেড়ান হচ্ছিল? না খ'নের শাকে নূণ লঙ্কা মিশিয়ে কুপথ্য তৈরী করে সইকে তার ভাগ দিতে বসেছিলে?" তাহার বিরুদ্ধে এত অলীক অভিযোগের প্রতিবাদস্বরূপ ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কমলা ক্ষিপ্রহাতে চায়ের সাজ সরঞ্জাম বাহির করিতে লাগিল। বড়দা ইংরেজীতে এম, এ। এদলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সকলের চেয়ে ভালো কথা বলিতে পারেন। তিনি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কমল, মেয়েদের সবচেয়ে বড় গুণ কি জানিস. তারা দেয় প্রত্যেক জিনিষকে একটা শ্রী, একটা রূপাতীত ব্যঞ্জনা।—" কমলা এসকল কথা তেমন ভালো করিয়া বুঝিতে পারেনা। কিন্তু বড় বড় চোখ করিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে শোনে। আজও সে তাহার ঘন পক্ষ্ম কালো চোখ দু'টি তুলিয়া নিবিড় মনোযোগে শুনিতে লাগিল। বড়দা পুনশ্চ কহিলেন, "তুই আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলিনে, এই তো আমাদের মেসের যদু চাকরটা দু'বেলা চা ক'রে হাত পাকিয়েচে। তোর চেয়ে খারাপ চা সে তৈরী করেনা। কিন্তু নিজের হাতে পেয়ালাটির ধরে তুই যখন সামনে আনিস, সমস্ত জিনিষটার চেহারা বদলে যায়। তাতে এসে লাগে বিশেষ একটা রঙ।"

কমলা সবিনয়ে মুখ নত করিল।

সেজদা বি এ পড়েন। এই সবে সেক্সপীয়রের নাটক এবং ইংরেজী কাব্যের অনেক লোকোত্তরা মানসীর সহিত পরিচয় হইয়াছে। কাব্যজগতে সঞ্চরণের সদ্যঃ মোহাবেশ এখন তাঁহার নয়নে লাগিয়া রহিয়াছে। সেজদা রুমালে মুখ মুছিয়া কহিলেন, "শুধু খাওয়া পরা কেন, সমস্ত জীবনের উপর নারীলাবণ্য এমন একটি মায়া বিস্তার করে। আর আর্টের জগতেও দেখ্‌বে নারীচরিত্র সৃষ্টির দিকেই কবিরা মন দিয়েচেন বেশি যেন ওর ভিতরকার সমস্ত মাধুর্য্যটুকু ফুটিয়ে তুলতে না পারলে তাঁদের সৃষ্টি বৃথা।"

কমলার সই মালতীও নিকটে বসিয়াছিল। সে বোধকরি কথামালার 'বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' সেই গল্পখানি সবেমাত্র শেষ করিয়াছে। বিদ্যার পরিধি তাহার অতটুকু। কাহাকে বলে আর্টের জগত কাহাকে বলে নারীলাবণ্য এ সকল কথা কস্মিন কালেও সে

জানেনা। কিন্তু তথাপি মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া শুনিতেছিল। কমলার দাদারা যে সুরে কথা বলিতেছিলেন তাহাতে চোখের সুমুখে তাহার মায়ামন্ত্র বলে যেন কোন এক অপূর্ব্ব সুন্দর জগতের দ্বার খুলিয়া গেল। সেখানে অন্ধকার বলিয়া কিছুই নাই। মেয়েরা সেখানে আলোক শিখার মতই উজ্জ্বল। কেবল আলো আর হাসি বিতরণ করা ছাড়া আর তাহাদের কোন কাজ নাই। নিজের পরিচিত জগতে যেখানে মা, মাসী দিদিমাকে সে সকাল হইতে রান্নার আয়োজন করা এবং রান্নার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে আবার রান্না চড়াইবার আয়োজনে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়াছে সেখানকার সহিত কোনখানে ইহার এতটুক মিল নাই।

ছোটদা বলিলেন, "কমল, তোরজন্যে এবার যা এনেচি আন্দাজ কর্তে পারবিনে। সবচেয়ে নতুন ধরণের নাগরা আর শাড়ি। আর কান বালা কাকে বলে জানিস? আজকালকার কলকাতার মেয়েরা কাণের এয়ারিংয়ের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র তাই ব্যবহার করে। আর এনেচি রূপের বালা। অবাক হোয়ে যাস্‌নে যেন। রূপোর গয়না যে আজকালকার ফ্যাশন। সোণার গয়নার চেয়ে মেয়েরা পছন্দ করচে বেশি।"

কমলা কহিল, "আর সেই যে আমি একটা টয়লেটের বাক্স আন্‌তে বলেছিলুম।"

"তাও আছে বই কি।"

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া ছোটদা ছোট একটি সুদৃশ্য সুট্‌কেস্‌ আনিয়া কমলার হাতে দিলেন, "এইটের মধ্যে রয়েচে তোর জন্যে যা কিছু এনেচি। বাক্সটাও তোর। কিন্তু একটি অনুরোধ রইল, আজ যখন আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবি এই জামা কাপড় আর জুতো পর্‌তে হবে।' কমলা সলজ্জস্মিত মুখে উপহার গ্রহণ করিল। ইহারই মিনিট পনের পরে নব বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া, পায়ে নাগরা এবং হাতের রুমালে সুগন্ধ ঢালিয়া কমলা যখন তাহার আপন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল তখন তাহার পানে তাহার সই মালতী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এইতো সেদিনও জামদানী ডুরে পরিয়া খোঁপায় বেলকুড়ি কাঁটা গুঁজিয়া কমলা তাহাদের সঙ্গে বাবুদের বাগানে গাছের তলায় ফুল তুলিয়া বেড়াইয়াছে। এক সঙ্গে সেঁজুতি পুণ্যিপুকুর ব্রত করিয়াছে। আজ সেই তাহারই রূপ এবং রঙ দুই-যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। মাথায় দীর্ঘ বেণী ঝুলিতেছে প্রান্তভাগে রেশমী ফিতার গুচ্ছ দুলিতেছে। বাঁদিকের কাঁধে ব্রোচ আটকাইয়া এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাপড় পরা। পায়ে জরির কাজ করা নাগ্‌রা।

খড়মের আওয়াজ পাওয়া গেল। কমলার খুড়তত ভাই হরিদাস মাঠের কাজ দেখিয়া বহির্ব্বাটির দরজা দিয়া প্রাঙ্গণে আসিলেন। 'আরে, এ মেয়েটি কে!'

কমলা লজ্জায় নতমুখী হইল।

মৃদুহাসিয়া হরিদাস কহিল, 'খাসা মানিয়েচে। যেন লক্ষ্মী ঠাকুরুণটি।' তাহার পরে বড়দার দিকে চাহিয়া করিলেন, "কিন্তু এমন কোরে বিলাসিতার দিকে মনটা ফিরিয়ে দিলে কমলের লেখা পড়ায় যেটুকু বা মনোযোগ ছিল তা'ও থাকবেনা একথা কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছি।"

মেজদা ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির আভাস আনিয়া শুষ্ক স্বরে কহিলেন, "এত দুর্ভাবনা! কিন্তু এখানে ওর লেখাপড়াটা কী হচ্চে যে তাতে বাধা পড়বে শুনি? মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুখস্থ করা আর সংস্কৃতের মত একটা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য অপ্রয়োজনীয় ভাষা লেখার পিছনে বৃথা সময় নষ্ট করাকে আমি লেখা পড়া শেখা বলিনে। বাবাকে বলেছিলুম, লরেটো কিংবা ডায়োসেসন্ স্কুলে কমলাকে ভর্ত্তি করে দিতে কিন্তু আমার কথায় মোটে কর্ণপাতই করলেন না।' বড়দা ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন, 'তা করবেন কেন, সেই তো তাঁদের মতে তেরোবছর বয়সে ঘোমটা টেনে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে। কতটুকুইবা বিদ্যার প্রয়োজন, কষ্টে সৃষ্টে বোধোদয় খানা শেষ কর্‌তে পারলেই হোল। আর ধোপার হিসেব টুকে রাখবার মত একটু খানি গণিত বিদ্যা।' ছোটদা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "আমাদের একটি মাত্র বোন, তার অল্প বয়সে কখনো বিয়ে দিতে দেবনা।'

সেজদা বলিলেন, "একটা গ্রামে সারা জীবন কাটিয়ে দিলে দৃষ্টির প্রসার বা হৃদয়ের প্রসার কোনটাই বাড়েনা। জগতে কত পরিবর্ত্তনের ধারা বয়ে গেল, কিন্তু তাঁরা খবর রাখলেননা তার কিছু। চোখের সামনে খাড়া হয়ে রইল তাঁদের অচলায়তনের বেড়া। কী আর হবে বলো?......" শেষের কথাগুলা তাঁহার ক্ষোভমিশ্রিত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত মিলিয়া গেল।

কমলা এধরণের বক্তৃতার সহিত পরিচিত। যখনই তাহার দাদারা একত্রে বসিয়া গল্প গুজব তর্ক আলোচনা করে তখনই এই ধরণের নারীসমস্যা, নারীপ্রগতির বিষয়ে ঝাঁঝালো কথা সে শুনিতে পায়। কিন্তু মালতীর পক্ষে এ সমস্তই একেবারে অভাবিত রূপে নতুন। সে অবাক হইয়া কথাগুলা যেন গিলিতে লাগিল। এবং দাদাদের সঙ্গে কমলা যখন মাঠের পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল তখন ধীরে ধীরে আপন বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিবার সময় এই কথা গুলাই তাহার মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, গোয়াল ঘরে গরুকে জাব্‌না খাইতে দিয়া মালতীর মা ঘুঁটের ধোঁয়া দিতেছেন, "এত বড় মেয়ে যদি সংসারের কুটি কেটে দু'খান করেচে! বলি কোথায় ছিলি এই ভরসন্ধ্যে পর্য্যন্ত?'

মালতী কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নিঃশব্দে কাজে লাগিয়া গেল। প্রদীপ জ্বালিল। দাওয়াতে বঁটি পাতিয়া তরকারীর ঝুড়িটা টানিয়া আনিয়া আনাজ কাটিতে বসিল। কিন্তু এই সমস্ত কাজ কর্ম্মের অন্তরালে তাহার মন অণুক্ষণ যেখানে বিচরণ করিতে লাগিল সেখানে সমস্তই যেন ইন্দ্রজালের মত মোহময়। সমস্তই জ্যোতির্ম্ময় সমস্তই সুন্দর সেখানে বাঁশের মাচা, খড়ের ঘর, মাটির দাওয়া, জাবনার গন্ধ এবং ঘুঁটের অপর্য্যাপ্ত ধূম নাই। সেই অমর্ত্ত লোকের আভাস তাহার চোখের সুমুখে ভাসিতে লাগিল কমলাদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়া তাহার দাদাদের তর্কালোচনা শুনিয়া। মনে মনে ভাবিল, কমলার কী সৌভাগ্য! অহরহ এই সকল শুনিতে পায়, বাস করিতে পায় এই আব্‌হাওয়ায়।

এমেলিয়া ইয়ারহার্ট

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

অনেকদিন থেকেই ভাব্‌ছিলাম আমেরিকার বীর নারী এ্যমেলিয়া ইয়ার হার্টের (Amelia Earhart) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলা দেশের বোনদের তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে জানাব। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হতে অনেকটা দেরী হয়ে গেল। ইনি একজন সুদক্ষ নারী এরোপ্লেন পরিচালক; কাজেই সর্ব্বদা সেই সব কাজ ও বক্তৃতাতে ব্যস্ত থাকেন। তাঁকে হাতের "লাগাত" পাওয়া বড় সহজ নয়। যা হোক আমিও "নাছোড়বান্দা"। কয়েকবার টেলিফোনে ডাকাডাকির পর, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার নিমন্ত্রণ পেলাম।

আমেরিকার সাধারণ ধনী গৃহ যেমন দামী আস্‌বার পত্রে সুসজ্জিত এঁর বাড়ীতে এসে সে রকম কোন আভাস পেলামনা। নিউইয়র্কের একটী হোটেলের বত্রিশ তালার উপর এঁর সুপরিমার্জ্জিত গৃহ। আমরা যেতেই সাদরে একটী ঘরে নিয়ে বসালেন। আঁড় চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, গৃহখানি আড়ম্বরহীন; অথচ সযত্নে রক্ষিত সকল জিনিষ গুলিই উত্তরাধিকারীর সুপরিমার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিতেছে। দেখতে অতিশয় লম্বা সোণালী চুলভরা মাথা (Blonde Hair) সাদা সিধে পোষাক পরা এই স্মিতমুখী, অতি বিনয়ী ও স্বাধীন প্রকৃতির তরুণীটিকে যখন জানালাম, যে আমি বাংলা দেশের একটী সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত মাসিক পত্রিকাতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে চাই, তখন তিনি মুক্তার মত তাঁর সুন্দর দাঁতগুলি বের করে হেসে আমার হাতে হাত রেখে বল্লেন, "দেখ, আমি কিন্তু বড় সেকেলে ধরণের লোক, কাজেই পৃথিবীর সকল দেশের এই সব নারী জাগরণ ও আন্দোলন আমি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পারিনা। পুরুষকে বাদ দিয়ে নারী যেমন কাজ করতে পারেনা, নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষ ও কোন রকমে জীবন পথে অগ্রসর হতে পারেনা। এই পুরুষ ও নারী নিয়েই মানুষের সৃষ্টি ও সভ্যতা হয়েছে। কাজেই মানুষ মাত্রেরই স্বাধীনতা ও সমান অধিকার জন্মগত ন্যায্য পাওনা ইহা যে আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি এটুকু বুঝ্‌তে পারলে এই নিয়ে বৃথা আন্দোলন করার দরকার হয়না। এ পৃথিবীতে এসে আমরা যে, যে কাজের উপযোগী, যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে যাব, তাতে, পুরুষ ও নারী বলে ভেদাভেদ থাকা আমি অতিশয় ক্ষতিকারক মনে করি। যদিও আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো ভারতীয় নারীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাইনি, তবু তাদের সকল অনুষ্ঠান ও আন্দোলনের খবর আমি রাখি। আমার মনে হয় তারা যদি পুরুষের সঙ্গে সমানে সর্ব্বত্র বিচরণ করতে চান, তবে নিজেদের সেই রকম করে গঠন করুণ; উপযুক্ত হতে পারলে কোন পুরুষই সে নারীকে বাধা দিবেনা বরং উপযুক্ত সম্মান দিবে।"

ভারতবর্ষে যাবেন কি না, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, "ভারতবর্ষ দেখবার জন্য আমি তৈরী হয়েই আছি, সুযোগ পেলেই যাব। এবার মেক্সিকো থেকে ফিরে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা আছে, হয়ত সেই সুযোগে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ঘুরে আস্‌ব। তবে এবার একা নয়, স্বামীসহ। (স্বামী তার পাশেই বসেছিলেন, স্ত্রীর কথায় স্মিতমুখে অনুমোদন করলেন)। "ভারতবর্ষ যদি মেক্সিকোর মত স্বাধীন হ'ত তবে হয় ত এতদিনে সেখান থেকে যাবার নিমন্ত্রণ পেতাম" বলে একটু হাসলেন। আশাকরি উনি যখন ভারতে যাবেন তখন ভারতবাসী একে উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা করিতে ভুল্‌বেনা।

সময় কম, তাঁর আবার আধঘণ্টার মধ্যেই এক জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা, কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি তার একখানা বই ও কয়েকখানা ফটো দিয়ে বল্লেন, "কাগজে ছাপান হলে তাঁকে এক কপি দিতে যেন ভুলে না যাই"। তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুত হয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছি এমন সময় তাঁর স্বামিটী, আমার অতি নিকটে এসে সবিনয়ে বল্লেন, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?" উনি জিজ্ঞাসা করবার আগেই কথাটা কি তা বুঝতে বাকী রইলনা। বল্লাম, 'নিশ্চয়ই করতে পারেন।' তখন তিনি তার একটী অঙ্গুলি আমার কপালে নির্দ্দেশ করে বল্লেন, "আপনার কপালে ঐ লাল দাগটী কি?" (সিঁদুরের ফোঁটা সিঁদুর অভাবে আমেরিকার লিপষ্টিক্‌ বা ঠোঁট রঙ্গাবার রং!) "ওটা কি আপনার জাতের পরিচয়" (caste mark)? কাজেই সিঁদুরের মাহাত্ম্য বোঝাতে আরো কয়েক মিনিট সময় নিলাম। শেষে যখন বল্লাম, "I am advertising myself that I am a married woman" তখন সকলেই হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। ভারতের নানা খবর জান্‌বার জন্য আবার শীঘ্রই এক সন্ধ্যায় তাদের অতিথি হবার কথা জানিয়ে আমাদের বিদায় দিলেন।

এই বীর তরুণীটার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেবলই ভাব্‌ছিলাম, ইচ্ছা করলে নারী যে সব কাজই ক'রতে পারে ঘর ছাড়া বহির্জগতেও যে নারীর কাজ আছে, সেটা বুঝ্‌বার সময় আজ এসেছে এবং অনেকে তা বেশ বুঝ্‌তেও পারছে। এ বিষয়ে বোধহয় আমেরিকায় নারীরাই সবচেয়ে অগ্রগামী (অগত্যা বর্ত্তমান যুগে)। নিজেকে ইচ্ছামত গড়ে তুল্‌বার সুযোগ ও সুবিধা আমেরিকায় যতটা পাওয়া যায় ততটা বোধহয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। পদে পদে বাধা এরা পায় কম, এবং পেলেও এরা থামে না, বরং বাধাটাকে "বিজয় টীকা" করে আরো উৎসাহে মেতে যায়। তাই এদেশে বীর নরনারীর অভাব নাই। নূতন জ্ঞানের জন্য দেশের উন্নতির জন্য ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য এরা প্রাণপাত ক'রতে আজ দ্বিধা করে না। তাই এদেশে কত রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষণকর বীরত্বের খবর শুন্‌তে পাওয়া যায়। অনেক সময় এরা মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করে না, তাই এরা এমনভাবে জয়ী হয়। তাই এদেশের নারী আর অবলা নয়। পুরুষের মতই সে আজ বিদ্যায় বিদুষী, বুদ্ধিতে পণ্ডিত, এবং মানসিক বলে (কখনও কখনও শারীরিক বলেও) সবল ও সক্ষম।

মিস্ এ্যমেলিয়া ইয়ারহার্ট এর (in private life Mrs. George Palmer Putnum) লোমহর্ষণ বীরত্বের খবর সকল সভ্য জগতে কে না রাখে? ইনি গত ১২ই জানুয়ারী একলা এরোপ্লেনে Honolulu, Hawaia Island থেকে উড়ে Oakland, ক্যালিফোর্ণিয়াতে নিরাপদে পৌঁছে জগতকে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করে দিয়েছেন। Honolulu, Hawaii থেকে প্রশান্ত মহাসাগর উড়ে পার হয়ে আস্‌তে তাঁর ঠিক ১৮ ঘণ্টা ১৭ মিনিট লেগেছিল। তাঁর এই জয় সেদিন Hakland এ পাঁচ হাজারের উপর নরনারীর যুক্ত আনন্দ ধ্বনিতে ভরপুর হ'য়ে উঠেছিল। মুখের আওয়াজ যথেষ্ট হচ্ছিল না তাই অসংখ্য মোটরের 'হর্ণ' বাজিয়ে এই বীর নারীকে যেন জানাচ্ছিল "তোমার গৌরবে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত—তুমি আমাদেরই মেয়ে—তোমাকে আমরা পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছি।" পাঁচ হাজারের উপর লোকের জয়ধ্বনি, ও মোটর ধ্বনিতে ও অসংখ্য ফুলের তোড়াতে তার সম্বর্দ্ধনা কেমন হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। হনলুলু থেকে Oakland ২,৪০০ শত মাইল। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর তুমুল ঝড় ও কুয়াসার (Fog) ভিতর দিয়া নিজেকে নির্ভীক রেখে যখন উনি Oakland, Airport এ পৌঁছালেন, তখন সেখানকার সেই বিরাট জনতাকে বলেছিলেন, "Well I'm sure glad to be on land again," ধন্য মেয়ে যাহোক।

বিশ্ববিখ্যাত এই অদ্ভুত বীর নারীটী চেহারায়, সাহসে ও গুণে অনেকটা লিণ্ড্‌বার্গের (Lindburgh) মত। বলা বাহুল্য যে লিণ্ড্‌বার্গ ১৯২৮ শালে ২৫ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রথম নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসে এরোপ্লেনে একা উড়ে যান। অনেকে বলেন এর কর্ম্মক্ষমতা লিণ্ডবার্গকেও অনেক সময় হার মানায়। চেহারার দিক দিয়াও লিণ্ডবার্গের সঙ্গে এর এতদুর সাদৃশ্য যে একসঙ্গে দেখ্‌লে মনে হয় এরা দুটী যমজ ভাইবোন। মিস্ ইয়ারহার্ট লিণ্ডবার্গের মতই অসাধারণ লম্বা, রোগা, স্থির, শান্ত। এর চেহারা সুন্দর না হলেও ছাঁটা সোনালী চুলগুলো যখন Airport এর মুক্ত হাওয়ায় উড়তে থাকে তখন এঁকে দেখায় বেশ। চুলগুলো যেন তাঁর উড়ন্ত মনের কথা জান্‌তে পেরে সব সময়েই উড়্‌ছে ; কাজেই অধিকাংশ সময়ই অপরিপাটী দেখায়।

বাংলা কথায় বলে, "সুখে থাক্‌তে ভুতে কিলায়" এর পক্ষেও একথাটা খানিকটা খাটান যায়। ধনীর ঘরে এঁর জন্ম। ইচ্ছা করলে উনি আজীবন রেশম, পশমে, দিব্য আরামে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। সে অধিকার ও দাবী তাঁর যথেষ্টই ছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁর কোনদিনই ঝোঁক ছিল না, কাজেই টাকার চাকচিক্য বা সুমোহন অট্টালিকা বা মূল্যবান্ কাপড় গহনা তাকে কোনদিনই আট্‌কে রাখ্‌তে পারে নি। মনটি তার চিরদিনই যেন হাওয়াতে উড়্‌ছে। ছোট বেলা থেকেই এঁর এরোপ্লেনে উড়্‌বার সখ।

মিস্ ইয়ারহার্ট ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই Atchinson, Kansas এ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বাবা ক্যালিফোর্ণিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট উকিল। মেয়ের Airplane

চালাবার উৎসাহ দেখে অথচ ওটা বিপদজনক ভেবে প্রথমে সাধারণ বাবাদের মতই উনি ভয়ানক রকমে বাধা দেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন যে তাঁর মেয়ে কিছুতেই শুন্‌বার পাত্রী নয়, তখন বাধা না দিয়ে অগত্যা উৎসাহই দিলেন—যদিও মনে মনে সর্ব্বদা তাঁর শঙ্কা ছিল। মিস্ ইয়ার হার্টের "Air Hobby" এতই প্রবল ছিল যে ১৯ বৎসর বয়সেই তিনি এরোপ্লেন চালাতে শেখেন। ১৯১৫ শালে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে হাই স্কুল পাশ করেই তিনি টরন্‌টোতে (Toronto) যুদ্ধের নার্সের কাজ শিক্ষা করেন। পরে ছাত্রী হিসাবে উনি Uni of California, Harvard ও Columbia, কলম্বিয়াতে Sociology এবং Experimental and Calculative Chemistryতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন। ইহা ছাড়া উনি একজন বহুভাষী (Linguist) নামে ও খ্যাত। পাঁচটী বিদেশী ভাষায় সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারেন।

হাই স্কুলে অধ্যয়ন কালেই উনি এরোপ্লেন চালাতে শেখেন। ১৯১৮ শালে মাত্র দশ ঘণ্টার শিক্ষা পেয়েই উনি একা এরোপ্লেন চালাতে পেরেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে Pilot লাইসেন্স ও পেয়েছিলেন। এরপরে দুই বৎসরের মধ্যেই ১৪,০০০ ফিট উঁচুতে উঠেন। এর আগে আর কোনও মহিলা Pilot এত উঁচুতে উঠ্‌তে পারে নাই। আরও এক বৎসর পরে Federation Aironatique International এর Pilot's license পান। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও মহিলা Pilot য়ের এ সৌভাগ্য হয় নাই।

Social worker বা সমাজ কর্ম্মী হিসাবেও ইনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। ১৯২৬ শালে শিকাগোর Denison House এ Settlement work এর জন্য কিছুদিন চাকুরী করেন। ইহাছাড়া বিদেশী নরনারীকে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া ও বিদেশী মা মেয়েদের ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য একটী নৈশ বিদ্যালয়ের ডিরেক্টার হয়ে বণ্টন এবং তৎসন্নিকটস্থ জায়গার ফ্যাক্টরীর শ্রমজীবিদের মধ্যে অনেক কাজ করেন ও তাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। এঁরবন্ধু বান্ধবেরা এঁর এই অসীম কার্য্য ক্ষমতা ও অক্লান্ত উৎসাহের জন্য এঁকে 'কাজের অসুর' উপাধি দিয়েছিলেন। যখন যে কাজ হাতে নিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ না করে কখনও ছাড়েন নাই এই হোল তাঁর স্বভাব। সদা কর্ম্মরতা ও শতকর্ম্মে সদা নিরলসতা এর জীবনে খুব দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সিকাগোর সেটেল্‌মেণ্ট হাউসে যখন কাজ করতেন তখনও সেখানকার বন্ধুরা জানতেননা যে উনি একজন বিশেষ উৎসাহী এরোপ্লেন চালক। ১৯২৮ সালে ইনি যখন একজন Pilot ও একজন mechanic মেকানিকের সঙ্গে অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হতে চেষ্টা করেন তখন সকলকেই অবাক্ ক'রে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তাদের সে যাত্রা শুভ হয়নি। Pilot ও মেকানিক জীবন হারায় কিন্তু উনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এই দুর্ঘটনা হওয়ার কিছুকাল পরে উনি একলাই অ্যাট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগর এরোপ্লেনে পার হন।

এই সুত্রে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে একখানা বই লেখেন এবং ছাপাবার জন্য নিউইয়র্কের

একজন বিখ্যাত পাবলিশার George Palmer Putnum ও তার স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্টভাবে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। পরে মিসেস্ পাট্নাম তার স্বামীকে ডিভোর্স করে আপ্টন (Upton) নামক একজন ক্যাপটেনকে বিয়ে করলে মিস্ ইয়ারহার্ট ১৯৩১ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী পাট্নামকে বিয়ে করেন।

এ্যমেলিয়া ইয়ারহার্ট বিয়ে করলেও রান্না ঘরে ফিরে যান নাই তাঁর পূর্ব্ব স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় আছে; কাজেই তাদের বিবাহিত জীবন সুখের। তাঁর স্বামী তাঁর সকল কাজে বাধা না দিয়া বরং প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ দিয়া থাকেন, স্ত্রীও সেই প্রকার স্বামীকে তাঁর সকল কাজে সাহায্য করেন ও সহানুভূতি দেখিয়ে থাকেন। আমেরিকার সমাজে এরা আদর্শ যুগল নামে খ্যাত। এই আদর্শ যুগলের নাকি মতের অমিল খুব কমই হয় মারামারি তো দূরের কথা। অগত্যা এই রকম শোনা যায়। তবে একবার বিয়ের আগেই নাকি একটু খানি যা গোল বেঁধেছিল তা তেমন বিশেষ কিছু নয়। এ্যমেলিয়া ইয়ারহার্টের antogiro flight এ তাঁর স্বামী Putnum তাঁর সঙ্গে যাবার বায়না ধরেন; কিন্তু স্বামীকে ধমক দিয়ে বাড়ীতে রেখে তিনি একাই গিয়েছিলেন।

১৯৩২ সালের মে মাসে মিস্ ইয়ারহার্ট একলা Harbor Grace, Newfoundland থেকে Culmore (London derryর নিকটে) Ireland এ উড়ে গিয়েছিলেন। এ যাত্রায় তিনি ৪ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট হাওয়াতে ছিলেন, এবং ৫০০ শত মাইল ঝড়ের সঙ্গে রীতিমত লড়াই ক'রে ও মরণকে বরণ ক'রেও জয়ী হয়েছিলেন। ইনিই মেয়েদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম দু'বার সমুদ্র উড়ে পার হয়েছেন। এই বীর মার্কিন তরুণীর অত্যাশ্চর্য্য সাহস ও বীরত্বের কথা লিখে শেষ করা যায় না। ইনি সর্ব্বপ্রথম (Pioneer air-woman) হিসাবে জীবনে এ যাবৎ যা করেছেন তার কয়েকটী নীচে দিলাম। এই দেখে তার বিচিত্র কাজের কথা কতকটা অনুমান করা যেতে পারে।

মহিলা Pilotদের মধ্যে ইনিই প্রথম মহিলা এরোপ্লেনে অ্যাট্লাণ্টিক মহাসাগর পার হন। প্রথম মহিলা antogyro প্লেন চালান। সর্ব্ব প্রথম চালক antogyro প্লেনে যুক্তরাজ্য অতিক্রম করেন। প্রথম মহিলা (Distinguish) Flying ক্রশ পুরস্কার পান। প্রথম মহিলা National Geographic সোসাইটীর স্বর্ণপদক (Gold medal) পুরস্কার পান। প্রথম মহিলা Trans-continental Non-stop flight করেন।

Women's International speed record এ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। যুক্ত প্রদেশে প্রথম মহিলা pilot, যাত্রী নিয়ে যাবার লাইসেন্স পান। ধন্য মেয়ে যা হোক। তাঁর এই সাহস ও ক্ষমতা বর্ত্তমানে আমেরিকার অনেক মহিলাকে এদিকে টেনে এনেছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহাদের সংখ্যা পুরুষ pilot দের তুলনায় যে কিছু কম হবেনা তাতে আর সন্দেহ কি? তাই ভাব্ছিলাম, নারীর অসাধ্য কাজ জগতে এমন কি আছে?

মৃত্যুর মাঝে ফুটিয়া উঠুক জীবনের শতদল

হোসনে আরা বেগম

দুর্গম পথের যাত্রী ওরে অমৃতের সন্তান
মৃত্যুর মাঝে জীবনের তোরা পেলি কিরে সন্ধান ?
উদার আকাশে হেরিয়াছ বুঝি জীবনের সমারোহ
ছাড়িয়াছ তাই হেলাভরে আজ মরিয়া বাঁচার মোহ ?
আপন বুকের পাঁজর জ্বালায়ে আঁধার ধরণী পর
সূর্য্য হয়ে কি উজল আলোক বিলাও নিরন্তর ?
আকাশের চাঁদ সেও বুঝি তব কম-বদনের হাসি—
ধূসর-ধরণী জ্যোছনা-ধারায় ওঠে তাই উল্লাসি ।
তোমার দিঠির উজ্জ্বলতায় মলিন সন্ধ্যা তারা
ইঙ্গিতে তব আকাশের গ্রহ হয় বুঝি পথহারা ?
পুরাণো ভাঙিয়া নবীন সৃষ্টি তোমাতেই সম্ভব ?
ধ্বংসের পরে নূতন পৃথিবী গড়িবে কি অভিনব ?

তাই যদি হয় শ্মশান ছাড়িয়া জেগে ওঠো শঙ্কর
নূতন করিয়া শুরু হোক পুনঃ ধ্বংস ভয়ঙ্কর
ধ্যান ভাঙি লও ইসরাফিল* তব প্রলয়-শিঙ্গা হাতে
তোলপাড় হোক জীর্ণা ধরণী তোমার চরণাঘাতে ।
খালেদ আবার অসি লও হাতে, অর্জ্জুন ধর বাণ
তোমাদের হাতে পঙ্কিলতার হয়ে যাক অবসান ।
বৃদ্ধা ধরণী—পাপের বোঝায় কুব্জ হয়েছে দেহ
আর্ত্ত কণ্ঠে চাহে সে এবার শান্তির অবলেহ
যৌবন-দ্বারে ফরিয়াদ করে : ওগো চির-দুর্ব্বার,
হানো হানো তব কঠোর কুঠার, কর সবে সংহার ।
মরণ-পথিকে দাও দাও ওগো ঘোর কালকূট বিষ
মৃত্যু যেন গো তাদের জীবনে হয়ে ওঠে শুভাশীষ ।

জাগো জাগো তবে হে রুদ্র দেবতা—জাগ্রত-যৌবন
ধ্বংসের পরে হউক সৃষ্টি—সুন্দর নিকেতন।
পুরাণো ধরার গলিত শবে আঁকড়িয়া কিবা ফল?
মৃত্যুর মাঝে ফুটিয়া উঠুক জীবনের শতদল।

* মুসলমানদের মতে ধ্বংসের দূত।

শিশু-সাহিত্য

শ্রীনিরুপমা দেবী

শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে যত আলোচনা পূর্ব্বে এই সাহিত্য-সম্মিলনে হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত বিশেষ নূতন কথা যে আমি কিছু বলিতে পারিব এমন মনে হয় না। শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপৃত আছি সত্য কিন্তু শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে তলাইয়া ভাবিবার কখন অবকাশ ঘটে নাই, বক্তৃতা দেওয়া তো দূরের কথা। শিশুসাহিত্য পড়িয়া সর্ব্বদাই আনন্দ পাইয়াছি তবে কখন লিখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করি নাই, কারণ শিশু-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া যেমন তাহাদের সাহিত্য রচনা করা যায় না, তেমনি শিশুর মনোরঞ্জন করিবার বিশেষ কৌশলটি জানা না থাকিলে শুধু শিশু-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়াই সাহিত্য রচনা করা যায় না এ কথাও সত্য।

তবে শিশুদের সংস্পর্শে আসিবার যেটুকু পুণ্য সুযোগ আমি জীবনে লাভ করিয়াছি তাহার দ্বারা ইহাই আমি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি যে শিশু-হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় না পাইলে তাহাদের উপযোগী সাহিত্য রচনা করা কখনই সম্ভবপর হয় না। শিশু কি আকাঙ্ক্ষা করে ও কি পাইলে প্রকৃত সুখী হয় তাহা জানিয়া শিশু-সাহিত্য রচনা করিতে পারিলে শিশু-সমাজে তাহা যথার্থ সমাদর পাইবে। একপক্ষে ইহা যেমন সহজ অপর পক্ষে ইহা আবার তেমনি কঠিন কাজ। শিশু-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা ও সন্তোষের পরিচয় লাভ করা কিছুই কঠিন নয় কিন্তু শিশুর সহিত ভাবে ভাষায় ও কল্পনায় সমবয়সী হইতে না পারিলে শিশু-সাহিত্য রচনা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নহে। কষ্টসাধ্য কল্পনার দ্বারা শিশুচিত্তকে কখন প্রলুব্ধ করা যায় না। শিশু-কাব্য যেমন মধুর ও সুললিত হওয়া দরকার সেইরূপ যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত হইলে শিশু তাহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করে।

শিশু-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, কয়েকটি সাধারণ মানসিক অনুভূতি ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সম্বল মাত্র লইয়া শিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সুখ দুঃখ ও ক্রোধ এই

তিনটি অনুভূতি শিশুর মাঝে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর আরম্ভ হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার পারিপার্শ্বিক বস্তুর সহিত পরিচয় স্থাপন। এই অনুভূতি ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই তাহার অভিজ্ঞতা লাভ ও বুদ্ধিবিকাশের সহায়। Abstract বস্তু বুঝিবার মত বুদ্ধির বিকাশ সাধারণতঃ ১৩।১৪ বৎসরের পূর্ব্বে হয় না। ঐ বয়সের বালিকাকে Abstract noun কি বুঝাইতে গিয়া ও কোন Abstract subjectএ রচনা লিখিতে দিয়া দেখিয়াছি এ বিষয়ে তাহাদের ধারণা সুস্পষ্ট করা কত কঠিন। যে স্নেহ এবং ভালবাসা তাহারা জন্মাবধি পিতামাতার নিকট হইতে নিরন্তর পাইয়াছে তাহা কি এবং তাহার স্বরূপ কি লিখিতে বলিলে তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয় কিন্তু একটি শরতের প্রভাত অথবা বর্ষার সন্ধ্যা বর্ণনা করিতে দিয়া দেখিয়াছি অনেকেই একটি সুন্দর ভাষার ছবি আঁকিতে পারিয়াছে। সুতরাং প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় বাস্তব ও অনুভূতিগম্য বিষয়ই কেবলমাত্র শিশুচিত্তে কৌতূহল উদ্রেক করে। ১৩।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর নিকট Abstract অর্থাৎ বুদ্ধি ও জ্ঞানগম্য বিষয়ের ধারণা অত্যন্ত ভাসা ভাসা থাকে এমন কি সে সকল বিষয় বুঝাইতে গিয়াও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। এজন্য আমার মনে হয় এরূপ বয়সের পূর্ব্বে শিশুসাহিত্যের ভিতর সাধারণতঃ এইরূপ বিষয়ের অবতারণা সাধারণভাবে (directly) করা নিরর্থক। তবে শিশুর মধ্যে বয়সের তারতম্য অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও অনুভব শক্তির এত ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় যে জ্ঞানগম্য বিষয় সমূহও শিশুসাহিত্য হইতে একেবারে বর্জ্জন না করিয়া গল্প ও উদাহরণের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে মনের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে।

এ কথায় সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ রচনার বিবরণটি মনে পড়িতেছে। রাজা অমরশক্তি তাঁহার পুত্রদিগকে প্রচলিত প্রথানুসারে সৎশিক্ষা দিতে না পারিয়া একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের হাতে তাহাদের শিক্ষার ভার অর্পিত হইল। ছেলেগুলির প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত দেখিয়া উক্ত পণ্ডিত বুঝিতে পারিলেন গতানুগতিক প্রথানুসারে সদুপদেশগুলি গলাধঃকরণ করাইয়া এক্ষেত্রে কোন সুফল পাওয়া যাইবে না। তখন তিনি এক একটি সদুপদেশ অবলম্বন করিয়া এক একটি গল্প রচনা করিয়া তাহাদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন ও অভাবিত সুফল পাইলেন। এই গল্প সমষ্টিই পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ। আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না এরূপ দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি শিশুর ঘরে ঘরে আজিও অভাব নাই। শিশু শৈশব হইতে কৈশোরের মধ্যে এত দ্রুত এবং অধিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যে ৫ বৎসরের শিশু মনের সহিত ৬ বৎসরের শিশুর প্রচুর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ১৩।১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৎসরে বৎসরে শিশুমনের বিকাশ হইতে থাকে। ৪ বৎসর অর্থাৎ অক্ষর পরিচয়ের সময় হইতে ১৩।১৪ বৎসর বয়সের বালক বালিকার জন্য রচিত সাহিত্যকে যদি শিশুসাহিত্য আখ্যা দেওয়া যায় তবে আমাদের স্বীকার

করিতেই হইবে যে শিশুসাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক তাহা না হইলে সাহিত্য শিশুমনের ক্রমবিকাশের সহায়ক হইবে না। ৫।৬ বৎসরের শিশুর পুস্তকের বিষয়-বস্তু ১০।১২ বৎসরের শিশুমনের যোগ্য কখনই হইতে পারে না, তাই শিশুর বুদ্ধি পরিবর্দ্ধন অনুসারে সাহিত্য বস্তুরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

আমরা সকলেই জানি শিশুচিত্ত বাস্তবতা প্রিয়, তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তাহার নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই ধারণার উপরই বর্ত্তমান কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। শিশু মনস্তত্ত্বের প্রধান কথা এই, যে সকল জিনিষ সহজভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া, চোখে দেখা ও কানে শোনার মত সহজভাবে শিশুর নিকট উপস্থিত হয় শিশু তাহাকেই অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করে।

শিশুকে পাঠ্যপুস্তক এবং সাহিত্যের ভিতর সদুপদেশ দেওয়ার রীতি পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহার উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল বাল্যকাল হইতে কয়েকটি মূল সত্যের উপর চরিত্র গঠন করা, কিন্তু যে বয়সের শিশুর নিকট ইহা প্রচারিত হইত সে বয়সে এ সকল সত্য উপলব্ধি করিবার শক্তি থাকা সম্ভব নয়। আমরা যখন পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছিলাম সদা সত্য কথা বলিতে হইবে, কদাচ মিথ্যা বলিতে নাই, তখন এই কয়টি কথার অক্ষর বিন্যাসের আকৃতি ভিন্ন মনের ভিতর কোনরূপ রেখাপাত হয় নাই অথবা মনে কোন ধারণাই স্বচ্ছ হয় নাই। সত্য কথা বলিবার জন্য কিরূপ সত্য চিন্তা ও সত্য আচরণের আবশ্যক, মিথ্যার ভিতরই বা কি বিরাট পাপ লুকায়িত হইয়া আছে তাহা কিছুই বুঝি নাই শুধু যফলা যোগের একটি নূতন আনন্দ চোখের সম্মুখে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। অথচ যখন মায়ের মুখে শুনিয়াছি দশরথ রাজা সত্যরক্ষার জন্য কেমন করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়পুত্র রামকে বনবাসে পাঠাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন তখন মনের প্রচ্ছন্ন গোপনে কৈকেয়ীর উপর রাগ করিতে গিয়া হিংসা ও লোভের উপর বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে ও দশরথের সত্যরক্ষার মাহাত্ম্যে সত্যের প্রতি একটি অকপট অনুরক্তি অনুভব করিয়াছি।

এইরূপ পৌরাণিক ও আধুনিক গল্পের ভিতর দিয়া, রঙীন চিত্র দেখাইয়া অথবা শিশুদিগকে দিয়া ছোটখাট অভিনয় করাইয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়টি তাহাদের দৃষ্টির উপর চিত্রিত করিতে পারিলে তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করা সহজ হয়। এই দিক দিয়া দেখিলে বালক বালিকাদের অভিনয়-উপযোগী নাট্যসাহিত্যের ও রঙীন চিত্রপূর্ণ পুস্তকের যথেষ্ট অভাব বাংলা ভাষায় রহিয়াছে। গত কয় বৎসরে শিশুসাহিত্যের যে আশাতীত উন্নতি হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ ভ্রমণ-কাহিনী, জীবজন্তুর কথা গল্প ও জীবনীর ক্ষেত্রে, কিন্তু শিশু নাটিকার স্থান ও শিশু-সাহিত্যে নেহাৎ কম নয়। অধিকাংশ ইংরাজী শিশু-সাহিত্যে যেরূপ লিখিত বিষয় অপেক্ষা রঙীন চিত্র অধিক থাকে বাংলা শিশু-সাহিত্যে নেহাৎ কম নয়। অধিকাংশ ইংরাজী শিশু-সাহিত্যে

যেরূপ লিখিত বিষয় অপেক্ষা রঙ্গীন চিত্র অধিক থাকে বাংলা শিশু-সাহিত্যে সেরূপ বই একখানিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না অথচ চিত্র এবং নাট্য যে কল্পনাকে বাস্তব করিবার প্রধান উপকরণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে বাংলা শিশু-সাহিত্যের যে অভাবনীয় উন্নতি অল্প কয় বৎসরের মাঝে হইয়াছে এজন্য আমরা লেখক লেখিকাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন যোগীন্দ্র নাথ সরকারের কয়েক খানি মাত্র বই ও মুকুল নামে একখানি মাত্র মাসিক পত্রিকা আমাদের মনের প্রাত্যহিক খোরাক জোগাইয়াছে। সেই পুরাতন বৎসরের বাঁধান মুকুল খানিকে পড়া আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। ইহার প্রত্যেক গল্প ও কবিতা যে কতবার করিয়া পড়িয়াছিলাম তাহার সংখ্যা নাই। হাতে হাতে বই খানি শত ছিন্ন হইয়াছিল, ছিন্ন অংশে কত তালি পড়িয়াছিল তথাপি তৈলনিসিক্ত মলিন পৃষ্ঠার কাহিনীগুলি তখনও যেমন পুরাতন হয় নাই আজিও তাহা সেইরূপ হৃদয়ের পাতে অমলিন হইয়া মুদ্রিত রহিয়াছে।

এখন বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহা বুঝি যে সাধারণতঃ যে সব বই হাতের কাছে পাই তাহা একবার পড়িলে দ্বিতীয়বার পড়ি না, নূতন বইয়ের সন্ধান করি কিন্তু শিশু এক বই বার বার পড়িয়াও ক্লান্তি বা বিরক্তি অনুভব করেনা। ইহার একটি কারণ আমার মনে হয় আমরা বয়োবৃদ্ধির সহিত যেরূপ বিষয় বস্তুর অন্বেষণ করি শিশু সেরূপ করে না, তাহার আকর্ষণ বিষয় বস্তু অপেক্ষা বাহ্যিক সৌষ্টবের দিকে। আমরা কি ইহা দেখি নাই, যে সকল বইয়ের ভাষার মাধুর্য্য আমাদের মুগ্ধ করে তাহা ২।৩ বার পড়িতে আমাদের এখনও ভাল লাগে? আর বার বার পড়িতে ভাল লাগে কবিতা। কবিতাটী ভাষা, ছন্দ ও বাক্যবিন্যাসের মাধুর্য্যের জন্য যেমন আমরা বার বার পাঠ করিয়া অধিকতর রস উপলব্ধি করি, শিশু সেইরূপ করিয়া তাহার সাহিত্যের গদ্য পদ্য সকল রচনাকে পাঠ করে। শিশু-সাহিত্যের ভাষা তাই অবহেলার বস্তু নহে। আমাদের কাছে যেমন পাঠ্য বিষয়ের ভাবই প্রধান ভাষা পরোক্ষ, শিশুর কাছে ঠিক তাহার বিপরীত বলিয়া মনে হয়, তাহার নিকট ভাষাই প্রধান, ভাব পরোক্ষ। শিশু যাহা পড়ে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে চায় তাহার বস্তু-তান্ত্রিক মন পাঠ্য রচনার বিষয় বস্তুর সহিত ভাষাটিকেও শক্ত করিয়া ধরিতে চায়. তাহা হইতে একটি বাস্তব ঘটনাকে পাইতে চায়।

শিশু-সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য যেমন শিশুকে ভাব প্রকাশের অভিব্যক্তি ও চিন্তা-শক্তির ধারা-বাহিকতা শিক্ষা দেওয়া তেমনি আর একটি উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। শিশু স্বয়ং আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি, আনন্দের ভিতর দিয়াই সে জগতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, আনন্দের ভিতর দিয়া সে প্রত্যেক জিনিষকে চিনিতে চায়, তাই শিশু খেলা ভালবাসে ও খেলনা ভালবাসে। তাই শিশুর গতি এত লীলাচপল, তাই চলা বলা সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহার অহৈতুক আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। এই খেলার পথই শিশুর নিকট সুগম, একথা সাহিত্য ক্ষেত্রে ভুলিলেও চলিবে না।

সুতরাং দেখিতে হইবে শিশু-সাহিত্যে খেলার পথ কাহাকে বলা যায়। এরূপ খেলার ছলে সাহিত্য রচনা করার জন্য বড় লেখকের দরকার ; যে সে লেখক তাহা লিখিতে পারে না। খেলার ভিতর যেমন কোন গূঢ় অর্থ থাকে না, সেইরূপ ২।৪ খানি বই কদাচ আমাদের হাতে আসিয়া পড়ে যাহার ভিতর কোন অর্থের বালাই নাই, কোন উদ্দেশ্য ছদ্মবেশে নাই তথাপি চিত্তাকর্ষক। গদ্য পদ্য উভয় প্রকার রচনার মাঝেই এরূপ রচনা অত্যন্ত বিরল। ৺সুকুমার রায় চৌধুরীর আবল তাবল ও হযবরল যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন আমি কি বলিতে চাই। এরূপ লেখা শিশু-হৃদয়কে এমন কি আমাদের হৃদয়কেও কেন এত বেশী আনন্দ দান করে তাহা বলা কঠিন। আমার মনে হয় আমাদের মনের এক কোণে যে একটি চিরশিশু বাস করে সে এইরূপ সাহিত্য পাইয়া পুরাতন বন্ধু লাভ করার মত আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে তাই ইহার মাঝে কোন ভাষার সামঞ্জস্য নাই জানিয়াও ইহার ছন্দের দোলায় আমাদের মন নাড়া দেয়। ইহা ভাল লাগার একটি সহজ গতি আছে ও সাধারণতঃ ইহা কবিতাবহুল। নিজেদের বাল্যকালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই যে সকল গল্পের মাঝে ২।৪ ছত্র কবিতা ছিল তাহাই মনের মাঝে আজিও মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কত বৎসর বয়সে প্রথম পড়িয়াছিলাম যে গল্পে,—

লম্বা লম্বা দাড়ি
ঘন ঘন চোপা নাড়ি
"তুই ভাই কে রে"
সিংহির মামা ভোম্বল দাস
বাঘ মেরেছি গোটা পঞ্চাশ

সে গল্পটির ছবি এমন কি গল্পটি কোন রংএর কালীতে মুদ্রিত ছিল তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।

শিশু বই পড়িবার আগেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে গল্পে ছড়া আছে কিনা, ছবি আছে কি না, কথোপকথনের চিহ্ন আছে কিনা। এ সকল থাকিলে পড়িবার আগ্রহ তাহার দ্বিগুণ হয়।

শিশুর মনোরঞ্জন করা বড় সহজ কথা নয়, শিশু হইয়া আসিতে না পারিলে তাহার মনোরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। আবার সচেতন হইয়া শিশু সাজিলে শিশু একবার পড়িয়াই ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলে, এইরূপে কত লেখকের লেখা ব্যর্থ হইয়াছে। শিশুর পরখ করিয়া দেখিবার ক্ষমতা অতি প্রবল, কে তাহার সমবয়সী। যে সকল অমর কবি তাঁহাদের লেখনিতে চির-শৈশবকে জীবিত রাখিতে পারিবেন তাঁহাদের রচনা কেবলমাত্র শিশু-সাহিত্যকে নয় সমস্ত বাংলা সাহিত্যকে সজীব ও সরস করিয়া রাখিবে।

এতক্ষণ শিশু-সাহিত্যের বিষয় বস্তুর কথা বলিলাম। এবার শিশু-সাহিত্যের ভাষার কথা দু' একটি বলিব। বর্ত্তমান শিশু-সাহিত্যে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার যে সংমিশ্রণ দেখা যায় তাহার

ফল শিশু-শিক্ষার উপর কিরূপ তাহা দেখিতে হইবে। আমাদের বাল্যকালে যে সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছি তাহাতে চলিত ভাষার প্রচলন ছিলনা বলিলেই চলে কিন্তু বর্ত্তমানে দুই প্রকার ভাষারই বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু প্রথম শিক্ষার সময়ে যখন ভাষার রাজ্যে দিশাহারা হইয়া পড়ে সেই সময়ে তাহার সম্মুখে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ ভঙ্গী তুলিয়া ধরিলে তাহাকে আরো বিভ্রান্ত করিয়া তোলা হয় নাকি? শিশু জন্মাবধিই ভাষার মৌখিক প্রয়োগ চলিত ভাষায় শিক্ষা করে, তাহার পর পাঠ্যাবস্থা উপস্থিত হইলে সাধু ভাষার সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়, সেই সময়ে দুই প্রকারের নূতন প্রকাশ প্রণালী দুই প্রকারের বানান্ যদি আমরা তাহার অপরিপক্ক নিজ বিচারের উপর ফেলিয়া দিই সে কোন্‌টি বাছিয়া লইবে? সাধুভাষা ও চলিত ভাষার অদ্ভুত সংমিশ্রণ করিতে শেখাই তাহার স্বাভাবিক, এবং সেজন্য আমরাই দায়ী। আমার মনে হয় শিশুর প্রথম লিখিতে ও পড়িতে শেখা সাধু ভাষায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহার উপর একবার দখল জন্মিলে তখন চলিত ভাষায় যথেচ্ছ প্রয়োগ সে নিজেই করিতে পারিবে। কোন গল্প যদি সাধুভাষায় লিখিত হয় ও তাহার পাত্র ও পাত্রীর কথোপকথনের স্থানগুলি মাত্র চলিত ভাষায় লিখিত হয় তাহাতে শিশুর পক্ষে এই দুইটি ভাষার বিভিন্ন ব্যবহার শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে।

শিশুর হাতে উপযুক্ত সাহিত্য রচনা করিয়া দিলেই শুধু চলিবে না, তাহার মনে সাহিত্য রস জাগ্রত করিতে হইলে সাহিত্য রচনায় তাহাকে ব্রতী করিতে হইবে। যৎসামান্য প্রচেষ্টা হইলেও শিশুকে ইহার ভিতরে রস উপলব্ধি করিতে শিখাইতে হইবে। দুই এক ছত্র লিখিতে লিখিতেই শিশু সৃষ্টির একটি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতে শিখিবে। শিশুদিগকে দিয়া লিখাইলে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকেই কোন একটি ভাবে অথবা বাক্য সুসঙ্গত ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না; এ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে তাহাদের চিন্তার মাঝেও কোথাও গলদ রহিয়াছে। লেখার মূলে চিন্তা এবং বাক্যই আমাদের প্রেরণা দেয়। এজন্য কোন একটি বাক্য লিখিবার পূর্ব্বে তাহা ঠিক ভাবে ভাবিতে শেখা তৎপরে বলিতে শেখাও তৎপরে লিখিতে শেখা আবশ্যক। প্রয়োগের দ্বারাই আমাদের শিক্ষার সার্থকতা ইহা ভুলিলে আমাদের চলিবে না। বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সাহায্যে শিশুরা ইচ্ছামত বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া সাহিত্য রচনা করিলে ও শিশু সাহিত্য সভা আহ্বান করিয়া তাহা আবৃত্তি বা পাঠ করিয়া শুনাইলে অল্পদিনের মাঝে তাহাদের যে আশ্চর্য্য রসানুভূতি ও সাহিত্যানুরাগ জন্মায় তাহার প্রমাণ আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে পাইয়াছি।

আমার মনে হয় আর একটি উপায়ও ফলপ্রদ হইতে পারে। শিশুদিগের মাঝে সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ দিগের নিকট হইতে প্রশংসা পাইবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এইরূপ প্রশংসা লাভ করিলে তাহাদের মাঝে উৎসাহও বৃদ্ধি পায়। শিশুদিগের জন্য যে সকল মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহার মাঝে কয়েক পৃষ্ঠা যদি বালক বালিকাদের রচনার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হয় ও তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত গল্প ভ্রমণ কাহিনী ছোট ছোট কবিতা বা

আলোচনা প্রকাশিত করিতে পারে তবে তাহাদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। শিশু সমাজকে বুঝাইবার দিন আসিয়াছে আমরা যে কথা বলিব তাহা শুধু তোমরা শুনিলেই চলিবে না, তোমাদের কচি মনের কাহিনীও আমরা শুনিবার জন্য ব্যাকুল, তোমাদের আনন্দের অভিব্যক্তি না শুনিলে আমাদের আনন্দও পূর্ণ হইবে না। সাধারণতঃ আমরা বয়োজ্যেষ্ঠরা আমাদের সকল প্রকার আলাপ আলোচনা হইতে শিশুদের নির্ব্বাসিত করিয়া রাখি, আমাদের জ্ঞানজগতে শিশুসমাজকে প্রবেশাধিকার না দেওয়াই আমাদের অভ্যাসগত হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্তু এই সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষেরা আজ যে আয়োজন করিয়াছেন তাহার দ্বারা আমরা যে শিশু-সমাজকে উপেক্ষা করি না, তাহাদের অধিকার ও দাবী আমাদের অধিকারের সহিত সমান আসনে তুলিয়া ধরিতে চাই ইহা জানাইবার পুণ্য-সুযোগ লাভ করিলাম। যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে শিশুর কল্যাণের পথটি সুনির্দ্দিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন ও তাহাদের অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, সমস্ত শিশুসমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তালতলা সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত।

বৈজ্ঞানিকের বাড়ীতে

শ্রীঅরুণা দাশগুপ্তা

ভাস্করের মাঝে মাঝে নানা রকমের অদ্ভুত খেয়াল হত। সেদিন বেলা দু'টোর সময় তার খেয়াল হল, দোতলা বাসে চড়ে খানিকটা ঘুরে আসবে। অবশ্য ডিসেম্বর মাসে বড় দিনের দুপুর, মিঠে উপভোগ্য রোদ, কোনই কষ্ট হবার কথা নয়; তবু বেলা দু'টোর সময় বেরুণকে খেয়াল ছাড়া আর কিই বা বলা যায়।

একটা সিটে দুজন বসে গল্প করতে করতে শ্যামবাজারের দিকে চলেছি। আমি বললুম বটে গল্প করতে করতে চলেছি, কিন্তু আসলে সে গল্পের প্রায় সবখানিই ভাস্কর একা করছিল।

উত্তর দিকে তাকিয়ে সে তখন অনেকটা নিজের মনেই বলছিল, "সবাই বলে কলকাতার এ অঞ্চলটাতেই সবচেয়ে গরীব বাসিন্দেরা থাকে রাজ্যের চোর, ডাকাত, পিকপকেট সবাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। উত্তর কলকাতার গলিতে সূর্য্যের আলো ঢোকে কৃপণভাবে, এমন কি সভ্যতাও গলির মুখ পর্য্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি বলি, এরা যে সভ্যতার ধার ধারেনা তা' এদের পক্ষে ভালোই। এখনও এরা বেঁচে আছে—এদের সবাই পিকপকেট অথবা ডাকাত নয়;

সুখে দুঃখে এখনও এরা পরস্পরের সাথী হয়। যেদিন এরা সভ্য হবে—যখন এদের সভ্যতার ছোঁয়াচ লাগবে, তখনই এদের সত্যিকারের দুর্দ্দিন। তখনই এরা অনায়াসে একজন আর একজনের গলায় ছুরি বসাবে। সভ্যতা বলতে সাধারণ লোকেরা যা বোঝে তা থেকে আলাদা করে আমরা যা বুঝি, তা' যেমন ভাল, মেকি সভ্যতা তার চেয়ে ঢের বেশি খারাপ, অনিষ্টকর। যাদের দেখে আমরা, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরা, নাক সিঁটকে অসভ্য বলি, আমার প্রায়ই মনে হয়, তারাই সত্যিকারের মানুষ, কেননা এখনও তারা এই অতি জঘন্য সভ্যতার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করছে। সভ্যতার নামে আমরা যে আত্মবলি দিয়েছি, কতগুলো কুসংস্কারের হাত থেকে নিজেদেরকে উদ্ধার করবার কোনই উপায় রাখিনি—"

"তারপর," আমি অন্যদিকে তাকিয়ে বললুম।

কোন উত্তর নেই।

"তারপর কি হল," গল্পের শেষটা শোনবার জন্য ছেলেরা যেমন আগ্রহ দেখায়, আমিও ভাস্করের দিকে তাকিয়ে তেমনি করে বললুম।

ভাস্করের চোখ দুটো তখন অপলক দৃষ্টিতে সামনে কি দেখছিল।

'কি আশ্চর্য্য! আমি একটু আগেই এদের প্রশংসা করছিলুম," ঘুম ভেঙ্গে ওঠবার মত আস্তে আস্তে সে বললে। "বলছিলুম এরা ধার্ম্মিক—এরা সব মানুষ। কিন্তু আমাদের কয়েক বেঞ্চি আগে যে লোকটা বসে আছে, বোধ করি ওর চেয়ে পাজী, ওর চেয়ে শয়তান কলকাতায় আর কেউ নেই।"

"কে, কোন লোকটা ?" আমি খানিকটা ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলুম। তারপর ভাস্করের দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারলুম সে কার কথা বলছে।

পাৎলা ছিপছিপে গড়নের একটি লোক, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে মূল্যবান কোঁচান ধুতি, মাথায় কোঁকড়া চুল মাঝখানে সিঁথিকাটা, বয়স সাতাশ থেকে একত্রিশের মধ্যে—চট্ করে চেহারা দেখে বোঝা যায় না। আঙ্গুলে দামী আংটি, পায়ে পেটেন্ট-লেদার জুতো—সব জড়িয়ে নিখুঁত বড়মানষি সাজসজ্জা। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন এসব বড়মানষি পোষাক কিছুই তার নিজের নয়, এক দিনের জন্য ধার করে পরা। লোকটি মোটামুটি সুপুরুষ হলেও মনে হয় যেন এসব তাকে মানায় না ; কতগুলি মূল্যবান জিনিষ স্তূপীকৃত হয়ে এলোমেলোভাবে তার গায়ে জড়ানো রয়েছে। একটু যেন রুচির ও কালচারের অভাব, একটু ভাল্গার, এই ইম্প্রেশনই লোকটি প্রথম দৃষ্টিতে দেয়।

'কেন, লোকটা করেছে কি ? ওকে তুমি চেন নাকি ?"

"লোকটা ঠিক কি করেছে, তা আমি জানি না," ভাস্কর বললে, "কিন্তু ওর প্রধান দোষ হচ্ছে অন্যকে বিপদে ফেলে নিজের সুবিধা করে নেওয়া। সম্ভবতঃ নিজের মতলব কার্য্যে পরিণত করবার জন্যে ও যা নয় তাই বলে পরিচিত হয়ে লোক ঠকাচ্ছে।"

"কি মতলব কার্য্যে পরিণত করবে? তুমি যদি ওকে চেন, ওর সম্বন্ধে সব কথা জান, তাহলে খুলে বল্‌ছ না কেন?"

"তুমি ভুল বুঝেছ," ভাস্কর আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে; "আমি ওকে চিনি না। জীবনে এই প্রথম আমি ওকে দেখছি।"

"তুমি ওকে চেন না!' আমি রেগে বললুম, "অথচ ওর সম্বন্ধে আন্দাজে যা'তা বলছ। তুমি কি করে বুঝলে যে এই লোকটি কলকাতার সব চেয়ে বড় শয়তান?"

"যে মুহূর্ত্তে এই লোকটিকে দেখেছি, তক্ষুণি আমার মনে হয়েছে যে এর তুলনায় আর সবাই দেবশিশু। আমার এতটুকু সন্দেহ নেই যে আর সবাই যা তা-ই; কিন্তু এ লোকটা যা' নয় তাই হবার চেষ্টা করছে। সেইটেই অন্যায়, সেইটেই পাপ।"

"কিন্তু তুমি যে বলছ আগে কখনও একে দেখনি পর্য্যন্ত—" "আঃহা, ওর দিকে একবার ভাল করে, তাকিয়েই দেখ না; ওর পোষাক, ওর মিশ্‌মিশে কালো কোঁকড়া চুল, চোখের ওপরে গর্ব্বিত ভুরু—ভাল্‌গার, ভাল্‌গার। এই গর্ব্বের জন্যেই স্বর্গের এঞ্জেল হয়েও শয়তানের পতন হয়।"

"কিন্তু যাই বল," জোরাল বক্তৃতার সামনে আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললুম, "যেহেতু তুমি ওকে চেন না, আগে কখনও দেখনি, সেই জন্যে জোর করে কিছুই বলতে পার না।"

"খুব পারি, খুব পারি।" ভাস্কর এতক্ষণে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁচেছিল। "আমার কথা বিশ্বাস না হলে চল, ওকে অনুসরণ করি, দেখবে আমি যা বলছি তা-ই ঠিক।"

মেছোবাজারের মোড়ে বাস্‌ আসতেই লোকটি নেবে পড়েছিল। আমরাও তাড়াতাড়ি নেবে তার পেছনে পেছনে চললুম।

মেছোবাজার দিয়ে খানিক দূর গিয়ে লোকটি ডানদিকে একটা এঁদো গলির ভেতরে ঢুকল। আমরাও একটু দূরে থেকে সেই গলির ভেতরে পা বাড়ালুম।

"ও রকম লোকের পক্ষে এই বিশ্রী গলিতে ঢোকা তো বড়ই আশ্চর্য্যের বলে মনে হচ্ছে," আমি বললুম।

"কি রকম লোকের পক্ষে?" বন্ধুবর জিজ্ঞেস করলেন।

"মানে—এই ভদ্রলোকের কথা বলছি আর কি। সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক এরকম জায়গাতে ওকে দেখবার আশা করিনি।"

ভাস্কর কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। আরও খানিক দূর গিয়ে লোকটি হঠাৎ মোড় ঘুরে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে আর একটু হলেই আমরা ওর ঘাড়ে এসে পড়েছিলুম আর কি। লোকটি মোড় ঘুরে একটা অত্যন্ত পুরণো ও জীর্ণ বাড়ীর সামনে কয়েক ফুট খোলা জায়গাতে এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে নিষ্ক্রমণের একমাত্র পথ হচ্ছে পূর্ব্বোক্ত

গলি। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর মোড় ঘোরবার প্রয়োজন হল না। গলির ওপরে সেই জীর্ণ বাড়ীটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমরা যথাসাধ্য দেখতে ও শুনতে চেষ্টা করলুম, যদিও লোকটির কথাবার্ত্তার কোন অর্থই আমাদের বোধগম্য হল না।

জীর্ণ বাড়ীটার সুমুখের নড়বড়ে দরজাতে কয়েকবার ধাক্কা দিতেই, আমরা বুঝতে পারলুম, দরজাটা খুলে গেল এবং ভেতর থেকে একটি লোক খুব আস্তে আস্তে কি বললে।

তারপর আমরা যাকে অনুসরণ করছিলুম সেই লোকটি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বাড়ীর ভেতরের লোকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "এক্ষুনি, এক মিনিটও দেরি করবেন না। বরং একটা ট্যাক্সি নিয়ে যান।"

মোটা গলায় ভেতরের লোকটি বললে, "আচ্ছা, এক্ষুনি যাচ্ছি।"

তারপর লোকটি গলিতে ঢুকে যে পথে এসেছিল আবার সেই দিকে চলল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মেছোবাজারে পৌঁছে লোকটি ডান হাতে মোড় ঘুরে হাঁটতে লাগল।

"পেটেণ্ট-লেদার জুতোর পক্ষে এসব রাস্তায় এত অনায়াসে আসা-যাওয়া করা বড় কম আশ্চর্য্যের নয়।"

"লোকটি এখন সার্কুলার রোডের দিকে যাচ্ছে। রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে," ভাস্কর বললে।

আরও বোধ করি আধঘণ্টা হাঁটবার পরে সার্কুলার রোডে একটা বাড়ীর কাছে আমরা থামলুম।

"কি আশ্চর্য্য!" ভাস্কর হঠাৎ বললে।

"কী আশ্চর্য্য?" আমি জিজ্ঞেস করলুম; "তুমি তো একটু আগেই বললে লোকটার পক্ষে সবই স্বাভাবিক।"

"নোংরা গলিতে অথবা ছোট লোকের পাড়াতে যাওয়াতে আমি একটুও আশ্চর্য্য হইনি; কিন্তু লোকটা একজন অত্যন্ত ভালো লোকের বাড়ীতে ঢুকলো দেখে আমি অবাক হয়েছি। যে বাড়ীতে ঢুকলো, সেখানে ওর মত লোকের কোনই প্রয়োজন থাকতে পারে না।"

"বাড়ীটা কার? বেশ ফিট্‌ফাট্ সাজান—গোছান বাড়ী—চেহারা দেখে মনে হয় গৃহস্বামীর রুচিজ্ঞান আছে।"

"বাড়ীটা বিজ্ঞান কলেজের প্রফেসর ডক্টর মৈত্রের। জ্ঞানী লোক, কিন্তু এই একটি দোষ; বড্ড বেশি আধুনিক, যে কোন লোক যে কোন অজুহাতে ডক্টর মৈত্রের ড্রইংরুমে ঢুকতে পারে এবং প্রত্যেকেই সাদর অভ্যর্থনা পায়। তুমি কবিতা লেখ, তা যতই বাজে হোক না কেন অথবা গল্প লেখ—ডক্টর মৈত্রের কাছে তোমার কবি অথবা সাহিত্যিকের আপ্যায়ন নির্ঘাত মিলবে। তুমি রাজনীতি করে সময় কাটাও, ডক্টর মৈত্র তোমার সঙ্গে রাজনীতিচর্চ্চা

করবেন। তুমি তারায় যাবার জন্যে একটা প্লেন আবিষ্কারের চেষ্টা করছ, ডক্টর তোমার সঙ্গে তারায় যাবার সম্ভাব্যতা নিয়ে মহাতর্ক আরম্ভ করবেন। এক কথায়, সব শ্রেণীর পাগলই তার আড্ডাতে জায়গা পায়, কিন্তু সাধারণতঃ তারা সকলেই একটু বোকা হলেও ভালো মানুষ। সুতরাং এই দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকটি এ বাড়ীতে ঢুকবে তা আমি কখনও আশা করিনি।"

'তুমি পাগল হয়েছ, ভাস্কর," আমি দৃঢ়ভাবে বললুম, "রাস্তায় একটা লোককে দেখে তুমি তার সম্বন্ধে যা—তা—কতগুলো কথা বললে। এখন তাকে একজন ভালো মানুষের বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেখে তুমি হয়ত বল্‌বে লোকটার চুরি করবার মতলব। স্বীকার কর যে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তারপর চল বাড়ী ফিরে যাই। এদের চা খাওয়া হয়ত শেষ হয়ে এল, কিন্তু আমাদের বাড়ী পৌঁছতেও এখনো অনেকটা সময় লাগবে তা ভুলে যেও না।"

"আমি ভেবেছিলুম বৃথা গর্ব্ব বস্তুটা আমার ভেতরে নেই।"

"কেন, আবার কি হল?"

"কিছু না, আমি শুধু তোমার কাছে প্রমাণ করব যে আমি যা বলেছি তা সর্ব্বৈব সত্য। তুমি বলছ প্রমাণ করবার কোন উপায় নেই। আমি বলছি আছে। চল. ডক্টর মৈত্রের সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। দেখবে কি চমৎকার লোক।"

"কিন্তু এই কাপড় চোপড়ে—"

"তাতে কিছু এসে যায় না।"

দরোয়ান আমার বন্ধুর নাম জিজ্ঞেস করে ভেতরে ঢোকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রকেশ অমায়িক চেহারার এক ভদ্রলোক ছুটে এসে দুহাত বাড়িয়ে ভাস্করের হাত ধরলো।

"এস, এস, ভাস্কর; কি সৌভাগ্য—এতদিন ছিলে কোথায়? ডক্টর মৈত্র সব কথাগুলি একসঙ্গে বলে হাঁপাতে লাগলেন।

"কিন্তু, মৈত্র, তোমার কোন অসুবিধা করছি না তো? এই অসময়ে—"

"অসময়? এর চেয়ে ভাল সময় হতে পারে না। জানো এখন কে এখানে আছেন?'

"না।" ভাস্করের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের একটা ঘর থেকে অনেক লোকের সম্মিলিত হাসির শব্দ ভেসে এল।

'সোমেশ চৌধুরী", বৈজ্ঞানিক মৈত্র সময়োচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললেন।

"সোমেশ চৌধুরী কে?"

"সোমেশ চৌধুরী কে? সোমেশের নাম শোননি? তুমি কি এতদিন চন্দ্রজগতে ছিলে নাকি? সেকস্‌পিয়র কে?"

"সেকস্‌পিয়র কে তা' ঠিক জানিনে, তবে তিনি যে বেকন্ নন এসম্বন্ধে আমার

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু সোমেশ—" ভেতর থেকে আর এক দমকা জোরাল হাসির শব্দে ভাস্করের শেষ কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

"কি আশ্চর্য্য! তুমি সোমেশের নাম শোননি। এরকম রসিক, কথা বলবার এ রকম সরসভঙ্গী প্রায় বিরল। আজকাল সোমেশকে ছাড়া তো কোন ড্রইংরুম, কোন আড্ডা চল্‌তেই পারে না। কোন কথা বললে সোমেশ তার এমন সরস ও জোরাল জবাব দেবে সে তুমি আর কোন উত্তরই খুঁজে পাবে না। সেইটেই হচ্ছে ওর কৃতিত্ব; ও যে কথার উত্তর দেবে তাই শেষ জবাব, কোন রকম পাল্টা জবাব তার আর হতেই পারে না।"

ভেতর থেকে আবার সেই বিরাট হাসির শব্দ শোনা গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট চেহারার স্থূলকায় এক ভদ্রলোক রাগতভাবে বেরিয়ে এসে ডক্টর মৈত্রকে বললেন, "ডক্টর, আমি আপনাকে স্পষ্ট বলছি এরকম হলে এখানে থাকা অসম্ভব। কে-না-কে এক নামহীন গোত্রহীন সোমেশ, সে আমাদের সকলকে যা-তা বলে ঠাট্টা করবে—এ অসহ্য।"

মৈত্র বিড় বিড় করে দু'একবার 'ভারী অন্যায়' বললেন, যদিও তাঁর চেহারা দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল যে স্থূলকায় ভদ্রলোকটির কষ্টে সমবেদনার চেয়ে আমোদই তিনি বেশী অনুভব করছিলেন। তারপর বললেন, "আসুন আপনাদের পরিচয় করিয়েদি! ইনি ভাস্কর মিত্র—ইনি রায়বাহাদুর প্রভঞ্জন ব্যানার্জ্জি! এঁর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?"

"কে না শুনেছে?" বলে ভাস্কর হাত তুলে নমস্কার করল। এমন সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আটাশ কি উনত্রিশ বছরের একটি ছেলে।

"কি খবর মানস?" ডক্টর ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাস্কর তুমি বোধ হয় মানসকে ভুলে যাওনি ও এখন আমার সঙ্গে রিসার্চ্চ করছে।"

"না ভুলে যাইনি," ভাস্কর বললে, "মানস কলেজে আমার ছাত্র ছিল।"

"দেখুন, আপনি এক্ষুণি চলে যাবেন না," মানস রায়বাহাদুরকে বললে। "সোমেশবাবু বললেন, আপনি চলে গেলে তিনি মনে করবেন, তাঁর ওপরে রাগ করেই চলে যাচ্ছেন। তাছাড়া মঞ্জুদেবীও আপনাকে থাকবার জন্য অনুরোধ করেছেন।"

মঞ্জুশ্রী ডক্টর মৈত্রের একমাত্র সন্তান। লোকে সাধারণতঃ মঞ্জু কি মঞ্জুদেবী বলে ডাকত। তার বাবার ড্রইংরুমে যাঁরা আসতেন তাদের সঙ্গে সে অসঙ্কোচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিত।

"আচ্ছা. চলুন তাহলে," "রায়বাহাদুর বললেন, "কিন্তু এ রকম অত্যাচার কার সহ্য হয়?"

আমরা ঘরে ঢুকতেই কিছুক্ষণের জন্য সকলের দৃষ্টি আমাদের উপরে আকৃষ্ট হল। কিন্তু তখনও দুটী লোক সোমেশের দিকে তাকিয়েছিল। একজন মঞ্জুশ্রী ওর দিকে তাকিয়ে

মুচকে হাসছিল। আর একজন আমাদের রায়-বাহাদুর। তাঁর চোখের হিংস্র দৃষ্টি কথার চেয়ে স্পষ্ট করে মনের ভাব প্রকাশ করছিল। সামনের খোলা জানলাটা দিয়ে তিনি ওকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে পারলে হয়ত খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। যে লোকটিকে আমরা বাস্ থেকে নেমে অনুসরণ করেছিলুম, দেখলুম সে-ই বিখ্যাত সোমেশ।

মঞ্জুর গলা শোনা গেল, "আচ্ছা, সোমেশবাবু আপনি যে কি করে গম্ভীরভাবে অত মজার কথা বলেন আমি তো ভেবে পাই নে। ওসব কথা তো আমার মনে হলেই হাসতে হাসতে দম্ আটকে মারা যেতুম।"

"ঠিক বলছেন," রায়-বাহাদুর বললেন, "ভদ্রলোক অনায়াসে এত বাজে বকতে পারেন। গাম্ভীর্য্য রাখা বাস্তবিকই শক্ত।"

"গাম্ভীর্য্য রাখা শক্ত," সোমেশ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, "বেশ তাহলে রাখবেন না। ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসুন।" সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

"দেখুন, আমার বয়সের একটা মর্য্যাদা আছে তা' আপনি ভুলে যাবেন না" রায়-বাহাদুর রাগতভাবে বললেন, "না ভুলে যাব কেন," সোমেশ উত্তর দিল; "আপনার দিকে তাকালেই বোঝা যায় আপনি বুড়ো হয়েছেন।"

"আমি বুড়ো হয়েছি! কখ্খনো না। এখনও অনায়াসে আমি দু' এক মাইল হাঁটতে পারি। এমন কি, রাস্তা দিয়ে আমরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটলে লোকে আমাকে আপনার ছেলে বলে ভুল করবে।"

"আপনি অন্ততঃ ছেলেমানুষের মতই কথা বলছেন।"

আবার হাসির শব্দে ঘর ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হল।

মানসই শুধু হাসিতে যোগদান করে নি। বিরক্তির ভাব গোপন করবার চেষ্টা না করে সে চুপচাপ এক কোণে দাঁড়িয়েছিল।

ভাস্কর তাকে ডেকে বাইরে নিয়ে বলল, "মানস, তোমাকে বাইরে ডেকে আনবার কারণ হচ্ছে, এ সভাতে একমাত্র তোমারই বুদ্ধি আছে, মাথাও ঠিক আছে; বাকি সবাই হয় পাগল, না হয় তো বদলোক। সোমেশ সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

"ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়ত ঠিক হবে না।"

"কেন?"

"কারণ লোকটাকে আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি নে।"

মানস যে কেন ওকে ঘৃণা করে তার কারণ বাহুল্যবোধে ভাস্কর আর জিজ্ঞেস করল না। মঞ্জুর দিকে তাকাবার ধরণ দু'একবার লক্ষ্য করেই আমরা তা বুঝতে পেরেছিলুম।

"লোকটাকে আমি শুধু এক কারণেই ঘৃণা করি না", মানস বললে, "ওর কাছে বাস্তবিক

বয়সের কোন মর্য্যাদা নেই। শুনলেন তো প্রভঞ্জন বাবুকে কি রকম যা-তা সব বললে। বুড়ো রায়-বাহাদুরও রোজ আসেন, সোমেশও রোজ আসে এবং এ খেলাও একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতগুলো সস্তা রসিকতা করে লোকটা নাম কিনেছে। বুড়ো মানুষকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করবার মত মানসিক অবস্থা আমার অন্ততঃ নেই।"

মানসের কথাতে যে ঝাঁঝ ছিল তা' থেকেই বুঝতে পারলুম. ঘা'টা কোথায় লেগেছে। সুতরাং সোমেশ সম্বন্ধে তার মতও আমি চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারলুম না।

হঠাৎ ভাস্কর বলে উঠল, "চল বেরিয়ে যাই। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকাও অসম্ভব।"

"ব্যাপারটা এতই জঘন্য যে ভাবতেও লজ্জা হয়। শোন", "রাস্তায় বেরিয়ে ভাস্কর বললে, "আজ রাত্রে—ডক্টর মৈত্র তাঁর বাড়ীতে আমাদের দুজনকেই নেমন্তন্ন করেছেন। সেখানে আরও অনেকে আসবেন এবং সোমেশ তার বাক্যচ্ছটায় সবাইকে মুগ্ধ করবে। আমরা সেখানে উপস্থিত থাকব না।"

"কেন ?"

"কারণ আমরা নেমন্তন্ন খাবার চেয়ে ঢের বেশী চিত্তাকর্ষক কোন কাজে ব্যস্ত থাকব।"

"কি কাজ ?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

"সম্প্রতি কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকা যতক্ষণ না রায়-বাহাদুর ও সোমেশ বেরিয়ে আস্‌ছে।"

"দু'জন কি এক সঙ্গে বেরুবে ?"

"তা ঠিক বলতে পারি না। রায়-বাহাদুর রাগ করে হয়ত আগে চলে যাবেন; আবার এও হতে পারে যে বেরিয়ে আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গে শেষ রসিকতা করলে ঢের বেশী ভাল শোনাবে মনে করে সোমেশও আগে যেতে পারে। দেখাই যাবে না।"

দরোয়ানটা একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে বাড়ীর সামনে দাঁড় করাল এবং একটু পরেই আমরা অবাক হয়ে দেখলুম, রায়-বাহাদুর ও সোমেশ এক সঙ্গেই ভেতর থেকে বেরুল।

শীতকালের সন্ধ্যা। রায়বাহাদুর বললেন, 'চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।'

দুজনে একই ট্যাক্সিতে উঠল। সৌভাগ্যক্রমে আর একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে আমরাও অনুসরণ করলুম।

মেছোবাজার ও সার্কুলার রোডের মোড়ে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে দু'জনে হাঁটতে সুরু করল। একটু আগের প্রচণ্ড ঝগড়ার পরে এতখানি হৃদ্যতা আমরা আশা করিনি। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমরাও হাঁটতে লাগলুম।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত গিয়ে রায়বাহাদুর ফিরলেন সঙ্গে সঙ্গে ভাস্করও ফিরছে দেখে

আমি বললুম, 'সোমেশ তো কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে চলে গেল। শীগ্‌গির চল না হলে দু'এক মিনিটের মধ্যেই ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

'তা হোক'।

"তা' হলে আর এই শীতের রাত্রে হিমে ভিজে লাভ কি চল বাড়ী ফিরে যাই।"

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ধোঁয়া ও হিম একত্র হয়ে এক অদ্ভুত কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে না যায় ভাল করে নিঃশ্বাস নেওয়া না যায় দশ হাত দূরের জিনিষ দেখা।

'কিন্তু তুমি ভুল করেছ', আমি বললুম, 'যে লোকটিকে আমরা অনুসরণ করছি সে সোমেশ নয়, স্থূলকায় রায়বাহাদুর।'

'তা জানি। শোন, ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্য আমি তোমাকে যা' বলব বিনা দ্বিধায় তাই করবে। প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে কাপড় দিয়ে ওর হাত পা ও মুখ বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেল যাতে নড়তে অথবা চেঁচাতে না পারে।'

রায়-বাহাদুর ইতিমধ্যে মেছোবাজার থেকে ডান হাতে একটা অন্ধকার ও নোংরা গলির মধ্যে ঢুকে সোমেশ যে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল, সেখানে পৌঁছে এক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াল। আমরাও তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়ে তাকে বেঁধে ফেললুম। ভদ্রলোক বয়োবৃদ্ধ ও স্থূলকায় হলেও দেখলুম গায়ে বেশ জোর আছে। তারপর ভদ্রলোককে তুলে নিয়ে গলির ভেতরে একটা বাড়ীর পেছনে রেখে আমরা অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কেনই বা একাজ করলুম আর কার জন্যেই বা অপেক্ষা করছি কিছুই বুঝতে পারলুম না।.

'এই নোংরা গলির মধ্যে অন্ধকারে বসে থাকতে তোমার খুবই অসুবিধে হবে, 'ভাস্কর বললে, 'কিন্তু উপায় নেই একজন লোককে এখানে আসতে বলেছি, তারজন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

'একজন লোককে এখানে আসতে বলেছ?'

'হ্যাঁ, তাকে তুমিও চেন। মানস রঞ্জন তার নাম। তার আসতে অবশ্য ঘণ্টা তিনেক দেরি হতে পারে। মৈত্রের বাড়ীর খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আসবে।'

অন্ধকারে ও শীতে বসে থেকে সেদিন আর আমার মনে সন্দেহ রইল না যে ভাস্কর পাগল। বরাবরই জানতুম ওর মস্তিষ্কের অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক নয়। আজ রাত্রের ঘটনা তা—ই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়ে গেল।

ঘণ্টা চারেক বসে থাক্‌বার পরে মানস রঞ্জনের দেখা পাওয়া গেল। ভাস্করকে দেখেই সে উত্তেজিত ভাবে বললে, অদ্ভুত আশ্চর্য্য! আপনি যা বলেছিলেন তা' একেবারে ঠিক। পুরো দু'ঘণ্টার ওপরে সোমেশ আমাদের নেমন্তন্ন সভায় উপস্থিত ছিল, অথচ একটা রসিকতা করল না,

তার মুখ থেকে একটা কথা বেরুল না। তার রসাল কথাবার্ত্তা শোনবার জন্য আজ বিশেষ করে সবাইকে আসতে বলা হয়েছিল; আর সে-ই গেল একেবারে বোবা বনে। ডক্টর, মৈত্রের লজ্জায় মাথা হেঁট: অনেকেই তাঁকে পাগল বলে গেলেন। আপনি আগে থেকে কি করে জানলেন যে ঠিক এই হবে। এর মানে কি?"

"মানে বিশেষ কিছু নয়," ভাস্কর বললে; "মানেটি এখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে।"

অন্ধকারে এতক্ষণ মানস রায়বাহাদুরকে দেখ্‌তে পায়নি। তাকে দেখে সে স্বভাবতঃই চমকে উঠ্‌ল।

"একি?"

ভাস্কর কোন জবাব না দিয়ে রায়-বাহাদুরের বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরো কাগজ টেনে বার করে মানসকে পড়তে দিল। কাগজটাতে কতগুলি প্রশ্ন ও তার উত্তর লেখাছিল। পড়তে পড়তে মানসের ভ্রূকুঞ্চিত হল; নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে ধরাশায়ী রায়-রাহাদুরের দিকে তাকিয়ে রইল। কাগজের এক অংশ মারামারিতে ছিঁড়ে গিয়েছিল। যে—অংশটা ছিল তা-ই এখানে উদ্ধৃত করছি।

প্র বলবে—গাম্ভীর্য্য রাখা·········শক্ত।

সো বলবে—ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসুন।

প্র বলবে—বয়সের মর্য্যাদা············।

সো বলবে—তাকালেই·········বুড়ো হয়েছেন।

প্র বলবে—পাশাপাশি হাঁটলে ছেলে বলে ভুল করবে।

সো বলবে—ছেলেমানুষের মতই কথা বলছেন।

"এসব কি? এর মানে কি?" কাগজের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানস জিজ্ঞেস করল।

"এসব কি?" ভাস্কর বললে, তার কথার সঙ্গে অনেকখানি গর্ব্বমেশানো ছিল, "এ একটা নতুন ধরণের ব্যবসা। যে কোন ব্যবসার মত এও—একটা স্বাধীন ব্যবসা, যদিও এর গোড়াতে আছে খানিকটা দুর্নীতি।"

"কিন্তু এই ভদ্রলোক এ লোকটা———"

"হ্যাঁ, এলোকটিই—এই চমৎকার ব্যবসার সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমাদের হয়ত ধারণা ছিল এলোকটি অত্যন্ত নির্ব্বোধ ও ভয়ানক রকমের বড়লোক। আসলেও আমাদের কারুর চেয়ে কম চালাক নয় এবং আমাদের মতই গরীব। একে দেখতে এত স্থূলকায় হলেও মোটেই তা নয়—সমস্তই ষ্টাফিং। বয়সও বেশী নয়, পাউডার মাখালেই চুল সাদা হয়। লোকটা

ওস্তাদ সুইণ্ডলার, কিন্তু ওর ঠকানোর মধ্যেও যে নতুনত্ব ও বিশেষত্ব আছে তা' তোমরা জান। মনে কর পার্টিতে অথবা কোন ড্রইংরুমে তুমি নাম চিনতে চাও। এই ভদ্রলোককে কয়েকটা মোটা ফি দিলে, উনি যেমন করে হোক সেখানে আলাপ জমিয়ে বোকার মত নানারকম কথা বলবে, আর খুব রসালো উত্তর দিয়ে তুমি অনায়াসে একে ঘায়েল করে খ্যাতি লাভ করবে। অবশ্য কথাবার্ত্তা কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে হবে তা' আগেই ঠিক করা থাকে। যেমন এই কাগজের টুকরোটাতে দেখলে এ ভদ্রলোক্ বোকার মত কথাগুলো বলবে এবং এর মক্কেল বাছাই করা উত্তরগুলি দেবে, এই হল বন্দোবস্ত। প্রভঞ্জন ব্যানার্জ্জি এর ছদ্মনাম এবং রায়বাহাদুর উপাধিটাও ভূয়ো।

"ভবিষ্যতে সোমেশ আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবে না; কেন না তার সমস্ত খ্যাতি আমাদের এই বন্ধুবরের সঙ্গেই ধরাশায়ী হয়েছে।"

গান

শ্রীমমতা মিত্র

পরশনে কার কোমল কমল সম
মেলিয়াছে দল সকল হৃদয় মম।
এ কি সুধা ঝরে
মোর প্রাণ 'পরে।
নিখিল ধরণী লাগে চোখে অনুপম।

রহি রহি আজি আমার পরাণ মাঝে
পুলক-মধুর আগমনী কার বাজে।
যে ফিরেছে খুঁজি
সেই আসে বুঝি
জীবন-মাঝারে জীবনের শ্রেয়তম।

যুক্ত-রাজ্যে শিশু-শ্রমিক

শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়

"বলে, মা গো এ কেমন ধারা ?
এত বাঁশি, এত হাসি রাশি
এত তোর রতন ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন।"

যুক্তরাজ্যের শিশু শ্রমিকদের বা অবয়ঃপ্রাপ্ত শ্রমিকদের (child labourers) দুর্দ্দশা দেখ্‌লে, এই কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে করিয়ে দেয়। আমরা বিদেশীরা, আমেরিকার বড় বড় অট্টালিকা, মহা বদান্যতা ও আশ্চর্য্য কার্য্য-ক্ষমতার কথা প'ড়ে ও দেখে অনেক সময় বিস্মিত ও মুগ্ধ হযে যাই; ভাবি এরা মানুষ না দেবতা? কিন্তু লক্ষ কাঁচের জানালাযুক্ত বিরাট বাড়ীগুলির জানালার ভিতর দিয়ে উঁকিমেরে দেখ্‌লে মনে হবে ঐ উদারতা ও বদান্যতার ভিতরে রয়েছে এক ভীষণ পাশবিক অত্যাচার, অকথ্য দারিদ্র্যতা ও অমানুষিক নৃশংসতা, যা আমাদের চোখে সহজে পড়েনা। মাঝে মাঝে কেবল নির্ভীক সংবাদগুলি দ্বারাই এর আভাস পাওয়া সম্ভব। আমেরিকার দৃশ্যপটে শিশু-শ্রমিকদের করুণ দৃশ্য, আব যাই হোক, আদৌ সুখের নয়; বরং বহু জায়গায় অতিশয় হৃদয় বিদারক! এদেশের অনেক জায়গায় শিশু-শ্রমিকেরা প্রায় হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই কল, কারখানাতে ও খনিতে কৃতদাসের মত কাজে লেগে যায়। এরা গোটা কয়েক-পয়সা উপার্জ্জন করবার জন্য যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ও অনেক সময় প্রাণ পর্য্যন্ত হারায়, সে দৃশ্যাবলী দেখে চোখে জল না প'ড়ে, চোখ জ্বালাই করে বেশী!

স্বার্থান্বেষী কোটিপতি ব্যবসায়ীদের বাসনার শেষ নাই; যত পায়, আরও তত চায়, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য না করে এমন কোন কাজ নাই। আমেরিকায় সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর থেকে শিশু-শ্রম "রিফর্ম্‌" নিয়া লড়াই চলে আস্‌ছে; বহুবার এ আইনটী পাশ করার বিশেষ চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু এ যাবৎ তা কার্য্যতঃ সম্ভব হয়ে উঠে নাই। সম্প্রতি নিউইয়র্ক ষ্টেট্‌ "লেজিস্‌লেচারে" (Lagislature) শিশু-শ্রম (Child Labour Amendment) নিয়া লড়াই হয়ে গেল। এই আইনে শিশুদের কাজে যোগ দেওয়ার বয়স নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা হচ্ছে। (এই লেখার সময়ে আমাদের আশা হচ্ছে হয়তো সফলতা ও লাভ করবে।) অনেকে এর সফলতাটাকে একটা মস্ত "রিফর্মের" কাজ মনে করে ইতিমধ্যেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ছেন।

কিন্তু "রিফরম্" খানিকটা হলেও বর্ত্তমান আইনে আমেরিকার শিশুশ্রম সমস্যা ও তাদের দুর্দ্দশা একেবারে ঘুচে যাবে না। শিশু-শ্রমিক অপেক্ষাকৃত অনেক সস্তা, কাজেই, ধূর্ত্ত কারখানার মালিকেরা শিশুদের প্রাণান্ত ক'রে ও যথাসাধ্য লাভ করতে দ্বিধা বোধ করে না। তাই আমেরিকার সুদীর্ঘ বেকার সমস্যার দিনে এই শিশু শ্রমিকের সংখ্যা না ক'মে দিন দিন কেবল বেড়েই চলেছে। বেকার অবস্থায় পরিণতবয়স্ক লোকেরা অভাবের তীব্র তাড়নায় যখন আমেরিকার "bread line" এ দারুণ শীতেও দাঁড়িয়ে থাকে, অথবা "রিলিফ এঞ্জোল" তে অন্নবস্ত্রের জন্য নাম মাত্র সাহায্যের ভিক্ষায় অপদস্থ, অসম্মানিত হ'য়ে অনাহারে বা স্বল্পাহারে চোখের জলে দিন কাটায় তখনও এই ক্ষুদ্র শিশু শ্রমিক গুলির সামান্য পয়সায় "চাকুরী" পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীরা দুর্দ্দিনের দোহাই দিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় সস্তা শিশু শ্রমিকগুলি ভাড়া ক'রে বেশ দু'পয়সা উপায় করে নিয়েছে। কাজেই পরিণতবয়স্ক লোকের বহু জায়গাতেই কাজ পাওয়া সম্ভব হয়নি।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১৯৩৩ সালের জুন মাসে এক হুকুম জারি করেন, যে, কোনও কলকারখানাতে ষোলবছরের নীচে কোন ছেলেমেয়েকে চাকুরী দেওয়া হবে না এবং নির্দ্দিষ্ট বেতনের কমে কোন লোক ভাড়া করা যাবে না। ইহার পরে আরো কড়াকড়ি নিয়ম করার অনেক চেস্টা হয়েছে, য'াতে সস্তায় শিশু-শ্রমিক কাজ না পেয়ে তার বাপ মা' বা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকে উপযুক্ত মাইনেতে কাজ পেতে পারে। সাধারণ নিয়মে, কোন ছেলে মেয়ে আঠার বছরের কমে কোন মিলে বা খনিতে কাজ করতে পারবে না। তবে ষোল বৎসর পূর্ণ বয়সের ছেলে মেয়েরা সাধারণ কাজ করলে আইনে তা বাধা পড়্বে না।

এই "কোড্" (Code) বা সর্ত্ত ঠিক হওয়ার পর প্রায় ১০০,০০০ শিশু-শ্রমিক নানা কলকারখানা মিল ও নানা ব্যবসায় হ'তে চাকুরী ছাড়্তে বাধ্য হয় এবং তাদের জায়গায় বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের চাকুরীর সুবিধা হয়। আমেরিকার সমাজ এই সামাজিক রিফ্রমের জন্য খুব জোরে করতালি দিয়ে মনে করলেন, এই আইন করে এখন প্রতিগৃহে পূর্ণবয়স্ক লোকদের জীবিকা উপার্জ্জনের একটা পথ করে দেওয়া গেল ; অন্ততঃ একটা মস্ত বড় সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তা সত্য নয়। অনেকটা "আকাশ কুসুম।" আমেরিকার শ্রমিকের সংখ্যা কল, কারখানার চাইতে বাইরে কৃষিক্ষেত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ; এবং এই আইনটী কল কারখানার জন্যই, কৃষিক্ষেত্রে কাজের জন্য হয় নাই। কাজেই সমস্যাটী গুরুতর এবং সহজে মিটবারও কোন লক্ষণ অন্ততঃ অচিরে দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ যতদিন না আইনটীকে বাড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রের উপরও প্রয়োগ করা যায়।

১৯৩০ শালের আদম সুমারীতে দেখা যায় যে দশ হ'তে আঠার বৎসরের মধ্যে ২০,০০,০০০ (২০ লক্ষ) অবয়ঃপ্রাপ্ত "শিশু" শ্রমিক নানা কৃষিকার্য্যে ও ব্যবসায়ে

নিযুক্ত ছিল। এই কুড়ি লক্ষের মধ্যে সাত লক্ষ ছেলে মেয়েই ষোল বছরের নীচে। এই সাত লক্ষের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশুই কৃষিকার্য্যে, এবং অতি অল্প সংখ্যকই কারখানার কাজে নিযুক্ত। এছাড়া অনেক শিশু শ্রমিকেরা যোগ্যতা হিসাবে জুতা পালিশ, জুতার ফিতা বিক্রী, সংবাদ পত্র বিক্রী ক'রে দু'পয়সা উপার্জ্জনে নিযুক্ত ছিল। অভাবের তীব্র তাড়নায় প্রায় ৪০,০০০ হাজার ছোট মেয়ে স্কুলের পর খেলা ফেলে চাক্‌রাণী, রাঁধুনী, ধোপানী বা গৃহকর্ম্মের কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। পেটে খিদের আগুণ জ্বলে উঠ্‌লে মানুষ না করতে পারে এমন কাজ নাই। এদেশের আইনে বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ হলেও, আবার এই দিকেই যে মেয়েরা "সহজ" অর্থের জন্য ছোটে, দারিদ্র্যতাই অনেকটা তার কারণ মনে করতে হবে। ক্ষুধাই এর প্রধান কারণ। সে সদা ব্যস্ত। তার না আছে রবিবার, না আছে পূজাপার্ব্বণ, না আছে বড় দিনের ছুটী।

যুক্ত রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, অর্থাৎ অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক্ মহাসাগর হ'তে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত, কৃষি কার্য্যে অবয়ঃপ্রাপ্ত শ্রমিকদের যে বেদনাপূর্ণ করুণ নাটক অভিনয় দেখা যায়, তা যেন স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। গায়ে গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখ্‌তে হয় যে, একি সত্যি, দুঃস্বপ্ন নয়ত! বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী আমেরিকাতে ঘটা করে নানা প্রতিষ্ঠান হ'চ্ছে ও সমাজের কল্যাণে বহু লোকে অজস্র টাকা দান করছে, অথচ আমেরিকার গরীব ও শিশু শ্রমিকদের অবস্থা ও দুর্দ্দশা অন্য কোন দেশের তুলনায়, আর যাই হোক ভাল নয়।

যুক্ত রাজ্যের শিশু শ্রমিকরা গরমের দিন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলো ও তামাকের চাষে, তরকারীর বাগানে, শাল্‌গম্ ও 'বিট্' তরকারীর মাঠে, পেয়াজের মাঠে, আলুর মাঠে ও বহুবিধ বেরীর বাগানে কাজের সন্ধানে ছোটে। স্কুল বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব নাবালক শ্রমিকেরা খেলার ঘরে বা খেলার মাঠে না ছুটে, ছোটে কৃষির মাঠে, কৃষি কাজের সন্ধানে। স্কুল বন্ধ হওয়ার পর এ জাতের এই ক্ষুদ্র শিশু শ্রমিকদের উপর সকল ব্যয়সায়ীদের দৃষ্টি পড়ে। গরীব বাপ মায়ের অভাব মোচনের জন্য এই সামান্য চাকুরীতে সূর্য্যোদয় হ'তে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনি খেটে দরিদ্র সংসারের অভাব যৎকিঞ্চিৎ মোচন করে। আবার অনেক স্থলে দেখা যায় আমেরিকার শিশু শ্রমিকেরা তাদের বাপ মায়ের কেনা জমিতে বা ধার করা জমিতে অনেক সময় শ্রমিকের কাজ করে। এটাকে কতকটা স্বাভাবিক রীতি বলা যেতে পারে, কেননা প্রকৃত পক্ষে এটী তাদের নিজেদের কাজ কিন্তু ওরা যে অবয়ঃপ্রাপ্ত সে কথা ভুললে চলবে না। আদি কাল হ'তে মানুষ যখনই যে দেশে লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে জমি চষ্‌তে নেমেছে তখনই সে তার সন্তান সন্ততি গণকে বংশানুক্রমে এই চাষ আবাদের কাজেই জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেছে। তফাৎ এই যে আমেরিকার ধনী কৃষকেরা শ্রমিক ভাড়া করে নিজের শ্রম লাঘব করে, আর গরীব কৃষকরা শ্রমিক ভাড়া না করতে পেরে নিজেদের ও শিশুদের এই কৃষিকার্য্যে প্রাণপাত করে।

প্রকৃতি বড় কঠিনহৃদয়া শিক্ষয়িত্রী। রোদ, বায়ু ও বৃষ্টির সাহায্যে এবং প্রবল শীত, বরফ ও বন্যার বিরুদ্ধে আমরা মাটি থেকে সুন্দর শস্য, ফল, মূল, ও অন্যান্য জিনিষ পাই। ভাল ফসল পেতে হ'লে তাকে সময়মত স্বাভাবিক নিয়মে লালন পালন করা চাই। মানুষের গড়া আইন কানুনে তার জীবন চলেনা। তার উৎপন্নতার সময় অল্প। বাঁধা সময়ের মধ্যে তার জীবনের ইতিহাস শেষ করতেই হবে। নতুবা গ্রীষ্মের ফসল শীতের বরফে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ মানুষ যদি ভাবে সে রোদ বৃষ্টি গায়ে না লাগিয়ে তার ইচ্ছা মত, যখন খুসী তখন সে ফসলের কাজ করবে, তাহ'লে হবে না। তাই এ কাজের গুরুত্ব এবং অনেক সময় অতিরিক্ত খাঁটুনিতে অনেক গরীব কৃষকদের ও তাদের পরিবারের সকলের মুখে কষ্টের স্পষ্ট রেখা টেনে দেয়!

শোচনীয় দুর্দ্দশার ছবি সব চাইতে বেশী দেখতে পাওয়া যায় যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণে তুলো ও তামাকের মাঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলির বিষাদপূর্ণ চেহারা এখানে যেমন দেখতে পাওয়া যায় এমন বোধহয় আর কোথাও নয়। এখানে চাষীরা কেউ নিজেদের জমিতে, কেউবা অপর কারো জমি ভাড়া নিয়ে শস্য ভাগাভাগি করে নিজেদের অভাব ও অর্থসমস্যা দূর করবার চেষ্টা করে। তাদের একমাত্র সম্বল নিজেদের ও সন্তানদের বাহুবল। তামাকের মাঠে তামাকের কচি পাতা তুলবার সময় হ'লেই এমন কি ছোট ছোট ৫।৬ বৎসর বয়সের ক্ষুদ্র শিশুগুলিকেও দশ বার ঘণ্টা এই তামাক পাতা তুলবার কাজে নিযুক্ত করা হয়। তামাকের মাঠে এই ক্ষুদ্র সন্তানগুলি হাঁটুগড়া দিয়ে গাছের নীচু পাতাগুলি দু'হাতে সমানে ছিঁড়তে থাকে। তাদের এ কাজে বিরাম, বিশ্রাম নাই, তাহলে পয়সা কম পাবে। তুলোর মাঠেও সেই একই দৃশ্য। ক্ষুদ্র শিশুগুলি কাঁধে ব্যাগ্ ঝুলিয়ে সারাদিন তুলোর হাল্কা বল কুড়িয়েই বেড়াচ্ছে—এদের কাজ আরম্ভ হয় ভোর না হতেই আর শেষ হয় যখন আঁধার হয়ে আসে। এই তুলো কত দেশ বিদেশে রপ্তানী হবে, কত ধনী ব্যবসায়ী লক্ষপতি, কোটিপতি হয়ে বস্‌বে, আর এই শিশুগুলি? হয়তো সারা বছরের প'রবার মত, ভাল দূরে থাক অতি সাধারণ কাপড়ও সহজে জুট্‌বেনা। এই সব শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ঘুর্‌লে অনেকে অনেক সময় শুনতে পায়, "আমি একটু বড় হ'লেই মিলেতে কাজ করব। সেখানে মাত্র আট ঘণ্টার বেশী খাঁটতে হবেনা, তা'হলে আমি একটু খেলতে পারব!" হায়, তরুণ প্রাণের নৈরাশ্যপূর্ণ কথা!

আজকাল অনেক চাষ আবাদের কাজ মানুষের পরিবর্ত্তে কল বা মেশিনের দ্বারা কতকটা সম্ভব হ'লে ও বিজ্ঞান এখনো মেসিনকে চোখ ও হাত দিতে পারে নাই। যাদ্বারা বিনাক্লেশে, আগাছা তোলা, পেঁয়াজ তোলা, বেরী তোলা, বা পোকা বাছার কাজ চল্‌তে পারে। কাজেই অগত্যা ঐ সবকাজের জন্য মানুষের দরকার। ধূর্ত্তব্যবসায়ীরা বেশী পয়সা দিয়ে পরিণতবয়স্ক লোক ভাড়া না করে এই সস্তা অবয়ঃপ্রাপ্ত শ্রমিকদের এই কাজে লাগায়, ফলে, বয়ঃপ্রাপ্তরা, সস্তা শিশু শ্রমিকদের সঙ্গে না পেরে উঠে বেকার ব'সে আছে।

সমস্ত যুক্তরাজ্যে শিক্ষা আইনতঃ বাধ্যতামূলক হলেও, বহু ষ্টেটে নানারূপ বিদ্‌ঘুটে আইন ও বিভিন্ন স্থানীয় ব্যবস্থা আছে। তাই অনেক সময় শিশু শ্রমিকদের আইনতঃ কাজ বন্ধ কর্‌বার বিশেষ সুবিধা নাই। অনেক ব্যবসায়ী চাষীরা বলে, যে তারা স্কুল থেকে ছেলে মেয়েদের এনে কাজে লাগায় না। ছেলেরা সাধারণতঃ গ্রীষ্মের ছুটীর সময় নিজেরা এসে কাজে লাগে। কতকগুলি ষ্টেটে মার্চ্চমাসে বীজ বপনের সময় হ'লে স্কুলের ছুটী দেয় এবং পাকা শস্য তুল্‌বার জন্য নভেম্বরে আবার ডাক পড়ে। কাজেই দেখা যায় অনেক দরিদ্র কৃষক মার্চ্চ মাস থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত মাঠের কাজের জন্য ছেলেদের স্কুল ছাড়িয়ে ক্রমাগত বাসস্থান বদল করে। তা'হলেই আইনের হাত থেকে রক্ষা পায়। ইহারা অধিকাংশই বিদেশী, পোলিশ্‌ বা ইটালিয়ান্‌ এরা কোনও এক ষ্টেটে বাসিন্দা হয়ে বাস না করাতে এদের সব সময় দৃষ্টিতে রাখাও নিতান্ত মুস্কিল। তাই এদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার অনেক বাধা পড়ে।

ব্যবসায়ী কৃষীরা (industrialized farms) অনেক সময় শিশু-শ্রমিকদের আলাদা ভাড়া না করে বাপমায়ের সঙ্গে একসঙ্গে চুক্তি করে নেয়। এই শ্রমিকেরা বিভিন্ন স্থানে বীজ রোপন ও ফসল উৎপাটনের কাজে নিজেদের মোটরে বা ট্রাকে ক'রে কৃষিস্থানে উপস্থিত হয়। বসন্তের উন্মুক্ত হাওয়াতে সৌন্দর্য্যেপূর্ণ সবুজ শস্যে ভরা মাঠের কথা ভাব্‌লে "রোমান্টিক" হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এসব চাষীদের দুর্দ্দশা দেখ্‌লে সে ভাব আর থাকেনা। অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায় ইহাদের বাসস্থান অতিশয় জীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর জায়গায়, অনেক জায়গাতে বাড়ী ঘর মানে, জীর্ণ কুঁড়ে ঘর, গোশালা, বা অশ্বশালা। অনেকের আবার তাঁবু খাটিয়েই বাড়ী ঘর। অনেক চাষী পরিবার নিজেদের মোটরে বা ট্রাকেই ঘুমাবার ব্যবস্থা ক'রে পয়সা ও হাঙ্গামা বাঁচায়। অবশ্য এ ছাড়া অনেক বড় ফার্ম্‌ও আছে, যেখানে গরীব শ্রমিকদের থাক্‌বার সুব্যবস্থা আছে এবং আনন্দপূর্ণ ছবি ও যথেস্ট দেখা যায় তবে এগুলির কথা স্বতন্ত্র। গরীব চাষী শ্রমিকদের বাসস্থান বলে কোন একটা চিন্তা আসেনা। ঘুমাবার একটা স্থান হ'লেই যথেষ্ট। সারাদিন মাঠে বীজ বুনে ফসল সংগ্রহ করেই এদের দিন কাটে। এদের প্রতিদিনের কাজ আরম্ভ হয় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে, বাইরে একটী উনুনে প্রাতঃ ভোজনে রান্না করে ও খেয়ে, আর শেষ হয় ঘোর সন্ধ্যায় মাঠের এক প্রান্তে রাত্রের ভোজন শেষ করে যখন ক্লান্ত দেহে ঘুমাবার জন্য ফিরে আসে। এই কাজে শিশু শ্রমিকদের ও তাদের বাপ মায়ের মতই সমানে খাটতে হয়। খেলার কোনও অবকাশ নাই। অনেক সময় দেখা যায় মোটরের আলোর সাহায্যে অনেক রাতে ও শিশু শ্রমিকরা "বিট্‌" তরকারীর মাঠে কাজে নিযুক্ত আছে। প্রকৃতি সকলের জন্যই অজস্র সম্পদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী, লোভী ব্যবসায়ীদের জন্য মানুষকে অতি সাধারণ অন্নবস্ত্রের জন্যও কত না দুঃখ, কষ্ট সহ্য করতে হয়।

দাসত্বের চরম হ'ল, যেখানে শিশুদের দৈনিক ভাড়া করে নেওয়া হয়। ১৯৩০ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় যে ৬৭, ১৫৩ জন ছেলে মেয়েকে (ইহাদের বয়স ১০ থেকে ১৫ বৎসরের মধ্যে) শ্রমিক হিসাবে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ইহারা অধিকাংশই সহরবাসী। নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট টাউনের ও গ্রামের কৃষিকাজের জন্য ইহাদের ভাড়া নেওয়া হয়। এই সব শিশু শ্রমিকদের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান বা "বাজার" আছে, যেখানে ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীরা বা তার দলের লোকেরা বাছাই করা শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের দরদস্তুর করে নেয়। কোন কোন স্থানে ইহাদের জন্য মাঠেই শোবার ব্যবস্থা আছে, আবার কোথাও ব্যবসায়ীরা ট্রাকে প্রতিদিন ভোরে টাউন ও গ্রাম থেকে ছেলে নিয়ে আসে ও সন্ধ্যায় ফেরত দেয়।

কৃষিকার্য্যে শ্রমিক শিশুদের এযাবত কোন প্রকার "protection" ই ছিলনা। বর্ত্তমানে এই নূতন ব্যবস্থাতে এই গ্রীষ্মে ১৪ বৎসরের নীচে কোন বালক বালিকা "বীট" তরকারীর মাঠে কাজ করতে পারবে না। সেক্রেটারী ওয়ালেস (Secretary Wallace) "বিট্" তরকারী উৎপন্নকারীদের সঙ্গে (Agricultural Adjustment Act) এ ব্যবস্থা করায় চৌদ্দ হাজার শিশু শ্রমিক একাজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে চৌদ্দ হাজার পরিণত বয়স্ক লোকের কাজের পথ পরিষ্কার করে দেবে।

সুদীর্ঘ কাল বেকার অবস্থার দরুণ ১০ হতে ১৬ বৎসরের বহু মেয়ে স্কুলের পড়া ছেড়ে বা অবহেলা করে, দাসী, চাকরাণীর কাজে আছে। ইহাদের কাজের কোনও নির্দ্দিট সময় নাই, খাওয়াটা দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই হয়ে যায়, এবং শোবার ব্যবস্থা রান্না ঘরের বা ঐ রকম কোন জায়গায় হয়ে থাকে। এই ক্লাশের চাকরাণী যদি মাসে দশ ডলার উপায় করে ত যথেষ্ট উপায় হ'ল মনে করে।

নিউইয়র্কের মত ঐশ্বর্য্যশালী সহরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলে মেয়েদের স্কুলের পর নানারকম ব্যবসা ও জুয়া খেল্‌তে সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অভাবের তাড়নায় এই সব দরিদ্র সন্তান স্কুলের পড়া ছেড়ে অনেক রাত কাগজ, চকলেট ইত্যাদি বিক্রীর জন্য রাস্তায় হেঁকে বেড়ায়।

দু'চোখ দিয়ে ভাল করে দেখ্‌লে মনে হবে ঐশ্বর্য্যশালী যুক্তরাজ্যের এই সব গরীব শিশুদের জীবন সুখের ত নয়ই, বরং বড়কঠোর ও অনেকখানি বিষাদপূর্ণ। অগাধ দুঃখ ও অসীম দৈন্যতা এই সমৃদ্ধশালী আমেরিকাতেও বিরাট আকারে বিদ্যমান। প্রকৃতির অসীম কৃপায় এদের কিছুরই অভাব নাই। সবই অপরির্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, তবু লোকে অভাবে হাহাকার করছে। একদল রক্তশোষা গরীবের রক্ত চুষেই সন্তুষ্ট, আর গরীব কেবল কপালে করাঘাত করেই বলে, "হায় আমার অদৃষ্ট!"

বীর বাঙালী

ধানবাদ অঞ্চলে বাগদীঘি কয়লার খনিতে বিস্ফোরণের ফলে ষোলজন শ্রমিক হত এবং তেইশজন আহত হইয়াছে। খনির মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ব্যাপার কি জানিবার জন্য খনির সহকারী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় অপর একজনের সহিত ভূগর্ভে অবতরণ করেন। উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। এই মৃত্যুর সংবাদ দুঃখের সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিপদের সম্মুখে আপনার অসামান্য সাহসের পরিচয় দিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি যখন খনির গর্ভে নামিয়াছিলেন তখন জানিতেন—জীবিত অবস্থায় উপরে ফিরিবার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। কিন্তু মৃত্যু অনেকটা নিশ্চিত জানিয়াও কর্ত্তব্যপথ হইতে তিনি বিচলিত হইলেন না। খনির অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার জন্য তিনি মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিলেন। একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়—বাঙ্গালী বড় ভীরু। এ অপবাদ যে কত মিথ্যা—শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনদানের আদর্শই তাহার প্রমাণ। এই বীরত্বকে নমস্কার করি। বীর বলিতে আমরা এতদিন মনে মনে আলেকজাণ্ডার আর নেপোলিয়নের কথাই ভাবিয়াছি। কারণ ঐতিহাসিকেরা জোর গলায় তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদেরই চারিপাশে বর্ত্তমানের এই তরঙ্গ চূড়ায় আমরা এমন সব মানুষের সাক্ষাৎ কি পাই না, যাহারা রণক্ষেত্রে মানুষ মারিবার কাজে দক্ষ না হইলেও মানুষের বিপদের দিনে অনায়াসে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া মরণের মুখে ঝাঁপ দিতে কুণ্ঠিত হন না? ইতিহাস ইহাদিগকে উপেক্ষা করে বলিয়া আমরাও কি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিব?

দেশ

'ফ্রী প্রেস জার্ন্যালের' অবস্থা

বোম্বাইয়ের "ফ্রী প্রেস জার্ন্যাল" বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পূর্ব্বে কোয়েটা সম্বন্ধে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করায় সরকার উহার বিশ হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়া লয় ও উহার স্থলে আরো বিশ হাজার টাকা জামানত তলব করে। ঐ টাকা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে জমা দিতে না পারায় এই দৈনিক পত্রখানি বন্ধ হইয়া গেল। "ফ্রী প্রেস জার্ন্যালের" যে পরিমাণ জামানত সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, ভারতে বোধ হয় আর কোন একটি কাগজের তত টাকা বাজেয়াপ্ত হয় নাই। এত টাকা দিয়াও যে কাগজ এত দিন বাঁচিয়াছিল তাহা এখন বন্ধ হওয়ায় সকলেরই দুঃখিত হইবার কথা। সাংবাদিক হিসাবে এজন্য আমাদের দুঃখ করিবার কারণ আরো বেশি। যাঁহারা এত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ঐ পত্র পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহস ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

নব্য বাংলা

মেডিক্যাল ছাত্রী

এবারে আই-এস সি পরীক্ষায় ১৯টী মহিলা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ৭টী মহিলা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই ৭টীর মধ্যে ৫টী বাঙ্গালী হিন্দু মহিলা। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা আর একটী বাঙ্গালী হিন্দু মহিলাও মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন-কমিটি তাঁহার দরখাস্ত দ্বিতীয় বিভাগ বলিয়া অগ্রাহ্য করায় তিনি বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট বিশেষ অনুমতির প্রার্থনা করিয়া আবেদন পাঠাইয়াছেন। মধুসূদন গুপ্ত যখন মেডিকেল কলেজে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন, তখন তাঁহার সম্মানার্থ কেল্লা হইতে তোপ দাগা হইয়াছিল। আজকাল মেডিক্যাল লাইনে যাইবার জন্য মহিলাদের যে এই আগ্রহ, তাহা কি কম প্রশংসনীয় ?

বেকার-সমস্যা সমাধানে সরকার

বাঙ্গলা সরকারের শিল্প-বিভাগ, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বেকার সমস্যা-সমাধান কল্পে, হাতে কলমে জুতা তৈরী শিক্ষা দিবার জন্য নূতন একদল ছাত্র ভর্ত্তি করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা, ১১০নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডস্থিত, ক্যালক্যাটা টেকনিক্যাল স্কুল গৃহে উহার ক্লাস খোলা হইবে। শিক্ষা সমাপনান্তে যে সব বেকার ভদ্র যুবক জুতা তৈয়ারী ব্যবসা অবলম্বন করিতে আগ্রহান্বিত ঐসব যুবকের জন্যই ঐ ক্লাস খোলা হইবে। একমাত্র বাঙ্গালার অধিবাসিবৃন্দই ঐ ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে পারিবে।

শিলংয়ে নারীদের কলেজ

শিলংয়ে লেডী কিন নারী কলেজ নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী কলেজ খোলা হইয়াছে। কলেজ ও ছাত্রী নিবাসের জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের নিকট কেণ্টনমেণ্ট এলাকাস্থিত একটী ক্ষুদ্র পাহাড় চাহিয়াছেন।

অল্পদিন পূর্ব্বে খৃষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে শিলংয়ে সেণ্ট এণ্টনি কলেজ ও সেণ্ট এডমণ্ডস কলেজ নামক আরও দুইটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

রুশিয়ায় শিক্ষা বিস্তার

সোভিয়েট সরকার কি ভাবে রাষ্ট্র হইতে অশিক্ষা বিদুরিত করিয়াছেন তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯১৭ সালে রুশিয়ায় শতকরা প্রায় ৭০ জন অশিক্ষিত ছিল আজ সেই স্থানে প্রায় সকলেই অল্পাধিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। রুশ বিপ্লবের পূর্ব্বে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী ছিল না, ১৯৩৩ সালে উহার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৯০ লক্ষ। ১৯১৫ সালে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ। ১৯৩৩ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় আড়াই কোটী হইয়াছে। ১৯২৯ সালে সমগ্র রুশিয়ায় বৈজ্ঞানিক যেখানে ছিল মাত্র ৪৩১টী সেই স্থলে তিন বৎসরের বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২ শত।

১৯১৩ সালে সমগ্র গ্রন্থের মোট মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ১১ কোটী ৩৪ লক্ষ। ১৯৩৩ অব্দে গ্রন্থ সংখ্যা হয় ৪৯ হাজার ৯৯০ খানি এবং তাহাদের মুদ্রণ সংখ্যা হয় ৫১ কোটী ৮ লক্ষ ১৯ হাজার।

১৯১৩ সালে রুষিয়ায় মোট ৮৫৯ খানি সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ ২৯ হাজার মাত্র। সেই স্থলে ২০ বৎসর পরে পত্রিকা সংখ্যা হয় ৬ হাজার ৮৭৪ খানি এবং ইহাদের প্রচার সংখ্যা ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ।

গত ১৬ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের ১৬ কোটী নরনারীর মধ্যে যে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনিয়াছে উপরের তালিকা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

স্ত্রী-শিক্ষায় বোম্বাই

বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রী শিক্ষার কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইকেছে, তাহা নিম্নলিখিত পাঁচ বৎসরের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। এই তালিকায় প্রথমে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল রকম পরীক্ষার ফল প্রদত্ত হইল:—

খ্রীষ্টাব্দ	প্রবেশিকা	
১৯৩০	২০৭	৫৮৭
১৯৩১	৪৮৬	৮৯৬
১৯৩২	৩৯৬	৯৩৩
১৯৩৩	৪৮৬	১০৯৬
১৯৩৪	৫২৫	১৩০৬

গত বৎসর ৪১টী ছাত্রী ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ অপেক্ষা অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশে চিকিৎসা বিদ্যার প্রতি নারীদিগের আকর্ষণ অধিক। গত পাঁচ বৎসরে দুইজন মহিলা এম, ডি, এবং একজন মহিলা এম, এস্, সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ন্যায় বোম্বাই প্রদেশেও এ পর্য্যন্ত কোন মহিলা ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষা দেন নাই। কোমলাঙ্গী মহিলাগণের পক্ষে "হাতুড়ী পেটা" বা শারীরিক শ্রমসাধ্য ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। শিক্ষা ও সাহিত্য

সাংবাদিকের কারামুক্তি

"অমৃতবাজার পত্রিকার" লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক কারামুক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কণ্টকাকীর্ণ সাংবাদিকের পথ করিতে করিতে 'অমৃতবাজারের' মারফতে ঘোষবংশ দেশের সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও শিল্পে যে কৃষ্টিগত পরিপুষ্টি আনিয়াছেন তাঁহাদেরই উচ্চ ভাবধারা তুষারবাবু সম্পূর্ণ নির্ভীকতার সহিত রক্ষা করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। বন্দী মুক্তি পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন—বন্দীত্বের অবমাননা লইয়া নহে, দেশবাসীর অটুট ও অক্ষুন্ন শ্রদ্ধা মস্তকশীর্ষে বহন করিয়া। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি। তাঁহার জীবন অধিকতর কর্ম্মময় ও যশোমণ্ডিত হোক। ভারত

বিধবা বিবাহে মহাত্মা গান্ধী

জনৈক ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীর নিকট কোয়েটা ভূমিকম্পে বিপন্ন তাঁহার একটী খুড়তুত বোন সম্পর্কে এক করুণ পত্র লিখিয়াছেন। এই মেয়েটীর বয়স ১৭ বৎসর। ভূমিকম্পে সে তাহার স্বামী, দুই মাস বয়স্ক সন্তান, শ্বশুড় ও দেবরকে হারাইয়াছে। অর্থাৎ তাহার আর কেহই নাই। পত্রলেখক বলেন যে, তিনি বোনটিকে লইয়া যে কি করিবেন—তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। মেয়েটী লাহোরে তাহার মাতার নিকট আছে। পত্র লেখক লিখিয়াছেন—তিনি মেয়েটীর পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কেহ তাহাতে সহানুভূতি দেখান—আবার কেহ প্রস্তাবটীতে উষ্মা প্রকাশ করেন।

মহাত্মাজী হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি অনুভব করিয়াছেন, যদি যুবতী বিধবারা লোক নিন্দার ভয় না করিয়া স্বাধীন মতাবলম্বী হইবার সুযোগ পাইত—তাহা হইলে অনেকেই বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না করিয়া স্বেচ্ছায় বিবাহ করিত। কোয়েটার ভূমিকম্পের ফলে এই নিঃসহায় বিধবার ন্যায় সমস্ত বিধবাকে একথা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে তাহারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে মোটেই দোষের হইবে না—এবং বিবাহের উপযুক্ত বর সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক সংস্কারকামী ব্যক্তি যাহাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এইরূপ বিধবা আছেন—তাহাদের উচিত নিজেদের মধ্যে সংযম সততার সহিত প্রবল আন্দোলন পরিচালনা করা। সফলকাম হইলেই তাহার বহুল প্রচার আবশ্যক। ইহা দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সাহায্য করা হইবে। ভূমিকম্প ফলে যাহারা বিধবা হইয়াছে—তাহাদের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি থাকায় এই ক্ষেত্রে এই সময় সফল হওয়ার আশা খুব বেশী এবং ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবে যাহারা বিধবা হইয়াছে—তাহাদের ভবিষ্যৎ উপকারও সাধিত হইবে। জনশক্তি

শিশুদের জন্য সিনেমার প্রচলন

অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও সিনেমার প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিদিন সিনেমা গৃহে যে সমস্ত অভিনয় হইয়া থাকে তাহার দর্শকদের মধ্যে অল্প বয়স্কের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অন্যান্য সহরের কথা ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র কলিকাতাতেই প্রায় ৩৯টীর দেশী সিনেমা গৃহ আছে। গড়পড়তা হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, প্রতি সিনেমা গৃহেই প্রায় ১০০০ এর বেশী সংখ্যক আসন আছে। রাত্রি সাড়ে নয়টার অভিনয় বাদ দিয়া অন্যান্য অভিনয়ে যে পরিমাণ দর্শক হয় তাহার ¼ ভাগ দর্শক অপরিণত বয়স্ক। সুতারং সিনেমা এখানেও শিশুমনের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রচুর সুযোগ পাইতেছে। বর্ত্তমানে সমস্ত দেশেই সিনেমা সম্পর্কে শিশুদের লইয়া বিশেষ সমস্যা জাগিয়াছে। ভারতবর্ষেও আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিশু মঙ্গল সমিতির অধিবেশনে এই সমস্যার বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে। এবং একটি কৌতূহলজনক বিবৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসরের অধিবেশনে শিশুমঙ্গল সমিতি স্থির করেন যে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে শিশুদের আমোদ বিধানের জন্য সিনেমার প্রচলন সমস্যা আলোচনা করিবেন এবং সেই মর্ম্মে শিশুমঙ্গল সমিতির সদস্য দেশগুলিকে এই বিষয়ে খবরাখবর দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিভিন্ন দেশ হইতে যে সমস্ত সমাচার পাওয়া গিয়াছে তাহা ভিত্তি করিয়াই উল্লিখিত বিবৃতি রচিত হইয়াছে।

চিত্র দর্শনোপযোগী বয়স

কতকগুলি দেশে (আমেরিকা, ভারতবর্ষ, জাপান ইত্যাদি) সিনেমা দেখার অনুমতি হিসাবে বয়সের তারতম্যের কোনই আইন নাই, আবার কতগুলি দেশে সিনেমা দেখা সম্বন্ধে বয়সের সীমা স্থির করা আছে। বেলজিয়ামে ১৫ বৎসর বয়সের কম দর্শকদের সিনেমা দেখা নিষেধ; তুর্কীতে ১২ বছরের কম বয়সের বালক বালিকারা সিনেমা গৃহে যাইতে পারে না। যুক্ত রাজ্যে নিয়ম, যে সমস্ত ছবিবোর্ড অবসেন্সর সর্ব্বজনীনভাবে দর্শনীয় না বলেন, সে সকল ছবি দেখিতে ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকারা পিতামাতার সঙ্গে ব্যতীত যাইতে পারে না। শিশুমঙ্গল সমিতির মতে এই নিয়মগুলির কোনটাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নয়। কেননা, এর ফলে হয়ত যে সমস্ত ছবি শিশুদের দেখা উচিত নয় তাহা তাহারা দেখে এবং যে ছবিগুলি বিশেষ করিয়া তাহাদের দেখা উচিত তাহা তাহারা দেখে না। মা বাপের উপরও এই কর্ত্তব্য একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন নয়, তাহার কারণ, ছবির ভাল মন্দের খবর সকল সময়ে ঠিক মত তাহাদের কাছে পৌঁছায় না এবং অনেক স্থলে

পাছে শিশুরা তাঁহাদের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গৃহে দুষ্টামি করে, সেই ভয়ে সিনেমাতেও শিশুদের সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়।

শিশুমনের উপর সিনেমার প্রভাব

বিভিন্ন দেশ হইতে যে সমাচার পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে শিশুমনের উপর সিনেমার প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে, দুই তিন বছর পূর্ব্বে লণ্ডন বিদ্যালয়ের শিশুদের লইয়া এবিষয়ে একটি অনুসন্ধান হয় তাহাতে প্রকাশ—

(১) নীতিবিরুদ্ধ ছবিগুলি শিশুরা প্রায়ই বোঝে না, বরং তাহাদের বিরক্তির উদ্রেক করে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দুই একটি শিশুর অনিষ্ট করিলেও বেশীরভাগ সময়েই এই ছবিগুলির দ্বারা শিশুদের অপকার হয় না, (২) সিনেমাতে যাহা দেখে শিশুরা খেলাতে তাহার অনুসরণ করে বটে, কিন্তু সিনেমার এই প্রভাব শুধু খেলাতেই নিবদ্ধ থাকে এবং সময়ের সঙ্গে ক্রমশঃ তাহা ভুলিয়া যায়; (৩) ঠিক মত উদ্দীপনা পাইলে শিশুরা মনের কোণে সিনেমা জ্ঞান রাখিয়া দেয় ও তাহা বিদ্যালয়ের পাঠের মত ব্যবহার করিতে পারে; (৪) সিনেমার একটী খারাপ প্রভাব কিন্তু শিশুমনের উপর সব সময়েই লক্ষিত হয়—প্রায়ই শিশুরা সিনেমা দেখিয়া ভয় পাইয়া থাকে এবং সেই ভয় হইতে স্বপ্ন দেখে; (৫) কোন জিনিষ সঠিকভাবে জানাইবার জন্য কিংবা শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিবার জন্য কার্য্যকরী যন্ত্র হিসাবে সিনেমা ব্যবহৃত হইবার যোগ্য।

বেলজিয়াম, ইতালী এবং রুমানিয়ার প্রতিনিধি কিন্তু (১) এবং (২) সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই এই প্রসঙ্গে বেলজিয়ামের প্রতিনিধি বলিয়াছেন, 'তাঁহার দেশে যে সমস্ত অপরাধী শিশুদের আদালতে বিচারের জন্য আনা হয় তাহাদিগের অপরাধের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে প্রায়ই ঐ সমস্ত অপরাধের মূল কারণ সিনেমার ছবি দেখার ফল।'

শিশুদের জন্য বিশেষ অভিনয়ের বন্দোবস্ত

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, রুমানিয়া ইত্যাদি কতকগুলি দেশের সমাচার হইতে জানা গিয়াছে যে, শিশুদের জন্য বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন মাঝে মাঝে করা হইয়া থাকে, কিন্তু এবিষয়ে গুরুতর এবং একটানা ভাবে কিছুই বন্দোবস্ত নাই। আর্থিক অসঙ্গতিই ইহার আসল বাধা। শনিবারের দুপুরবেলা 'ম্যাটিনীর' বন্দোবস্ত প্রায় সমস্ত সহরেই আছে, কিন্তু সেগুলিতে শিশুদের উপযোগী ছবির একান্ত অভাব; সুতরাং সুফল লাভ সুদূর পরাহত।

কি-ধরণের ছবি শিশুরা ভালবাসে

সাধারণতঃ সমস্ত দেশেই দেখা যায় যে, বালকেরা দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ ও বালিকারা রূপকথার ছবি দেখিতে ভালবাসে যাহা হউক, এবিষয়ে এখনও কোনরূপ সন্তোষজনক গবেষণা হয় নাই।

শিশুদের উপযোগী ছবি প্রচলনের ব্যবস্থা

এপর্য্যন্ত কোন দেশেই শিশুদের উপযোগী ছবির ব্যবস্থা করা হয় নাই। কোন কোন দেশে শিশু-সাহিত্য বা পরীর গল্প হইতে ছবির বিষয় লওয়া হইলেও তাহা এমন ভাবে তৈয়ারী হয় যে, শিশুদের অপেক্ষা তাহা তাহাদের জনক জননীরই বেশী ভাল লাগে। এই বিষয়ে শিশুমঙ্গল সমিতির সদস্যেরা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—আজকাল সিনেমার ঝোঁক হইয়াছে শিশুদের উপেক্ষা করিয়া বয়স্কের আনন্দ বিধান করা। এর ফলে, শিশুরা সিনেমার আসল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সিনেমার দ্বারা যাহাতে

পারিবারিক আনন্দ বিধানের সুবিধা হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সেই হেতু সমস্ত পরিবারের পক্ষে একসঙ্গে দেখিবার যোগ্য ছবির আয়োজন করা সমীচীন।

শিশুদের শিক্ষণীয় ছবির ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা গেলেও যাহাতে শিশুরা আমোদ উপভোগ করে এরূপ ছবি তৈয়ারীর কাজ উপেক্ষিতই হইতেছে। শিশুমনকে আনন্দ দেয়, বর্ত্তমানে এরূপ ছবির সত্যই একান্ত অভাব। আর্থিক সমস্যাই ইহার কারণ। বর্ত্তমানে চিত্র তৈয়ারীর খরচ প্রচুর, সুতরাং খরচের জন্য দর্শনীর মূল্যও বেশী করিতে হয়, অথচ বেশী দর্শনী দিয়া ছবি দেখা শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কম খরচে শিশুদের উপযোগী ছবি তৈয়ারী করিতে হইবে। ইহাতে শিশুদর্শকের সংখ্যা বাড়িবে সন্দেহ নাই, কেননা সরলভাবে সরল গল্পের বিবৃতি শিশুরা যে কোন দূষিত চিত্রের চেয়ে বেশী পছন্দ করে।

আধুনিক যুগে শিশুদের জন্য বিশেষ চিত্রের প্রচলন করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দর্শনীর মূল্য কম করিতে হয় বলিয়া অবশ্য শিশুদের জন্য বিশেষ চিত্রের অভিনয় গোড়া থেকেই অর্থের দিক দিয়া বিশেষ সাফল্য লাভ নাও করিতে পারে তথাপি ইহা সত্য যে, বিশেষ চিত্রের চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িবে কোন কোন দেশে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও চিত্রব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় অর্থের দিক হইতে সাফল্য লাভ করিয়াছে। শিশুদের উপযোগী চিত্রাভিনয়ের অনুষ্ঠানে এইরূপ সহযোগিতাই চিত্রপ্রদর্শকগণের আর্থিক সাফল্য লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

শিশু মঙ্গল সমিতির মতে শিশুদের আমোদ বিধানের জন্য সিনেমার প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনার আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কেননা, সমস্ত দেশের শিশুদের মানসিক হিতসাধনের সমস্যা ইহাতে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ অধিবেশনের এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা হইবে।

রাষ্ট্রসম্মিলন, জেনেভা

পাঞ্জাবে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা

পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাট জেলার ডিঙ্গার অধিবাসী পরলোকগত রায়বাহাদুর লালা সুন্দর দাস চোপরার বিধবা পত্নী শ্রীমতী কুশল দেবী ডিঙ্গাতে একটি বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮,০০০৲ টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সাংবাদিকের বিবেচ্য

* * আমাদের দেশের অপর একটি সমস্যা বিষয়ে আমাদের সজাগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা নারীহরণ ও ধর্ষণজনিত মামলার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ। অশ্লীল সাহিত্য প্রচার বন্ধ করা বিষয়ে সংবাদপত্র সেবকদের মধ্যে মতভেদ নাই। যে কারণে অশ্লীল সাহিত্য প্রচার আমরা ক্ষতিজনক মনে করি, সেই কারণেই নারী ধর্ষণ সম্পর্কিত মামলার বিস্তৃত জবানবন্দী ও জেরা সম্বলিত বিবরণ অবাঞ্ছিত। অবশ্য নারী হরণ ও ধর্ষণ জনিত জাতীয় লজ্জা বিষয়ে জনমত জাগ্রত করা সংবাদ পত্রের কর্ত্তব্য। কিন্তু ঘটা করিয়া নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারের বিবরণ, দিনের পর দিন পরিবেশন করা (বিদেশী নারীর বহু ব্যভিচারের মামলার বিবরণ প্রকাশ করাও সংবাদ পত্রের যেন কর্ত্তব্য হইয়া উঠিতেছে) অশ্লীলতা প্রচারেরই সামিল। ইহাতে সাধারণ পাঠকের মনে নারীহরণ ও ধর্ষণকারীর প্রতি যতটা ঘৃণা উদ্রেক হয়, তাহার বেশী ঔৎসুক্য জন্মে ঐ পাশবিকতারই জঘন্য বিবরণ পাঠ করিতে। ইহাতে মানুষের পশুটাই

জাগে—মনুষ্যত্ব জাগে না। জাগিলে এত নারী ধর্ষণের মামলার বিবরণ পাঠ করার পরও একটা মানুষের সাড়া কি মিলিত না? আদতে যে মনোবৃত্তি লইয়া অশ্লীল সাহিত্য পাঠ করে, সেই মনোবৃত্তি লইয়াই নারী ধর্ষণের মামলার বিস্তৃত বিবরণ উপভোগ করে। মানুষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সংবাদপত্র সংবাদ পরিবেশন করিতে গেলে সংবাদ বিকাইবে বটে, কিন্তু সংবাদ পত্রের দেশের নৈতিক জীবনের কথা মনে রাখিয়া তাহাতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। সংবাদ পত্রের কর্ত্তব্য হিসাবে নারী হরণ জনিত মামলার বিবরণ অবশ্য দিতে হইবে, তবে তাহা ঘটা করিয়া নহে। এবং সংবাদ প্রচার দ্বারা অশ্লীলতা প্রচারের কুফল না আসিয়া পড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংক্ষেপে সংবাদ ছাপিয়া সংবাদ পত্রের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যতই অবাঞ্ছিত ও দুঃখের হউক, এই কথা সত্য যে, ঐ ধরণের ব্যাভিচার বা নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারের খুটনাটি শুনিবার একটা বিকৃতরুচি পাঠক সমাজে বর্ত্তমান, এবং ঐ ধরণের সংবাদ বিকায়। কিন্তু তথাপি সংবাদপত্রওয়ালাদের এবিষয়ে অধিকতর অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সোনার বাংলা

আন্দামান বন্দী-নিবাস

গত ২৭শে জুন তারিখের "এডভান্স" পত্রিকায় "one who knows" এই ছদ্মনামে এক ব্যক্তি আন্দামান বন্দী-নিবাসের অবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল:— পরিষদের আগামী অধিবেশনে কোন সদস্য আন্দামান বন্দীদিগের নিম্নলিখিত দাবীগুলি উত্থাপন করিতে পারেন।

(১) তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদিগকে প্রাতঃকালে চা পান করিতে দেওয়া হউক। কারণ আন্দামানের আবহাওয়া জলীয় ও ঠাণ্ডা। বন্দীগণ অনেকেই সর্দ্দি কাশিতে ভুগিয়া থাকে। এজন্য প্রাতঃকালে তাহাদের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ গরম পানীয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদিগকে প্রাত্যহিক আহার্য্যের জন্য যে সাড়ে নয় আনা করিয়া দেওয়া হয়, সেই পয়সাতেই তাহাদিগকে আহার্য্যের পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়া হউক।

(৩) বন্দীদিগকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে সুযোগ ও অনুমতি দেওয়া হউক।

(৪) বন্দীদিগকে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতে দেওয়া হউক। চীফ কমিশনারের অফিস হইতে যে আন্দামান বুলেটীন বাহির হয়, উহা বন্দীদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া হউক।

(৫) বন্দী-নিবাসের লাইব্রেরীর জন্য চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতি কতকগুলি সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হোক।

(৬) গবর্ণমেণ্ট বন্দীদিগের পড়িবার জন্য পুস্তক ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন সেই টাকায় বন্দীদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত পুস্তক ক্রয় করিতে দেওয়া হোক।

(৭) বন্দীদিগের জন্য বাহিরের কতকগুলি খেলা ধূলার ব্যবস্থা করা হোক।

(৮) হাসপাতালের সহিত যিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এমন কোন মেডিকেল অফিসারকে বন্দী-নিবাসের হাসপাতালের ভার প্রদান করা হোক এবং দন্তরোগের চিকিৎসার ব্যয় গবর্ণমেণ্ট বহন করুন।

(৯) বন্দীদিগের প্রতি বেত্র দণ্ডের যে ব্যবস্থা আছে তাহা রহিত করা হোক।

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীগণের সুবিধার জন্য বহুকাল হইতেই নানাভাবে আলোচনা হইতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ সংখ্যায় বেশী, টাকা বেশী তাহারাই দেন এবং তাহারাই যৎপরোনাস্তি অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। আলোচনায় ইহাদের অসুবিধা কিছু মাত্র হ্রাস হইতেছিল না। সম্প্রতি প্রকাশ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলকোম্পানী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের সুবিধার্থে গাড়ীগুলির উন্নতি সাধন করিতেছেন। যাত্রীরা প্রয়োজন বোধে এক কামরা হইতে অন্য কামরায় যাইতে পারিবেন, গাড়ীর মধ্যে বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত হইবে এবং আসনগুলিও অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে।

সংবাদ কয়েকটাই ভাল অন্ততঃ বক্তৃতার মুখে ভালই শুনাইতেছে। কিন্তু রেলকর্ত্তৃপক্ষের সম্বন্ধে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের অতীত অভিজ্ঞতা বড় প্রশংসার্হ নহে। তাহারা ঐ সকল সুসংস্কার সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি পূর্ব্বতন কুসংস্কার পরিহার করিতে খুব নির্ভর করিতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠিয়াছে,—

(১) তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা "প্রতি বেঞ্চে ৪জন বসিবেক" স্থলে বর্ত্তমানে যত জন ইচ্ছা বসিতে পারিতেছে,—এই সুবিধান সম্পর্কে কোন নিয়ম করা হইবে কি-না?

(২) তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে মালপত্র ভর্ত্তি হওয়ার পর যখন উঠা নামার দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ হয় ও গাড়ী 'দু' মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না শুনিয়া যাত্রীরা প্রাণপণে অরোহণ ও অবতরণ করে,— তাহার কোন প্রতিবিধানের কথা চলিতেছে কিনা?

(৩) বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস ইহাদের দেহে লাগিলে কোনরূপ অভিনব ব্যাধির আশঙ্কা আছে কিনা?

(৪) মেয়েদের গাড়ীর বর্ণ সংস্কার দ্বারা উহা সকলের চেনা জানা হওয়ার ব্যবস্থা হইবে কিনা এবং রাত্রিতে মেয়েদের গাড়ীর দুই পাশে দুইটী আলোর ব্যবস্থা হইবে কি না?

এই সকল গেল প্রয়োজনের কথা। আর একটী আলোচ্য বিষয়, ষ্টেসনে ও পথে চলন্ত ও অচলন্ত ট্রেণে রেলকর্ম্মচারীগণের ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইবে কি না? রেলের কর্ম্মচারীরা যে নির্দ্দিষ্ট মাহিয়ানার চাকর মাত্র এই কথাটা যাহাতে তাহাদের মনে থাকে, এইরূপ কোন ব্যবস্থা রেলকর্ত্তৃপক্ষ করিবেন কিনা জানিতে ইচ্ছা হয়। রেল আফিসের কুলি মজুর, হইতে অনেক উপরওয়ালা পর্য্যন্ত সকলেরই ধারণা যে তাহারা প্রত্যেকই এক একজন জঙ্গীলাট। এই ধারণার অদল বদল হওয়া আবশ্যক এবং যদি কোন রেলকর্ম্মচারীর ভদ্রতাজ্ঞানে অভাব থাকে। তাহাদিগকে কিছুকাল সুশিক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থানে রাখিলে ভাল হয়। ইহাতে যাত্রীদের অসুবিধা হ্রাস পাইবে।

শ্রীমধু মৈত্রেয়, ঢাকাপ্রকাশ

বরোদায় বিবাহ আইন

বরোদা রাজ্যে এক নূতন আইন গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই আইনে ২৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ ১৮ বৎসরের কম বয়স্কা নারীকে বিবাহ করিতে পারিবে না; আবার ১৮ বৎসরের কম বয়স্কা নারীর কিংবা তাহাপেক্ষা কম বয়সের পুরুষের সহিত, ক্ষয়রোগাক্রান্ত, উন্মাদ অথবা অশক্ত ব্যক্তির সহিত বিবাহ অস্বাভাবিক বিবেচিত হইবে। ঐ সকল বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

ঢাকায় নূতন হাসপাতাল

পরলোকগত নবাব স্যার খাজে আসানউল্লা সাহেবের কন্যা ও বর্ত্তমান নবাব স্যার হবিবুল্লা বাহাদুরের পিসি নবাবজাদি আখতার বানু বেগম সাহেবার অর্থসাহায্যে ঢাকায় এক নূতন হাসপাতাল সংস্থাপিত

হইয়াছে। পাঠক এ সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত আছেন। "স্যার আসানুল্লা রৌপ্য জুবিলি মেমোরিয়েল হাসপাতাল" নামে ইহা পরিচিত করা হইয়াছে। গত ৯ই জুলাই মঙ্গলবার বঙ্গের গবর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন বাহাদুর এই হাসপাতালের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সহরের বহু গণ্যমান্য লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন।

নারীনিগ্রহ নিরোধ সমস্যা

কলিকাতা এলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত সরলা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। হিন্দুমিশনের উদ্যোগে এই সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সভার মতে নারীহরণ বিশেষতঃ হিন্দুনারী নিগ্রহ দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গ বিহার ও আসামের হিন্দুগণকে নারীনিগ্রহ প্রতীকারার্থ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এই সভা বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। যাহাতে নারীনিগ্রহকারীর গুরুতর দণ্ড হয় এবং সেজন্য প্রয়োজনানুরূপ নূতন বিধি রচিত হয়, সেজন্য এই সভা বিশেষভাবে চেষ্টিত হইবেন। পল্লী অঞ্চলের নিরীহ অধিবাসীগণ যাহাতে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে স্ত্রী কন্যা লইয়া বাস করিতে পারে, সেজন্য চেষ্টা করা হইবে এবং নিগৃহীতাগণকে উদ্ধার ও রক্ষার জন্য মুক্তিফৌজ গঠন করিতে হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটী গঠন করা হইবে। এই কমিটী দেশ হইতে নারীনিগ্রহের মূলোচ্ছেদের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন।

চলন্ত পাঠাগার

শ্রীবিনয়ভূষণ বসু, ৫৭-১, সুবার্ব্বন স্কুল রোড, ভবানীপুর হইতে আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

মহাশয়, আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই চলন্ত পাঠাগারের সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ-আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনো ইহা ব্যাপকভাবে কাজে পরিণত হয় নাই। কি প্রকারে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে, আমি নিম্নে তাহার একটা খসড়া প্রদান করিতেছি।

প্রায় সহরে পাঠাগার আছে, কাজেই সেখানে চলন্ত পাঠাগারের আবশ্যকতা নাই। চলন্ত পাঠাগার পল্লীর জন্য, কিন্তু তাহার কেন্দ্রস্থল হইবে সহর। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া কার্য্য পরিচালক সমিতি থাকা দরকার। গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমিতির সম্পাদক থাকিবেন। তাঁহার দায়িত্বে সমস্ত বই পাঠান হইবে এবং পাঠাগার থাকাকালে তিনি একজন অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন।

বই প্রেরণ সম্বন্ধে সমিতির আর্থিক অবস্থা অনুসারে বন্দোবস্ত হইবে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মধ্য দিয়া পরস্পরিক পুস্তক আদান প্রদান করিলে গাড়ীর চাকা বিশিষ্ট বাক্সের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। কলিকাতার কোন কোন লাইব্রেরী এরূপভাবে আলমারী বা বাক্স বিশিষ্ট গাড়ীর দ্বারা পুস্তক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রথা কেবলমাত্র পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে পুস্তক আদান প্রদানের জন্য কাঠের বাক্সবন্দি করিয়া পাঠান সর্ব্বাপেক্ষা ভাল; ইহাতে বই নষ্ট বা হরাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। বাক্স রেলওয়ে পার্শ্বেল বা মুটী দ্বারা প্রেরিত হইতে পারে।

পাঠকবর্গ প্রত্যেকে পুস্তকের মূল্য অনুযায়ী অর্থ জমা রাখিবেন। অক্ষম হইলে সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে পরিচয়পত্র দিতে হইবে।

এক একটি কেন্দ্রে এক সঙ্গে তিন মাস করিয়া পাঠাগার থাকিবে। পাঠকদের অভিরুচি অনুযায়ী পাঠাগার স্থায়ী হইবে।

নারী হরণের প্রতিকার

যে সকল নরপশু অসদুদ্দেশ্যে নারীহরণ করে তাহাদের কঠোরতম দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিয়া সামাজিক পাপ দমনের কথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। গত শনিবার এলবার্ট হলে এ সম্পর্কে যে জনসভা হইয়াছে তাহাতেও বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু নারীহরণ ঘটিত অপরাধে যেমন কঠোর দণ্ডবিধান আবশ্যক, অন্তঃপুরে নারীনির্য্যাতনের বিরুদ্ধেও কঠোর সমাজশাসনের একান্ত প্রয়োজন। সমাজপতিগণ সে সম্পর্কে কি করিয়াছেন? যাহারা গৃহত্যাগ করিয়া দুর্ব্বৃত্তের কবলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের সকলেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্য্যাতিতা নহে। যাহারা পরিবার পরিজনের আচরণ অসহ্য মনে করিয়া গৃহত্যাগ করে, তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। নরপশুদের দণ্ডবিধানের জন্য সম্রাটের আদালত আছে, কিন্তু অন্তঃপুরে নারী নির্য্যাতনকারীদের দণ্ডবিধানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি? সমাজের অবিচারে যদি কেহ গৃহত্যাগ করে, সে জন্য দায়ী সমাজ। নারীহরণের প্রতিকারের জন্য আমরা যে আন্দোলন করি, তাহাতে আমাদের নিজেদের অপরাধের কথাও যেন না ভুলি।

নবশক্তি

বীমা ব্যবসায়ে নারীর স্থান

বীমা ব্যবসায়ে আমাদের দেশের স্থান অন্যান্য দেশ হইতে অতি নিম্নে হইলেও বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষ এই ব্যবসায়ে এত অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই।

আজকাল মেয়েরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন বিভাগে যোগদান করিয়া নিজ উপার্জ্জনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। বীমার কাজ বিশেষ সম্মানজনক, তাঁহারা এ বিভাগে যোগদান করিয়াও স্বাধীনভাবে যথেষ্ট রোজগার করিতে পারেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ আমাদের দেশেই এমন অনেক মেয়ে আছেন যাঁহারা বীমার কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। ছেলেদের ন্যায় মেয়েরাও যদি এই ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি দেন তাহা হইলে যে শুধু তাঁহারাই লাভের অংশ পাইবেন তাহাই নয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সহায়তায় সমাজের ও তথা দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে ও আমাদের অর্থকৃচ্ছ্রতাও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। তাই ইংলণ্ড আমেরিকা জাপান প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে হইবে এবং ঐ সকল দেশের মেয়েদেরও সহায়তার একান্ত প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের এক খ্যাতনামা বীমা পত্রিকা আমাদের দেশের কয়েকজন মহিলাকে বীমা কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগী দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, ইহা বিশেষ আনন্দের ও প্রশংসার বিষয় যে ভারতীয় মেয়েরা বীমার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পাইতেছেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া বীমার কাজে যোগদান করিতেছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মিসেস্ ক্র্যামার নামে কোন এক মহিলা তাঁহার স্বামীর জীবদ্দশায় কিছুতেই বীমার উপকারিতা স্বীকার করিতেন না, পরন্তু তাঁহার স্বামী যখন তাঁহার বীমা পলিশির প্রিমিয়াম দিতেন তখন মিসেস্ ক্র্যামার ইহাকে অপব্যয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই মিঃ ক্র্যামার যখন ইহলোকের মায়া মমতার বহু উর্দ্ধে স্থান গ্রহণ করিলেন তখন মিসেস্ ক্র্যামার তাঁহার শিশু পুত্রদ্বয়কে লইয়া অকূল সাগরে পড়িলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই যখন একলক্ষ ডলারের মৃত স্বামীর বীমা পলিসি পাইলেন তখন তিনি বুঝিলেন, বীমার প্রকৃত উপকারিতা। এর পরেই তিনি ব্যবসায়ে দীক্ষিতা হন এবং আজ তিনি আমেরিকার বীমা কার্য্যে লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এমনি অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অন্যান্য দেশের বীমা-ব্যবসায়ের ইতিহাসে—এসব কাহিনী আমাদের কাছে গল্প বলিয়াই মনে হইতে চায়, কিন্তু এগুলি যথার্থ ঘটনা। আমাদের দেশের মেয়েরাও বীমাকার্য্যে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিতে পারেন যদি তাঁহারা এদিকে তাঁহাদের শক্তি নিয়োজিত করেন।

স্বদেশ

অল্প কিছু বলা

শ্রীঅমলা দেবী

লেখা কেরাণীর পেশা, সাহিত্যেকের নেশা! সেই নেশার ঝোঁকেই কিছু একটা বলবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে।

প্রথমেই আমি সমগ্র সুধীমণ্ডলীর কাছে কবির ভাষায় নিবেদন করি—'হয়ত এ ফুল সুন্দর নয় ধরেছি সবার আগে।'

আমার ভাষায় বহু ক্রটী থাকা সম্ভব তবু আমার বলবার এ ব্যাকুলতাকে জননী যেমন শিশুর প্রথম কথা বলার ব্যাকুলতাকে সস্নেহ প্রশ্রয়ে বরণ করে নেন, তেমনি আমার এই সামান্য তম কয়েকটী কথা আপনাদের সস্নেহ প্রশ্রয় পাবে আশা করি।

আমি কিছু মেয়েদের কথা বলতে চাই, অর্থাৎ বলতে চাই না আলোচনা করতে চাই। আজকাল মেয়েদের সম অধিকার নিয়ে খুবই আন্দোলন চলছে; নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনীতে নারীরা কি চান সেই মত ব্যক্ত করেছেন সে দাস জাতির মুখেই সগৌরবে শোভা পায়। চাইবার করবার মত কাজ মেয়েদের জন্য বহু আছে, পল্লীগঠন শিক্ষাবিস্তার যা দ্বারা সমাজ দেশের বহু উপকার হয় নারীরা তা চান না, তাঁরা চান সুলভ বিলাস, অর্থাৎ জন্ম-শাসন এবং উত্তরাধিকার। সম্পত্তি সঞ্চয় করতে পারে এমন যোগ্যতা যাদের নাই তারা চায় অধিকার দাবী এর চেয়ে দীনতা আর কি আছে জানিনা। এই সম অধিকার দাবী যারা সমগ্র নারীজাতির প্রতিনিধি সেজে ব্যক্ত করলেন তাঁরা নারী জাতিকে সম্মানিত করেন নি, কলঙ্কিত করেছেন।

যাই হোক একই পিতামাতার সন্তান যখন তারা উভয়েই, তখন পুত্র সর্ব্ব স্থাবর অস্থাবরের হ'ল অধিকারী আর কন্যা হ'ল বঞ্চিত, স্থুল যুক্তিতে এ অধিকার নিষ্ঠুরতায় মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় নারীর উত্তরাধিকারের পথে কত বাধা।

পৈত্রিক উত্তরাধিকার না হয় পুত্র কন্যা উভয়েই সমভাবে পেল, কিন্তু তাকে রক্ষা করবার যোগ্যতা তাঁদের আছে কিনা সেটা ও বিবেচ্য।

সাধারণতঃ স্ত্রীধন বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ অলঙ্কার সে সম্পত্তি ও দেখা যায় যত দিন তার রক্ষক থাকেন তত দিনই সে অধিকারীর দেহের শ্রী বৃদ্ধি করছে এবং যে মুহূর্ত্তে সে রক্ষক বিহীন হ'ল তার পরক্ষণেই অধিকারিণীর চক্ষের সম্মুখে অধিকারিণীর আত্মীয়স্বজন তার গুরুভার লঘু করে দিলেন, এ দৃষ্টান্ত বহু দেখা গেছে।

যাঁরা দু' চার খানি অলঙ্কার রক্ষা করতে পারেন না, তাঁরা করবেন বিপুল সম্পত্তি রক্ষা! এ হাস্যকর কথা শুনে বিস্মিত মন প্রশ্ন করে 'একী নিজেই নিজেকে বিদ্রূপ করছে?'

পুরুষের সঙ্গে সম অধিকার যদি নারী গ্রহণ করেন তাতে বিপক্ষতা করা কারুরই উদ্দেশ্য নয়, এবং যোগ্যের যোগ্যতার পুরস্কার হ'তে বঞ্চিত করার শক্তি কারুরই নাই, কিন্তু সে শক্তি সঞ্চয় করুণ, সে মন গঠন করুণ, অধিকার ভিক্ষায় মেলে না, তাকে শক্তি দিয়ে উপার্জ্জন করতে হয়।

আমাদের দেশের নারীরা কি চাইছেন তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। এই যে নারী জাগরণের সাড়া একটা প্লাবনের মত এসেছে এ দেখে কোন এক সাহিত্যিকের কথা মনে হয় তাঁরই ভাষায় বলি 'সবাই বলে নারী জেগেছেন, কিন্তু আমি দেখছি রেগেছেন। নারীর রাগই কেবল প্রকাশ হচ্ছে, জাগ্রত ভাব ত কই দেখা যাচ্ছে না।'

অধিকার চাইতে হ'লে প্রথম জানতে হবে আমরা কি চাই আমাদের কিসের অভাব, আমাদের অধিকারের পথে কি বাধা, এ সমস্ত সত্যরূপে জ্ঞানের চক্ষে জাগ্রত হয়ে দেখতে হবে, দেখতে হবে, অন্ধভাবে শুধুই পথে ছুটাছুটী করলে শুধু কোলাহলের সৃষ্টি হবে প্রতিকার কিছু হবেনা।

যে দেশের মেয়েরা আজকের এই প্রগতি যুগে প্রশ্ন করেন 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে?' যে দেশে দেশ জুড়ে আছে আনন্দময়ী, সাবিত্রীরাণী সেই জাতের প্রগতি!

গতি-ই আছে কি?

দেশ জুড়ে সমগ্র নারীজাতি অজ্ঞান অন্ধকারে অত্যাচারে উৎপীড়িতা, আর সেই সময় জন কয়েক শিক্ষিতা নারী বলেন, 'আমাদের চাই উত্তরাধিকার।' যেন আর সমস্ত অভাব অভিযোগের মীমাংসা হয়ে গেছে শুধু উত্তরাধিকারটুকুই বাকী।

বর্ত্তমান সময় উত্তরাধিকার আইন যদি প্রবর্ত্তন হয় তবে তাতে নারীর প্রয়োজন মিটবে কিনা সন্দেহ, কারণ অধিকার ও শুধু জন কতক শিক্ষিতা বিশেষ বিশেষ মহিলারাই পারে না সমগ্র নারীরাই পাবেন, এ দেশের সাবিত্রীদের হাতে সে সম্পত্তি কয় ঘণ্টা থাকার সে কথা কি তাঁরা ভেবেছেন?

উত্তরাধিকার পেলে ও এ অজ্ঞান অত্যাচারিত জাতের কোনই লাভ নাই, যাঁদের সম্পত্তি তারাই ভার লঘু করে দেবেন।

তালতলা সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

ভারতের মৌলিকতা

শ্রীমতী দিবা মৈত্র ও শ্রীবটুক সাণ্যাল

ভূমিকা। আজ ভারতবর্ষে অনুকরণের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। যদিও কিছুদিন হইতে স্বদেশীর আহ্বানধ্বনি শোনা যাইতেছে, তবু তাহাতে বিদেশী গন্ধ বর্ত্তমান। কেননা, স্বদেশীর আত্মা এখনও আমাদের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার বহিরাবরণটাই আমাদের চোখের সম্মুখে দৃশ্যপটের মত শোভা পাইতেছে। এই তথাকথিত স্বাদেশিকতার ভিতরটা যদি একবার অন্বেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে আমাদের মনে ও প্রাণে প্রকৃত স্বাদেশিকতার স্পর্শলাভ এখনও ঘটে নাই। যদি শুদ্ধ স্বদেশীর মহিমা গান করিয়া আমরা কোন বস্তু গ্রহণ করি ত তাহার প্রয়োগ সব সময়ই করি বিদেশী রীতিতে। যে পর্য্যন্ত না আমরা সেই স্বদেশী বস্তু সমূহ স্বদেশী রীতি অনুযায়ী ব্যবহার করিব, ততদিন স্বাদেশিকতার আহ্বান হইবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত অনুকরণের রূপ এমন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে কেবল বাহ্য আচরণেই নহে, আভ্যন্তরিক চিন্তা ও বিচার সমূহেও ইহার বিষ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যতদিন আমাদের বিচার, ভাবনা ও আদর্শসমুহ স্বাদেশিকতার অমৃতবর্ষণে অভিষিক্ত না হইবে, ততদিন ভারতীয় রাষ্ট্র গঠনের আশা সুদূর-পরাহত। স্বাধীনতা হইতেছে পরাধীন ভারতের লক্ষ্য, কিন্তু যদি আমাদের নৈতিক অবনতি ঘটে, যদি আমরা যে সমস্ত দুর্ব্বলতার চাপে য়ুরোপ ও আমেরিকা গোঙাইতেছে সেই সমস্ত দুর্ব্বলতার আক্রমণ হইতে নিজেদেরকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদের সেই স্বাধীনতার কোনই সার্থকতা থাকিবে না। রোমক সাম্রাজ্যের সীমা একদিন প্রায় ভারতের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যে সমস্ত দেশের নিজস্ব রাষ্টিক সত্তা বিজয়ী রোমান্ লীজিয়নদের পদতলে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রোমান্ বিজয় বৈজয়ন্তীর উপর চিত্রিত ঈগল্ পাখীর পক্ষদ্বয় তাড়িত পবনের গতি যখন কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, সেই সময়কেই হয়ত ঐতিহাসিকগণ রোমের বিজয়ের চরম সীমা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক গিব্বনই ইহার প্রমাণ। বিজিত হইয়াও কিন্তু গ্রীকেরা রোমান্‌জাতিতে বর্ব্বর ও দস্যু বলিয়াই অভিহিত করিত। আর, প্রকৃতপক্ষে রোমান্‌সভ্যতার স্বরূপই বা কি? যদি আজ কোন জিজ্ঞাসু রোমান্ সাহিত্যে তাহার নিজস্ব কিছুর খোঁজ করে, তবে কি পাইবে? পাইবে শুধু সৈনিকনীতি—দস্যুনীতি—সংস্কৃতি ও সভ্যতার যুগে যাহার কোন প্রয়োজন হয় না। এবং সেই সমরনীতিই বা স্পার্টার সৈন্য বিশারদদিগের নিকট কতখানি মর্য্যাদা, শ্রদ্ধা বা সম্মান লাভ করিয়াছিল তাহা ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রই অবগত আছেন। রোমের বিদ্যা, জ্ঞান, সাহিত্য, গবেষণা, কলা, শিল্প, নীতি, সংস্কৃতি সমস্তই এথেন্সের মস্তিষ্কপ্রসূত। অবশ্য রোম-সাম্রাজ্যের পতনের সময় তাহার ভিতর

উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। গথ্ ও হুণ সম্রাট্ অট্টিলা যখন প্রলয়াগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া য়ুরোপ ভস্মসাৎ করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছিলেন, তখন রোমের সিনেটে কয়েকজন সিনেটার নিজেদের স্বাদেশিকতায় ভাষা ও শক্তি প্রদান করিতেছিলেন। যে সময় ধ্বংসকারীরা সেনেটের মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করিয়া কলা ও শিল্পের নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করিতেছিল, তখনও ঐ পাঁচজন সদস্য রোমের উদ্ধারের উপায় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। যখন আততায়ীরা দেখিল তাহাদের উন্মুক্ত রক্ত-রঞ্জিত তরবারীর দিকে একটী তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঐ সভ্যগণ পুনরায় নিজেদের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডলের সামান্য একটী স্নায়ু পর্য্যন্ত রহিল অকম্পিত, তখন তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সমগ্র মধ্য য়ুরোপ যাহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের অভ্যর্থনা করা দূরে থাক ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না; এত বড় স্পর্দ্ধা ইহাদের, ইহারা কাহারা? সভ্যতার শত্রুদিগের তরবারী সভ্যদের বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। কিন্তু প্রকৃত বিজয় হইল কাহাদের? ঐ আততায়ীদের না এই শহীদ্ সেনেটারগণের?

এই প্রকার বিজয়লাভ হইতেছে সংস্কৃতির, দৈহিক শক্তির নহে। প্রতীচীর সংস্কৃতির ভিত্তি আন্তরিক সত্য নয়, ভৌতিক শক্তির উপর ইহার অবস্থিতি। প্রতীচ্য সংস্কৃতির অনুকরণ অমৃতত্বের বিরোধী—মৃত্যুর সমর্থক। পাশ্চাত্যের উত্থানের পরিণতি পতন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছে প্রাচীগগন হইতে রবি উদয়ের সাথে সাথে। পাশ্চাত্যের প্রভুতা ও বিজ্ঞানকে প্রাচ্যের প্রকৃত জ্ঞানী তাই বলিয়াছেন মিথ্যা, অসার। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বেদধ্বনি উঠিয়াছিল—মা মা প্রাপৎ প্রতীচিকা। অনাদিকাল হইতে ভারতবর্ষ বিকাশ ও অবসান সম্বন্ধে সচেতন। এই ধ্বনি তখনকার যখন, লর্ড কার্জ্জনের ভাষায় "Britons wandered painted savages in the woods." প্রতীচীর শরণ গ্রহণ করা মানে মৃত্যুকে বরণ,—এবং ইহার দিকেই আমরা বর্ত্তমানে ভীষণ বেগে ধাবিত হইয়াছি। সর্ব্বনাশের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন মানুষ বিচার বিবেচনা বিসর্জ্জন দিয়া ধ্বংসের অভিমুখে ছুটিয়া চলে। প্রতীচীর অনুকরণ করিয়া আজ নিখিল বিশ্ব মরণকে বরণ করিতে চলিয়াছে—

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ গী—১১—২৯॥

"স্বান্তঃ সুখায়" প্রবৃত্তি তত অশুভ নহে, কিন্তু "স্বসুখায়" প্রবৃত্তির সামান্য মাত্রাও বিষতুল্য। "স্বসুখায়" হইতেছে ভোগবাদী পাশ্চাত্য মানবসমাজের আদর্শ। পশ্চিমের মানুষ **Mill**এর **greatest good for the greatest number** হিতবাদকে অসফল ও বিড়ম্বনা মাত্র মনে করে। আর যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে মিলের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ নহে, তবু ইহার

শ্রেষ্ঠত্বের দাবী স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যায় যখন ভারতীয় আদর্শ "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ও বুদ্ধের নির্ব্বাণের আদর্শের সহিত ইহার তুলনা করি। প্রতীচ্যের আন্তর্জ্জাতিক ও মানবতা-সম্বন্ধী সিদ্ধান্ত সমূহ (International and humanitarian principles) সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রীয়তার সংস্পর্শে ব্যর্থ হইয়াছে। ভারত চলিয়াছে বিশ্বব্যাপী প্রকৃতির অটল, অটুট্ নিয়মাবলীর অভিমুখে, সত্য ও তপঃ ও জ্ঞানের পথ দিয়া। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণই তাহার ধ্যেয়। রাষ্ট্রীয়তা তাহার নিকট অস্থায়ী এবং সীমাবদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ। যদি ভারতীয় সিদ্ধান্ত বা principleগুলি পৃথিবীতে প্রচার লাভ করিতে পারিত যদি স্বার্থপর রাষ্ট্র তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ না করিত, তাহা হইলে আজ অন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘের প্রয়োজন হইত না, এবং যদি প্রচারের সংগঠন ভারত হইতে করা হইত, তাহা হইলে আর কিছু না হউক্ জাতিসংঘের কাজ অত্যন্ত সরল হইয়া যাইত।

যাহা হউক্, এখন সর্ব্বথা মৌলিক এই ভারতবর্ষ নিজের যোগ্যতা প্রচার দ্বারা পৃথিবীকে কি পরিমাণে ঋণী করিয়াছে এবং ধর্ম্ম, বিভিন্ন শাস্ত্র ও সাহিত্য ভারতের নিকট পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঋণ কতখানি তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের মৌলিকতা লইয়া, উৎপাদনে নহে। কারণ উৎপাদন প্রকৃতির কার্য্য, দেশ ও জাতি তাহা করিতে পারে না। দেশ বা জাতি শুধু উহা প্রথমদর্শন করিয়া মৌলিক বলিয়া অভিহিত করে। সালোমন বলিয়াছেন, "Knowledge is but remembrance" এবং গ্রীক্ পণ্ডিত প্লেটোর কথানুসারে "মৌলিকতা বিস্মৃতির নামান্তর মাত্র" (Novelty is but oblivion) তাই দর্শনের জন্মভূমি এই ভারতের ছায়া কোন্ কোন্ দেশের উপর কি কি প্রকারে পড়িয়াছে তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

বস্ত্রশিল্প

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেরই ঐতিহাসিক প্রাচীনতার সীমা আছে, কিন্তু মিশর দেশের অতীত ঘনতমসাবৃত। মিশরের পিরামিডগুলি খৃষ্টের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। যদি আমরা স্বদেশের সুদূর অতীতের সাক্ষাৎলাভ করিতে চাই, তাহা হইলে অন্যদেশের ভিতরেও তাহার সন্ধান করিতে হইবে। ঐ পিরামিড্গুলির মধ্যে মিশরের ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট্ ও ধনকুবেরগণ অনন্ত নিদ্রায় শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সুরক্ষিত শব কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান্‌মুাজিয়মে ও লণ্ডনের বৃটীশ মুাজিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি আমরা এই মমিগুলির উপর একবার দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাইব এগুলিকে কালক্ষয়ের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নানারকম মসলা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহাদের পাবনতা সুরক্ষিত করিবার জন্য এক প্রকার শুভ্র, মসৃণ ও সূক্ষ্মবস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। এই বস্ত্র কি? পৃথিবীর খ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এই যে এই বস্ত্রগুলি ঢাকার মসলিন ব্যতীত অপর কিছু হওয়া অসম্ভব।

যদি আমরা কোন অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতের রচিত "Periplus of the Erythrean Sea" গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, ভারতবর্ষের সাথে মিশর, আরব এবং রোমের বাণিজ্য সম্বন্ধ কতখানি প্রগাঢ় ছিল। রোমের সম্রাট্ রাজ্য হইতে ভারতীয় মলমল দুরীকরণের জন্য সৌখীন বণিক এবং নাগরিকগণের উপর করস্থাপন করিতে বাধ্য হন। ভারতবর্ষের এই সুন্দর, সূক্ষ্ম ও চিক্কণ বস্ত্র মিশর এবং রোমের ধনিক ও বিলাসীগণের না হইলেই চলিত না। যখন ভারতে শিল্পের এই অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল, তখনকার সেই ভারত বর্ত্তমান ভারতকে ব্যঙ্গ ছাড়া আর কি করিতে পারে ?

ধর্ম্ম

যদিও য়ুরোপে এবং মধ্যএশিয়ায় সময়ে সময়ে বিবিধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার অধিবাসীগণ সর্ব্বদাই কোন না কোন ধর্ম্মের অনুগামী হইতেছিল তথাপি সর্ব্বপ্রথম যে ধর্ম্মের স্পষ্ট সঙ্ঘরূপ আমাদের চোখে পড়ে, তাহা হইতেছে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বাইবেল-নব-সিদ্ধান্তের অধ্যাত্মতত্ত্ব পাঠ করিয়া একথা জোর করিয়া বলা যায় যে ইহার উপর বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব পড়িয়াছে। খৃষ্টের শিক্ষার উপর গৌতমের শিক্ষা প্রণালী ও 'ভূতানুকম্পার' যে প্রভাব পড়িয়াছে সে বিষয়ে তত্ত্ববিদ্‌গণ সম্পূর্ণ অভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ কেহ এমনও বলেন যে খৃষ্ট ভারতে অবস্থান করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এবং খৃষ্টধর্ম্মের পণ্ডিতগণ ও খৃষ্টের জীবনীলেখক তাঁহার জীবনের অজ্ঞাত দ্বাদশবর্ষের কোন বিবরণ দিতে সমর্থ হন নাই, ইহাও আমরা জানি। যাহা হউক, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সমতা বর্ত্তমান। সঙ্ঘধর্ম্ম হইতেছে উভয়ের সর্ব্বপ্রধান স্বরূপ। জীবেদয়া ও অহিংসা উভয়েরই প্রাণস্বরূপ। অশোক তাঁহার চতুর্দ্দশ শিলালেখের মধ্যে লিখিয়াছেন কিরূপে তিনি মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপে প্রচারক প্রেরণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করাইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতের বাহিরে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, অনাম কাম্বোডিয়া, চীন, জাপান, চীনা-তুর্কীস্থান, সীরিয়া, মাসিডোনিয়া, সাইরিন্, এপিরস্ প্রভৃতি বাইশটী দেশে অশোক "ধর্ম্মবিজয়" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মধ্য এশিয়ার যে সমস্ত বর্ব্বর অধিবাসী শোণিত পাত ও লুণ্ঠনের নামে উন্মত্ত হইয়া উঠিত, তাহারা নিজেদের দুর্দ্ধর্ষ ও রক্তপিপাসু স্বভাব ও আচরণ পরিত্যাগ করিয়া এই অহিংসামূলক বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসকে পরিণত হয় এবং তাহারা এই সত্যের স্মারকচিহ্নস্বরূপ ভারতীয় বৌদ্ধকলার যে সব চিহ্ন মধ্যএশিয়ায় রাখিয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত কলা নিদর্শনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিত স্যর অরেল ষ্টেন্ যে বিবৃতি রচনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! মধ্যএশিয়ায় বিস্তৃত ভারতীয় কলার এই সমস্ত সুন্দর চিত্রণ ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণের নিদর্শন দিল্লীর মধ্যএশিয়া ম্যুজিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবল পরাক্রম হুণেরা—যস্য সমাগতস্য সমরে দোর্ভ্যাং ধরা কম্পতে—সূর্য্য এবং শিবের উপাসকে পরিণত হয়। পশ্চিম এশিয়া হইতে সমাগত শক্ ও কুশানজাতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং অবশেষে কনিষ্ক ও

অশোকের মত বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটী প্রকাণ্ড স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠেন এবং মধ্যএশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ধরিতে গেলে তাঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। যখনই রোমান্ ও গ্রীক নরপতিগণ ভারতের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তখনই তাঁহারা ভারতীয় রাজধর্ম্ম; কখনও বৌদ্ধ কখনও শৈব, কখনও বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সীমাপ্রান্তের ব্যাক্ট্রিয়ন নৃপতিগণের মুদ্রাসমূহের উপর ত্রিশূল হস্তে শিবের ও নন্দীর অথবা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক্‌রাজদূত পরমবৈষ্ণব প্রথিতযশা হেলিওডোরস্ বিদিশায় বিষ্ণুদেবের উদ্দেশে একটী স্তম্ভ স্থাপন করাইয়া তাহার উপর বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। আমাদের বিশ্বাস রোমান লিজিয়ানদিগের পতাকার উপর ঈগল পাখীর আকৃতি ভারতের গরুড়েরই প্রতিমূর্ত্তি। ভারতের সীমা প্রান্তের গ্রীকনরপতি মিনাণ্ডার, পুষ্যমিত্রের হস্তে যাঁহার পরাজয় ঘটে, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার স্থান চিরস্থায়ী। তাহারই প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসার ফলে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থ "মিলিন্দপঞ্‌হ" রচিত হয়।

ভারতের নাম বিদেশে এতখানি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীদের কল্পনা ছিল বিচিত্র। সুদূর দেশদেশান্তেও ভারতীয় ঐশ্বর্য্য ও শীলের চর্চ্চা হইত। এই অবসরে অনেক গাল্পিকেরা গল্প করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে তিনি ভারতবর্ষে একটা সিংহের দুইটী লেজ দেখিয়াছেন। তাঁহারই বংশধরেরা যদি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা বর্ণনা য়ুরোপে প্রচার করে, তাহা হইলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রে ভারতের নিকট অন্যান্য সভ্যদেশের ঋণ অপরিমেয়। গ্রহণের রহস্য ভারতের গণিতজ্ঞগণই সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে পারেন। গ্রহণের বিষয় আজকাল জলের মত সরল হইয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রথম প্রথম যখন ভারতীয়

জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্র

জ্যোতির্বিশারদগণ ঘোষণা করিতেন যে অমুক মাসে অমুক দিন অমুক সময় সূর্য্য অথবা চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তখন বিদেশীয়গণ তাঁহাদিগকে যাদুকর অথবা দেবতা ব্যতীত অন্য কি বলিয়া ভাবিতে পারিত? বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিন্তু ইহা আজ গণিতের একটা সাধারণ বিষয় মাত্র। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট এবং ভাস্করাচার্য্য গণিত সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক কিছু আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, ইহা আর্য্যভট্ট তখন ঘোষণা করেন যখন গ্যালিলিও পৃথিবীর মুখ দর্শনই করেন নাই। পৃথিবীর পরিধির যে পরিমাপ আর্য্যভট্ট করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আরবীয়গণ অঙ্কগণিত ও বীজগণিত ভারত হইতে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষালাভ করিয়া ইউরোপকে শিক্ষা দেয়। আরবীয়গণ অঙ্ক গণিতকে "হিন্দসা" অর্থাৎ হিন্দুস্থান হইতে অধীত বিদ্যা বলিয়া অভিহিত করে। বীজগণিত তাহাদের নিকট এত কঠিন বলিয়া মনে হইত যে

তাহারা ইহাকে অ-অল (বিদ্যা)—জবর (কঠিন) বলিয়া চীৎকার করিত। এইরূপে এই সমস্ত বিষয়ের আবিষ্কার ও প্রচারের গৌরব ভারতের প্রাপ্য। অন্যান্য দেশ ভারতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াই এ সমস্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

চিকিৎসাশাস্ত্র ও ওষধি-বিজ্ঞানের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসের অথরিটী ডক্টর জনস্টন্‌ও ইহা দৃঢ়ভাবে প্রচার করিয়াছেন। ভারতেই সর্ব্বপ্রথম ঔষধ ও চিকিৎসালয়ের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা হয়। তক্ষশীলার চিকিৎসালয় বিশ্ববিখ্যাত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে সেখানে রোগীর সমাগম হইত। বিশেষ করিয়া এখানকার নেত্র-চিকিৎসালয়ের খ্যাতির সীমা ছিল না। জাতকগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে চীনের এক রাজকুমার পৃথিবীর বহুস্থানে চিকিৎসার জন্য ভ্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি ভাল হইল না। অবশেষে তক্ষশিলায় (তক্ষশিলার অস্ত্রচিকিৎসার খ্যাতিও তখন দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে) আসিয়া পৌঁছিলেন ও তথায় অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্যে আরোগ্যলাভ করিলেন। এখানেই ধন্বন্তরি, জীবক ও চরক অধ্যাপনা করিয়াছেন। জীবক গৌতম বুদ্ধের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। মথুরা ম্যুজিয়মে সুরক্ষিত একটি শিলাখণ্ডে একটী কৌতুকপূর্ণ বিষয় উৎকীর্ণ আছে,—একটী কুশাসনে আসীন বানর চিকিৎসক অপর একটী বানর-রোগীর চোখ পরীক্ষা করিতেছে। অশোক শুধু ভারতেই নহে, য়ুরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশেও বহু পশু চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

এক্ষণে, অন্যান্য দেশের উপর ভারতীয় সাহিত্যের কতখানি প্রভাব পড়িয়াছে তাহাই আলোচনা করিব। সংস্কৃত সাহিত্যের কতকগুলি গ্রন্থের অনুবাদ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় বহু প্রাচীনকালেই হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের স্থান সর্ব্বপ্রথম। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইরাণের সম্রাট নৌশেরওয়াঁর মন্ত্রী বার্জুয়া পহ্লবী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়া, চীনা, আরবী, গ্রীক্, লাটিন, ইটালিয়ন্, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মন, ডচ্, স্প্যানিশ্, ইংলিশ প্রভৃতি আরও অনেক ভাষায় পঞ্চতন্ত্র অনূদিত হইয়াছে। যতগুলি ভাষায় এই পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে, এক বাইবেল ছাড়া অন্য ভাষার অন্য কোনও গ্রন্থ হয়ত এত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় নাই। বালকগণের নীতিশিক্ষার জন্য ভারতীয় নীতিকারগণের কল্পনাপ্রসূত এই সমস্ত গল্প ও কথিকা ভারতের মৌলিকতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই। কথা ও কাহিনী রচনার কল্পনা ভারতীয়ের মস্তিষ্কেই সর্ব্বপ্রথম জন্মলাভ করে। গৌতম বুদ্ধ-সংকলিত জাতক কাহিনীগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা। ফারসী ও আরবী কথাসাহিত্যের উপর ভারতীয় কথাসাহিত্যের প্রভাব সুপরিস্ফুট। আরব রজনীর গল্পসমূহের রচনাপ্রণালী ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চৈনিক বিশ্বকোষদ্বয়ের মধ্যে একটীর রচনা কাল ৭২৫ সংবৎ; এই বিশ্বকোষে অনেক ভারতীয় গল্পের উল্লেখ আছে ও তৎসঙ্গে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে সে সমস্ত কাহিনী ২০২টী ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে চয়ন করা হইয়াছে। সীরিয়ার অনুবাদে পঞ্চতন্ত্রের নাম "কলিলগ-দমনগ" এবং আরবী অনুবাদে "কলীলা-দমনা" রাখা হইয়াছে। মিত্রলাভ-মিত্রভেদ গল্পটীর করটক দমনক শৃগাল দুইটীর জন্য এইরূপ নামাকরণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ

ভাষা ও সাহিত্য।

সত্য না মিথ্যা

শ্রীমানকুমারী সান্যাল

দুই

পরের দিন। বেলা আন্দাজ ১১টা বাজিতেই অশ্রুদের বাড়ীর দুয়ারে সুদৃশ্য একখানি 'মুণ' কার থামিতেই, অশ্রু জান্‌লা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াই দুয়ার খুলিয়া দিল। ষ্টিয়ারিং হুইলের উপর দুখানি হাত রাখিয়া কুন্তী ব্যগ্র চোখে সেই দিকেই চাহিয়া আছে দরজা খুলিবা মাত্র, সোফার পিছন দিক হইতে নামিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া ধরিল। কুন্তী একরকম ছিট্‌কাইয়াই নামিয়া পড়িল এবং দুয়ারের উপর দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া বলিল—"বাহাদুর, তুমি গাড়ী নিয়ে চলে যাও। বিকেলে তোমার সুবিধা হবে না, খোকাদের বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। দাদাকে বলে দিও সে যেন বেড়িয়ে ফিরবার সময় আমায় তুলে নিয়ে যায়।"

'জী, আচ্ছা!' বলিয়া বাহাদুর গাড়ী লইয়া ফিরিয়া গেল।

সুদীর্ঘ দুই বৎসর পরে দুই সখীর দেখা! কুন্তী অশ্রুর হাত ধরিয়া বলিল,—'তুই আগের চেয়ে অনেকটা রোগা হোয়ে গেছিস!' অশ্রু হাসিয়া বলিল, 'তুই ঠিক তেমনিটিই আছিস।'

'নাঃ—তোমার মত আঠার বছর বয়সে বুড়িয়ে যাবো। নে, ভেতরে চল্, বাপ্‌রে কী গরম পড়েছে, ভাই?'

ভিতরে বারান্দায় মাদুর মাতিয়া, অশ্রু পাখাখানা নাড়িতেই কুন্তী ধম্‌কাইয়া উঠিল—'তুই এবার ঠিক আমার কাছে মার খাবি, সু।' একটু পরে উঠিয়া সরমার কাছে গিয়া, তাহার পায়ে হাত দিয়া বলিল—'আজকাল কেমন আছেন বৌদি?' বলিয়া পাশের চৌকীটায় বসিল। সরমা অল্প হাসিয়া বলিল, 'বিশেষ ভাল আর বল্‌তে পারলুম কই ভাই?' 'বাঃ, তাবলে অমন শুক্‌নো মুখে কেন বল্‌ছেন? দিন কতকের মধ্যে নিশ্চয় সেরে যাবেন, তখন সবাই মিলে একসঙ্গে পুরী যাওয়া যাবে, কি বলেন?'

কুন্তী একটা জীবন্ত প্রাণের ঝড়! নিজেও দোলে, আশ পাশকেও দোলাইয়া তোলে।

অশ্রু চাহিয়া চাহিয়া দেখে তাহাকে। সেও ঠিক এম্‌নিই ছিল। দুরন্ত, অস্থির। একটু হাসিয়া বলিল—'নতুন কলেজ কেমন করছিস রে?'

কুন্তী হাত নাড়িয়া বলিল,—'আরে, দুর দুর কিছুই ভালো লাগে না। এক লেক্‌চার আর লেক্‌চার। 'স্কুল লাইফ' এর থেকে ঢের ভাল। আমাদের দলের মেয়েগুলোর মধ্যে পাঁচ্‌টা তো বিয়ে করে পাত্‌তাড়ী গুটিয়েছে। ছ'টা ফেল, তুই আর এক পথে। আমি, রেবা

আর মায়া পড়ে আছি। সেকেণ্ড ইয়ার হোল। আই এ টা পাশ করে দাদার সঙ্গে লম্বা পাড়ি দেব, বিলেতে। হোয়ে আসবো মিস কুন্তী মিত্র বি, অক্সফোর্ড! সে কী সুন্দর হবে ভাবতো একবার ?'

কুন্তী একাই সহস্র রকম বকিয়া চলে—অশ্রু বলিয়া উঠিবার সময় পায় না।

যতীকে লইয়া খানিক খেলা করিয়া কুন্তী ছাদে আসিয়া বিমলার সহিতও ভাব করিয়া ফেলিল। গল্পান্তে নামিবার সময় সিল্কের শাড়ীর আঁচলের তলা হইতে একখানা ছবি বাহির করিয়া বলিল,—"একে চিন্তে পারিস্ সু ?" অশ্রু নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"পরিমলদা না ?" "হুঁ" বলিয়া ছবিখানা পুনরায় কাড়িয়া লইয়া কুন্তী বুকে পুরিল। অশ্রু তাহার চুলে হাত রাখিয়া বলিল, "কবে নেমন্তন্ন-কার্ড পাচ্ছি ?" কুন্তী তাহার ঘাড়ে চিম্টী কাটিয়া আরক্ত মুখে বলিল—"দূর, এখন কী ? আগে বিলেতটা ঘুরে আসি, দাঁড়া ?"

সারাদিনটা যেন হাওয়ায় ভাসিয়া গেল। কুন্তী ছাড়ে নাই অশ্রুর সেদিনের মধ্যাহ্নের আহার কল্যকার শীতলের অভুক্ত বাসিরুটীতে ভাগ বসাইয়াছে। অশ্রু কী আর সামনে খাইতে বসিয়াছিল ? কুন্তী নিজে রান্নাঘরে ঢুকিয়া, বাহির করিরাছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু' একটা গান, খালি গলায় গাহিয়া ও জোর করিয়া অশ্রুর গান শুনিয়া, কুন্তী তাহার অগোছাল হইয়া-পড়া বেশবাস সংযত করিয়া লইল।

দুয়ারে হর্ণ বাজিতেই কুন্তী বলিল—"ওইরে, এসেছে। যাই ভাই আজ, দাঁড়াতে হোলে আবার বক্‌বে। যা ছেলে।"

অশ্রু সহসা বলিয়া ফেলিল,—"অমলদা, তো ?" "হ্যাঁগো! আমার আবার কটা দাদা আছে ? আয়না—অচেনা তো নয় ?" বলিয়া কুন্তী সরমার নিকট বিদায় লইতে গেল বটে কিন্তু সে তখন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। ম্লানমুখে বাহিরে আসিয়া, উর্দ্ধনেত্রা অশ্রুকে বলিল, "তোর প্রশংসা না করে থাকতে পারছিনে. সু! কিরকম ভাবে তুই জীবনের সব কিছুকেই হাসি-মুখে বরণ করে নিয়েছিস! আমি হোলে পাগল হোয়ে যেতাম।" দৃষ্টি নামাইয়া অশ্রু হাসিয়া বলিল, "এমনিতেই বা বাকী কী আছে ?" বলিয়া সে কুন্তীর হাত ধরিয়া বাহিরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। বাহিরের ঘরের অব্যবহার্য্য টেবিলটার উপর অশ্রু হ্যারিকেন্‌টা নামাইয়া রাখিল। দোর খুলিতেই অমল ধম্‌কাইয়া উঠিল—"এই কুন্তী শীগগীর আয়না,—কতক্ষণ দাঁড়াবো ?"

কুন্তী বলিল—"দাদা. নেমে এসোনা ? অশ্রু এসেছে"

"অশ্রু ?" বলিয়া অমল নামিয়া আসিল এবং অপ্রস্তুত ভাবে বাহিরের ঘরে একপা ও নীচের ধাপে এ পা রাখিয়া বলিল—"আমি জানতাম না তো কে ? বাহাদুর ঠিকানাটা বলে চলে গেল। আর এ বাড়ীটা তো কখন দেখিনি কিনা!" বলিয়া সে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল,—"অনেক দিন পরে দেখা—আগে তবু দেখা পাওয়া যেত, এখন আর যাওয়া টাওয়াও ছেড়ে

দেওয়া হোয়েছে।" তিন বৎসর আগে, অবাধে অশ্রুর সহিত অমল মিশিয়াছে, বোনের মত হাসি গল্পও করিয়াছে, দুজনকে "জোড় পায়রা" বলিয়া ক্ষেপাইয়াছে। কিন্তু আজ অদূরবর্ত্তিনী, নতনয়না ওই মেয়েটীর দিকে চাহিয়া সে বিস্মিত হইল। এই সেই সদাহাস্যময়ী চপলা অশ্রু? কোথায় যেন একটা বাধা আসিয়া দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। অশ্রুর ভাব দেখিয়া কুন্তী হাসিয়া বলিল, "মেয়ের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছেনা! না? তুই-ই তো বললি—অমলদা এসেছেন? তাই তো তোকে দেখা করাতে ডাকলাম।' এইবার মুখ তুলিয়া অশ্রু একটু হাসিয়া বলিল, 'ভাল আছেন তো?' অশ্রুর মুখের দিকে চাহিয়া অমল কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, 'হ্যাঁ, তুমি?'

'আমিও ভাল আছি।' সহসা কুন্তী বলিল—'এই স্রু! এক কাজ করনা? দাদা তো ডাক্তার হোয়েছে, বৌদিকে দেখুন না? দেখি কেমন ওর বিদ্যে? কাল বিকেলে এসে একবার দেখে যাবে অখন—কেমন?' অশ্রু ব্যাকুলভাবে কী একটা বলিতে গেল—কিন্তু কুন্তী তাহা অন্যরকম বুঝিয়া বলিল, 'না--না, তোর কোন কথা শুনবো না। দাদা তো বাইরে ঘোরে সারা বিকেল, একবার এসে দেখে যাবে এখন—বলিয়া সে আর অপেক্ষা না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া গেল এবং চেঁচাইয়া বলিল—'দাদাকে বলে রাখিস বেড়িয়ে এলে'। অমল নবীন ডাক্তার—তাহার উপর পুরানো স্নেহ! সহজেই সে রাজী হইয়া বলিল, 'ঠিক আসবো কাল—'বলিয়া নামিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া কুন্তীর পাশে বসিল। কুন্তী বলিল, 'আচ্ছা! আজ গুড্‌নাইট?' অমল বাধা দিয়া বলিল, 'ধেৎ গুড্‌ইভনিং বল্‌। সবে সাতটা' বলিয়া অশ্রুর দিকে চাহিয়া বলিল—'আচ্ছা, কাল আসছি তাহলে।' বলিয়া মুখ ফিরাইতেই, কুন্তী হাওয়ার বেগে গাড়ীখানাকে যেন উড়াইয়া লইয়া গেল।

অশ্রু নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুয়ার বন্ধ করিল। সরমার জ্বরটা ইতিমধ্যে কমিয়াছিল, অশ্রুকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'ওদের কথা শুনলুম। যত বড়লোকই হোক অন্তরটা বেশ সরলই আছে দু' ভাই বোনের।'

অশ্রু তখন কর কপোল-সংলগ্ন হইয়া ভাবিতেছিল অমলের ডাক্তারী করিতে আসাটা শীতল কেমন ভাবে লইবে কে জানে?

তিন্‌

শীতলকে সব বলিতেই হইল। বেড়াইয়া ফিরিয়া শীতলের মেজাজটা কিঞ্চিৎ শীতলই ছিল, তাই বেশী কিছু আর বলিল না। শুধু সরমার আড়ালে, অশ্রুকে বলিল—'ডাক্তার, দেখাই সার! প্রেসক্রুপশন অনুযায়ী চলা আমার পক্ষে অসম্ভব, তা মনে রাখিস।'

বিকালে অমল গাড়ী হাঁকাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ আর দেশী ধুতী, সিল্কের পাঞ্জাবী নয়, পুরাদস্তুর ডাক্তার সাহেব সাজিয়া আসিয়াছে! শীতল তখনও আফিস হইতে ফিরে নাই—অশ্রুই অমলকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া শীতলের ঘরে বসাইল শীতল ফিরিলে, অমল সযত্নে সরমাকে পরীক্ষা করিল। এবং তাহার পর, তাহার মুখের ম্লান ছায়াটাকে লক্ষ্য করিয়া অশ্রু

নীরবে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। শীতলের সহিত ঔষধ পথ্যাদির বিষয় দুচার কথা কহিয়া, অশ্রু প্রদত্ত এক পেয়ালা চা পান করিয়া অমল সেদিনকার মত বিদায় লইল। এরপর হইতে সে প্রায় প্রত্যহ, সকালে, দুপুরে এবং বিকালে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

যথাসাধ্য ঔষধ-পথ্যাদিও সংসার খরচের টাকা হইতে অশ্রুর একান্ত অনুরোধে, শীতল কিনিয়াছে কিন্তু আর কোনও ঔষধই সরমাকে আটকাইতে পারিল না। দিন পনেরো পরে, একদিন গোপনে, অশ্রুকে অমল বলিল, 'তুমি শক্তি সংগ্রহ করো অশ্রু, বৌদিকে আর ধরে রাখা গেলনা।' ইহার দিন তিনেক পরে, একদিন সন্ধ্যাবেলা সরমা কেমন যেন করিতে লাগিল। বিশেষ কী একটা কাজে আটকা পড়ায়, অমল সেদিন আসিতে পারে নাই। বিমলা ঝি পাঠাইয়া, যতীকে নিজের কাছে লইয়া গিয়াছে।

অশ্রু সরমার মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া, সজোরে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "বৌদি! বৌদি! অমন কোরছো কেন?" সরমা বিভ্রান্ত ভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, "যতী কই? যতী কই ঠাকুর ঝি? একবার আনো না—আমি একবার দেখবো!" অশ্রু ডাকিল—"দাদা, চট্ করে একবার এসো—"

শীতল শুইয়াছিল। অশ্রুর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া দ্রুতপদে সরমার শিয়রে আসিল। এবং তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া বলিল, "সরমা? অমন করছো কেন? এই যে আমি। রমা! রমা!"

সরমা শীতলের হাতখানা প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কী বলিতে গেল পারিল না। শুধু দু' চোখ বাহিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। তারপর সরমা শীতলের পানে চাহিয়া চাহিয়া যেন ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল। শীতল দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া তিন বৎসরের অবহেলিতা, অভিমানিনী পত্নীর বক্ষের পানে লুটাইয়া পড়িল! অশ্রু, অশ্রুশূন্য, তীব্র দৃষ্টিতে শীতলের দিকে চাহিয়া রহিল।

চার

অমল তবু আসে। চা খাইবার আবদার করে, না দিলে নিজে করিতে ছোটে। অশ্রুর অন্তরের মর্ম্মঘাতী শোকের জ্বালা তবু কতকটা জুড়াইয়া আসে।

সরমার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বিমলা নিজে আসিয়া যতীকে দিয়া গিয়াছে এবং শ্রাদ্ধের দিন সে ও কুন্তী সমস্ত করিয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধ একরকম নম-নম করিয়া সারা হইয়া গিয়াছে। বিমলা সম্প্রতি পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে।

দুপুর বেলা অমলের গাড়ীর আওয়াজে দরজা খুলিয়া অশ্রু বলিল, "আচ্ছা! দাদা যখন না থাকেন, বেছে বেছে তখন আপনি কেন আসেন, বলুন ত?"

অমল ভিতরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, 'দাদাকে যে আমার কিরকম ভয় করে জানোনা ত? আর তুমি দুপুরে একলা থাকো, তাই একটু গল্পের লোভে আসি।'

হাসিয়া অশ্রু বলিল, 'বেশ করেন। কিন্তু আর আস্‌বেন না, প্রয়োজন তো ফুরিয়েই গেছে, অমলদা,—তাহলে আর এ কষ্ট করবার কী দরকার ?

দরকার যে কী, তাহা মুখে আর কেমন করিয়া বলা যায় ? অভিমান করিয়া অমল বলে—'বেশ। আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ তো ?'

'নাঃ আপনি বড় ছেলেমানুষ, তাড়িয়ে দিতে গেলাম কেন ? কিন্তু লোকে কী ভাব্‌বে বলুন তো ?'

গম্ভীরভাবে অমল বলিল, "লোকে উচিৎ কথাই ভাব্‌বে যে, দারিদ্র্যের ছায়ায় ঢাকা একটী রত্ন আছে, চালাক ছেলেটী সেটা নিতে চায়।"

আরক্তিম মুখে অশ্রু বলিল, "কী যে আপনি বলেন! কবি হোয়েছেন কবে থেকে! ডাক্তারদের সঙ্গে কবিদের তো বিষম মনান্তরই জানি ?"

—"তাই তো আমার ডাক্তারী মনের সঙ্গে, কবি-হৃদয়ের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে।"

অশ্রু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "মন আর হৃদয় বুঝি, আপনার বিচারে আলাদা হোল ?"

"আলাদাই তো—ও দুটো এক জিনিষ বল্‌লে লোকে হাস্‌বে। কখনো বোল না।"

"তা হাসুক লোকে। আপনি একা কেন আসেন ? কুন্তী বুঝি কলেজ যায় ?"

অমল বলিল—"হ্যাঁ আমি কী বলি তাকে কোথায় যাচ্ছি—তাহলে জ্বালিয়ে খাবে।"

এম্‌নি করিয়াই দুটী তরুণ-হৃদয়, নিজেদের অগোচরে পরস্পরের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

দুই দিন পরে।

অমল চা খাইতে খাইতে বলিল, "অশ্রু, প্রপোজ কর্‌তে আমি জানি নে।"

অশ্রু রান্নাঘরের আড়ালে নিজেকে লুকাইয়া বলিল, "তার মানে"

অমল আর অশ্রুর শাসন কিছুতেই মানিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া তাহার নরম হাতখানি ধরিয়া বলিল, "দাদাকে বলি ?"

আরক্তমুখে অশ্রু বলিল, "আমি কী জানি ?"

"বাঃ, তুমি জানো না ত কে জানে ? শুধু তুমি বল, তোমার কোনও অমত হবে না এতে ?

"না—না" বলিয়া অশ্রু, সরমার মৃত্যুর পর এই প্রথম—সরমার জন্যই কাঁদিয়া ফেলিল। অমল নীরবে তাহার ঘন-বিন্যস্ত চুলের উপর হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিল।

যাইবার সময় অমল বলিল, "কাল কিম্বা আজ সন্ধ্যাবেলাই দাদার কাছে আস্‌বো।"

"আমি তার কী জানি ?" বলিয়া অশ্রু দুয়ার রুদ্ধ করিল।

সেইদিন, অফিস প্রত্যাগত শীতল, বাড়ী ঢুকিয়াই উত্তেজিত ভাবে অশ্রুকে বলিল, "অমল নাকি প্রায়ই দুপুরে এখানে আসে ?"

লজ্জায় সে যে বলিতে গিয়াও বার বার ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহা অশ্রু বলিতে পারিল না।

শীতল উগ্রকণ্ঠে বলিল, "তার মতলব কী?"

অশ্রু, ভাইকে বাঁকা-পথ ধরিতে দেখিয়া বলিল, "সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করে নিও।"

"সে উপদেশ না দিলেও চল্‌বে। আমি যে উত্তর চাচ্ছি তার কী জবাব?"

দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া অশ্রু বলিল, "জবাব এই যে, সে আমায় বিয়ে করবে।"

শীতল নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া গেল—অশ্রু দেওয়ালে ঠেস দিয়া দালানে বসিল। যতী অদূরে বসিয়া খেলা করিতেছিল।

ঘর হইতে শীতল বলিল, "এতে অমলের কোন অপরাধ নেই একরকম—কিন্তু জেনে শুনে তাকে প্রশ্রয় দিলি কেন? তোর মন জেনে তবে তো সে এগিয়েছে?"

অশ্রু জবাব দিল, "তাতে দোষটা হোয়েছে কী শুনি?"

শীতল এবার মরীয়া কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুই জানিস যে, তুই বিধবা!"

এবার জবাব আসিতে বিলম্ব হইল বটে কিন্তু সমান মরীয়া কণ্ঠে, সতেজে অশ্রু জবাব দিল, "হ্যাঁ জানি। পাঁচ বছরে ঠাকুর্দ্দা বিয়ে দিস্‌লেন—ছ' বছরে বিধবা হোয়েছি। আর এও জানি যে 'আমি বিধবা' এই কথাটা যে আমাকে দশ বছর বয়সে শুনিয়েছিল, তাকে তুমি বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলে। সেদিন ঝি-মা পায়ে ধরেও ক্ষমা পায় নি। আরও জানি যে, বাবার পায়ে ধরে আমায় স্কুলে ভর্ত্তি করে, বাবার পদবীই দিয়েছিলে, নিজে মাছ ছেড়ে, আমায় মাছ খাওয়া ধরিয়েছিলে, শাড়ী পরিয়েছিলে, আর—আর—বিয়ে কত্তে যাবার আগে নিজের গা ছুঁইয়ে দিব্বি করিয়েছিলে, যাতে একথা বৌদিকে না বলি।" অশ্রুর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল। মিনিট দুয়েক সব নীরব। পরে শীতল আবার বলিল, "সব মান্‌ছি, কিন্তু তখন পয়সা ছিল, তাই সবের জোরও ছিল। সে অবস্থা থাকলে বিয়ে দিতেও পেছোতাম না। তা বলে তখন আর এখন সমান? এখন কিছু করতে গেলে জ্ঞাতি-গুষ্টী পেছনে লেগে সব শান্তি ঘুচিয়ে দেবে। তারপর আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি, তা'বলে তোর কর্ত্তব্য তুই করবি না?"

অশ্রু মর্ম্মভেদী স্বরে বলিল—"হ্যাঁ, আমারই অকর্ত্তব্য হোয়েছে—সব দিকে কুমারীর মত থেকেও, আমার মনে রাখা উচিৎ ছিল—আমি বিধবা!"

শীতলের আজ কাণ্ড-জ্ঞান বলিয়া কিছুই আর অবশিষ্ট নাই বোধ হয়। আবার সে তাই বলিল—"আর যাই করনা কেন—বিয়ের আশা করা তোমার উচিৎ ছিল না।" অশ্রু বিদ্যুৎবেগে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কোরবো—কোরবো আমি, তুমি কী কর্‌তে পারো!"

শীতল এবার অশ্রুর পাগলের মত চোখ দেখিয়া জ্ঞান ফিরাইয়া পাইল। অশ্রু টলিতে টলিতে বারান্দায় আসিয়া ঝুপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। চেঁচামেচিতে যতী ভয় পাইয়া তাহার কাছে আসিতেই, নির্জ্জীব কণ্ঠে অশ্রু বলিল,—"আমার কাছে আর এসোনা যতী, তোমার বাবার কাছে

যাও বলিয়া লুটাইয়া সেইখানেই ভাঙিয়া পড়িল। যতী ভয়ে ভয়ে শীতলের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। কোমলকণ্ঠে, ভীতভাবে যতী ডাকিল—"বাবা ?" শীতল নিঃশব্দে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। পিতার অশ্রুজলে, পুত্রের ক্ষুদ্র দেহ ভিজিয়া উঠিল।

দালানের পাশের দোর হইতে অমল নিঃশব্দে রাস্তায় নামিয়া গেল।

পরের দিন, বেলা তখন দশটা। কড়া নাড়ার আওয়াজে, অশ্রু দরজা খুলিয়া দিতেই অমল ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল সে অশ্রুর দিকে চাহিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছিল, কোন রকমে দেওয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইল। সারা রাত্রির জাগরণ ক্লান্ত, ব্যগ্র-উৎসুক চোখ দুটী পাতিয়া অমল অব্যক্তস্বরে বলিল, "যা বল্‌তে এসেছিলাম, তার আর প্রয়োজন নেই!"

অশ্রুর পরণের ধব্‌ধপে মোটা থানখানি, তাহার তনুটীকে সস্নেহে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নিরাভরণ হাত দুখানি দিয়া সে যতীকে বুকের কাছে ধরিয়া আছে। ছোট করিয়া কাটা অলক রাজীর উপর ঈষৎ কাপড় তোলা। আজ সে দেবীর আসনে উঠিয়া বসিয়াছে।

অমল তবু বলিল—"নিজের ওপর এমন মর্ম্মান্তিক শোধ নিলে অশ্রু ? আমি কী তোমার কেউ নই যে অমন করে বল্‌লে, তাকে তুমি মাপ করলে ?"

নতনেত্রে অশ্রু শুধু বলিল—"সে আমার দাদা!" "আর আমি ? আমি তোমার কেউ নই ? একজনের ওপর দিয়ে সবাইকে বিচার করলে ?" বলিতে বলিতে অমল স্খলিত পদে বাহির হইয়া গেল। অশ্রু নীরবে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

* * * * *

পরদিন, সারারাত্রির জাগরণ-ক্লান্ত শরীর ও দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাও মন লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া অশ্রু দেখিল, শীতল মাঝের দরজাটার কাছে দাড়াইয়া একখানা খবরের কাগজ হাতে লইয়া পড়িতেছে! তাহার পাশে কাঁধের কাছে পাড়ার একটী যুবকও দাঁড়াইয়া কী পড়িতেছে।

সে বলিল—"আপনাদের সেই অমল বাবুতো ?" কথাটা অশ্রুর কাণে গেল। অশ্রুকে দেখিয়া যুবকটী সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল।

অশ্রু ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া ডাকিল—"দাদা!" তাহার স্বরটা ঈষৎ অস্বাভাবিক ভাবে বাহির হইয়া গেল।

অশ্রুকে দেখিয়া শীতল চমকাইয়া উঠিল। হাত হইতে কাগজ খানা পড়িয়া গেল। অশ্রু নত হইয়া কুড়াইয়া, শীতলের হাতে দিতে যাইবে—শীতল, অস্বাভাবিক সুরে "থাক্‌" বলিয়া নিজে কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া, পৃষ্ঠাটা চাপা দিল। অশ্রু বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা সন্দেহ মনে জাগিল। কাগজখানার দিকে চাহিতেই দেখিল, শীতল পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া দিয়াছে কিন্তু সে পৃষ্ঠাটী পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। বড় বড় হরপ কটা সহজেই তাহার চোখে পড়িল—

আত্মহত্যা !

ডাক্তার অমল মিত্র গতরাত্রে আত্মহত্যা করিয়াছেন। করোণারের তদন্ত চলিতেছে।

অশ্রুর মিথ্যা বিধবার সাজ, কঠোর সত্য হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ধরিল।

শীতল কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া কাঁধে হাত রাখিল।

"দাদা—" বলিয়া, নাড়া পাইয়া অশ্রু দুইহাতে বাতাস আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, শীতলের পায়ের কাছে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল !

গান

শ্রীমমতা মিত্র

পাঠালে কোন্ সুদূর হ'তে
আজি আমার দ্বারে
তরুণ তোমার প্রাণের ভীরু
লাজুক বাসনারে।
থাকি আঁখির অন্তরালে
অন্তরেতে দীপ কে জ্বালে ?
ভকতি-ফুল কে গো আমায়
দিলে অঝোর ধারে ?

চাঁপার গন্ধে মাতাল দিনে
হঠাৎ পাওয়া নিধি
তুমি আমার ভাইটি চাঁপা,—
আমি পারুল দিদি।
মধুর তোমার আবেদনে
ঘনায় হরষ আমার মনে,
উছল স্নেহে তোমারে ভাই
ডাক্‌ছি বারে বারে।

নারী

শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু

শৈশবের ধাত্রী, যৌবনের সঙ্গী ও বর্দ্ধক্যের সান্ত্বনাদায়িনী রূপেই আমরা নারীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। দেশে দেশে এবং যুগে যুগে নারীর উদ্দেশ্যে বহু স্তুতিবাদ রচিত হইলেও এই বাক্য কয়টিতেই যে নারীত্বের প্রকৃতি স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নারী স্বভাবতঃ কি শরীরে, কি মনে, দুর্ব্বল। শারীরিক কিংবা মানসিক শক্তি নারীর পক্ষে স্বাভাবিক নহে সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা নারীর বিচার করিলে ভুল করা হইবে। দুঃখ ভোগই তাহার ধর্ম্ম; প্রসব বেদনা, সন্তান পালন, স্বামীর মনোরঞ্জন ও বশ্যতা স্বীকারেই নারী জীবনের সার্থকতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতাই সার্থকতার মাপকাঠি। সুখদুঃখের গভীরতম অনুভূতি স্ত্রীসুলভ নহে সাধারণ, শান্তিপূর্ণ ও নিরুদ্বেগ জীবন নারীর উপযুক্ত, ইহাই তাহার কাম্য।

স্ত্রীচরিত্রের বালসুলভ চাপল্য ও অদূরদর্শিতার জন্য স্ত্রীজাতি আমাদের শৈশবের পালয়িত্রী ও শিক্ষয়িত্রী হইবার সত্যই উপযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির বাল্য চিরজীবনস্থায়ী, নারীকে শিশু ও প্রকৃত পুরুষের মধ্যবর্ত্তী এক জীব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শিশুর সহিত নাচিয়া, গাহিয়া খেলিয়া তাহার সাথী হইয়া দিনের পর দিন কাটান একমাত্র স্ত্রীলোকেই সম্ভব; কোন্ পুরুষ অল্পক্ষণের জন্যও আপনাকে এইরূপে হারাইয়া ফেলিতে পারিবে?

মেয়েদের সৌন্দর্য্যও এক হিসাবে অদ্ভুত। তাহার স্থায়িত্ব মাত্র জীবনের কয়েক বৎসর। মনে হয় এই অল্পকালের জন্য প্রকৃতি তাহার সমগ্র সৌন্দর্য্যসম্পদে রমণীকে অভিষিক্ত করে। কিন্তু এই রূপ শুধু পুরুষের মোহ সঞ্চার করিবার জন্য। মোহাবিষ্ট পুরুষ সহজ জ্ঞান হারাইয়া নারীর সারাজীবনের সকল ভারই গ্রহণ করে এবং মোহভঙ্গের পর দেখে, যে রূপকে সে স্বর্গীয় ভাবিয়াছিল তাহা ফাঁদ মাত্র, ভোগ করিবার বস্তু নহে। অন্যথা যুক্তি দ্বারা বিচার করিলে কে স্বেচ্ছায় এই দুর্ব্বিসহ ভার গ্রহণ করিবে? প্রকৃতির সকল জীবেরই আত্মরক্ষার কোন না কোন উপায় আছে, নারীর যৌবন তাহার সারাজীবনের সংস্থান জোগাইবার উপায়। তাই উদ্ভিন্নযৌবনা বালিকার প্রেমের অভিনয়ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। ইহা তাহার জয়ের পর্ব্ব, সুতরাং তৎকালে অন্য সকল কার্য্যই তাহার নিকট হীন হইয়া যায়। কোনরূপ

পুরুষের স্কন্ধে তাহার সারাজীবনের ভার চাপাইয়া দিতে পারিলেই নারীর রূপের প্রয়োজন শেষ হয়। সুতরাং মিলনের পরই যেমন স্ত্রী পিপীলিকার ডানা খসিয়া যায় তেমনই দু'একটী সন্তান জন্মের পর স্ত্রীলোকের রূপও আর থাকে না।

মহত্তর বস্তুর পরিণতি লাভে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। সেই জন্য সাধারণতঃ দেখা যায় পুরুষের ধারণাশক্তিও অন্যান্য মানসিক শক্তির পূর্ণবিকাশ হইতে আটাশ বৎসর লাগে কিন্তু নারী আঠার বৎসর বয়সেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। নারীর মানসিক শক্তি পুরুষের শক্তির তুলনায় অতি নগণ্য ও অগভীর। ইহাই নারীর চাপল্যের অন্যতম কারণ, তাহার অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞতার কারণও ইহাই। পুরুষ, পশুর ন্যায় কেবলমাত্র বর্ত্তমানেই সন্তুষ্ট নহে, পরন্তু ধারণাশক্তির বলে অতীত ও ভবিষ্যৎ তাহার আলোচ্য। তাই পুরুষ প্রাজ্ঞ, চিন্তাশীল ও গভীর। ধারণা শক্তির অভাব হেতু নারী বহু দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পায়। নারীর বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির কেবলমাত্র বাস্তবেই সীমাবদ্ধ সুতরাং যাহা দৃষ্টির বাহিরে, যাহা অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ তাহাই নারীর কল্পনার আয়ত্তাতীত। ইহাই হয়ত রমণীর অমিতব্যয়িতার ও অপরিণামদর্শিতার কারণ। নারী ভাবে উপার্জ্জনের দায়িত্ব পুরুষের, কিন্তু ব্যয়ের কর্ত্রী সে, নারীর উপর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার, সেই জন্যই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

নারীর প্রধান গুণ প্রফুল্লতা, বর্ত্তমানে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলিয়া সাধারণ জীবনও নারী পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারে। পরিশ্রান্ত ও চিন্তাগ্রস্থ পুরুষের অবসর বিনোদনের জন্য এই কারণেই নারী তাহার প্রধান অবলম্বন।

বহু সমস্যা সমাধানে নারীর পরামর্শ ফলপ্রদ; কারণ কোন সমস্যা উপস্থিত হইলেই পুরুষের স্বভাব তাহাকে দুরূহ করিয়া তোলা। কিন্তু নারী সহজ সমাধানের পথটী সহজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলে। নারীর সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তিই সমস্যা সমাধানের উপায়। অন্যপক্ষে পুরুষের উচ্চ ধারণাশক্তি সরল সমাধানের পথে প্রধান অন্তরায়। কল্পনাশক্তিহীনা বলিয়া নারী কোন জিনিষকে ঘোরালো করিয়া তোলে না, অন্যপক্ষে আতিশয্য পুরুষের স্বভাব; সেই হেতু নারী অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়।

একই কারণে পুরুষ অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণতা, বিবেকবুদ্ধি ও আত্মসম্মানজ্ঞানে হীন হইয়াও নারী অপেক্ষাকৃত কোমলহৃদয়া। বর্ত্তমানের স্থূল বস্তু উচ্চাদর্শের দৃঢ় সঙ্কল্প ভাসাইয়া দিয়া নারী হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। ধর্ম্মশীলতার সকল বাহ্য গুণাবলীর অধিকারী হইয়াও নারী হৃদয়শক্তিতে দুর্ব্বল।

স্ত্রী চরিত্রের আর একটি প্রধান দোষ তাহা সহজ সুবিচার করিতে পারে না। ইহার কারণও ধারণা শক্তির অভাব, নারীর শারীরিক গঠনও হয়ত ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। নারী স্বভাবতঃই দুর্ব্বল সুতরাং শারীরিক বলের পরিবর্ত্তে চাতুরীর উপর নারীকে নির্ভর করিতে হয়। পশুদিগের আত্মরক্ষার অস্ত্র হইতেছে, দন্ত, শৃঙ্গ, ইত্যাদি এবং নারীর প্রধান অস্ত্র কাপট্য। যাহার প্রধান অবলম্বন তাহার পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাকথনে পারদর্শী হওয়া আর বিচিত্র কি? সরল ও সত্যবাদী নারী এই জন্যই বিরল।

"Women have, in general, no love for any art; they have no proper knowledge of any, and they have no genius".

সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই একথা স্বীকার করিবেন। সাহিত্যে, কাব্যে কিংবা অন্য কোন ললিতকলায়

নারীর অভিনিবেশ অভাবনীয়, এমন কি সাধারণ অভিনয়ে কিংবা সঙ্গীতজলসায় কোন নারীকে রসোপলব্ধি করিতে কদাচিৎ দেখা যায়। এই জন্যই বোধ হয় গ্রীক থিয়েটারে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

ললিতকলার কোন ক্ষেত্রেই আজ পর্য্যন্ত যাহাদের একটীও মৌলিক দান নাই, তাঁহারাই করিবে গর্ব্ব, রসজ্ঞানের? গর্ব্ব করিবার মত সৃষ্টি জীবনের অন্যক্ষেত্রেই বা তাহাদের কই? চিত্রকলার কথা ধরা যাউক, অঙ্কনপদ্ধতি কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই আয়ত্বাধীন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটীও প্রথম শ্রেণীর চিত্র নারী কর্ত্তৃক অঙ্কিত হয় নাই। ইহার কারণ, যে সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও শক্তি প্রথমশ্রেণীর চিত্র রচনায় প্রয়োজন তাহা হইতে নারী বঞ্চিত। সকল বস্তুর স্থূল রূপ অতিক্রম করিয়া অন্তরে তাহারা কোনদিন প্রবেশ করিতে পারে না। শুধু ললিতকলা কেন অন্যান্য ক্ষেত্রেও উচ্চতম শক্তির অধিকারিণী নারী দুর্লভ।

আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর সৃষ্টি মহিলা (lady)। মেরুদ্বয়ের বিভিন্নতার মতন নারী ও পুরুষে প্রভেদ, এক হইতে অন্য কেবলমাত্র বিপরীতই নহে কোন বিষয়েই নারী পুরুষের সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত নহে। এ হেন জীবকে অকারণে অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন নিরতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতা, ইহা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া নারী ঘরে অশান্তি ও বাহিরে বিপর্য্যয় ঘটায়। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে নারীকে তাহার স্বস্থানে রাখিতে হইবে। অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখাইয়া বা পুরুষের সমপর্য্যায়ে তুলিয়া আনিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিলে অশান্তি বাড়িয়াই চলিবে। রন্ধনশিল্পই নারীর প্রধান শিক্ষনীয় বিষয়, ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহার আলোচ্য এবং বিবাহ নারীর সর্ব্বোত্তম পেশা। কি প্রয়োজন তাহার কাব্যালোচনায়, অথবা রাজনীতি চর্চ্চায়। নারী আপন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে গৃহ শান্তিময় হইবে, পুরুষ সবল ও স্বাভাবিক হইবে, দুর্নীতি বহুলাংশে লোপ পাইবে এবং সর্ব্বোপরি প্রগল্‌ভা, অকারণগর্ব্বিতা, উদ্ধত, কপট ও বিলাসী মহিলা নাম্নী জীব জগতের উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাইবে না।

সভ্যজগৎ একস্ত্রীত্বের পক্ষপাতী। বিবাহ হইলে স্ত্রী স্বামীর সুখ সুবিধায় অর্দ্ধভাগিনী হয়, যদিও কর্ত্তব্যের ভার স্বামীর উপরই থাকিয়া যায়। এই অন্যায় নিয়মের কি ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য শক্তিতে পুরুষ অপেক্ষা হীন হইয়াও রমণী সুখসুবিধার সমভাগী হইবে কোন নিয়মে? এবং এই অপ্রাপ্য অধিকার লাভে প্রমত্ত হইয়া নারীর মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটে। এই জন্যই আধুনিকা, পুরুষের প্রীতিবিধায়িনী না হইয়া, হয়, দুঃখদায়িনী। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বহুবিবাহ দূরীভূত হওয়ায় সহিত নারীজাতি দুঃখ বদ্ধিত হইয়াছে। যে ভাগ্যহীনা স্বামীলাভে বঞ্চিত হইল তাহার জীবন চিরকুমারীত্বে ব্যর্থ হইয়া যায়। পশ্চিমে আজ এই সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে আমাদের দেশেও এই সমস্যা অবশ্যম্ভাবী। চিরকুমারীর বা বালবিধবার অন্য পথ ঘৃণ্য জীবন যাপন। একস্ত্রীপ্রথার বেদীতে এই অসংখ্য বলি বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলন। যে অধিকার একটী বিবাহিতা নারী ভোগ করে তাহাতে একাধিক নারীর প্রতিপালন সম্ভব। সুতরাং কতিপয় ভাগ্যবতী নারীর অতিরিক্ত অধিকার সঙ্কুচিত হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। তাহা ছাড়া দৈহিক প্রয়োজনের দিক্ হইতে এক পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী প্রকৃতিরই বিধান। সুতরাং একের জন্য বহুর বলি একেবারে অযৌক্তিক।

শুধু তাহাই নহে একস্ত্রীত্ব বহু দুর্নীতির মূল। দৈহিক প্রয়োজনে পুরুষ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে এবং বহুবিবাহ উচ্ছেদের সহিত পতিতালয় বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নারী স্বভাবতঃ পরমুখাপেক্ষী, সেই হেতু হিন্দুশাস্ত্রে বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে নারী অভিভাবকত্বের ভার যথাক্রমে পিতা, স্বামী ও পুত্রের উপর

অর্পিত হইয়াছে। চিরজীবন অভিভাবকহীন হইয়া জীবন যাপন নারীর পক্ষে দুর্বিসহ। অভিভাবকহীন বিত্তশালী বিধবার পরিণামও সর্ব্বত্রই প্রায় এক।

আমাদের দেশের মেয়েরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নহে, সম্প্রতি অবশ্য তাহাদের অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু কেন তাহারা এ অধিকার পাইবে? বহু শ্রম স্বীকার করিয়া ধনসম্পদ উপার্জ্জন করে পুরুষ। এই শ্রমলব্ধ কষ্টার্জ্জিত ধনের অধিকারী হইলেই অদূরদর্শী, অপরিমিতব্যয়ী নারী তাহা অকাজে ও বিলাসে উড়াইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা নারী সংসারের অশেষ অকল্যাণকর। পুরুষের গর্ব্বের বিষয় বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য, বীর্য্য; আর নারী গর্ব্ব করে তাহার ধনের, সাজ সজ্জার ও অন্যান্য জাঁকজমকের। এ হেন স্ত্রীজাতিকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করিলে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং নারীকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে জীবন উপস্বত্ব ভোগের অধিকার দিলেই যথেষ্ট।

নারীকে অত্যধিক অধিকার দানের বিষময় ফলের দু'একটী ঐতিহাসিক নজীর দেখাইয়া আমরা প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। Aristotle তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন নারীজাতিকে স্বাধীনতা ও অতিরিক্ত ক্ষমতা দানই স্পার্টান জাতির ধ্বংসের কারণ। ত্রয়োদশ লুইয়ের সময় হইতে ফরাসী রাজগণ নারীর প্রভাবে চালিত হইয়া ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে অত্যাচার, অবিমৃষ্যকারিতা ও অনাচারের জন্য ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে তাহারও মূলে নারী।

নারী স্বভাবতঃ পরাধীন, অন্যের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকাই তাহার কাম্য। সুতরাং আধুনিক সভ্যতাপ্রসূত স্বাধিকারা, স্বাধীনা নারীও আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে অক্ষম। তাই স্বাধীন নারী অবিলম্বে তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার লোক অন্বেষণ করিয়া লয়। যুবতী বরণ করে প্রেমিকরূপে, বৃদ্ধা গুরুরূপে। তাই মনে হয় নারীকে স্বাধীনতা দান করিয়া পূর্ব্বকালে স্পার্টার ও পরবর্ত্তী কালে ফ্রান্সের যাহা হইয়াছিল আধুনিক সভ্যতার পরিণামে হয়ত তাহাই অপেক্ষা করিতেছে।

এই প্রবন্ধলেখক, প্রধানতঃ Schopenhauer এর On Women প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছেন। ইহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য মাত্র তাঁহার মতটিকে প্রকাশ করা। আশা করি পাঠকপাঠিকাগণ এই মতকে আমাদের মত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। সম্পাদক, ভাবীকাল

কবর

শ্রীরমা দেবী

শিউলি ফুলের গাছটির তলায় শ্বেত পাথরে বাঁধান এই কবরটি। সকাল বেলা শিশির ভেজা শিউলি ফুলগুলি যখন তার উপর ছড়িয়ে প'ড়ে তাকে ঢেকে রাখে, তখন মনে হ'য় সে যেন জীবন্ত হ'য়ে তাদের মধ্যে বাস করছে। মরণ তাকে স্পর্শ কর্‌তে সাহস পায়নি।

সিরাজী ছিল বাদশার প্রাসাদের একজন প্রিয় বীণাবাদিণী। এরই বীণার সুমধুর ঝঙ্কারে বাদশা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তেন, আবার এরই কোমল মোহন অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শের ধ্বনি শুনতে শুনতে নয়ন মেলে তাকাতেন। বীণাবাদিণী রূপে ছিল অসামান্য রূপসী। তাই সে বাদশার মন হরণ করে নিয়েছিল। জ্যোৎস্নায় মাখান তার দেহের রং। মাথার কেশগুচ্ছ কাল ঘন মেঘের মত, নয়ন দুটি তার একজোড়া ভ্রমর।

বাদশার প্রাসাদখানি ছিল যমুনার কূলে। অবিশ্রান্ত কুলুকুলু ধ্বনি, আর নৌকা বাওয়া মাঝির গান, এরাই ছিল তার দিবারাত্রি সঙ্গের সাথী হ'য়ে। সিরাজী যে দিন বাদশার সভার মাঝে এসে তার বীণার তারে ঝঙ্কার দিলে সে দিন সমস্ত ঘরখানি সেই সুরে সুর মিলিয়ে সারা দিয়ে উঠ্‌ল। দর্শকেরা সিরাজীকে দেখে তাদের চোখের দৃষ্টি ফেরাতে পারলে না, নিশ্চল পাথরের মুর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। সিরাজী একটার পর একটা বাজিয়ে চললো, হাতের তার বিশ্রাম নেই! তাকেও এই নেশায় মাতিয়ে রাখলে। ভোরের পাখীর ডাকে তবে তার নেশা টুটল। চারিদিক হ'তে বাহবা, হাততালির ধুম পড়ে গেল। সিরাজী বাদশার কাছে কুর্ণিশ করে বিদায় নিতে গেলে বাদশা তাকে আপনার গলা হ'তে মতির মালাখানি খুলে নিয়ে সিরাজীকে উপহার দিলেন। সিরাজী সেইটি হাত পেতে গ্রহণ করে বলেল,—'জনাব, আপনার এই উপহার পাবার যোগ্য আমি নই। আপনার স্নেহ যা আমি এতদিন লাভ করেছি, সেই আমার অলঙ্কারের অপেক্ষা মূল্যবান। আপনার দান, আপনার চরণ তলে রেখে দিয়ে দাসী এই ত্রুটির জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করছে, আপনি আপনার ধৈর্য্যগুণে তাকে মার্জ্জনা করুন।' বাদশা কোন কথা বললেন না, আনন্দচিত্তে তার পরিবর্ত্তে যুথিকার মালাখানি তার গলায় দুলিয়ে দিলেন। সিরাজী তাহা গ্রহণ করে বিদায় নিলে।

সভা ভঙ্গ হ'ল। ঐ সভায় যাঁরা সে দিন দর্শক হয়ে সভাটিকে উজ্জ্বল করেছিলেন, তাদেরই এক কোণে বসে ছিল দরিদ্র বেশে এক যুবক। সে এসে ছিল সিরাজীকে দেখে তার জন্ম সার্থক করবে। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল বীণাবাদিনী সিরাজীর নাম। বাদশার প্রাসাদে লোকের অন্ত নেই, দিন দিনই ভীড় বেড়ে চলেছে। সিরাজী তার দেহখানিকে

নিত্য নূতন রঙের ছন্দে সাজিয়ে সভার মাঝে দেখা দেয়। কখন বেণীখানি দুলিয়ে নিয়ে, কখন বা শিথিল কুন্তল উড়িয়ে দিয়ে। সব সময়ই মনে হয় তাকে কোন এক স্বপ্নরাজ্যের মায়াবিনী সে, হঠাৎ ভুলক্রমে মর্ত্ত্যে এসে দেখা দিয়েছে। সিরাজীর দৃষ্টি পড়ল সেই যুবকটির পানে। সিরাজী দেখলে, মুখখানি তার বিষাদের কালিমায় মাখান। মুখে কথা নেই। সিরাজী যখন বীণাখানি হাতে তুলে নিয়ে ঝঙ্কার দিতে সুরু করলে তখন ঐ যুবক দু' হাত দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরলে—বুক তার কেঁপে উঠল। সিরাজী ছাড়া আর কেউ তার কাতরতা দেখতে পেলে না। সিরাজীর অঙ্গুলির স্পন্দন থেমে গেল। আর বাজনার সুর বেরুল না। দর্শকগণ অবাক্ হ'য়ে সিরাজীর পানে তাকিয়ে রইলেন, অর্থ বুঝতে পারলেন না। বাদশা নিজেও যথেষ্ট লজ্জিত হলেন সিরাজীর এই ব্যবহারে। বাদশার কাছে সিরাজী এর জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি বললেন,—"সিরাজী! এমনতর অবস্থা ত তোমার কোন দিন ও হয়নি, আজ হঠাৎ এমন কেন হ'ল?" সিরাজী উত্তর করলে,—"জনাব! মানুষের চিরদিন সমান যায় না। আজ আপনার বাঁদী সিরাজী কোন এক অজ্ঞাত বেদনায় পীড়িত, মার্জ্জনা করুন তার এই অপরাধ। সে আজ আপনার করুণা ভিক্ষা চায়.—আর কিছু সে চায় না।"

বাদশা এবারেও তাকে মার্জ্জনা করলেন। সেই যুবকটি সিরাজীর সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে কোথায় যে অদৃশ্য হ'ল আর তার দেখা পাওয়া গেল না। রাত্রিতে সে দিন সিরাজী বাদশাকে দেখা দিতে না আসায়, অন্য বাদ্যকরের যন্ত্রের সুরে নিদ্রার ঘোরে অভিভূত হ'লেন, কিন্তু ভাল ঘুম হ'ল না, মধ্য রাত্রেই ঘুমের নেশা টুটে গেল। সে দিন শুক্লা একাদশী। যমুনার তীর হতে বীণার ঝঙ্কারের আওয়াজ বাদশার কাণে এসে পৌঁছাল। বাদশার বুঝতে বাকি রইল না এ কার হাতের ঝঙ্কার।

সিরাজীকে বাদশা বললেন,—"সিরাজী! তুমি এই অসময়ে আমার কাছে কেন? কি চাও বল!' সিরাজী বাদশার পানে তাকিয়ে বললে,—"বিদায় নিতে এসেছি জনাব, বিদায় দিন। আবার যখন সময় হবে তখন এই ভিখারী এসে আপনার দেখা দেবে।" বাদশার মন আজ উতলা। সিরাজীর কথায় বিরক্ত হয়ে উত্তর করলেন,—'বিদায়? বিদায় দেওয়া সম্ভব নয়। এইখানে জীবন ভোর কাটাতে হবে, তোমার যাবার উপায় নেই এই বাদশার হুকুম। সিরাজী কোন উত্তর করলে না কেবল মাথা নত করে জানালে,—'তাই ভাল জনাব, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

(২)

সিরাজী যখন তার বীণাখানি নিয়ে যমুনার তীরে এসে ঝঙ্কার দিলে তখন দেখ্‌তে পেলে এক যুবককে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে। সিরাজী ভাল করে তার উপর দৃষ্টি দিতেই চিন্‌তে পারলে

সে বাদশার সভার সেই দরিদ্র যুবক। সিরাজী তার কাছে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াতেই সে চমকে উঠে তাকালে। বললে, 'তুমি মানবী না দেবী? কি দুঃখে এ ধরার বুকে জন্ম নিয়ে এসেছিলে? এ ত তোমার যোগ্য স্থান নয়।' সিরাজী যুবকের কথায় একটু হেসে উত্তর দিলে,—'স্থান না হ'লেও স্থান করে নিতে হ'য়েছে, যুবক।' যুবক বললে,—'কিন্তু সুন্দরী! তুমি স্থান পাবে না, এই ধরণীই তোমাকে সে হ'তে মুক্তি দান শীঘ্র করবে। সিরাজী একটু হেসে উত্তর করলে, 'তাই নাকি? তুমি এ খবর কি করে জানলে! তবু তোমার কথাই সত্যি হোক। সিরাজীর আর এ বন্দিনী জীবন ভাল লাগেনা। বাদশা মনে করেন, সিরাজী কেবল তার রূপে সকলকে মুগ্ধ করে, রাখতে চায়। সে আর কিছুর প্রত্যাশা জীবনে করে না। আশা কিছুই তার নেই, তাই হুকুম হয়েছে জীবন ভোর এইভাবে এইখানে কাটাতে। যুবক সিরাজীর কথায় ভীত হ'য়ে উত্তর করলে, "সুন্দরী বাদশার কথায় বিরাগিনী হলে তার শাস্তি যে ভীষণতর হয় জ্যান্ত কবর নয়ত এই যমুনার জলে দেহ বিসর্জ্জন।" সিরাজী হেসে বললে 'তার জন্য আমি ভয় করি না।' যুবক বললে,—'সিরাজী তুমি জান কি, তোমাকে চোখের দেখা দেখবার জন্য কয় দিন পথ হেঁটে চলে এসেছি। ক্লান্তি অনুভব করিনি। তোমার হাতের বীণাখানি যখন কেঁদে কেঁদে তার বেদনা জানাচ্ছিল তখন আমিই একমাত্র তোমার সেই বেদনার অর্থ বুঝেছিলুম, তাই দু'হাতে নিজের বুক চেপে ধরলুম সহ্য করতে পারলুম না। তারপর তোমার বীণা থেমে গেল দেখতে পেলুম, তুমি তার জন্য বাদশার কাছে ক্ষমা চাইলে। সিরাজী উত্তর করলে, জানি—জানি তাই ত আর তেমন করে বীণা আমার বেজে উঠেনা, এই নিশীথ রাত্রে তোমার দেখা পাব বলেই ত এই পথে আসতে সাহস করেছি। আজ তোমার দেখা পেয়েছি জন্ম আমারও সার্থক হল, কিন্তু আমি যে রাজপ্রাসাদের ঐ বন্দিনী নারী। তোমার দেখা রোজ মিলবে কিনা জানিনা। তবু সময় পেলে এইখানে আবার তোমায় দেখা দিতে আসব।

(৩)

সিরাজী তার ভাঙ্গা মনখানি নিয়ে দুদিন বাদশার সম্মুখে বীণা বাজালেন। বাদশা তার মনের অবস্থা লক্ষ্য করলেন, কিছু প্রকাশ করলেন না। গোপনে তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। সিরাজী আবার গিয়ে যমুনার তীরে যুবককে দর্শন দিলেন। যুবক সিরাজীকে দেখতে পেয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে হাতখানি ধরে বললে,—'সিরাজী। তুমি রোজ না এলেও আমি তোমারই প্রতীক্ষায় রোজ এইখানে বসে থাকি। তুমি কি করে আজ বাদশার, কবল হতে মুক্তি পেলে সিরাজী! সিরাজী হেসে উত্তর করলে, সিরাজী কাউকে ভয় পায় না। ফিরে তাকাতেই সিরাজী দেখলে স্বয়ং বাদশা দাঁড়িয়ে, বাদশার নয়ন দুটি হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় জাজ্বল্যমান। বাদশা তৎক্ষণাৎ সিরাজীকে বন্দী করতে হুকুম দিলে। সিরাজী বললে,—'জনাব,—এই দাসী আপনার নিকট চিরদিনই বন্দিনী। চলুন, আমি নিজেই আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। এরা আমার সঙ্গে থাকুক।'

সিরাজীকে বাদশার কয়েদখানায় বন্দী করে, রাখা হ'ল। হুকুম এসেছে তাকে জ্যান্ত কবর দেবার। আজ তার সেই দিন। এই খবর পেয়ে বহু দূর দেশান্তর হ'তে লোকেরা এসে ভীড় করেছে সিরাজীকে শেষ দেখা দেখে নেবার জন্য। সিরাজীকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কবর স্থানের নিকট আনা হ'ল। সিরাজী একখানি নীল রঙের বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে এসেছে। বেণীটি তার পিঠে দোলান। মুখখানিতে কিছুমাত্র বিষাদের চিহ্ন নেই, সেই স্বাভাবিক পূর্ব্বের ভাব! নীল রঙের কাপড়খানির মধ্য হ'তে তাকে মনে হ'ল—নীল জলে একটি শ্বেতপদ্ম যেন ভেসে রয়েছে। সে তার বড় বড় ভাসা ভাসা কাজলমাখা নয়ন দুটিতে একবার চারিদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজে নিলে। তারপর বাদশার পানে তাকিয়ে বললে,—জনাব বিদায়। আপনার সুনাম রক্ষা হোক, রাজত্ব অক্ষুন্ন থাকুক, এই আজ ভিখারী সিরাজীর প্রার্থনা। বাদশার তখনও সেই অবজ্ঞার হাসি মুখে, করুণার চিহ্নের লেশ মাত্রও নেই! সিরাজীকে কবরের মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হ'ল ঐ শৃঙ্খলিত অবস্থায়। তার উপর ভার চাপিয়ে দেবার জন্য যখন আদেশ করা হ'ল, তখন ঐ ভীড়ের মধ্য হতে বেড়িয়ে এসে এক যুবক চীৎকার করে বললে,—'থাম তোমরা, শেষ দেখা একবার আমাকে দেখে নিতে দাও—আর আমি তোমাদের কাছে কিছু চাইনে।' লোকগুলির হাত কেঁপে উঠল তার কথায়। যুবকটি এসে সিরাজীর পানে তাকাতে সিরাজী বললে,—'ভুলবনা তোমায়—আমার দরদী, আমার ব্যর্থতাভরা জীবনের দীর্ঘনিঃশ্বাস তোমার ভালবাসার কথা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রাখবে, ভুলতে দেবে না। যদি কখনও আমাদের মিলন হয় তবেই এই আশা পূর্ণ হবে।' তার কম্পিত ওষ্ঠ নিয়ে সিরাজীর কপোলে একটি শেষ চুম্বনের রেখা টেনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সিরাজী চিরদিনের মতন তার বীণাখানি সঙ্গে করে নিয়ে ধরিত্রীর বুকে আশ্রয় নিলে। বাদশার বাদশাহী মেজাজ চরিতার্থ হ'ল।

তারপর বহুদিন কেটে গিয়েছে। বাদশার রাজত্ব ফুরিয়ে গিয়ে ঐ সিংহাসনে অনেক বাদশার আগমন হল। এখনও সিরাজীর কথা কেউ ভুলতে পারে নি। সকলের মুখে মুখে সে অমর হয়ে রয়েছে, আর আছে ঐ ঘাসে ঢাকা, শিশির ভেজা ঝরা শিউলি কবরখানির বুকে। এখনও লোকে পথে যেতে যেতে শুনতে পায়, সিরাজীর সেই বীণার ঝঙ্কারে কেঁদে কেঁদে তার বন্দীজীবন কাহিনী জানাতে। কিন্তু তার দরদের দরদী সে ত আজ নেই, কে তার দরদখানি বুঝবে? তাই তার কান্নার সুর ভেসে চলে যায়, থামতে চায় না।

নারীর মুক্তি

শ্রীনিস্তারিণী দেবী

দৈনিক বসুমতীতে (১০ই।১১ই বৈশাখ ১৩৪২) উক্ত নামের একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। বিলাতের কোন ভদ্রমহিলা লিখিত। এবং বসুমতীর জনৈক লেখকদ্বারা সঙ্কলিত। বিষয়টি গুরুতর। ইহা শিক্ষিতা মহিলাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। কথা হচ্ছে এই, যে এখনকার পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত সমভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চাহেন। সেজন্য যুবতী ও কিশোরীরা নানা প্রকারে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছেন। তাহাতে দেশের ও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ স্থলে অকল্যাণ ও উন্নতির অবনতি সাধিত হইতেছে। এই কথা পাশ্চাত্য মহিলাই নিজে স্বীকার করিয়া উদাহরণ দেখাইয়াছেন। উহাই গোচরার্থে জানাইলাম। সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিতেছেন, কথাগুলা কাল্পনিক নহে, সত্য কাহিনী। পরে তিনি ঘটনাটি আমূল বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ মেয়েরা ও রকম অল্প বয়সে নিতান্ত সরল মনে, সুখের ও আনন্দের লীলা খুঁজিয়া বেড়ায়। গোলাপের নীচে কণ্টক আছে বুঝিতে পারে না। সহজেই পথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সাজিয়া গুজিয়া স্বাধীন ভাবে পার্ক, সিনেমায় বেড়াইতে দ্বিধা বোধ করে না। তাঁহার কাহিনীর উপসংহার টুকু হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম।

"একদিন সন্ধ্যায় এক পার্কে দেখিলাম, সহসা এক কিশোরী এক যুবকের সহিত খুব প্রণয় চর্চ্চা করিতেছে। আমরা দলে ছিলাম পাঁচজন। দুজন পুরুষ ছিলেন। একজন পুরুষ এ দৃশ্য দেখিয়া, মন্তব্য করিলেন। মেয়েটির লীলার ভঙ্গী একটু দ্রুত। যুবকটির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, অর্থাৎ মেয়েটিই যেন নিজের স্বার্থে যুবকটিকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে।"

এ সব বিষয়ে গোলযোগ ঘটিলে মানুষ মন্তব্য করে, মেয়েগুলা এমন নির্লজ্জ অথচ পুরুষের দুর্ব্বৃত্ত লোলুপতার কথা ভুলিয়াও কখন মুখে আনে না। "মেয়ের দাম খুব সস্তা, একদিন সিনেমা দেখান, কিম্বা মোটরে খানিকটা ড্রাইব, (Joy Drivo) কিম্বা হোটেলে খানা—এই লোভে আজকালের কিশোরী, তরুণীদের যথা ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারা যায়। এ লোভে সে তোমাকে অনুসরণ করিবে পৃথিবীর প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত।"

"মেয়েদের বেশ ভূষার জন্য খরচ হয় বেশী। বহু অভিভাবক ইহাদের ব্যয়াধিক্য বহিতে না পারায় মেয়েদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এখন দরাজ হইয়াছে। তথাপি চাকরির বাজারে গিয়া দেখিব একই কাজের জন্য মেয়েরা পায় অল্প মাহিনা, পুরুষ পায় বেশী। অতএব সাম্য কৈ? এই যদি ব্যাপার তো পুরুষে আর নারীতে সাম্য কোথায়? সেকালে নারীর এত দুর্দ্দশা ছিল না, তখন নারী এমন স্বাধীন ছিল না।"

উপসংহারে লেখিকা বলিতেছেন মেয়েরা স্বাধীন হইয়া সব দিকে লাঞ্ছনা পাইতেছেন। ইহার চেয়ে সংসারে কল্যাণময়ী মুর্ত্তি কি ভাল নয় ?”

কথাগুলি যিনি লিখিয়াছেন তিনি নিজের দেশের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, তাহার প্রাণে সেজন্য ব্যথাও যথেষ্ট লাগিয়াছে। সুতরাং প্রতিকারের জন্য প্রয়াসী। নারীর দুঃখ নারীই অনুভব করিতে পারেন। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের মধ্যে অসীম জলধি ব্যবধান থাকিলেও আচার ব্যবহারের প্রলোভনে দেশ মুগ্ধ। বিদ্যা বুদ্ধির জ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রাধান্যে প্রতীচ্যই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রাচ্যে নারী সমাজের এখন শিক্ষার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছেন। এই ঝড় ঝাপটার হাত থেকে রক্ষা করাই আসল মুক্তি। মুক্তি ও স্বাধীনতা যথাযোগ্য ভাবে নর ও নারীর উভয়েরই ঈপ্সিত বস্তু কিন্তু পুরুষের ও রমণীর সমকক্ষতা সকল বিষয় সমভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পুরুষ ও রমণী নিজেদের অনুপযোগী আচার ব্যবহার বর্জ্জন করিতে বাধ্য। তবে কয়েকটি বিষয় মানুষ মাত্রেরই প্রার্থনীয়। মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্ম ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস। এই নবযুগে ভারতনারী যেন নূতনের মোহে পড়িয়া স্বধর্ম্ম বৰ্জ্জিত হইত অবনতি পথে নিমজ্জিতা না হইয়া পড়েন। আর্য্য-রমণীরা বিদ্যাধর্ম্মে ওতপ্রোত ভাবে বিভূষিতা হইয়া জ্ঞানে গুণে যশে মানে চিরস্মরণীয়া হইয়াছিলেন। তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভাষা মুখরিতা বিহঙ্গিনী হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে উপবিষ্টা হইয়া সুমধুর কাকলিতে প্রকৃতির শ্রবণবিবর পরিতৃপ্ত করিতেন মাত্র তাহা নহে, Blue Bird সাজিলে তৃপ্তি হইত না।

আর্য্যরমণী জ্ঞানপিপাসু হইয়া বিদ্যা আয়ত্ত করিতেন। ভারতের কন্যাগণের ধমনীতে এখনও সেই রক্ত বর্ত্তমান যদিও এখন দেশে বৈদেশিক উচ্চশিক্ষা প্রণালী ব্যতীত গত্যন্তর নাই, তথাপি নীর হইতে ক্ষীর সংগ্রহ করিতে আয়াস ও যত্ন করিয়া কৃতিত্ব লাভ করিব। এই শিক্ষা ও সাধনাই বিদ্যা অর্জ্জনের মূল হইলে পথভ্রষ্টের ভয় থাকে না। উল্লিখিত প্রতীচ্য সম্ভ্রান্ত মহিলার 'নারীর মুক্তি' নামক প্রবন্ধের অসম্ভব্যতা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, এদেশেও যেরূপ অনুকরণ-প্রিয়তা প্রতিপদে দেখা যাইতেছে তদ্দারা সাধারণে উক্ত আচার ব্যবহারের অপক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায় বিবেচিত না হওয়ারই কথা। সুতরাং অনুপযুক্ত উচ্চশিক্ষার ফলে দরিদ্র ভারত কন্যার শোচনীয় উন্নতির পরিণাম ঘটা বিচিত্র কি ?

রমণীর বিবাহিত জীবন অপেক্ষা সংসারে শ্রেষ্ঠ সুখ, আনন্দ ও ধর্ম্ম নাই। কিন্তু কালের প্রভাবে প্রতিকূল বায়ু বহমান। শুধু যে এই যুগে রমণীর সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য অকল্যাণ আশঙ্কা হইতেছে, তাহা মনে হয় না। সংসার যখন নরনারীর গুণে ও দোষে অনুমস্ত অবনমস্ত তখন উভয়েরই শক্তি পরিচালিত করিতে হইবে।

“মুক্তি” অর্থে কষ্ট ও যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া। রমণী নিজ পদমর্য্যাদা বিচ্যুত হইলে **“মুক্তি”** লাভ করিয়া কখনই সুখী হইতে পারিবেন না। তিনি সংসার-রাজত্বের অধীশ্বরী। তিনি

নিজ পরিবারে বেষ্টিতা হইয়া স্বামীপুত্রকন্যা লইয়া মানব জীবন সার্থক করিতেই চরিতার্থ। যখন নারী অভাবগ্রস্তা আপনজন বিচ্ছিন্না তখন সে পরের দাসত্ব করিতে প্রস্তুত। আজকাল মেয়েরা স্বেচ্ছায় চাকরী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে চায় যাহাদের ভাগ্যে প্রজাপতির আশীর্ব্বাদ লাভ হয় না। সুতরাং অন্নসমস্যা তাহাকেই পুরুষের সহিত দাসত্ব করিয়া অর্থের চেষ্টা করিতে হয়।

মেয়েদের যেমন সৎশিক্ষা সদাচার অভ্যাস শিক্ষা প্রয়োজনীয় ছেলেদের যে উহা হইতে কিছু কম তাহা নহে একটা অন্যায় কাজের জন্য সমাজে উভয়কে সমানভাবে দণ্ড গ্লানি নিন্দনীয় হইতে হয়। এই শিক্ষাবিপ্লবে সকল মেয়েদেরই অতিরিক্ত অসাম্যের উপদ্রব হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়।

সকল শাস্ত্রে পুরাণে নরনারীর পাপপুণ্যের ফল সমভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য একথা সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য যে নারীশক্তি সকল অমঙ্গল দূর করিবার অধিনেত্রী। তিনি গৃহে ও বাহিরে দেবীর পদে প্রতিষ্ঠিতা।

নারীর মুক্তি ধর্ম্মাচরণে, উহা ত্যাগেই অধঃপতন। ভারতের ইহাই শ্রেষ্ঠ নীতি। যতই সভ্যতার আলোক ছড়াইয়া পড়ুক না মেয়েদের সে মন্ত্রটি জপ করিতেই হইবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

দুহিতা—শ্রীশান্তাদেবী প্রণীত। প্রকাশক প্রবাসী প্রেস ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড—

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে লেখিকার পরিচয় প্রদান নিস্প্রয়োজনীয়। 'দুহিতার' ভিতর তিনি সহজ ও সরল ভাবে সমাজের একটি আলেখ্য প্রস্তুত করিতে যাইয়া যে ক্ষুদ্র সমস্যাটুকুর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা খুব নূতন না হইলেও অসাধারণ। মাতৃহৃদয়ের উচ্ছ্বাসিত স্নেহধারা ও হৃদয়ের উদারতাই এই উপন্যাসের মূল সূত্র। কল্যাণী ও তাহার মাতা নারায়নীই এই বইখানার উৎস বিশেষ কিন্তু তাই বলিয়া চরিত্রসৃষ্টির অভাব ইহাতে নাই। সমাজে প্রতিদিন যা ঘটিতেছে যাহাদের আমরা প্রতিদিন চোখের সম্মুখে দেখিতেছি তাহাদের লইয়াই এই উপন্যাস। কিন্তু মেয়ে চরিত্রগুলির কাছে পুরুষ চরিত্রগুলি নিতান্তই নিস্প্রভ। কল্যাণী ও নারায়নী যতটুকু আমাদের চোখে মহৎ ও পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় তেমনি অপর দিকে ততটুকু নিরঞ্জন, ও হীরালাল, বিষ্ণুচরণ প্রভৃতিকে শুধু নিস্প্ভ ও নগণ্য বলিয়াই বোধহয় না স্থানে স্থানে ঘৃণা করিতেও প্রবৃত্তি জন্মে। কল্যাণী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কিন্তু তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই যে সে বড় লোকের মেয়ে হইয়াও দরিদ্রের পত্নী সেজন্য তাহার অন্তরে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। অকাতরে নিস্মমভাবে তাহার স্নেহের ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছে সেখানে আসিয়া অসংখ্য ভাবে তাহার মেজ যা' প্রভৃতি আশ্রয় পাইতেছে। পরিশেষে মাতার মৃত্যুর পর তাহার ভাই নিরঞ্জন ও হীরালালের সহিত তুচ্ছ কতকগুলি, বহুমূল্য অলঙ্কার লইয়া ঝগড়ার সূচনা হইলে তাহার সমাধান যেরূপ সুনিপুণ ভাবে সে করিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই অভিনব ও লেখিকার তীক্ষ্ণবুদ্ধির তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

লেখিকার লেখার ও প্রকাশের ভঙ্গিমা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তবে স্থান বিশেষে ঘটনা বৈচিত্র্যের এমন ঝড় বহিয়া গিয়াছে যে চরিত্র সৃষ্টির মিছিলের ভিতর স্থানে স্থানে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটনাও অস্বাভাবিক নয়। ছোট বই তা ও উপন্যাসের ছোট সংস্করণ বই ত নয়। এমনি অল্প পরিসর জায়গার ভিতর ও বিশাল সময়ের ব্যবধানের ভিতর চরিত্রের প্রকাশ শুধু স্থান বিশেষে গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছে কিন্তু উপভোগের রসদ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তবু মেয়েদের মনের অলিগলির খবর এমন দরদ দিয়া লেখা সহজে চোখে পড়ে না। বর্ত্তমান নারী-আন্দোলনের অনেক খানি কথা অতি সরল ছন্দে এই ছোট গল্পটীর প্রতিছত্রে প্রকাশ পাইয়াছি। বইখানি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। মহিলা-সমাজে যে ইহা সমাদৃত হইবে, এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

প্রবাসী বাঙালী—শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—পি, সি, সরকার ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।

'প্রবাসী বাঙ্গালী' বইখানি প্রথম যখন খুলে পড়তে বসলুম, মনে হোল হয়ত বা এতে বাঙ্গালীর প্রবাসজীবনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গোছের কিছু পাব। কিন্তু ক্রমশঃ যত অগ্রসর হওয়া গেল ততই এর সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হতে হোল। অবশেষে দেখলুম এটি একখানি এমনই বই যাতে উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ, ভ্রমণকাহিনীর উদ্দীপনা এবং সরস প্রবন্ধের বইয়ের চিন্তাশীলতা সংযুক্ত হয়েচে। বস্তুতঃ এতে যতগুলি অধ্যায় রয়েচে, দিল্লীর কথা, মীরাঠের কথা, আগ্রার কথা, পুণার কথা, দেওঘরের কথা, শিলংয়ের কথা সমস্তগুলিতেই একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, কোন স্থান বিশেষের বিবরণ মাত্র এ নয়। বাংলার বাইরের সুদূরতম প্রবাসের সুখদুঃখ সৌন্দর্য্য সৌহৃদ্য সাহিত্যিক মনে যে অনুরণন তুলেছিল, এ তারই প্রকাশ। বিশেষ করে ভাল লাগলো স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত করে লেখক যে যে চরিত্রগুলির বিবরণ দিয়েচেন, দোষগুণে দুর্ব্বলতায়, স্নেহে, ক্ষমায়, ধৈর্য্যে জীবন্ত এবং আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচিত

মানুষের মত তাঁরা যেন চোখের সুমুখে ফুটে উঠেচেন। জীবনের স্মৃতি ফলকে যাঁরা রেখাপাত করেচেন তাঁদের এভাবে অপরের হৃদয়দ্বারে উপস্থাপিত করবার মধ্যে লেখকের যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবাসী বাঙালীর সঙ্গে বাঙ্গালীদের তফাৎ টা কোথায় এবং কেমনতরো, এসব খবরই অত্যন্ত সরস ভাবে বইখানিতে দেওয়া আছে। বইখানির ভাষা মধুর, প্রাঞ্জল। গল্পের বইয়ের মত তা সরস ও চিত্তাকর্ষক! পড়তে এতটুকু ক্লান্তি বোধ হয় না। এমনি একখানি বইয়ের বাংলা সাহিত্যে অভাব ছিল বোধ করি। অনেকে বইটি পড়ে প্রচুর আনন্দ পাবেন। বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালী সম্বন্ধে যাঁদের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েচে। এতে বাঙ্গালীর প্রবাসী মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এমন অনেক ইঙ্গিত রয়েচে এবং এমন অনেক যথার্থ সত্যকে উদ্ঘাটিত করে দেখান রয়েচে যা ইতিপূর্ব্বে আমাদের চোখে পড়েনি। প্রসঙ্গতঃ অনেক ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা রয়েচে যাঁদের চেনা এবং জানা সত্ত্বেও তাঁদের মাহাত্ম্যের প্রতি মন শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে ওঠে। মনে হয় প্রবাস জীবনের নিঃসঙ্গতার মাঝেও এমন সব চরিত্রের দীপ্তি নিঃশব্দে ফুটে উঠেচে এবং নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভে গেছে, আমরা তার খবর রাখিনি। শ্রীআশালতা সিংহ

"ক্ষণিকের অতিথি"—শ্রীসীতাদেবী প্রণীত। প্রকাশক—প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

বইখানি পড়িয়া তৃপ্তি মিলিল লেখিকার সূক্ষ্ম মনস্তত্ব বিশ্লেষণের নিপুণতার কথা ভাবিয়া। যে সমস্যার সমাধান এক ট্যাজেডির অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিল তাহা বাস্তবিকই পুরাতন তবু সত্য-শরণের জীবনের এই গভীর সমস্যা যে রেখাপাত করিয়াছিল তাহা শুধু নিপুণ ও পরিপক্ক হাতের পরশেই মুক্ত হইতে পারে এবং "ক্ষণিকের অতিথিতে" তাহাই সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সত্যশরণ ধনী পিতার পুত্র। কিন্তু পিতা দেউলিয়া হইলে পর সে চাকুরীর অন্বেষণে রেঙ্গুন যায় সেখানে কনকাম্মা নামে এক মহিলাকে নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। এই কনকাম্মার সাহায্যে একদিন বার্ম্মা হইতে সে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া স্বদেশে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া কর্ম্ম ব্যপদেশে সে তপতীর সহিত পরিচিত হয় ও তাহাদের সৌহৃদ্যের শ্লথগতি যখন বিবাহের পর্য্যায়ে আসিয়া থামিতে চাহিয়াছিল এমনি কনকাম্মা আসিয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইল। কনকম্মা বহুরোগ ভুগিয়া এলাহাবাদ আসিয়াছিল সত্যশরণের শরণ লইতে। সত্যশরণ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। একদিকে তপতী অন্যদিকে কনকাম্মা। একজনের প্রতি সে আসক্ত অন্যজনের কাছে চিরজীবনের নিমিত্ত ঋণী—যে তাহাকে দুর্য্যোগে বাঁচাইয়া ছিল। দুইটি রমণীর ছবি তাহার চোখের সম্মুখে আসিয়া সেদিন দেখা দিল। প্রথমটি তারুণ্যে, সৌন্দর্য্যে বাৎসল্যরসে টল টল; অন্যটি ব্যাধিগ্রস্ত, ক্লিষ্ট ও হৃতসর্ব্বস্ব কাহাকে সে বাছিয়া লইবে? কিন্তু ভগবান বাছিয়া লইবার সুযোগ তাহার ভাগ্যে জুটাইয়া দিলেন না। অতীতে বাছিয়া লইলে তাহারা দুইজনেই সুখী হইত কিন্তু কনকাম্মাকে বাঁচাইলে শুধু সেই সন্তুষ্ট হইবে। সত্যশরণ প্রথমটিই চাহিয়াছিল। কিন্তু বীরেশ্বর বাবু ভাবী জামতার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়া মেয়েকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। সত্যশরণের অন্তরের পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু সেদিন কনকাম্মাও ফিজিযাত্রী কুলীর সহিত পলাইয়া গিয়াছে। সত্যশরণের জীবনে সেদিন শুধু পড়িয়া রহিল দুইজনের স্মৃতি। কিন্তু সে স্মৃতির রাজ্যে ভাবনার জগতে আর বাছাবাছির পালা নাই।

সমস্যা উঁকি বুঝি একটু মারিতেছিল, কিন্তু মীমাংসা সহজেই হইয়া গেল।

বইখানি সুখপাঠ্য। অবসর সময়ে সকলেরই চিত্ত-বিনোদন করিবে।

চিঠির বাক্স

মাননীয়া

জয়শ্রী সম্পাদিকা সমীপেষু,

আপনাদের "চিঠির বাক্সে" মাঝে মাঝে সুন্দর ও প্রয়োজনীয় নানাবিধ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে উত্তর প্রত্যুত্তর দেখিতে পাই। কিন্তু, বর্ত্তমান দিনে বাংলার একটী অতি গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে কোনও কথা না দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। নারীর মুক্তি, দেশের রাষ্ট্রীয় জাগরণ, আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি বহুবিধ প্রসঙ্গ আপনারা আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু, বাংলার নিদারুণ নারীধর্ষণ সম্বন্ধে বাংলার নারী সমাজের একমাত্র মুখপত্র "জয়শ্রী" আজও নীরব কেন?

সেই দিকেই আজ আমি 'জয়শ্রী'র লেখিকা ও পাঠিকা বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দিনের পর দিন সংবাদ পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে যে বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতেছি, তাহাতে এই নারীধর্ষণ ব্যাপারকে আর কদাচিত দৃষ্ট অথবা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। ইহা বর্ত্তমানে বাংলার প্রতি জিলায় জিলায় প্রায় নিত্যকার ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ নারীর উচ্চ শিক্ষা, ভোটের অধিকার, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সব সমস্যাকে ছাপাইয়া গিয়াছে এই সমস্যা। বাংলার নারী-সমাজ তাহার লাঞ্ছিতা ভগিনীদিগের নিঃসহায় আর্ত্তনাদ প্রতি নিয়ত শ্রবণ করিয়া আজও উদাসীন রহিয়াছে কেমন করিয়া?

'জয়শ্রী'র লেখিকাও পাঠিকাদিগের প্রতি আমার এই দুইটী প্রশ্ন আজ জিজ্ঞাস্য :—

১। নারীহরণ ব্যাপারে তাহারা সমাজের পুরুষমণ্ডলীর উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিবে, না, বিশেষ ভাবে তাহাদেরও কোনও প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন?

২। যদি প্রয়োজন বিবেচিত হয়, তবে তাহার পথ কি?

আশা করি, তাঁহারা 'জয়শ্রী'র চিঠির বাক্সের মারফতে অথবা স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে এই বিষয়টী সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত জানাইবেন। ইতি

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ

ঢাকার মুকুল থিয়েটারের সুবিবেচনা

ভারতের বাহিরে ভারতের কুৎসা কীর্ত্তনকারীর অভাব নাই, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দুইখানি ফিল্মের সংবাদ এদেশে জানাইয়াছেন, তাহাতে ফিল্মের সাহায্যে ভারতবাসীর কত বড় কলঙ্ক রটনা করা হইতেছে, অনেকেই জানিয়াছেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে 'বেঙ্গলী' ছায়াছবিখানি লইয়া এদেশে অনেক আলোচনা ও প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে, উহাই নাকি 'লাইভস্ অব বেঙ্গললেন্সার' নামে কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে এদেশে প্রদর্শিত হইতেছে। সংবাদের সত্যাসত্য এখনও নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু মুকুল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এই সন্দেহের সুযোগ গ্রহণ করেন নাই, তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইলেও ছবিখানি প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সকলেই বুঝিতে পারিবেন ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ কতখানি ক্ষতি স্বীকার করিলেন। চুক্তির সম্পূর্ণ টাকা তাহাদের দিতে হইবে। অথচ পূর্ব্ব হইতে স্থির না থাকায় সেই সপ্তাহে তাহারা কোন ভাল ফিল্ম দেখাইতে পারেন নাই, সেজন্য দর্শক সমাগম কম হইয়াছে। কিন্তু তথাপি জনমতের প্রতি তাঁহারা যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন, ভারতবাসীর যে সম্মান রক্ষা করিলেন, তাহাতে ইঁহারা সকলের ধন্যবাদার্হ।

এরূপ সদ্-দৃষ্টান্ত সহজে দেখা যায় না। অন্যান্য ফিল্ম কোম্পানী ইহাদের অনুসরণ করিলে ভারতের কুৎসাকারীদের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে।

দ্বারকা তীর্থে অহিন্দুর প্রবেশ নিষেধ

বরোদা রাজ্যে দ্বারকা হিন্দুর এক পরম তীর্থ, ইহার নিকট হিন্দুগণ স্নানদানাদি করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বরোদা রাজ্যের মহারাজ গায়কোয়ার এই তীর্থ সম্বন্ধে এক নূতন আদেশ জারী করিয়াছেন। প্রকাশ যে গোমতীর মন্দিরের পশ্চাতে যে সোপান শ্রেণী আছে, সেই স্থান হইতে সঙ্গমঘাট পর্য্যন্ত অহিন্দু নরনারী প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আমরা এই আদেশে কিছু বিস্মিত-ই হইয়াছি, কারণ মন্দিরে দ্বার এখন সর্ব্বশ্রেণীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিবার জন্যই সর্ব্বত্র চেষ্টা চলিতেছে, দেবতার দ্বার রুদ্ধ করিয়া হিন্দু যে এতকাল পাপ করিয়া আসিয়াছে, তাহার

প্রায়শ্চিত্তের জন্য সকলেই যত্নশীল হইয়াছেন। এমন সময়ে নূতন করিয়া আবার গণ্ডি দিয়া দেবতাকে রাখা— বড়ই আশ্চর্য্যের মনে হয়। বরোদার মহারাজ হয়তো অশান্তির বিবাদের প্রতিকার কামনায় এ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু বিরোধের বীজ যদি অন্তরে থাকেই, তবে ঢাকিয়া রাখিলে কতদিন চলিবে, এবং খোলাখুলি বুঝিবার অবকাশ দিলেই, আপাততঃ বিরোধিতার মধ্যে একদিন যথার্থ বোঝাপাড়া হইয়া শান্তি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইবে।

মহাত্মার সমাজ-তন্ত্রিক মতবাদ

ব্যবসা হিসাবে খদ্দর প্রচারে সার্থকতা নাই, মিলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খদ্দরউৎপন্নকারীর লাভ কিছুই হয় না। খদ্দরের মূল্যাধিক্য হেতু ইহার প্রচলন ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। কর্ম্মীদেরও মজুরী অতি নগণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যেও আবার শ্রমের তারতম্য আছে। একই সময় পরিশ্রম করিয়া তাঁতি পায় ৬ পাই, কাটুনী মাত্র এক পাই পায়। এই ক্ষেত্রে মহাত্মা বলিতেছেন যে সর্ব্বপ্রকার শ্রমের মজুরী সমান করিতে চেষ্টা করা উচিত। সমাজ তন্ত্রীগণ ও তাহাই বলিয়া থাকেন তবে শুধু খদ্দরের জন্য নয়, সর্ব্বক্ষেত্রেই আংশিকভাবে এই মতবাদ যে সাফল্য লাভ করিতে পারে কিনা তাহাই পরীক্ষার বিষয়।

অশ্লীল চিত্র

অশ্লীল সাহিত্য ও ছায়াছবি বিরুদ্ধে দেশে আন্দোলন চলিয়াছে। এ বিষয়ে সভাসমিতিও হইতেছে। কিন্তু অশ্লীল চিত্র সম্বন্ধে বেশী আলোচনা আজিও হয় নাই। বর্ত্তমানে একাধিক বিশিষ্ট পত্রিকাতে এরূপ কয়েকটী চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, যে উহা যথার্থই কুরুচি-জনক বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। দেশের বিশিষ্ট কয়েকটী পত্রিকায় এরূপ প্রকাশ দেখিয়া আমরা অতিশয় লজ্জা অনুভব করিয়াছি। নগণ্য পত্রিকার প্রকাশ স্বল্প-পরিসর, সেজন্য তাহাদের কোন ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিলে সাধারণতঃ অনেকেই উপেক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু দেশের গৌরবস্থল পত্রিকাদির কোন অশোভনতা কেহই বাঞ্ছনীয় মনে করে না।

শিল্পী যিনি, তাঁহার সম্ভবতঃ শ্লীলতা ও অশোভনতার মাপকাঠি এত দৃঢ়হস্তে ধরিয়া রাখিলে চলে না, কিন্তু প্রকাশের নির্ব্বাচন-ক্ষমতা যাঁহার হাতে তাঁহার নিকট সকলেই প্রত্যাশা করে। এই সব চিত্র প্রকাশ না করিলে পত্রিকার সৌন্দর্য্য হানি হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

জাপানী ব্যবসারীদের ব্যবসায় বুদ্ধি

জাপানের ওসাকা ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের নিকট এক চিঠি দেন যে তাঁহারা উক্ত মিলের জন্য প্যারামাক্স বস্ত্র বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন, কাপড়গুলির উপর জাপানী ছাপ এরূপভাবে থাকিবে যে অতি সহজেই তুলিয়া ফেলিয়া বাজারে চালাইতে পারা যাইবে। প্রস্তাবটী যে কিরূপ গর্হিত সকলেই বুঝিতে পারেন। ভারতে স্বদেশী বস্ত্রের চাহিদা আজকাল বাড়িয়াছে, জাপানী ব্যবসায়ীগণ এই 'জাল স্বদেশী' বস্ত্রের যোগান দিয়া অর্থবান হইতে চান। এরূপ ঘৃণিত পন্থা যে অবলম্বন করে উভয়েই সমান দোষী, নিঃসন্দেহ যে ভারতীয় অনেক কাপড়ের কল এরূপ অসাধু প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদিও মাত্র একটীর বিষয় সাধারণে প্রকাশ পাইয়াছে। কুষ্টীয়ার মিল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের নির্লোভ ব্যবহারের নিমিত্ত বাঙালীর ধন্যবাদের পাত্র। বাঙালী ব্যবসায়ী এই আপাতঃ মধুর পন্থা গ্রহণ করিলে ভারতের শিশু বস্ত্র-শিল্পের সর্ব্বনাশ হইবে ও বিদেশীবস্ত্রে দেশ প্লাবিত হইলে পরিণামে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। ভারতীয়গণ স্বদেশী

ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য অনেক সময় উচ্চ হারে স্বদেশী বস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকেন—অল্প মূল্যের বিলাতী বস্ত্র থাকিতেও। তাহাদের বিশ্বাস এইরূপে ভঙ্গ করিয়া প্রতারণা করা অতীব নিন্দনীয়।

ভারতীয় বণিক সমিতি এই অবস্থার প্রতিকারে কতদূর অগ্রসর হইতে পারেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যের প্রবেশ নিষেধ

সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বলে পুলিশ ও সৈন্য কোনস্থানে কাহারও উপরে বে-আইনী আচরণ করিয়াছে কিনা জানিবার জন্য শ্রীযুক্ত মোহনলাল শক সেনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ইত্যাদি স্থানে যাওয়ার সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনি কুমিল্লায় পৌছিলে ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন, কারণ জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে তাহার অবস্থান প্রতিকূল। কলিকাতায় আসিয়াও চীফ্ সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিয়া এই একই মর্ম্মে চিঠি পান। সুতরাং তিনি কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই এলাহাবাদ ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

পুলিশ ও সৈন্য বে-আইনী কার্য্য করিলে বিভাগীয় তদন্ত হয় ও তাহারা যথাযোগ্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং অন্যায় কার্য্য হইলে সকলকেই শাস্তি দেওয়া সরকারের অনভিপ্রেত নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। বরং কর্ম্মচারীদের অন্যায়ের প্রতিবিধানে তাহারা যত্নশীল জানিলে সাধারণের নিকট সরকারের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। শ্রীযুক্ত শকসেনার তদন্তে যদি পুলিশ ও সৈন্যের আচরণ সম্বন্ধে তাহাদের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু প্রকাশ পাইত উভয়তঃই সরকার লাভবান্ হইত, নিন্দনীয় কার্য্য অনুষ্ঠানের সংবাদ না থাকিলে জনসাধারণ আশ্বস্ত হইত, অপর পক্ষে প্রতিকারযোগ্য কোন আচরণের বিষয় প্রকাশ হইলে, ভবিষ্যতে সরকার সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিতেন।

হাওড়া সেতুনির্ম্মাণের চুক্তি

ইতিহাস প্রসিদ্ধ হাওড়াসেতুর পরিবর্ত্তে নূতন সেতুনির্ম্মাণের পরিকল্পনা চলিতেছে, দেশী, বিদেশী বহু ফার্ম্ম ইহার নির্ম্মাণ-ভার গ্রহণ করিতে সমুৎসুক, প্রায় দুইকোটী টাকা সেতুনির্ম্মাণে প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমানে ভারতীয় ফার্ম্মগুলি ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে সক্ষম, ইহাদের হাতে এই ভার দিলে এই দুইকোটী টাকা দেশেই থাকিয়া যাইবে, বহু নিরন্ন দেশবাসী এই কাজে অন্ন পাইবে, উপরন্তু মাল আনা-নেওয়াতে রেলকোম্পানীও লাভবান্ হইবে। কিন্তু এই ভার যাহাদের হাতে, দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত কি তাহারা করিবেন ?

ভারতের নিন্দাকারী চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর মহিলাদের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের নিন্দা-রটনাকারী চলচ্চিত্রের প্রতিবাদ-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিদেশী কয়েকটী চলচ্চিত্রে ভারতের যে দুরপনীয় গ্লানি প্রচার করিতেছে, তাহার বিশেষভাবে প্রতিবাদ আবশ্যক, উক্ত স্বনামধন্যা মহিলাগণ এই সভায় যোগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ভারতীয় মহিলাদের ধন্যবাদার্হ।

সাংবাদিক-পত্নী পরলোকে

খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী মনোরমা দেবী ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার কন্যাদ্বয় শ্রীযুক্তা সীতা দেবী ও শান্তা দেবী বাংলার সর্ব্বজন-পরিচিতা লেখিকা। পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত কেদার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করিয়াছেন। স্বর্গীয়া মনোরমা দেবী প্রকৃত সহধর্ম্মিনীর ন্যায় রামানন্দ বাবুর সর্ব্বকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। 'প্রবাসী', 'মডার্ণরিভিউ' পত্রিকা বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু, কিন্তু রামানন্দ বাবুর এই সংবাদ-পত্র-সেবার পিছনে রহিয়াছে এই সাধ্বী-নারীর অকৃত্রিম দরদ ও উৎসাহ।

আমরা ইহাদের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

শরৎচন্দ্রের নোবল পুরস্কার প্রচেষ্টা

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নোবল প্রাইজ প্রাপ্তির তদারকের চেষ্টায় ইউরোপ গমন করিবেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, বাংলায় শরৎচন্দ্র যে সমাদর পাইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত আনন্দের। বিদেশের সম্মান তার নিজের জন্য হয় তো প্রয়োজন নাই, কিন্তু যদি যথার্থ ই তিনি এই সম্মান লাভ করেন তাহাতে বাঙালার মুখই উজ্জ্বল হইবে।

স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার আধিপত্য ও মৃত্যুর হার ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বিভিন্ন রোগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, একথা অস্বীকার করিবার নহে। প্রতি বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ এই ম্যালেরিয়া জ্বর। এমন একদিন ছিল—যখন বাংলার সৌন্দর্য্য, ধনসম্পদ, আমোদপ্রমোদ, আশাভরসা, সুখশান্তি ও স্বাস্থ্যবল সকলই বাংলার প্রতি পল্লীতে, প্রতি সহরে বিরাজমান ছিল। কিন্তু আজ ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া বাংলার এই সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য ক্রমশঃ নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এ ধ্বংসের পথ রোধ না করিলে বাংলার আর মঙ্গল নাই, বাঙ্গালীজাতিরও আর উন্নতির কোন আশাই নাই। আজ যে কেবল এই রোগ এই প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে, বরং ইহা বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবনৃত্যে পল্লীর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সমূহ এখন পরিত্যক্ত। দেশের আবহাওয়া এখন এত দূষিত যে ইহাকে শোধিত করিবার ব্যবস্থা শীঘ্র শীঘ্র না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার আর উপায় নাই।

ম্যালেরিয়া এদেশে এখন ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এমন কি, নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত ইহার সহিত সুপরিচিত। সুখসম্ভোগের ক্রোড়ে লালিত পালিত ধনীলোকের প্রাসাদেও ম্যালেরিয়া রাক্ষসী প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে এনোফিলিস্ মশা কামড়াইয়া পরে যদি কোন সুস্থলোককে দংশন করে, তবে এই সুস্থলোকের শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ সংক্রামিত হয়, এবং কিছুদিন পড়ে সেও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, যেস্থলে এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, সেখানে ভুগিতেছে অন্ততঃ বিশ জন। এই কাল ব্যাধিতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি যে কত নষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শীর্ণদেহে, প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত উদরে, পাংশু মুখে, কত শত উপার্জ্জনক্ষম যুবক গৃহের কোণে নিরুপায় হইয়া দেশের দারিদ্র্য এবং বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার সীমা নাই। বহুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া নবীনা মাতার স্তন্যদুগ্ধ ও শুকাইয়া যায়, ক্ষুধাতুর শিশু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহে মাতার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া বিষ রক্তস্থ লালকণিকাগুলিকে আশ্রয় করিয়া বা ক্রমে তাহাদের ধ্বংস সাধন করিয়া রক্তাল্পতা দোষ আনয়ন করে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর ক্ষীণদেহ রক্তের অভাব বশতঃ পাংশুবর্ণ হইয়া যায় ; খাদ্যে অরুচি জন্মে, পেট জোড়া প্লীহা ও যকৃত হয়, এবং শরীরে কর্ম্মশক্তি হীন হইয়া পড়ে। তখন এ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। বহু বৎসর গবেষণার পর ইহা বিশেষজ্ঞগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সুইজারল্যাণ্ডের আবিষ্কৃত রচি টোন ম্যালেরিয়া রোগীর কর্ম্মশক্তি ফিরাইয়া আনিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণের ভয় দূর হয়। রচি টোনের মূল্যবান্ উপাদানগুলি স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ এবং খনিজ দ্রব্যের সংমিশ্রণ বলিয়া অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহার গুণ অনেক বেশী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকমণ্ডলী ইহার গুণে ও কার্য্যকারিতায় মুগ্ধ হইয়া যে ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবস্থা দিতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইহা রক্তস্থিত ম্যালেরিয়া বীজাণুদিগকে ধ্বংস করিয়া শরীরে নূতন রক্ত কণিকা সৃষ্টি করতঃ রক্তকে সতেজ করে। ইহা সেবনে আহারে রুচি হয়, ক্ষুধা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং হজম শক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ হয়। রচি টোন সেবনে দুর্ব্বলতা দূর হইয়া দেহে যথেষ্ট নববল ও জীবনীশক্তির সঞ্চয় হয়, এবং উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

ডাঃ এম, জি, বসাক, এম, বি।

Printed & Published by Bibhabati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

মনোরমা দেবী

পঞ্চম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪২ | পঞ্চম সংখ্যা

রেশ

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

থেমে গেলে মুগ্ধ গান
বীণার ঝঙ্কৃত তান
তবু থাকে রেশ !
মুদিত কমল মাঝে
কিছু গুপ্ত মধু আছে
কিছু গন্ধ লেশ !
কুসুম শুখালে শাখে
তবু যেন বাকী থাকে
এতটুকু মায়া—
যে আনন্দে আপনাতে
ফুটেছিল মধুরাতে
তারি ক্ষীণ ছায়া ।

সৌভাগ্যের লগ্ন শেষে
স্বপ্ন সম কী আবেশে
মগ্ন থাকে প্রাণ
ব্যথিত হৃদয়ময়
স্মৃতির ভাণ্ডারে রয়
কিছু তার দান ।
প্রেম চলে গেলে তার
অনুপম উপহার
পিছে পড়ে রয়
মিলনের হর্ষস্রোতে
সমস্ত জীবন হতে
শ্রেষ্ঠ যা সঞ্চয় ।

একদিন মধুমাসে
যে মুগ্ধ বসন্ত হাসে
প্রস্ফুটিত ফুলে
সোহাগের যে রাগিনী
রক্তে বাজে রীনি রিনী
যৌবনের কূলে।
চামেলির বৃন্ত হতে
যে গন্ধ সমীর স্রোতে
বাতাসে মিলাল
পূর্ণিমার রাত্রিকালে
যে শিখা সহসা ঢালে
প্রণয়ের আলো।
বসন্তের শেষ ক্ষণে
সে শিখা নিবিলে মনে
বাতাসে আকুল
সেই তীব্র দীপ্ত হেম
থেমে গেলে মুগ্ধ প্রেম
ঝরে গেলে ফুল।
এই যেন শেষ নয়
তবু পিছে পড়ে রয়
কিছু চিহ্ন তার
মাঝে মাঝে ভরি হিয়া
হেসে ওঠে বিকশিয়া
সেই উপহার।

তাই তপ্ত দ্বি-প্রহরে
বসে বাতায়ন পরে
বাজে মুগ্ধ সুর
যে প্রেম হয়েছে শেষ
তারি ক্ষীণ স্বপ্ন লেশ
কী লাগে মধুর।
ভুলে যাওয়া কথা কত
মুগ্ধ স্মৃতি শত শত
কত ক্ষুদ্র সুখ
যেন এ হৃদয়ময়
ছায়া মেলে চেয়ে রয়
আনন্দ উন্মুখ।
তাই বিদায়ের ক্ষণে
প্রেম বলে মনে মনে
এই নহে শেষ
দিনে দিনে চিত্তে তব
আমি নব রূপ লব
ফেলে যাব রেশ।
এক দিন যে পরশে
ভরেছিনু যে হরষে
হারাবেনা আর
ক্ষীণ যদি হয় শিখা
তবু রবে স্বপ্নে লিখা
স্পর্শখানি তার।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া

শ্রীসুলতিকা পাল

আশ্বিন মাস আগতপ্রায়। আকাশে বাতাসে যেন আগমনীর সুর ভাসিয়া উঠিয়াছে। একদিন কণা দ্বিতল বৃহৎ একটী অট্টালিকার ছাদে বসিয়া গঙ্গা বক্ষে সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া অবলোকন করিতেছিল। শুভ্র বসন পরিয়াও তাহার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। সান্ধ্য সমীরণে আলোকিত ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি তাহার ললাটে সকৌতুকে ক্রীড়া করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে কণা আবৃত্তি করিতেছিল—

'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

ভরা ভাদ্রের ভরা গঙ্গা, মাতিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে যেমন বলাকাশ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে, নদী বক্ষেও তেমন অসংখ্য তরণী শুভ্র পাল তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নৌকা ও বলাকার মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। নদীর এপারে শ্রীরামপুর, ওপারে ব্যারাক্‌পুরের সৌধশ্রেণী দেখা যাইতেছি। সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে অস্ত যাইতে বেশী বিলম্ব নাই। কণা একাকী উপবিষ্টা, বিংশতিবর্ষীয়া কণা সংসারে নিতান্ত একা। তাহার অর্থের অভাব নাই, কিন্তু সঙ্গীর একান্ত অভাব। চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন এই গৃহে আসিবার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই, তখন সে দরিদ্র পিতার জীর্ণ গৃহে লালিতপালিত হইতেছিল। দরিদ্রের গৃহে জন্মিলেও যে সুষমাসম্ভার সম্বল করিয়া কণা দীনের কুটিরে আসিয়াছিল, তাহা ধনীরও আকাঙ্ক্ষিত। ধনীর একমাত্র পুত্র রজতকুমার যখন এই দরিদ্র দুহিতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল, তখন বৃদ্ধ বনমালী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। বিপত্নীক বনমালীর যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইলেন। জামাতা রজতের রূপ ত ছিলইনা, উপরন্তু তাহার মনটীও অত্যন্ত নীচ ছিল। সে কেবল প্রভুত্ব করিতেই ভালবাসিত। কণাকে গৃহে আনিয়া তাহাকে সহানুভূতি দেখনোর পরিবর্ত্তে তাহার উপর অত্যাচারই করিত।

কণার দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণের সে কোনই মূল্য দিত না। রজতের বর্ব্বরোচিত আচরণে কণা বড় ব্যথা পাইত। স্বামী গৃহে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে কণা বুঝিতে পারিল, অর্থে সুখ হয় না। স্বার্থপর রজতের নিষ্ঠুর, পীড়নে সে মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। অত্যধিক মদ্যপান করায় রজতের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, বিবাহের পর তাহার শরীর অধিক খারাপ হইয়া পড়িল। কণা ধৈর্য্যের সহিত এই অসুস্থ ও মেজাজী স্বামীর সেবা করিত, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হইল না। রজত অচিরেই

কণাকে অব্যাহতি দিয়া চলিয়া গেল। কণার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়া রজত অত্যন্ত ভুল করিয়াছিল। এই রকম ভুল মানুষ সংসারে প্রতি নিয়তই করিতেছে, কিন্তু ফল ভোগ করে অপরে ইহাই দুঃখের বিষয়। এই অল্প বয়সেই কণার জীবনকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া রজত সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল। সেই সন্ধ্যায় কণা বিগত জীবনের স্মৃতি দূর করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় মূক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল আর অজ্ঞাতসারেই যেন প্রিয় শ্লোকটী আবৃত্তি করিতেছিল, এমন সময় নিকটস্থ ঘাটে মৎস্যজীবিদের মধ্যে তুমুল কোলাহল উঠিল। আকাশের বক্ষ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া কণা জলের বুকে তাকাইল ও জেলেদের অস্পষ্ট আলাপ শুনিতে পাইল। প্রথম ধীবর, 'কাদের ছেলেরে'? দ্বিতীয় ধীবর, 'কাদের ছেলে কি করে জানবো? বোধ হয় কাছেই বাড়ী।' তৃতীয় ব্যক্তি 'অল্পক্ষণ পড়েছে, জল খায় নি, মরেও নি, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।' অপর একজন বল্লে, 'এই মা ঠাকুরুণকে খবর দিলে হয়'। কণা ক্ষিপ্রপদে ছাদ হইতে নামিয়া গেল, ও ভৃত্যকে বল্লে, 'রাম, তুই যা একটা ছেলে জলে পড়ে গেছে, তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে আয়।' পুরাতন ভৃত্য রাম ও ধীবররা ধরাধরি করিয়া বালককে বাড়ীর মধ্যে আনিল।

কণা বালকের চেহারা দেখিয়া বুঝিল যে ভদ্রলোকের ছেলে কিন্তু কি জীর্ণ শীর্ণ শরীর, দেখিলে মায়া হয়। অনাহারে দুর্ব্বল ছেলেটী ঘাটে বসিয়া থাকিতে থাকিতে জলে পড়িয়া যায়, জল পেটে যায় নাই কিন্তু হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। বালকটীর হাতে পায়ে একটু সেঁক দিবার পরই জ্ঞান হইল। ছেলেটীর জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া জেলের দল গোলমাল করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যাদেবী হোলি খেলা শেষ করিয়া তাহার ধূসর রঙের শাড়ীর আঁচল দিয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া দিয়াছে।

কণা তাহার দাসীকে ডাকিয়া বলিল, 'সদু, তুই আলো জ্বেলে নিয়ে আয়'। সে নিজে বালকের শিয়রে বসিয়া রহিল, উঠিল না। দাসী আলো আনিলে, কণা পুনরায় বলিল, 'সদু, শীগগীর যা, ঠাকুরের কাছ থেকে একটু গরম দুধ নিয়ে আয়'। সদু দুধ আনিলে কণা বালককে সম্বোধন করিয়া বল্লে, 'খোকা, দুধটা খেয়ে ফেল'।

ছেলেটী শয্যার উপর বসিয়া দুগ্ধ পান করিয়া ও চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'দিদি, আমি কোথায়?' অনাত্মীয় বালকের মুখে 'দিদি' সম্বোধন শুনিয়া কণা পুলকিত হইয়া উঠিল।

বালক পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'আপনি কি আমার দিদি?' কণার বিহ্বল ভাব কাটিয়া গিয়াছে, এবার সে সহজ সুরেই উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ আমি তোমার দিদি, এ তোমার বাড়ী। এই উত্তরেও বালকের মুখ ম্লান দেখাইতে লাগিল। সতীশ একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে, কণা তাহাকে প্রশ্ন করিয়া তাহার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস জানিয়া লইল। দশ বৎসর বয়স্ক বালক সতীশ, কণাদেরই স্বজাতি কায়স্থ। শৈশবেই সে পিতৃমাতৃহীন হয়।

সে তাহার দিদির সহিত তাহার শ্বশুর বাড়ীতে থাকিত। তাহার দিদির খাশুড়ী তাহাকে সহ্য করিতে পারিতেন্ না। নিরপরাধ বালককে তিনি দিনের মধ্যে দশবার বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিতেন। দিদি তাহাকে স্নেহের অঞ্চলে আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু সবই বৃথা হইত। সেই দিন বালক মনের দুঃখে ঘাটে বসিয়া থাকিতে থাকিতে জলে পড়িয়া যায়। এই কাহিনী শোনার পর রাত্রে কণা বল্লে, 'সতু ভাই, তুমি আমার কাছে নির্ভয়ে থাক।' এই কথা শুনিয়া বালক কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দাসদাসী পরিবৃত হইয়াও কণা যে নিঃশব্দ জীবনযাপন করিতেছিল, এই বালকের আবির্ভাবে তাহার অবসান হইল। কণা সতীশকে পাইয়া যেন নবজীবন লাভ করিল, এখন তাহার হাতে অনেক কাজ। ধুমধামে পূজা হইয়া গেল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আসিয়া পড়িল। কণা সতীশের জন্য কাপড় আনিয়া, স্বহস্তে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়াইল ও ফোঁটা দিল। পূজার ছুটীর পর সতীশকে কণা শ্রীরামপুর স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল। সতীশ মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিল ও দিদির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এই শান্ত স্বভাবের ছেলেটীর প্রতি কেহ খারাপ ব্যবহার করিতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া কণা, বিস্মিত ও ব্যথিত হইত।

কয়েক বৎসর পরে শ্রীরামপুর হইতেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া একদিন কণাকে ডেকে বল্লে, 'দিদি, এবার তো বড় ছুটী পেয়েছি, চল কোথাও বেড়িয়ে আসি। কণা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর কোথায় যাবার ইচ্ছা ?' সতীশ হেসে উত্তর দিলে, 'চলনা দিদি, পুরী যাই।' কণা বল্লে, 'আচ্ছা, দেখা যাক্।' পুরী যাওয়া ঠিক হইল, পুরীতে কণার একজন জানা লোক ছিলেন, তাঁহাকে লিখিয়া বাসা ভাড়া করা হইল। শ্রীরামপুরের বাড়ী বন্ধ করিয়া ঠাকুর ও ভৃত্য রামকে লইয়া কণা ও সতীশ পুরী যাত্রা করিল। বাড়ীতে সদু দাসী রহিল।

রাত্রের পুরী এক্স্প্রেসে তাহারা রওনা হইল। সতীশ কণাকে তাহার নিজের গাড়ীতে লইয়াছে। ষোল বৎসর বয়স হইলেও সতীশ এখনো বালসুলভ সরলই আছে। ট্রেণ যখন খড়্গপুরের নিকটে আসিল, দূর হইতে কারখানার অত্যুজ্জ্বল আলোক মালা দেখিয়া সতীশ দিদিকে ডাকিয়া দেখাইল। দূরে যাইতে ট্রেণে এই প্রথম চড়িয়াছে, সুতরাং সকল জিনিষেই সে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। গাড়ী বালেশ্বর ষ্টেশন পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সতীশ ঘুমে ঢুলিতে লাগিল। তখন কণা তাহা জানিতে পারিয়া নিজের কোলে তাহার মাথা টানিয়া লইল ও ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। সতীশ দিদির ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া দিদির আদর উপভোগ করিতে করিতে কখন যে নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। ভোর হইলে ট্রেণ কটক ষ্টেশনে থামিল এতক্ষণে সতীশের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া লজ্জিতভাবে বলে, 'দিদি, সারা রাত বসে,

আর আমি আরামে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। কণা হাসি মুখে বলে, 'খুব হয়েছে এখন মুখ ধুয়ে কিছু খা।' মুখ ধুইয়া সতীশ নিঃশব্দে কিছু খাবার খাইয়া লইল। খাওয়া শেষ করিয়া, সতীশ বসিল, ও জানালা দিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তি ট্রেণ হইতে দেখিয়াই সতীশ আনন্দিত হইয়া উঠিল। অবশেষে গাড়ী পুরী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ষ্টেসনে নামিলেই তাহাকে পাণ্ডা ঠাকুরগণ ঘিরিয়া ফেলিল। সে এক যন্ত্রণা বিশেষ। তাহাকে লইয়া টানাটানির ব্যাপার। সদাশান্ত সতীশও বিরক্ত হইয়া উঠিল। বহু বাক্ বিতণ্ডার পর তাহাদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সতীশ গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। স্বর্গদ্বারের দিকে বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া ক্লাবের নিকটে ছোট একটী বাড়ী তাহাদের জন্য ঠিক করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব পরিচিত ভদ্রলোক তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

ছোট একতলা বাড়ীটি, নাম 'আনন্দ ধাম'। বাটীর সম্মুখেই দিগন্ত প্রসারী অনন্ত নীল সমুদ্র। সেই দিন বিকালে সতীশ কণাকে লইয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বাহির হইল। সে শিশুর ন্যায় বালুর উপর দৌড়াইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে ঝিনুক সংগ্রহ করিতে লাগিল। পরদিন প্রভাতে সতীশ কণাকে বল্লে, 'চল দিদি, সমুদ্রে স্নান করবো'। স্নানে নামিয়া প্রথম প্রথম কি ভয়! যেন ঢেউএর সঙ্গে লড়াই। ক্রমশঃ ভয় কমিয়া গেল, সমুদ্র স্নান অভ্যাস হইয়া গেল। তখন সমুদ্র স্নান নেশার মত হইয়া গেল, কখন স্নানে যাইবে চিন্তা করিত। একবার সমুদ্রে নামিলে, আর উঠিতে চাহিত না। একদিন কণা হাসিয়া বলিল, 'মাগো! সতীশ, তুই সমুদ্রে স্নান করে করে নুলিয়াদের মত কালো হয়ে গেছিস্'।

সতীশ হাসে বলে, 'মনে করে নাও তোমার ভাই এই রকম কাল তাতে ক্ষতি কি।' এই ভাবে হাসি তামাসার মধ্যে দিন চলিতে লাগিল। বিকালের দিকে সতীশ সহরের মধ্যে দিদিকে লইয়া বেড়াইতে যাইত। কোন দিন জগন্নাথের মন্দির দেখিতে যাইত, কোন দিন গুণ্ডিচা বাড়ী, কোন দিন শঙ্করমঠ, কোন দিন গোঁসাইজীর মঠ, কোন দিন চক্রতীর্থ দেখিয়া স্বপ্নের মত দিনগুলি দ্রুত তালে কাটিয়া যাইতে লাগিল। দুইমাস পরে সতীশ কণাকে লইয়া শ্রীরামপুরে ফিরিল।

যথা সময় পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল সতীশ ভাল ভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর সতীশ শ্রীরামপুর কলেজেই আই, এ পড়িতে লাগিল। দুই বৎসর পরে আই, এ পাশ করিয়া সতীশ বি, এ পড়িতে লাগিল। বি, এ পরীক্ষার পর সতীশের মন আবার পুরীর দিকে ছুটিল। সতীশ আর এখন বালক নহে। বাল্যের চপলতা দূর হইয়া গিয়া বয়সের গাম্ভীর্য্য দেখা দিয়াছে। একদিন সতীশ কণাকে ধরে বল্লে, 'দিদি, চল আবার পুরী যাই।' কণা হাসিয়া উত্তর দিলে, 'তোর পুরী এত ভাল লেগে গেল কেনরে?' এবারও তাহারা পুরী আসিল। এবার চক্রতীর্থের দিকে বাসা ভাড়া করিল। নিকটেই 'নীলিমা কুটীরে' এক ভদ্রলোক ছিলেন তাঁহার নাম অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা অনুকে লইয়া স্বাস্থ্য

লাভের জন্য পুরী আসিয়াছিলেন। অণু সেবার বেথুন হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল। কণা বিশেষ করিয়া এই লাজুক মেয়েটীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সতীশ আর এখন দিদিকে লইয়া সমুদ্রতীরে দৌড়ায় না। সকাল সন্ধ্যায় স্থির হইয়া বসিয়া সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের শোভা সন্দর্শন করে। নিরীহ লাজুক ছেলেটী একদিন সন্ধ্যাকালে তন্ময় হইয়া সমুদ্র বক্ষে রঙের খেলা দেখিতেছে, এমনি সময় হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া দেখিল কণার সহিত অণুও সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছে। অণুর প্রতি সতীশের চক্ষু পড়িতেই উভয়ে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। ইহা চতুর কণার দৃষ্টি এড়াইল না। কণা চিন্তিত হইয়া পড়িল, ইহাদের উভয়ের মধ্যে জাতিগত বৈষম্যই যে ইহাদের মিলনের অন্তরায় হইবে এই ভাবিয়া। সতীশের মনোভাব জানিবার জন্য একদিন কণা বল্লে, 'সতু দেখ অমর বাবুর মেয়েটী বেশ নারে? সতীশ উত্তর দিলে, 'আমি কি করে জান্‌বো? আমি কি মিশেছি?' কণা বলিল, 'না মিশলে দেখে একটুও বোঝা যায় না?'

সতীশ উত্তরে বল্লে 'আমি অত শত বুঝি না।' তখন কণা একদিন অমর বাবুর স্ত্রীর নিকট কথা পাড়িল এবং আভাসে বুঝিতে পারিল যে সতীশের মত পাত্র পাইলে, তাঁহাদের অসবর্ণ বিবাহে খুব আপত্তি হইবে না। ইহার পর শ্রীরামপুরে ফিরিবার সময় কণার খুবই কষ্ট হইল। শ্রীরামপুর ফিরিবার কিছুদিন পর অণু কণাকে চিঠি দিলে যে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিছু দিন পর খবর আসিল সতীশও বি, এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। ছয় মাসের মধ্যে সতীশ চেষ্টা করিয়া কলিকাতার একটী অফিসে কাজ পাইল। প্রত্যহ শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিত। ইহারও কিছুদিন পরে, কণা মহাসমারোহে সতীশের সহিত অণুর বিবাহ দিয়া গৃহে বধূ আনিল।

অণু যেমন শান্ত, তেমনি বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে অল্প দিনের মধ্যেই কণার খুব অনুগত হইয়া পড়িল। অণু বিবাহের পর একবার মাত্র মায়ের কাছে গিয়াছিল, কণা আর পাঠায় না, তাহার একলা থাকৃতে কষ্ট হয় সেজন্য অমর বাবুও অণুকে লইবার জন্য অনাবশ্যক জিদ করেন না। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী জানিতেন যে তাঁহাদের অণু খুব আদরেই আছে। দেখিতে দেখিতে আনন্দের সহিত একটী বৎসর অতীত হইল। কণার কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনটী ভুল হয় না। সতীশকে পাইয়া অবধি এই তিথিটী তাহার নিকট পরম পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের এক বৎসর পরে সতীশ প্রবল জ্বর লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিল। ডাক্তার ডাকা হইল, কণা প্রাণপণ সেবা করিতে লাগিল, কিন্তু জ্বরের বিরাম নাই। অণু চিন্তিত মুখে বসিয়া থাকে, দিদি যাহা বলে তাহাই করে। অণুর মুখের অবস্থা দেখিয়া কণা একদিন জোর করিয়া উঠাইয়া দিল। কণা অণুকে বল্লে, 'অমন শুকো মুখ করে থাকিস্ না, একটু ছাদ থেকে ঘুরে আয়, কি চেহারা হয়ে যাচ্ছে। অণুর উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি সে দিদির আদেশ অমান্য করিল না। একমাস সাংঘাতিক রকম সংগ্রামের পর সতীশের জ্বর ছাড়িল।

একদিন সতীশ মৃদু কণ্ঠে বল্লে, দিদি আমার তো অসুখে চেহারা এই হয়েছে, কিন্তু তোমার

চেহারাটা কি হয়েছে, আয়না দিয়ে দেখ ত। কণা মৃদু হাসিয়া বল্লে, 'আমার কথা ছেড়ে দে, অণুর কি শ্রী হয়েছে দেখ্‌তো ?' ইহার উত্তরে সতীশ বল্লে, 'তোমার কথাই বা ছেড়ে দেব কেন ? তুমি না থাক্‌লে আমাদের এমন করে দেখ্‌বে কে,' কণা এবার কাতর কণ্ঠে বল্লে, 'ওকথা বলিস্‌ না, যিনি দেখ্‌বার তিনিই দেখ্‌ছেন্‌ আমরা তো কেবল নিমিত্ত মাত্র।' সতীশ বল্লে, 'আচ্ছা ওকথা থাক্‌, এখন কথা হচ্ছে, সকলেরই শরীরের অবস্থা যে রকম সকলেরই ঘুরে আসা উচিত। সামনেই পূজার ছুটী!' অণু বল্লে, 'এবার দার্জ্জিলিংএ গেলে বেশ হয়।' সতীশ বল্লে, 'হ্যাঁ সেই ভাল, পুরী আমার কাছে তো তীর্থস্থান হয়ে রইল, এবার দার্জ্জিলিং যাওয়া যাক্‌। পুরীর নাম উল্লেখে অণু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আনন্দই অনুভব করিল।

যথা সময়ে কণারা সকলে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিল। সতীশ ও অণুর কৌতুহলের সীমা নাই! শিলিগুড়িতে যখন ট্রেণ বদল করিয়া তাহারা ছোট গাড়ীতে উঠিল, অণুরা হাসিতে লাগিল। ট্রেণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। গাড়ী যতই উপরে উঠিতে লাগিল নীচের খাদগুলি ততই ভয়াবহ হইয়া উঠিতে লাগিল। পর্ব্বত গাত্রে কোথাও পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতে ছিল, কোথাও বা সারি সারি 'চা' বাগানের শ্যামল শোভা নয়ন রঞ্জন করিতেছিল। এই সব দৃশ্য সমতলে চক্ষে পড়ে না, সেই জন্যই এক অপূর্ব্ব অনুভূতির উদ্রেক হয়। তিনধেরিয়া ষ্টেসন হইতে দার্জ্জিলিংএর বিখ্যাত বৃষ্টি দেখা দিল। পথে তাহারা 'পাগলা ঝোরার' প্রলয় নাচন দেখিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহারা কার্সিয়াং ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পর সর্ব্বোচ্চ ষ্টেসন ঘুমে যখন গাড়ী থামিল, তখন তাহারা শীতের প্রকোপ বুঝিতে পারিল।

অবশেষে ট্রেণ আসিয়া দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে থামিল। জিনিষ পত্র কুলির পিঠে দিয়া সতীশরা কার্ট রোড পার হইয়া অক্‌ল্যাণ্ড রোডে উঠিল। বিকালে যথা সম্ভব গরম বস্ত্রে আবৃত হইয়া তিন জনে বেড়াইতে বাহির হয়। কোন দিন বার্টহিলে যায়, কোন দিন বোটানিকাল গার্ডেনে, কোন দিন কাটা পাহাড়, জলা পাহাড় বা ম্যালে ঘুরিয়া আসে। জনসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায়, সহর তেমন ভাল লাগে না। দার্জ্জিলিংস্থ বাঙ্গালীগণ মিলিত হইয়া দুর্গা পূজা করিলেন। কালী পূজাও হইয়া গেল। ছুটী ফুরাইয়া আসিল। এবার গিয়া সতীশকে কার্য্যে যোগ দিতে হইবে। দার্জ্জিলিংএ থাকিতে থাকিতেই ভাই ফোঁটার দিন আসিয়া পড়িল। সেই দিন প্রত্যুষে উঠিয়া কণা চন্দন ঘষিয়া, ফুল আনাইয়া, স্বহস্তে আহার্য্যবস্তু প্রস্তুত করিল। সতীশ নূতন কাপড় পরিয়া বসিলে কণা তাহার ললাটে চন্দন ও দধির ফোটা দিল। অতঃপর তাহাকে ধান দুর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিল। সতীশ কণাকে প্রণাম করিল। এই সময় কণা অণুকে ডেকে বল্লে, 'অণু ওঘর থেকে খাবারের থালাটা নিয়ে আয়।' অণু খাবার থালা হাতে সেই ঘরে প্রবেশ করলে ও হাসি মুখে বল্লে, 'দিদি নিন্‌, আপনার কচি ভাইকে খাইয়ে দিন।' কণাও হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিল,' ছোট ভাই যতই বড় হোক্‌ না কেন, চিরকাল ছোটই থাকে।' সতীশ ইঙ্গিতে অণুকে শাসাইল। চতুর্দ্দিকে শান্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল, এমন সময় অদূরে একজন লোক গাহিয়া উঠিল :—

'কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।'

"আমরা কি চাই ও কেন চাহি ?"

শ্রীহাসিরাশি দেবী

ভারতে আজ যে কয়টি সমস্যা জাতি এবং জীবনের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে বর্ত্তমান নারী-সমাজ সমস্যা তাহার অন্যতম। উপস্থিত আমি যাহা বলিতে বা বুঝাইতে চাহি, তাহা ইহাই যে, ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিনা এবং তাঁহাদের বিষয়ে কিছু বলিবার মত ক্ষমতাও আমার নাই, তবুও বাংলার অতি সাধারণ মেয়েদের সম্বন্ধে জাতি-বিভাগের বৈশিষ্ট্য এবং আদর্শ-বাদই এই লেখার উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ্য না করিয়া আমি যাহা বলিবার এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি ইহাতে ত্রুটী থাকিতে পারে, এবং ত্রুটী ছাড়িয়াও এ পর্য্যন্ত কোনও কার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়ার বিশ্বাসে আপনাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রথমতঃ দেখা যায় বাঙ্গালীর জীবন-ইতিহাস অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত হইলেও বর্ত্তমানে সে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে শুধু দারিদ্র্যের পীড়নে। এই দারিদ্র্য কোথা হইতে এবং কিরূপে আসিল তাহার আলোচনা বহু সভা-সমিতি, জন-সমাজ এবং বহু মাসিক ও দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ করিয়া প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এবং তাহা অপেক্ষাও গভীরভাবে অনুভুত হইতেছে প্রাত্যহিক জীবনে; কিন্তু, ইহাও সত্য যে ইহার একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে গৃহ-বিবাদে, এবং ইহারও একটি প্রধান স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে নর ও নারীর সামাজিক সমস্যায়! মানুষ যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, সেইখানেই সে সৃষ্টি করিয়াছে কর্ম্ম, এবং এই বহুমুখী কর্ম্ম একই নিয়মে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বাঁচিতে পারে না বলিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে জাতি, ও জাতির প্রয়োজনে সমাজ; কিন্তু এই সমাজেরও যে কালের প্রয়োজনে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা কেহ কেহ অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই বলিবার সাহস করিতেছি যে, যে কালের গতিচক্রে আজ সুজলা সুফলা শ্যামলা বাংলা দেশের স্রোত এবং পথহীন নদীতে শস্য ও শিল্পের ভার বহিয়া নৌকা চলেনা, অধিকাংশ সময় বিশুদ্ধ পানীয় অভাবে বাংলারই শত শত ছেলেমেয়ে নানা রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুর চেয়েও কষ্টকর জীবন বহন করে, যে দেশে সুফলের পরিবর্ত্তে বন বাদাড়ের অকর্ম্মণ্য শ্যামলতা চোখ ভরিয়া দেখিবার আগেই অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, অচিকিৎসায় অকাল বার্দ্ধক্যে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, এবং টেক্স ও বাকী খাজনার দায়ে পূর্ব্ব পুরুষের বাস্তু-ভিটা নীলামের বাজারে উঠিয়াও উপযুক্ত দাম মেলেনা সে দেশের পূর্ব্ব গরিমা অহঃরহঃ স্মরণ করিয়া আদর্শবাদী দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার মত ক্ষমতা আজিও আমাদের আছে কি? আজ বাংলার নারীসমাজে সমস্যা যে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে, যথার্থ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে তাহার মূলেও নিহিত আছে

এই বিরাট অর্থাভাব। যেদিন বাংলার অসংখ্য শিল্পীদ্বারা বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্য ব্যবসায় চলিত সেদিন ঘরের পয়সা দিয়া পরের শিল্প ঘরে আনিবার বিশেষ দরকার হয় নাই, কিন্তু বাংলা আজ বাঙ্গালীর শিল্পহীন, দুই একটী, যাহা বাঙ্গালার শিল্প প্রতিষ্ঠান নামে চলে তাহাও অন্যদেশ এবং অন্য জাতির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। ইহার কারণ ভারতের অন্যদেশ অপেক্ষা বাংলার দারিদ্র্য বেশী, এবং বাংলার যাহা ধনৈশ্বর্য্য তাহা মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায়ে নিবদ্ধতার জন্য শিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকার দিনের পর দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চাকুরীর আশায় পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছে। ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কে করিবে?

পরিবারবর্গ বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, বিধবা বা কুমারী ভগিনী, নাবালক ভ্রাতা, অকর্ম্মণ্য পিতা এবং তদুপরি নির্ভরশীল আত্মীয় স্বজন, ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী; এবং এই সকল স্ত্রীলোকেরা হয় বিধবা, নয় কুমারী, কিম্বা স্বামীপরিত্যক্তা। হিন্দুসমাজ ইঁহাদিগকে পদে পদে সমাজচ্যুত হইবার ভয় দেখানো ছাড়া এবং আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ হইবার ব্যবস্থা দেওয়া ছাড়া ইহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ এবং ভরণ পোষণের কোনও সম্মানজনক ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; অথচ সুযোগ এবং বিন্দুমাত্র সুবিধা পাইলেও ইঁহারা যে কোনও আর্থিক সচ্ছলতার কার্য্য করিতে সক্ষম কিন্তু তাহা হইলেও বাংলার হিন্দুর ঘরে ঘরে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবনযাত্রা পথের এই আবর্জ্জনা আজিও আদর্শ নামে অভিহিত। অনুন্নত সম্প্রদায়ে বিবাহেচ্ছু বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থাও চলন আছে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েও যে বাল-বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহাও যে সমাজে অশ্রদ্ধেয় তাহা সকলেই জানেন। তবু, ইঁহাদের কথা বাদ দিলেও থাকিয়া যায় বয়স্থা কুমারীর বিবাহ, স্বামী পরিত্যক্তা ও পুনর্বিবাহে অনিচ্ছু বিধবাদের কথা। এই সকল নারীজীবন কি করিয়া কাটিবে?

অলস মস্তিষ্ক যে শয়তানের কারখানা ইহাও সর্ব্বজনবিদিত। সু-শিক্ষা না পাইলে এই সকল স্ত্রীলোক উন্নতপন্থীর কোন কাজে আসিতে পারে না; কিন্তু পাইলে নিজের এবং অপরের জীবনও অনেক অংশে উন্নত করিতে পারেন। সু-শিক্ষা বলিতে স্কুল কলেজে পাঠাভ্যাস অথবা ঠাকুরমা দিদিমাদের নিকট নীতি কথা শুনাই চরম নহে, কিন্তু ইহাকে বাদ দিলেও চলিবে না, কিম্বা বয়সানুযায়ী নিয়মানুবদ্ধতাতেও সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ সকল নারীই সমান বুদ্ধি, কর্ম্মানুরাগ কিম্বা কর্ত্তব্যের নিষ্ঠা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই; এবং এই পঙ্গু জীবন হইতে একেবারে উঠিয়াই যে চলিতে আরম্ভ করিবেন বা পারিবেন ইহাও অসম্ভব। তাহা হইলেও স্কুল কলেজের পাঠ, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান এবং তৎসহ ব্যায়ামশিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনীয় এবং এই সকল মেয়েদের বিবাহ সমস্যা ইঁহাদের হাতে এইজন্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিত যে জীবনের নানা জটিল পথ অনুসন্ধান শেষে ইঁহারা যে স্থানে পৌঁছাইবেন, আশা করা যায় সে স্থানের আশ্রয় পূর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ হইবে।

অবশ্য ইহাতে সকল সময়ে স্ত্রী-পুরুষের পৃথক পথ না হইতে পারে, এবং এই মেলা মেশার ফলে দুই একটি কুফলও যে না ফলিবে তাহাও আশা করা যায় না, কিন্তু ইহাও সকলে জানেন যে জমি শস্যোৎপাদন করে, তাহা যত্নাভাবে সময় সময় আবর্জ্জনাও সৃষ্টি করিয়া থাকে।

শুধু বাঙ্গালী কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় কোন দেশের কোন জাতি পর ভরসায় বাঁচিয়া নাই, কিম্বা থাকিতেও পারেনা, যদি সে আত্মশক্তির অনুশীলন না করে। আত্মার প্রয়োজন যেখানে শক্তিহীন, জড়,—সেখানে প্রয়োজন যত বড়ই হোক না কেন, প্রয়োজনীয়ের চির অভাব থাকিবেই; এবং এই অভাবের পরিণাম জাতির মৃত্যু।

কোনও দেশের নর যেমন নারীকে পদাঘাত করিয়া জাতির সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিতে পারে নাই, নারীও তেমনি নরকে অবহেলা করিয়া বাঁচিতে পারে না। উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন, এবং এই প্রয়োজনে নারীকে আজ সতীত্ব ও দেবীত্বের দোহাই দিয়া পৌরুষত্বের শূন্য-ভাণ্ডারে অপরাধের ফাঁশীকাষ্ঠে হত্যা করিবার দাবী সভ্যমনুষ্য সমাজে টিকিতে পারেনা।

নারীর অন্তর-অশুদ্ধির দোহাই দিয়া নরগঠিত শাস্ত্র এবং সমাজ যতই তীব্র মতবাদ প্রকাশ করুন, একথা তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে আজ যে অর্থ-সমস্যা তাঁহাদের শ্বাস-নালী টিপিয়া ধরিয়াছে ইহারই ফল ফলিবার উদ্যোগ করিতেছে তাঁহাদের অন্তঃপুর রাজত্বে, এবং ইহাও সত্য যে রাজত্ব পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ছিল, তাহা এই অভাবের ফলে হইয়া উঠিয়াছে শুধু কারাগার। কালের গতি প্রভাবে ইহারই প্রাচীরে ফাটল ধরিয়া যে সূর্য্যের ক্ষীণ-রশ্মি কক্ষতলে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার আলোকে নারী স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে সূতিকা-গৃহে শিশু ও প্রসূতির অপমৃত্যু, ভবিষ্যৎ ভরসাহীন অন্ধ, বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম।

ইহার জন্য দায়ী কে, এবং জন্মাবধি দৈন্য এবং দুঃখ-বর্দ্ধিত কুশিক্ষিতের দল দেশের এবং মহামানব সমাজের কোন কাজে লাগিবে?

বাধ্যতামূলক লিখন ও পঠন শিক্ষা যে শুধু ছেলেদের নয় মেয়েদেরও দরকার তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও বিশেষ কোনও ফল হয় নাই; কারণ যে দেশে গৌরীদানের মোহ সর্দ্দাবিল-পাশকেও তুচ্ছ করিয়া আজিও শত শত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে, এই সকল কর্ম্মকর্ত্তা ও পিতা শিশু-সন্তানদের কোন্ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মানবসমাজ ও দেশের উপকার করিতেছেন?

অথচ যাঁহারা অন্যান্য দেশ ও জাতির কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত নর-নারী সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশ করিয়া এবং অপ্রকাশ রাখিয়া ঐ সকল দেশের চালচলন সম্বন্ধে সদা সতর্কতার সহিত অন্তঃপুররক্ষার ভার গ্রহণ করেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন কি যে ঐ সকল দেশে আমাদের দেশের মত সধবা, বিধবা, কুমারী নারী, বা বিবাহিতা ও স্বামীর সহিত ঘর সংসার করিতেছে

এরূপ নারীহরণ ও ধর্ষণ হয়না, এবং ষোলো বৎসর বয়সেই অধিকাংশ মেয়ে তিন চারটি সন্তানের জননী হইয়া পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে ও স্বাস্থ্যকর স্থানাভাবে যক্ষ্মা কিম্বা অন্যান্য অসুখে মারা যায় না !

আজ বাংলার যতগুলি মেয়ে ভুল পথে গিয়াছেন কিম্বা ধর্ষিতা হইয়া অধুনা স্থাপিত অবলাআশ্রম বা নারীরক্ষক সমিতি ইত্যাদির আশ্রয়ে কোনওরূপে দিনাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদের কয়জনকে কোন আত্মীয় অথবা সমাজ পূর্ব্বের মত সসম্মানে গ্রহণ করিতে পারেন ? যে দুই একজন পুরুষ তাঁহাদের দুই একজনকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বেশীর ভাগ হয় সুনাম কিনিবার হুজুগে পড়িয়া, নয় নেহাৎ দয়ায় ; কিন্তু তাহাও অশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। যেন ঐ সমস্ত নারীজীবনে সামাজিক গৃহের সমস্ত দাবীই ফুরাইয়া গিয়াছে। চেষ্টা করিলে কি ইহারা দেশের এবং জাতির কোনও কাজেই আসিতে পারে না ?

কিন্তু যে দেশ স্ব-অধিকার বর্জ্জিত, সমাজ কুসংস্কারের পদানত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন, সে আজিও পুরাতন আদর্শের ভাঙ্গা মাস্তুল তুলিয়া ধরিয়া এই সব বিড়ম্বিত জীবনে কোনও লক্ষ্য-পতাকা দেখাইতে পারেনা ; সুতরাং বর্ত্তমান নারী-জীবনে আজ যে সমস্যা ও আন্দোলন দেখা দিয়াছে ইহার বীজও যে পুরুষেরই দায়িত্ব-জ্ঞান-হীনতায় রোপিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই আন্দোলন যে কোনও পথে অগ্রসর হইবেই ও হইলেও একথা সত্য নহে যে মাতা ভগ্নি, স্ত্রী-কন্যার চিহ্ন বাংলার ধূলায় লুপ্ত হইয়া সেখানে সৃষ্ট হইবে এক আসুরিক-লীলা-ক্ষেত্র চারিণী।

যেন কেহ না বোঝেন, যে, বিবাহ থাকিবেনা, গৃহ বা সমাজের প্রয়োজন নাই।

এই সমস্তই থাকিবে, কিন্তু যুগে যুগে সংস্কৃত হইয়া এবং এই যুগোপযোগী গতি যাহাতে সবল স্বাচ্ছন্দতার বিবেচনাধীনে চালিত হয় ইহাই প্রার্থনীয়।

জাতি ও দেশের উন্নতি নির্ভর করে মনুষ্যসমাজের উপরে। এই সমাজ যাহাতে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ধরা না পড়ে ইহা প্রত্যেক দেশবাসীর দেখা কর্ত্তব্য ও এই কর্ত্তব্যের প্রথম প্রয়োজন আর্থিক ও শারীরিক শক্তির উন্নতি। ইহার উপরেই আত্মোন্নতি বেশীর ভাগ নির্ভর করে। কারণ দেহ ও মনের সম্বন্ধ অতি নিকটতম।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত (তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃক অনুষ্ঠিত)

নববধূ

শ্রীআশালতা সিংহ

(৩)

কমলার খুড়তুত ভাই হরিদাস ও তাহাদের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। মাঠের চারিপাশে বুট্ অড়হর এবং সরিষ'র ক্ষেত্র। সরু আলের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বড়দা ছড়ি দিয়া চারা গাছের উপর আঘাত করিতে করিতে পূর্ব্বপ্রসঙ্গের জের টানিয়া কহিলেন, "হরিদাস তুমি বাড়ীতে থাক, তোমার উচিত কমলার পড়াশোনা দেখে দেওয়া। ইংরেজীতে যাতে একটু কথা বল্‌তে পারে, খবরের কাগজ পারে পড়তে এটুকুও তো তোমার বিদ্যেয় কুলোয়।"

হরিদাস নিস্পৃহ সুরে কহিল, "কী হবে তাতে?"

"কী হবে?...এমন প্রশ্ন তুমি বলেই করতে পারলে। আজকালকার আপ-টু-ডেট্ সোসাইটিতে চলা ফেরা করতে হ'লে এযে পদে পদে দরকার হয়। আর মেয়ে হয়ে জন্মেচে বলেই যে কমলার সারা জীবনটা অন্ধকারে কাটবে, এমন তো না'ও হতে পারে।"

"কী করবে তোমরা? আপ্ টু ডেট্ সমাজে বিয়ে দেবে এই তো? সেখানে বাংলাকথার মাঝে মাঝে দুটো ইংরেজী বুক্‌নি ছড়িয়ে দিতেই হবে। কোন নভেলটা সবচেয়ে নতুন ধরণের, গোল্ডস্ট্যাণ্ডার্ড আবার উঠ্‌লো কিনা করতে হবে তারই বিষয়ে একটু আধটু গল্প স্বল্প। কিন্তু আমি বলি এসব না করে, জ্যাঠামশায় যখন রোজ সূর্য্য উঠবার আগে ভোর বেলায় সাজিহাতে ঠাকুরের পূজোর জন্যে ফুল তোলেন সেই সময় কমলা যদি তাঁর সঙ্গে থাকে, এমন কিছু শিখবে যা সারাজীবনেও মনে থাকবে।"

"যত সব কুসংস্কার!"—ছোটদা পকেট হইতে রুমাল বার করিয়া মুছিতে কহিলেন, "দুটো ঠাকুর পূজোর মন্ত্র শিখে লাভটা কি? বাবার উপর হরিদাসের একটা অহেতুক ভক্তি রয়েচে। ভক্তি অবশ্য ভালো, কিন্তু অন্ধভক্তি নয়।"

হরিদাস শান্তভাবে বলিল, "আমার ভক্তি অন্ধ কি চক্ষুষ্মান তা নিয়ে আমি তর্ক কোরবনা। ওঁ জিনিষ আমার তর্কের বাইরে কিন্তু অবশ্য তোমরা আমাকে ভুল বুঝোনা। ইংরিজী শেখার উপর আমার অচলা নিষ্ঠা রয়েচে যদিচ তোমাদের মত অসীম উচ্ছ্বাস নেই। ইংরিজীতে অনেক কাব্য অনেক ইতিহাস জগতের অনেক ভালো বইয়ের অনুবাদ রয়েচে শুধু সেইজন্যেই ইংরিজী শেখা অত্যাবশ্যক। কমলা যদি ভালো করে ইংরিজী শিখতে চায়,

সবচেয়ে খুসী হব আমি। কিন্তু সে তা চায়না, তার দেখছি ফ্যাশানের দিকেই বেশি মন। আর তোমরা রাগ কোরনা, এই নতুন নতুন ফ্যাশানের কামনা আর তার ইন্ধন তোমরাই জোগাচ্চ।"

কমলা তাহার কোপ কটাক্ষ হরিদাসের প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই দুটি রোষারুণ চক্ষের দিকে চাহিয়া হরিদাস হাসিয়া কহিল, "কমল আমার উপর রাগ করেচে জানি, কিন্তু তাও জানি মিথ্যা দিয়ে ওকে আমি ভোলাতে পারবনা কিছুতেই, যদি আমি ওর অপ্রিয় হই তবুও।"

বড়দা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "না হয় মানলুম আমারাই ওকে ভোলাই, কিন্তু ভালো করে ইংরিজী শেখাবার ভার তুমি নিতে রাজী রয়েচ নাকি হরিদাস? বলি ভার বহন করতে পারবে ত? বিদ্যায় কুলোবে?"

হরিদাস নতমুখে কহিল, "বোধ হয় পারব। য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রী না নিয়েও কি পড়াশোনার চর্চ্চা করা যায় না?"……কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। কোন রকম করিয়া প্রসঙ্গান্তরে যাইতে পারিলেই যেন বাঁচে।

কিন্তু সে কিছু বলিবার আগেই বড়দা বলিলেন, "কিন্তু তোমার ঐ সব সেকেলে মতামত পড়াতে যেয়ে কমলার মাথায় ঢুকিয়ে দাও তা আমি চাইনে।"

কমলা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বড়দার মুখের পানে চাহিল।

৪

যে কদিন গ্রীষ্মের বন্ধ রহিল, কমলার দাদারা এইরূপ নব্যশিক্ষা, নব্যনীতি, নারীসমাজের অশেষবিধ সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাকার বস্তু লইয়া বিস্তর বকাবকি করিলেন এবং বন্ধ ফুরাইয়া গেলে তল্পিতল্পা বাঁধিয়া কলিকাতা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তারপরে আবার সুরু হইল তাঁহাদের অভ্যস্ত নাগরিক জীবন। সেই ব্যস্ততা, সেই কোলাহল, উত্তেজনা, জনসংঘাত। কলেজে প্রক্সি দেওয়া, প্রফেসরদের লইয়া সমালোচনা, নতুন নতুন সিনেমা, নূতনতর আর্টের ব্যাখ্যা। কোন কিছুরই ব্যত্যয় ঘটে না। কিন্তু স্নিগ্ধ পল্লীভবনের মাঝে একটি নিরালাগৃহের কোণে কমলার দিনগুলা আর ঠিক আগেকার মত করিয়া কাটিতে চাহিল না। আগে এই ছোটগ্রামের ছোট খাট সুখ দুঃখ আনন্দ উৎসব তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কালীপূজার দশদিন আগে হইতে মাটির প্রদীপ গড়িয়া, দুর্গাপূজায় পালেদের প্রতিমার গঠননৈপুণ্য এবং সাজসজ্জা মুগ্ধ চিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া, বৈশাখ মাসে ভোর হইতে না হইতে ফুল তুলিয়া সাজি ভরাইয়া সঙ্গিনীদের সঙ্গে হরির চরণ, পুণ্যিপুকুর ব্রত করিয়া এক অখণ্ড আনন্দের মাঝে সে দিন কাটাইয়াছে। কিন্তু এখন তাহার চিত্তের মাঝে আসিয়া লাগিয়াছে অন্য এক সুর। যে আকাশে বাতাসে কেবল সজীবতা ছিল এখন সেখানে দার্শনিকতত্ত্ব আসিয়া আসন জুড়িয়া বসিয়াছে। কমলার সইরা যখন আসিয়া

ডাক দেয়, 'কমল কাপড় কাচতে যাবিনে?' তখন কমলার মনে হয় রোজ পুকুরে স্নান করিলে রঙ্ যে কিছু ময়লা হইয়াই যায় একথাটা ছোটদা নেহাৎ মিথ্যা বলেন নাই। তাহা ছাড়া অতখানি সময় নষ্ট, আর সইরা যে ধরণের কথা বলে আর যে সকল গ্রাম্য রসিকতা করে মাঝে মাঝে কমলার তাহা অসহ্য লাগে। তার চেয়ে ভিনোলিয়া সাবান দিয়া বাড়ীতে স্নান করা প্রশস্ত।

গোপীনাথের মন্দিরে কমলা রোজ সন্ধ্যামণি ফুলের বিনাসূতার মালা গাঁথিয়া দিত। আজকাল অপরাহ্ণ বেলায় ফুল তুলিতে যাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়া সখীরা বারংবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেছে। কমলা সে সময়টা নুতন নূতন বাংলা নভেল পড়িয়া কাটায়। উপন্যাস পড়িতে পড়িতে নায়িকার দুঃখে ক্ষুব্ধ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এবং ছোটদাকে চিঠি লেখে এই ধরণের উপন্যাস রেজেষ্ট্রি পার্শ্বেলে তিনি যেন আরও কমলার জন্য পাঠাইয়া দেন। আদরের বোনটির অনুরোধ তখনই রক্ষিত হয়।

(৫)

সাদাসিধা ঘরটি। একপাশে কাঠের ছোট একটি তক্তপোষ। দেয়ালের গায়ে কাঠের তাকে সারি সারি বই সাজান। দড়ির আলনায় বঙ্গলক্ষ্মীমিলের মোটা নরুণ পাড়ের খান দুই ধুতি। হরিদাসের ঘর এইখানি। বাড়ীর একমাত্র ছেলে কিন্তু তাহার গৃহসজ্জার উপকরণ লইয়া কেহ কোনদিন মাথা ঘামায় নাই। কমলার মা এক আধদিন বেড়াইতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ছোট বৌ তোর বুদ্ধি শুদ্ধি কি চিরকালই একরকম থাকবে। সাতটা নয় পাঁচটা নয় একমাত্র ছেলে, ঘরখানা তার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবি। একটা ছোট বোম্বাই প্যাটার্ণের পালঙ্ক হোল, তারই সঙ্গে মিলিয়ে একটা নেটের মশারি। ছোট একটা পাথরের টেবিল দিতে পারিস। ছেলেরা এতবার যায় আসে বলেদিলেই পছন্দ মত সৌখীন জিনিষ পাতি নিয়ে আসতে পারে।"

ছোট বৌ কৃষ্ণভাবিনী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিয়াছেন; "বট্ ঠাকুরের ঘরখানায় একবার ঢুকে দেখো দিদি, মনের জ্বালা যন্ত্রণা যেন ঘর খানিতে দু'দণ্ড বসলেই জুড়িয়ে যায়। দু'বেলা প্রদীপ দিতে আর সন্ধ্যে দেখাতে সেখানে যাই কিনা। সেখানে যেয়ে আমার অনেক সন্দেহ আপনি মিটে গেচে, অনেক সখ নিজের থেকেই মিটেগেছে। এর পরে হরিকে আমি নেটের মশারি টাঙ্গাতে কোনদিন জেদ করতে পারিনি।"

"তোমার ওই এক কথা! বট্ ঠাকুরের মাঝে যে কী দেখতে পেচে জানিনা। দিবারাত্রি মুখে গুণ কীর্ত্তন লেগেই রয়েচে।"—বলিয়া প্রমীলা কৃত্রিম কোপ মুখে দেখাইলেও স্বামীগর্ব্বে ঈষৎ গর্ব্বিতা হইয়া প্রস্থান করিতেন।

সেই অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র ঘরখানিতে বাতায়ন পথে শরৎ প্রভাতের সোনালি রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। হরিদাস এইমাত্র খামারের কাজ দেখিয়া চৌকিতে আসিয়া বসিল। শরৎকালের রৌদ্র রঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন অভিভূত হইয়া উঠে।

সমস্ত মনে গভীর এবং নিবিড় এক শান্তি। আকাশে বাতাসে দিকে দিকে যেন উৎসাহ আর আনন্দসঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। আগামী পূজার আসন্ন উৎসবের আনন্দ সমস্ত গ্রামবাসীর মনে যে হিল্লোল্ তুলিয়াছে তাহারই তরঙ্গ যেন আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে শিশির স্নাত ঝরিয়া পড়া শেফালী ফুলের রাশিকে, মেঘলেশহীন ঘন নীল আকাশকে। সবেমাত্র হরিদাস আজিকার খবরের কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছে, পিছন হইতে কমলা এক আঁচল শিউলি ফুল লইয়া ঝর ঝর করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল, 'হরিদা, তুমি শিউলিফুল বড় ভালোবাস, নয়? তাই আমি সকাল বেলায় কুড়িয়ে এনেচি।'

কমলা চলিয়া যাইতেছিল, হরিদাস তাহার বাঁ হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল,

"একটু বোস্ না কমলা, সেই তো তাড়াতাড়ি যেয়ে নভেল খুলে বসবি।"

"হরিদা, তুমি যেন তর্কলঙ্কার ঠাকুর। নভেলই যদি পড়তে বসি, সেটা এমন কী দোষের হবে?"

"নভেল পড়া দোষ তা বলিনে। কিন্তু বাজে নভেল আর অতিরিক্ত নভেল পড়া দোষ বই কি। তাতে ক্ষতি হয়।"

"কিসের ক্ষতি?"

"প্রথমে বাজে নভেল পড়ার কথাই বলি। যদি তুই রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়র পড়িস্ আমি আপত্তি কোরবনা। কারণ তাঁদের লেখা বেশি করে পড়লে শুধু যে মনে আনন্দ পাওয়া যায় তাই নয়, বড় বড় শিল্পী আর কবির সৌন্দর্য্যময় রচনা রীতির কিছু কিছু ছাপ তোর চিন্তার মধ্যে তোর মনের অনেক সঙ্গোপন কোণের মধ্যে রয়ে যাবে। তোর প্রত্যেক কাজকেও হয় তো অলক্ষ্য প্রভাবান্বিত কোরবে। ঠিক তেমনি খারাপ লেখা পড়্লে এরই বিপরীত ফল হবে। শুধু যে তোর রুচি যাবে ছোট হয়ে নিস্তেজ হয়ে তাই নয়। ক্ষতির পরিমাণটা অদৃশ্যদিক দিয়ে আরও নানাদিকে ছড়িয়ে পড়বে।"

"তুমি যে দেখচি কথায় কথায় মুখে মুখে বক্তৃতা বানাও!"

"বক্তৃতা বানাইনে কমল। কেবল তোকে বড় বেশি ভালোবাসি বলে অল্পতেই আশঙ্কা হয়।"

"না গো মশাই, আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ছোটদা আমাকে নিজে বেছে বেছে হাল আমলের সমস্ত নামজাদা বই পাঠায়। সে সব আর যাই হোক্ বাজে বই নয়, তোমাকে হলফ্ করে বলতে পারি। কিন্তু বেশি নভেল পড়ার দোষটা কি বল্লেনা? বড় যে বাদ দিলে।"

"বেশি লঙ্কা মরীচের ঝাল খেলে কী হয় বল তো? এমনই অভ্যেস হয়ে যায় যে তারপরে আর কোন জিনিষের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায়না। বেশি নভেল ক্রমাগত পড়তে থাকলে জীবন সম্বন্ধে সর্ব্বদাই একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজিত ভাব জাগ্রত হয়ে থাকে। এরই উগ্রতায়

সারা মন এমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় যে জীবনের সাদাসিধে সুখ দুঃখ ঘরোয়া কথা আমোলই পায় না। সব জিনিষেই একটা অতৃপ্তি আসে। কল্পনার উগ্রতার সঙ্গে বাস্তবের যখন মেলে না তখনই এই অতৃপ্তির উৎপত্তি হয়।"

"তোমার সব কথা বুঝতে পারিনে হরিদা, কিন্তু কি বলছিলে বল। ভয় নেই এমন নভেল আমি পড়তে যাবনা। একটা সেলাই আরম্ভ করেচি তাঁর খানিকটা বাকী আছে সেইটে শেষ করব।"

"যা বলব মনে মনে তৈরী করে নিই, এই পাশের চৌকিটায় ততক্ষণ একটু বোস্।"

"কী এমন কথা?"

"কাল সকাল বেলায় আমি আর জ্যেঠামশায় বাগানে ফুল তুলছিলুম..."

"এমন তো তোমরা রোজই তোল।"

'শোননা, রোজই তুলি, কিন্তু রোজ জ্যেঠামহাশয় নিঃশব্দে থাকেন কিংবা গুন্ গুন্ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। সেদিন বল্লেন, হরি, কমলের কেমন জায়গায় বিয়ে দিতে হবে তা কি কখনো ভেবেচ? সে ষোল পেরিয়ে এই সামনের কার্ত্তিকে সতেরোয় পড়বে। আর তো এ বিষয়ে না ভেবে থাকতে পারিনে। পাড়াগাঁয়ে এত বয়স অবধি মেয়ে থাকলে নিন্দে ওঠে, রাখাই যায় না। কেবল আমাকে সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে বলে এ অবধি আমার আচরণের কোন সমালোচনা তোলেনি আর আমিও সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করতুম ভালো করে বিচারবুদ্ধি বিকশিত না হলে কন্যার বিবাহ কখনো দিতে নেই। কিন্তু আর সে ওজর চলেনা। কমলা চলে গেলে ঘর আমাদের শূন্য হয়ে যাবে তবুও এবারে ভাবতে হয়েচে সে কোথায় যাবে।"...

কমলা লজ্জা পাইল, অধোমুখী হইয়া কহিল, 'একথা আমাকে কেন শোনাচ্চ, আমি এ সবের কী জানি।'

'বাঃ তুমি জানবেনা যদি তবে কে জানবে? শোন কমলা, লজ্জা করিস্‌নে, জ্যেঠামহাশয় আমাকেই জিজ্ঞেস করবার ভার দিয়েচেন।'

'কিসের?'

'তোমার পছন্দের ধারা কেমন সে তুমি খুলে বল। আগেকার রাজকন্যাদের স্বয়ম্বর হোত, একালে তা অচল। একালে মন জানাজানির জন্যে মেয়ে পুরুষে একত্রে টেনিস খেলে, রেস্তোরাঁয় খায়, সিনেমা দেখে, মোটরে বেড়ায়, কিন্তু তুই জানিস নিশ্চয় আমাদের পাড়াগাঁয়ের কমলের জন্যে তা'ও জুটবেনা। কাজেই লজ্জা না রেখে খুলে বল। তবেই না আমরা পান্তা পাব।'

কমলা লাল হইয়া কহিল, 'হরিদা, সকাল থেকে উঠে আমার সঙ্গে তামাসা সুরু করলে। আমি কী জানি, বাবা যা ভালো বুঝবেন তাই হবে।' হরিদাস এইবারে একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "কিন্তু সেইখানেই যে জ্যেঠামহাশয়ের মনের সন্দেহ ঘোচেনা। তিনি বলেন, 'কমলকে যদি আমি

আমার নিজের মনের মত করে গড়ে তুল্‌তাম, হয়তো তবে তাকে না শুধিয়েও বলতে পারতুম তার মনের গতিবিধি। কিন্তু আজ দেখি তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ অপরিচয়।' তবে এটা তিনি আঁচ করেই রেখেচেন সহরে থাকে, উচ্চশিক্ষিত, আজকালকার যুগের সঙ্গে আচারব্যবহারের তাল মিলিয়ে চলতে পারে এমন ঘর তোমার জন্যে খোঁজ করতে হবে। পাড়াগাঁয়ে তুমি থাকতে পারবেনা, তোমার কষ্ট হবে'।'

কমলা বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে মৃদু কণ্ঠে কহিল, 'হরিদা, সত্যিকি খুব তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে করতেই হবে? যেমন আছি এমন থাকতে পাবনা?'

কমলার কণ্ঠস্বরে এমন একটু সকরুণ ভীত ভাব ছিল যে তাহা মনকে স্পর্শ করে। হরিদাস স্নিগ্ধস্বরে কহিল, 'বিয়ে করতে হবে বইকি ভাই। দেশচার বলে একটা জিনিষ আছে মানো ত? বিশেষ করে আমাদের এই পাড়াগাঁয়ের সমাজে।'

"আমার যেন কী রকম ভয় করে হরিদা। মনে হয় তাহলেই তো তোমাদের ছেড়ে, চিরকালের এই সব সঙ্গী সাথী ছেড়ে কোথায় কতদূরে চলে যেতে হবে। সেখানে দীঘির পাড়ে কি বকুল ফুল ঝরে পড়ে, ভোরবেলায় শিউলি ফুলের শিশিরভেজা গন্ধে সারা বাগান ভরে থাকে? সন্ধ্যে হলে গোপীনাথের মন্দিরের আরতির কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। সে জীবন কেমন হবে? হয়তো সুখ কিংবা হয়তো খুব কষ্ট। কিছুই জানিনে, কিছুই বলা যায়না...' কমলা থামিয়া গেল। তাহার লজ্জিত, অসমাপ্ত ব্যাকুল কথার সুরে শরতকালের সকালবেলা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

হরিদাস কিছুকাল একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এত ভয় কেন কমলা? যদি জ্যেঠামহাশয়ের কাছে ছোট থেকে আমারই মত থাকতে তা হ'লে তোমার মনে এত সন্দেহ এত দুর্ব্বলতা এত ভয় কিছুই থাক্‌তনা। জীবনে সুখ আসবে না দুঃখ আসবে সেটা নিয়ে বৃথা কেন ভেবে মরচ? তুমি যদি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সংসারে দান করে যেতে পার তবেই দেখবে নিজেকে দিতে পারাটাই আসল। সুখ দুঃখের কথাটা অবান্তর। আমাদের ঘর থেকে যখন নিজের ভবিষ্যৎ গৃহস্থালীতে যাবে তখন সংসারের সমস্ত শাখায় নিজেকে রিক্ত করে যেন দান করতে পার, পার যেন তাকে ভালো বাসতে, এইটুকু পাথেয় সঙ্গে করে নিয়ে যেও বোন দেখবে তাহলে সমস্ত সমস্যা আপনা থেকেই সহজ হয়ে আসবে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিজের ভিতর থেকেই পাবে।'

হরিদাসের কথা শুনিতে শুনিতে কমলার অন্তঃকরণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার সারা মন উদ্বেল হইয়া আসিল। অদূরবর্ত্তী জোয়ারের জলের মত জীবনের তটপ্রান্ত হইতে এমন একটা সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল যাহা অশ্রুতপূর্ব্ব। অনেক উপন্যাস পড়িয়াছে, নিজের দাদাদের কাছে হাল আমলের প্রগতির বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা অনেক উচ্চাঙ্গের আলোচনা শুনিয়াছে কিন্তু এ সুর কেথাও বাজে নাই।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হরিদাস পুনশ্চ কহিল, "কমলা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিস ?"

"সামান্যই পড়েচি। রবীন্দ্রনাথের লেখা "সোনারতরী' নামে একটি কবিতার বই মেজদা একবার ক'লকাতা থেকে আমার জন্যে এনেছিলেন।'

"কিছু তো পড়েচ, আর বুঝতেও নিশ্চয় পার। আমি একটি কবিতা পড়ে শোনাই কমলা। তোমার ভালো লাগবে। যে কথা হয়তো আমি ভালো করে বোঝাতে পারলুম না, সে কথা তুমি বুঝবে।"

একটা বইয়ের পৃষ্ঠা খুলিয়া হরিদাস পড়িতে লাগিল,

"চলেছে উজান ঠেলি' তরণী তোমার,
দিক প্রান্তে নামে অন্ধকার।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্ ঘাটে, হে বধূবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী।

উৎসবের বাঁশিখানি কেন যে কে জানে
ভরেছে দিনান্ত বেলা ম্লান মূলতানে,
তোমারে পরালো সাজ মিলি' সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল॥

মৃদুস্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে
"কত বধূ গিয়েছিল কতকাল এই স্রোত বাহি'
তীর পানে চাহি।

ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেননি কথা,
নিস্তব্ধ ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে নতা
তরুণী কন্যার পানে, তরী' পরে ছিলেন গোপনে
তরণীর কাণ্ডারীর সনে॥"

:কান্ টানে জানা:হতে অজানায় চলে
আধো হাসি আধো অশ্রুজলে।
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে
অচেনার ধারে.........

হরিদাস বই হইতে একটুখানির জন্য চোখ তুলিয়া কমলার দিকে চাহিয়া কহিল, এই লাইনটা কেমন লাগ্‌লো কমলা ? 'ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে, অচেনার ধারে।'

মেয়েদের ভাগ্যলিপির সবচেয়ে বড় অথচ সবচেয়ে বড় করুণ কথাটা কত সহজ কথায় প্রকাশ করেচেন।

"তুমি পড়না সবটা, আমার ভারি সুন্দর লাগচে।"

হরিদাস আবার পড়িতে লাগিল,

"ওপারের গ্রাম দেখো আছে ঐ চেয়ে,
বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে,
ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ ধরি'
ভিড়ায়েছে ভাগ্য-ভীরু তরী॥

জনে জনে রচি' গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী।
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম্ম উপহার
রেখে গেল তা'র।

আপনার প্রাণসূত্রে যুগযুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি' স্বাক্ষর,
ব্যথা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তার ক্ষত,
লভিল মৃত্যুর সদাব্রত॥

তাই আজি গোধূলির নিস্তব্ধ আকাশ
পথে তব বিছালো আশ্বাস।
কহিল সে কানে কানে, প্রাণ দিয়ে ভরা যার বুক
সেই তার সুখ।

রয়েছে কঠোর দুঃখ, রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ,
যদি ব'লে যাও বধূ, আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো॥"

"কমলা আমি তোকে এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলুম, 'তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবেনা খেদ, যদি ব'লে যাও বধূ, আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো, সবদিয়ে বেসেছিনু•ভালো'। বলতে চেয়েছিলুম কিন্তু এত মধুর কোরে বলতে পারতুম না। একথাটা কি তোর মনে থাকবেনা কমলা? যদি কোন দিন ভবিষ্যত জীবনে দুঃখ পাস, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলি তার সঙ্গে তোর সংসারের অমিল হয় তখন আমার কথাটা স্মরণ করিস্।" ক্রমশঃ

সিকাগোর 'শতাব্দীর উন্নতি-প্রদর্শনী'

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

এ যাবত সিকাগোর world's Fair বা Century of Progress সম্বন্ধে হয়ত অনেকেই অনেক প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীকে আমেরিকার এই শতাব্দীর উন্নতির কথা জানিয়েছেন। এই প্রদর্শনীটি ১৯৩৩ শালের জুন মাসে আরম্ভ হয়ে ১৯৩৪ শালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত থাকে। আমি একে এই 'শতাব্দীর উন্নতি প্রদর্শনীটী' আরম্ভ হওয়ার একটী বছর পরে দেখ্তে গিয়াছিলাম, তাতে আবার আমার দেখার আর এক বছর পরে এ প্রবন্ধ লিখ্ছি, কাজেই আমার এ প্রবন্ধের কথা শতাব্দী ছেড়েও এক কাঠি উপরে গেছে। এই 'প্রোগ্রেস্' বা 'উন্নতি' আমরা পাঁচদিন সেখানে থেকে যেরকম 'নাকে, মুখে, চোখে' দেখে এসেছি, সে খবর শতাব্দীর মতই প্রায় পুরাণো হয়ে গেলেও তার মোহটা এখনো আমায় ছেড়ে যায়নি, তাই ইংরাজিতে যাকে বলে Better late than never' বা বাংলায় যাকে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' বলে তাতে আশ্বস্ত হয়ে এক বছর পরেও 'সেনচুরি অব প্রোগ্রেস্' (Century of Progress) সম্বন্ধে লিখ্তে বস্লাম।

বিজ্ঞাপনের একটা বড় মূল্য আছে, এবং এই বিজ্ঞাপন কি ভাবে জন সাধারণের চোখের সাম্নে ধরলে প্রকৃত বিজ্ঞাপনের কাজ হয় তা আমেরিকার লোকগুলো যেমন বোঝে এমন বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও বোঝে না। বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপন!! বিজ্ঞাপন!!! এ নাহলে আমেরিকার কোন কাজ বা ব্যবসা চলতে পারে না। বিজ্ঞাপনের উপরেই এদের ভাল মন্দ ও কেনাবেচা, এক কথায় বলা যায় বিজ্ঞাপনের উপরেই এ জাতের নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া সম্ভব। আর আমি এ দেশের বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্য লিখ্তেই এ কলম ধরিনি—তবে এদেশে বাস করে আমাদের মত আধ্যাত্মিক (?) হিন্দুদেরও এই বিজ্ঞাপন স্রোতে মাঝে মাঝে ভেসে যেতে হয়! আমাদের সিকাগো যাত্রা খানিকটা এই বিজ্ঞাপনের দরুণই কেমন করে সম্ভব হয়েছিল এখন সেই কথাই বলি।

নিউ ইয়র্কের সমস্ত দৈনিক সংবাদ পত্রগুলিতে রেলওয়ে কোম্পানীর বিজ্ঞাপন বড় বড় অক্ষরে বেরুল 'Special Excursion train to Chicago worlds fair' এই বিজ্ঞাপনে

ট্রেণ ভাড়া অতিশয় সস্তা ও পাঁচদিন সেখানে থাক্‌বার সুবিধা হবে জেনে আমাদের মত অনেক লোক সিকাগোর 'সেন্‌চুরি অব প্রোগ্রেস্‌' দেখ্‌তে ছুটেছিল!

যথাসময়ে পাঁচদিনের উপযুক্ত জামা কাপড় গুছিয়ে নিউইয়র্কের গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে হাজির হয়ে দেখি, বিরাট জনতা ট্রেনের অপেক্ষায় গেটের কাছে অপেক্ষা করছে। সবাই বেজায় হাসি খুসী, সিকাগোতে সবাই 'উন্নতি' ও 'তামাসা' দেখ্‌তে যাচ্ছে। কিন্তু গেট্‌ খুলবার সঙ্গে সঙ্গে ঠেলাঠেলিতে আমাদের একটী প্রবীনা আমেরিকান বন্ধুর হাসি ছেড়ে প্রায় কান্না পেয়ে গেল। সবাই আগে যাবার জন্য ঠেলাঠেলি করে, কেউ আর এগোতে পারে না। তবু এই খুসী মেজাজী যাত্রীদল ঠেলাঠেলিটা আমোদজনক বলেই যেন উপভোগ কর্‌ছিল। বাংলা দেশের তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রীর মত এখানকার যাত্রীরা কোনমতে দাঁড়িয়ে বা মাটিতে বসে কখনও যায় না, তবু এরা যেন ঠেলাঠেলি করেই ঢুক্‌তে ভালবাসে—বিশেষতঃ যখন এই রকম স্পেশ্যাল ট্রেন থাকে। উদ্দেশ্য, আগে যেয়ে ভাল জায়গা দখল করে জানালার কাছে ব'সে পাশের সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। গেটের কাছে গার্ড্‌ এই ভিড় ও ঠেলাঠেলি দেখে অনবরতই বল্‌ছিল 'Take it easy, plenty of seats, dont hurry' ইত্যাদি। কিন্তু এত অনুরোধ করেও কোনরকমে ঠেলাঠেলি কমাতে পারছিল না। যদিও এদেশের নিয়মে রেলযাত্রীদের বস্‌বার জায়গা কোম্পানী দিতে বাধ্য, এবং আবশ্যক হলে বেশী গাড়ী জুড়ে দেয়, তবু যাত্রীদের ঠেলাঠেলি করা যেন স্বভাব। ঠেলাঠেলি করে ট্রেনে উঠে দেখি তখনো অনেকগুলি বস্‌বার জায়গা বেদখল পড়ে আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিরাট ট্রেন খানা যাত্রী বোঝাই করে সিকাগোর উদ্দেশ্যে ছুটল। এ রকম যাত্রায় অনেক অপরিচিতের সঙ্গে সহজে পরিচয় হয়, এবং হাসি, তামাসা ও আমোদ প্রমোদ বেশ চলে। গাড়ীতে ডাইনিং রুম থাকায় খাওয়ার অতিশয় সুব্যবস্থা আছে। তাছাড়া কফি, Sandwiches চকোলেট্‌ ইত্যাদি কিন্‌বার সুবিধা থাকায় যখন যার যা খুসী কিনে খেতে পারে। ট্রেনখানা হাড্‌সন্‌ নদীর গা ঘেঁষে দেড়শত মাইল এঁকে বেঁকে ছুটে চল্‌ল। আমেরিকার (অক্টোবরের) এই সময়কার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতিশয় চমকপ্রদ। চারিদিকে পাহাড়ের উপর গাছ গুলো শীতের শীতল হাওয়ায় রং বদ্‌লাচ্ছে। সবুজে, লালে, হল্‌দে, তামাটে মিশে এমন এক বিচিত্র শোভা হয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আঁকা বাঁকা হাড্‌সন্‌ নদীর সৌন্দর্য্য, পাহাড়ের সৌন্দর্য্য, গাছগুলির অদ্ভুত রংয়ের সমাবেশ, তারপর আস্তে আস্তে সূর্য্যদেবের অস্তমান। প্রকৃতির এই লীলা রহস্য দেখে কেবলই মনে হয়েছিল, 'ওগো মা মৃন্ময়ি তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই, দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া বসন্তের আনন্দের মত।' (রবি)

নূতনত্বের মোহ ও হট্টগোলে সে রাত ট্রেনে আর ঘুম এলনা। যদিও এদেশের পুল্‌ম্যান (Pullman) গাড়ীগুলি অতি আরামপ্রদ। বিছানা, বালিশ, লেপ সব যেন হোটেলের ব্যবস্থা। স্নানের জায়গা, পাইখানা, তামাক খাবার জায়গা, লাইব্রেরী, চিঠি লেখার জায়গা কিছুরই অভাব

নাই। যে পয়সা খরচ করে পুলম্যানে যেতে না চায় সে ইচ্ছা করলে ২৫ সেণ্ট দিয়ে পরিষ্কার ওয়াড় দেওয়া বালিশ ভাড়া করে ব'সবার জায়গায়ই ঘুমাতে পারে। আজকাল এদেশে ট্রেনে বেড়ান আর দামী হোটেলে থাকা প্রায় সমান বলে মনে হয়। ট্রেনখানা রাত ১২টার সময় ক্যানাডার (Canada) ভিতর দিয়ে ছুট্‌ল ও রাত সাড়ে তিনটায় ডিট্রয়েট্ (Detroit) ষ্টেশনে ও সাড়ে আটটায় আমাদের সিকাগো পৌঁছে দিল। এই নয়শত মাইল ট্রেনে আস্‌তে ১৯ ঘণ্টা মাত্র লেগেছিল। গোল বাঁধল আমাদের প্রবীণা নধরকান্তি মার্কিন মহিলাটীকে নিয়ে। বেলা সাড়ে আটটা বেজে গেছে ক্ষুধায় সে অস্থির। আমাদের কথাছিল গাড়ীতে ব্রেক্‌ফাষ্ট্ 'প্রাতঃ ভোজন' না করে, একেবারে সিকাগোতে পৌঁছেই কোন রেষ্টুরাঁণ্টে খেয়ে নেব। সেদিন সকালে নিউইয়র্ক থেকে তিনখানা স্পেশ্যাল ট্রেন যাত্রী বোঝাই করে প্রায় একই সময়ে এসে পৌঁছেছে, কাজেই ষ্টেশনে বেজায় ভিঁড়। মহিলাটী এই ভীড়ে ও ব্রেক্‌ফাষ্ট্ না খেয়ে আমার হাতধরে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, কমলা, যদি এখন ব্রেক্‌ফাষ্ট না খেতে পাই, তবে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ব। তাড়াতাড়ি তাকে ঠাণ্ডা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তা নইলে এই ভীড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে শেষটা আমাদের সব মাটি করে দেবে কি না তার ঠিক কি? আমাদের একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী বন্ধু আমাদের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন, আমরা সেই প্রচণ্ড ভীড়ে অনেক ঠেলাঠেলি করে তবে নিষ্কৃতি পেলাম। এই বন্ধুটী আগে থেকেই আমাদের জন্য একটী এপার্টমেণ্ট ভাড়া ঠিক করে রেখেছিলেন, তাই হোটেলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম খরচেই সিকাগো বাস সম্ভব হয়েছিল। এঁরই কৃপায় সিকাগো সহর দেখ্‌বার আমাদের বিশেষ সুযোগ হয়েছিল এবং এঁদের সঙ্গে আমাদের সেই ক'টি দিন বড় আনন্দে কেটেছিল।

সময় কম, মাত্র পাঁচদিন, এর মধ্যেই এক শতাব্দীর প্রগ্রেস্ দেখে নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে হবে; কাজেই আমরা বিশ্রাম বা ঘুমের মায়া ছেড়ে সেই দিকেই (Fair groundএ) ছুটলাম। যে ক'দিন ছিলাম, যতক্ষণ সম্ভব এবং যতটা সম্ভব প্রদর্শনীতে থেকে দেখে নিয়াছিলাম। আমেরিকার কোন জিনিষই ছোট খাট নয়, কাজেই শতাব্দীর উন্নতি ও ছোট খাট আশা করা বাতুলতা। সহরের বুকের উপর প্রায় তিন মাইল ব্যাপী বিরাট আয়োজন। নিউ ইয়র্কবাসীদের ও (যারা তাদের সব জিনিষই সব চেয়ে বিরাট আকারে দেখতে অভ্যস্ত) অবাক্ করে দিয়েছিল। এই প্রদর্শনী স্থানটী আকারে এত বৃহৎ যে হেঁটে দেখা নিতান্ত অসম্ভব না হলেও বেজায় কষ্টকর ব্যাপার। এই জন্য এখানে বাসের (Bus) সুবন্দোবস্ত ছিল; কাজেই অতিরিক্ত হেঁটে বৃথা সময় নষ্ট না করে বহুবার বাসের সদ্ব্যবহার করলাম। ভাড়া দশ সেণ্ট, মেলা দেখ্‌তে এসে সিকি দুয়ানীর মায়া করলে চলে না। Hall of Science দেখতেই আমরা প্রথম ছুট্‌লাম। পরিবর্ত্তনশীল জগতে একশত বছরে বিজ্ঞানদ্বারা কত কি পরিবর্ত্তন ও কত নূতন আবিস্কার ও উন্নতি হয়েছে তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। এখানে দিনের পর দিন কাটিয়েও যেন সমস্ত দেখে শেষ করা অসম্ভব। 'হাতে কলমে' ও

'মুভিতে' সহজ ভাষায় ও বক্তৃতায় জন সাধারণকে এক শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক পরিবর্ত্তন ও উন্নতির কথা বোঝাবার যে বিরাট আয়োজন তা চোখে না দেখলে বোঝান মুস্কিল। শত বৎসরের পূর্ব্বে লোকের যা স্বপ্নাতীত ছিল, আজ আর তার কোন নূতনত্ব নাই।

হল্ অব্ সোস্যাল্ সাইন্সটীও (Hall of Social Science) অতি চমৎকার। এদেশে সামাজিক পরিবর্ত্তন কি ভাবে, কেমন ক'রে হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পুতুল দিয়ে সাজিয়ে তা দেখান হয়েছে। অনেকগুলি ছোট মিউজিয়াম্ (Midget Museum) মত করে সাজান ছিল, যা দেখ্‌লেই সাধারণে সহজে বুঝ্‌তে পারে! গির্জ্জাগুলির অবস্থা শতবৎসর পূর্ব্বে যেমন ভরপুর ছিল, বর্ত্তমানে আর তা নাই। কেবল গুটী কয়েক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাই শুধু আঁকড়ে রাখ্‌ছে—অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার দরুণই হোক্ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্ আমেরিকার তরুণ সমাজ আজকাল গির্জ্জায় যেয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না। তাদের এখন স্কুল, কলেজে, নাচের ঘরে ও "কক্‌টেল্" পার্টিতে (Cocktail Party) বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সামাজিক পরিবর্ত্তন এদেশে যে কেমন তাড়াতাড়ি হচ্ছে তা কিছুকাল এদেশে বাস করলেই টের পাওয়া যায়। শত বৎসর পূর্ব্বে কি ছিল বা ছিল না, তা খোঁজবার আর দরকার হয় না।

জেনারেল্ ইলেক্‌ট্রিক বিল্ডিংএ (General Electric Building) ম্যাজিক ঘর (House of Magic) আমাদের কাছে ম্যাজিক্ বলেই মনে হয়েছিল। বৈদ্যুতিক আলো, স্থান ও যন্ত্র বিশেষে যে কত রকম অদ্ভুত কাজ ও ভাব প্রকাশ করতে পারে তা এই প্রথম দেখ্‌লাম। একই বৈদ্যুতিক আলো স্থান বিশেষে পরিবর্ত্তন হওয়ায় কখনো কাপড়ে অদ্ভুত রং ফলাচ্ছে কখনো আলোতে "সঙ্গীত" হচ্ছে, আবার কখনো মানুষের হাতের 'ছায়ায় থেমে' যাচ্ছে। আমার ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্বন্ধে জ্ঞান অতি কম; তাই এই সব বিজ্ঞানসঙ্গত যুক্তি খুব বোধগম্য না হলেও, বুঝ্‌লাম আশ্চর্য্যকর ইলেকট্রিকের ততোধিক আশ্চর্য্যকর ম্যাজিক! ইলেক্‌ট্রিকে আজকাল কি না হচ্ছে, এবং ইহার ক্রমোন্নতিতে যে মানব জীবনে আরো কত কি করবে তা কে বল্‌তে পারে?

এই ম্যাজিক দেখে আমরা নিজেদের কণ্ঠস্বর কেউ কথায়, কেউ গানে, কেউ পদ্যে রেকর্ড করে নিলাম। রেকর্ড তৈরী কর্‌তে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগেনা। প্রতি রেকর্ডের দাম ৩৫ সেণ্ট। কিন্তু বাজাতে যেয়ে দেখি আমার কণ্ঠস্বরের চাইতে কণ্ঠ পরিষ্কারের আওয়াজই বেশী। বৃদ্ধ আমেরিকান্ মহিলাটী কাণে কম শোনেন বলেই বোধ হয় পদ্যে গদ্যে মিলিয়ে খান কয়েক রেকর্ড করে নিলেন। বাড়ী যেয়ে—"একলা বসে আপন মনে" শুন্‌বেন এই যা রক্ষা। আমরা এই "রেকর্ড্ ব্রেকিং রেকর্ড" করে টেলিভিসন্ (Telivision) দেখ্‌তে গেলাম। এটা আমাদের কাছে খুবই ভাল লাগলো। এই টেলিভিশনের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চল থেকে কথা বল্লে, বক্তৃতার সঙ্গে চেহারাও স্পষ্ট দেখা যায়। এই টেলিভিশন দেখ্‌তে

আমাদের পঁচিশ সেণ্ট করে গেটে দাম দিতে হল। বুড়ী মহিলাটী তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে ডবল দাম দিয়ে টেলিভিষণে কথা বলার জন্য দাড়াল। আমরা দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে বসে টেলিভিশনে বুড়ীকে খুব দেখ্লাম ও তার কথা শুন্লাম। এবারে তার মেজাজ মহা খুসী টেলিভিষণে তাকে কেমন দেখাচ্ছিল জিজ্ঞাসা করায় বল্লাম, 'চমৎকার'।

ফোর্ড মোটর বিল্ডিংও অতিশয় চমকপ্রদ হয়েছিল। এই বাড়ীটীর ভিতরে ঢুকেই একটী বিরাট গোলাকার "পৃথিবী" দেখ্তে পেলাম। এটী বিদ্যুতের সাহায্যে ঘুরেঘুরে বেড়াচ্ছে চিহ্ন দিয়া দেখান হয়েছে পৃথিবীর কোন্ দেশ থেকে কি মাল সংগ্রহ করে "ফোর্ড" তৈরী হয় এবং সেই সঙ্গে সেই সব কাঁচা মাল ও নমুনাস্বরূপ প্রদর্শন করা হয়েছিল। কাঁচা মাল (Raw Materials) থেকে আরম্ভ করে আন্কোরা নূতন গাড়ী কি করে তৈরী হচ্ছে সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখাবার বিরাট আয়োজন ছিল। মেসিনেই একের পর একটী তৈরী হয়ে আপনা থেকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে আসছে। মানুষ কেবল তার নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কাজটী লক্ষ্য করে যায় মাত্র। একশত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন দেশের রাস্তা কেমন ছিল "ফোর্ড" কোম্পানী তার নমুনা তৈরী করে একজিবিশনের ব্যবস্থা করেছিল। আমরা ভারতবাসী বলে ফোর্ড মোটর কোম্পানী আগের থেকেই চালকসহ একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করেছিল। এরকম ব্যবস্থা ওরা অনেক লোকের জন্যই করে। এটা ব্যবসায়ের একটা ফন্দি মাত্র। সব দেখা শোনা হওয়ার পর কোম্পানীর নবনির্ম্মিত ভারতের শত বছরের পুরানো গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডের নিকট ফটো নিয়ে আমাদের নিষ্কৃতি দিল।

নানা দেশের গ্রামগুলো দর্শকদের দৃষ্টি বিশেষ করেই আকর্ষণ করেছিল। বেল্জিয়াম্ ইংলিশ, ইটালিয়ান্, স্প্যানিশ্, চাইনীজ্, জাপানীজ, মেক্সিক্যান্ ইত্যাদি নানা দেশের গ্রামের শোভা দেখলাম কিন্তু ভারতের গ্রাম ব'লে কিছু চোখে পড়লনা। বোধহয় নানা উৎপীড়নে আমাদের গ্রাম্যশ্রী দেখার মতও কিছু নাই। প্রত্যেকটী গ্রামে নাচ, গান, খাওয়া ও নানা রকমের কৌতুক-রহস্য (entertainment) যথেষ্টই ছিল এবং অনেকগুলি প্রকৃতই শিক্ষনীয় ছিল। এ বিষয়ে বেল্জিয়াম ও ইংলিশ গ্রামই আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করেছিল। দুই চারটী ভারতবাসীকেও ইংলিশ গ্রামে ব্যবসায়ে করতে ও স্থানান্তরে যোগীরূপে পেরেকের উপর শুয়ে থাক্তে দেখ্লাম।

সিকাগো তখন আনন্দোৎসবে (Festival mood) মাতোয়ারা, কাজেই দিনে রাতে সবাই আনন্দ করছে। এমন হাসিখুসি বিরাট জনতা দেখে মনে হয়েছিল আমেরিকার উৎকট বেকার সমস্যার বুঝি এতদিনে অবসান হল। সন্ধ্যায় লক্ষ লক্ষ বিজলী বাতি ও "নিয়ন" (Neon light) আলোতে সমস্ত সহরটা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করত। বুঝি বা তারা রাতকে দিনের চাইতেও দিন করে সূর্য্যদেবকে লজ্জা দিত।

অনেক কিছুই আমরা তাড়াহুড়া করে দেখে এসেছি। সে সব স্মৃতিতে আমরণ উজ্জ্বল থাকবে। কিন্তু আর একটী অপূর্ব্ব জিনিষের কথা এখানে উল্লেখ না ক'রে বিদায় নিতে পারছি না। তবে এটা শতাব্দীর উন্নতি নয়। বহু বহু শতাব্দীর প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা। সেটা হচ্ছে লেক্ মিসিগ্যান (Lake Michigan)। এই বিরাট, শান্ত সুন্দর হ্রদ সিকাগো সহরের বুকের উপর। দেখ্তে অনেকটা সমুদ্রের মত, অথচ এর জল পুকুরের জলের মত মিষ্টি। এই হ্রদের পাড়ের বাড়ী ও হোটেলগুলি অতি সুন্দর। এখানেই সিকাগোর কোটিপতিদের বাস। এত বড় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এত বড় সহরে থাক্তে পারে এ যেন ভাব্তেও কেমন লাগে। এর জল যেমন শীতল, তেমন পরিষ্কার ও মিষ্টি, দেখেও পরিতৃপ্তি হয়।

আমরা একখানা মোটরে এই হ্রদের পাশ দিয়ে একদিন খুব ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। সেদিনটী যেমন ছিল মেঘমুক্ত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, হ্রদটী ছিল তেমনই শান্ত ও শীতল, এই অপূর্ব্ব সমাবেশে মানুষকে যেন কোন অজানা আনন্দের সন্ধানে নিয়ে যায়। কেবলই মনে হয়েছিল, "এত বড় এ ধরণী, মহাসিন্ধু-ঘেরা, দুলিতেছে আকাশ সাগরে, দিন দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা, শুধু কি, মা যাব খেলা করে!"

আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় ফুরিয়ে গেল। বন্ধুটীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা আবার নিউইয়র্কের দিকে মুখ ফেরালাম।

'আধুনিক বুননী শিল্প'

'পুলোভার'

আজকাল পুলোভার পরার প্রচলন খুব দেখা দিয়াছে। অতএব এখানে পুলোভার বোনার আলোচনা করলে ইহা অপ্রাসংঙ্গিক বা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না ইহাকে যতদূর সম্ভব সরল করিয়া বুনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং কোন প্রকার নূতন বুননী যাহা প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে কষ্টকর তাহা ইহাতে সংযোগ করা হইল না। তবে পরে আবশ্যক মত নানা প্রকারের নূতন নূতন ও মনোহর বুননী দেখান হইবে। ইহাতে কেবল মাত্র পূর্ব্বেকার 'রেখা' ও 'মোজা' বুননী এবং প্রত্যেক লাইন সরল বোনা যাহাকে 'সরল বুননী' বলিতে পারা যায় তাহাই ব্যবহৃত হইতেছে।

আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি—পাঁচ আউন্স চারখি পাক ভেলু নিটিং ইয়ার্ণ পছন্দমত যে কোন রংএর ২টী ১০ নং হাড়ের ও ২টী ১২নং ষ্টীলের কাঁটা।

মাপ :—কাঁধ হইতে নীচের ঝুল—২১ ইঃ; ছাতি—৩২ ইঃ।

সম্মুখ হইতে আরম্ভ :—১২ নং ষ্টীলের কাঁটায় ১১০ ঘর তোল। ৩ ইঃ 'রেখা বুননী' বুনিয়া যাও। 'রেখা বুননী' ২ ঘব সোজা ও ২ ঘর উল্টা ক্রমাগত পর্য্যায়ক্রমে বুনিয়া যাইতে হয়। ৩ ইঃ রেখা বুননী পরে ১২ নং কাঁটা পাল্‌টাইয়া ১০ নং কাঁটা পরাইতে হইবে। এবং ১৩ ইঃ 'সোজা বুননী' (১ লাইন সোজা ও পরের লাইন উল্টা) ক্রমাগত বুনিয়া যাও।

বগল আরম্ভ :—ঘর মাপিয়া বগল তৈয়ারী করিতে হইবে। ৫ ঘর মার ১০৫ ঘর সরল বোন। পরের লাইন—৫ ঘর মার, ৬ ঘর সরল ৮৮ ঘর উল্টা, ৬ ঘর সরল।

গলার জন্য ঘর বিভাগ :—সমস্ত ঘর গুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেকগুলি একটী বাজে কাঁটায় নামাইয়া অপর অর্দ্ধেক ঘর লইয়া বুনিতে আরম্ভ করিতে হইবে। এখন তোমার কাঁটায় ৫০টী ঘর রহিয়াছে।

১ম লাইন—৬ ঘর সরল ১ ঘর কমাও (ঘর কমাইতে হইলে ১ ঘরের মধ্যে দিয়া প্রবেশ না করাইয়া একেবারে ২টী ঘরের মধ্যে কাঁটাটী প্রবেশ করাইয়া নিয়মিত ফাঁস তুলিয়া লইতে হয়) ৩৪ ঘর সরল, ১ ঘর বসাও ৬ ঘর সরল।

২য় লাইন—৬ ঘর সরল, ৩৬ ঘর উল্টা ৬ ঘর সরল। ৩য় লাইন—৬ ঘর সরল ১ ঘর কমাও ৩২ ঘর সরল, ১ ঘর কমাও, ৬ঘর সরল।

৪র্থ লাইন—৬ ঘর সরল, ৩৪ ঘর উল্টা ৬র সরল। ৫ম লাইন—৬ঘর সরল ১ ঘর কমাও ৩০ ঘর সরল ১ ঘর কমাও ৬ ঘর সরল।

৮ম লাইন—৬ ঘর সরল, ৩০ ঘর উল্টা, ৬ ঘর সরল। ৯ম লাইন—৬ ঘর সরল ১ ঘর কমাও ২২ ঘর সরল ১ ঘয় কমাও, ৬ ঘর সরল।

১০ম লাইন—১ ঘর সরল ২৮ ঘর উল্টা ৬ ঘর সরল। আর বগলের ঘর না কমাইয়া কেবল গলার দিকে ১ লাইন ছাড়া একঘর করিয়া কমাইয়া গেলেই হইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে গলা ও বগল দুই দিকেই ৬ ঘর করিয়া প্রত্যেক বারে সরল বুনিতে হইবে। এই প্রত্যেক লাইন সরল বোনাকে 'সরল বুননী' কহিতে পারা যায়। এইরূপে কয়েক লাইন বুনিবার পর যখন কাঁটায় ৩০টী ঘর থাকিবে তখন আর ঘর না কমাইয়া ঐ নিয়মে বরাবর বুনিয়া যাইতে হইবে। এবং যখন দেখিবে মোট ২১ ইং বোনা হইয়াছে তখন আর ঐ অংশটী না বুনিয়া যে ঘরগুলি বাজে কাঁটায় নামান ছিল সেগুলি লইয়া ঠিক ঐ নিয়মেই বুনিয়া সম্মুখের অংশ শেষ করিবে।

আর বগলের ঘর না কমাইয়া কেবল গলার দিকে ১ লাইন ছাড়া এক ঘর করিয়া কমাইয়া গেলেই হইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে গলা ও বগল দুই দিকেই ৬ ঘর করিয়া প্রত্যেক বারে সরল বুনিতে হইবে। এই প্রত্যেক লাইন সরল বোনাকে 'সরল বুননী' কহিতে পারা যায়। এইরূপে কয়েক লাইন বুনিবার পর যখন কাঁটায় ৩০টী ঘর থাকিবে তখন আর ঘর না কমাইয়া ঐ নিয়মে বরাবর বুনিয়া যাইতে হইবে। এবং যখন দেখিবে মোট ২১ ইঃ বোনা হইয়াছে তখন আর ঐ অংশটী না বুনিয়া যে ঘরগুলি বাজে কাঁটায় নামান ছিল সেগুলি লইয়া ঠিক ঐ নিয়মেই বুনিয়া সম্মুখের অংশ শেষ করিবে।

পশ্চাৎ দিক :—১২নং কাঁটায় ১১০ ঘর তুলিয়া ৩ ইঃ রেখা বুননী বুনিবার পর ১০নং কাঁটায় ঘরগুলি পাল্টাইয়া লইয়া পূর্ব্বের মত নিয়মে বগল পর্য্যন্ত বুনিয়া যাও। পরে—৫ ঘর মার সমস্ত ঘর সরল। ৫ ঘর মার ৬ ঘর সরল ৮৮ ঘর উল্টা ৬ ঘর সরল। ৬ ঘর সরল ১ ঘর মার ৮৪ ঘর সরল ১ ঘর মার ৬ ঘর সরল। ঐরূপে আরও দুই লাইন বোন এবং দেখিবে যে তোমার কাঁটায় ৯৪টী ঘর রহিয়াছে। ঐ ৯৪টী ঘর লইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অর্থাৎ দুই পার্শ্বের ৬টী ঘর প্রত্যেক লাইন সরল বুনিতে থাক।

যখন দেখিবে মোট ২১ ইঃ বোনা হইয়াছে তখন ৩২টী ঘর বুনিবার পর ৩০টী ঘর মারিবে এবং অপর ৩২টী ঘর বুনিবার পর হাতের কাজটী ঘুরাইয়া লইয়া ৩০ ঘর যথা নিয়মে বুনিয়া ২ ঘর মার এবং অপর দিকে উল জুড়িয়া ঐরূপে ৩০ ঘর বুনিয়া ২ ঘর মারিতে হইবে এবং সমস্ত ঘরের মুখ বন্ধ করিয়া কাজটী শেষ করিতে হইবে।

এখন টুকরা দুইটীকে লইয়া অল্প গরম জলে সাবান গুলিয়া আস্তে আস্তে কাচিয়া লইয়া মেলিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে এবং ভিজা কাপড় উপরে চাপাইয়া ইস্ত্রি করিয়া লইতে হইবে। পরে টুকরা দুইটীকে পাশে ও কাঁধে শেলাই করিয়া লইলেই পুলোভার তৈয়ারী হইয়া গেল।

ভালোবাসা, না অত্যাচার!

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বাসে আসছিলাম 'আনন্দবাজার' আফিস থেকে বাগবাজারের দিকে। মাঝ-রাস্তায় একজন পশ্চিমে উঠ্‌লো একটা ছোট ছেলে নিয়ে। ছেলেটা কাঁদছিল। সেই রোরুদ্যমান ছেলেটার গালে পশ্চিমে লোকটা গোটাকতক চড় বসিয়ে দিলো। ভাবলো, বোধ হয় চড় দিলে ছেলেটা থাম্‌বে। তার কান্না কিন্তু থামলো না। তখন আবার চড়ের উপর চড়।

লোকটা ছেলেটার নিশ্চয়ই বাপ হবে। নইলে একটা অসহায় জীবের উপর এমন নির্ম্মম ব্যবহার কর্‌তে সে সাহস পাবে কেন? মৃদু প্রতিবাদ ছাড়া আমরাও বা কি কর্‌তে পার্‌তাম? ছেলের প্রতি বাপ যা খুসী তাই করতে পারে—এই ধারণা অসংখ্য-মনে এখনও বদ্ধমূল হয়ে আছে। এমন একদিন ছিল, যখন রোমে পিতা ছেলেকে মেরে ফেল্‌লেও সে অপরাধী ব'লে পরিগণিত হতো না! পরিবারের প্রত্যেকের জীবন মৃত্যুর উপর তার অধিকার ছিল অপরিসীম! রোমক পিতার মত এখনকার পিতারা ছেলেদের মেরে ফেলতে পারে না বটে, কিন্তু এখনও ছেলের জীবনের উপরে পিতার অধিকারের সীমানির্দ্দেশ করা কঠিন।

বাসের সেই অত্যাচারী পিতা আর নির্য্যাতিত অসহায় পুত্রের কথা ভুলিনি। ঐ ছেলে যখন বড় হ'য়ে উঠবে তখন সেও তার ছেলেকে বর্ব্বরের মত ঠেঙাবে; কারণ ছেলে হ'য়ে বাপের হাতে যে বারবার মার খেয়ে এসেছে—বাবা হ'য়ে নিজের ছেলেকে সহায়হীন সম্পত্তি ছাড়া সে কি আর ভাব্‌বে? দুঃখ হয় পৃথিবীর এই বর্ব্বরতা দেখে! ছোট ছোট ছেলে—গায়ে জোর নেই। সেই জন্যই মারা তাদের সোজা। আমরা বয়স্কেরা বলে থাকি, না মারলে কি ছেলে শায়েস্তা হয়? যেন ছেলেকে ভালো করবার জন্যই আমরা তাকে মেরে থাকি! এত বড় মিথ্যা কথা আর নেই! ছেলে ঠেঙানোর মধ্যে যদি কোনো যুক্তি থাকে, সে যুক্তি হ'চ্ছে ছেলের দৈহিক দুর্ব্বলতা; প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়া ছাড়া বেচারার আর যে কোনও উপায় নেই! বড় মানুষকে ঠেঙাতে যাওয়া বিপদ—কারণ উল্টে সে যদি মেরে বসে! মেরে বসলে, মারার মধ্যে যে একটা পৈশাচিক উল্লাস আছে সেই উল্লাস নষ্ট হ'য়ে যায়। জেলখানায় কয়েকবার গেছি।

সেখানে দিনের পর দিন দেখেছি কয়েদীদের উপর নিষ্ঠুর আচরণের সকরুণ দৃশ্য। কোনও কয়েদী জেলের নিয়ম ভাঙ্গলে তাকে নির্জ্জন কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দী ক'রে রেখে দেওয়া হয়। গরমকালে তার গায়ে পরিয়ে দেওয়া হয় চটের আলখাল্লা, খেতে দেওয়া হয় ভাতের মাড়! কি দুঃখ বেচারাকে ভোগ করতে হয় তার কিছু কিছু আমরা অনুমান করতে পারি। বর্ব্বরতাকে সমর্থন করা হ'য়ে থাকে এই বলে' যে, সমাজকে রক্ষা করবার জন্য তাদের প্রতি এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার অত্যাবশ্যক। আমরা যখন খেঁকশিয়ালী শিকার করি তখনও এই কথাই ব'লে থাকি—শেয়াল না মারলে হাঁস-মুরগী কিছুই থাকে না। মনে মনে কিন্তু আমরা জানি সমাজের মঙ্গলের জন্য চোরের গায়ে চটের আলখাল্লা পরানোর কোনই প্রয়োজন নেই; সমাজের কল্যাণের জন্য খেঁকশিয়ালও আমরা শিকার করি না। চোরকে অযথা শাস্তি দিই—কারণ অন্যকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে খুঁজে পাই একটা নিষ্ঠুর আনন্দ; খেঁকশিয়াল মারি কারণ জিঘাংসার মধ্যে আছে একটা পৈশাচিক উল্লাস। ছেলে ঠেঙানোর মধ্যেও ছেলের কল্যাণকামনার চাইতে মারার আনন্দটাই থাকে বেশী। এই নিষ্ঠুর আচরণকে মনোবিজ্ঞায় বলে sadism যে সব বাপ-মা ছেলের মনে অথবা দেহে নিষ্ঠুর আঘাত দেয় তাদের বলে sadistic parents.

জগত জুড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ চলেছে। তাদের ছোট ছোট নরম গায়ে কত বাপ-মা আর শিক্ষক এঁকে দিচ্ছে আঘাতের চিহ্ন। তাদের স্পর্শকাতর মনের নীরব বেদনায় আকাশ কাঁদে। এই হতভাগ্যদের সম্পর্কে সচেতন হবার দিন কি আজও আসে নি? একদিন ছিল যখন আমরা শ্রদ্ধা করতাম শুধু দুইটী সম্প্রদায়কে—অভিজাত শ্রেণীকে (nobility) আর কুলগুরুকে (clergy). তারপর আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখলাম মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর নরনারীকে—যাদের বলা হয় middle class. ফরাসী বিপ্লব এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকারকে করলে প্রতিষ্ঠিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সীমানার বাইরে এতদিন যে সর্ব্বহারা হতভাগ্য নরনারীর দল আমাদের অনাদরের মধ্যে উপেক্ষিত জীবন বহন করছিল—তাদেরও অবশেষে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতায় আমরা শুনেছি হাতুড়ি আর লাঙলের জয়গান। এখানে আভিজাত্যের বিজয় সঙ্গীত নেই—আছে পার্সোন্যালিটির কাছে অর্ঘ্যদান; আর এই পার্সোন্যালিটীর মহিমাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন জনসাধারণের মধ্যে—যাকে বলেছেন তিনি divine average. সর্ব্বহারাদের কাছে এসে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কিন্তু নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি। দুষ্কৃতকারী, পতিতা—এদের মধ্যেও যে দেবতা লুকিয়ে লুকিয়ে অশ্রুমোচন করেন—তাঁর পায়েও মানুষ অর্ঘদান করিতে কুণ্ঠিত হয়নি। জিন ভ্যালজিন্, ফ্যানটাইন—এই সব চরিত্র অঙ্কিত ক'রে হিউগো, সমাজের দিক দিয়ে যারা অপরাধী, তাদেরই কাছে তাঁর অশ্রুসিক্ত প্রণাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। "লে মিজেরাবল" প'ড়ে কোন মানুষ কি চোরকে ঘেন্না ক'রতে পারে? যাঁরা ডস্টয়ভস্কির crime and punishment এর মধ্যে সোনিয়ার চরিত্র এবং টলষ্টয়ের resurrection এর মধ্যে ক্যাটুসার চরিত্র পাঠ করেছেন—তাঁদের পক্ষে পতিতা দেখ্‌লে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করা কি সম্ভব? নিখিল জগতের হতভাগিনী কলঙ্কিনীদের প্রতি তাঁদের চিত্ত কি অপরিসীম সমাবেদনায় পূর্ণ হ'য়ে উঠে না? কিন্তু চোর আর পতিতা পর্য্যন্ত এসেই কি আমাদের সমবেদনার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে? অসহায় শিশুদের মৌন-বেদনার প্রতি আমরা কি কোন দৃষ্টিই দেবো না? দেহের দিক দিয়ে দুর্ব্বল এবং আরও অনেক দিক দিয়ে অসহায় বলেই কি তারা অশ্রুমোচন ক'রবে?

ছেলেদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা মধ্য যুগে যা ছিল, এখনও তাই আছে। তাহাদের অন্তরের গভীর

অনুভূতিগুলিকে এখনও তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা আমরা করি না। ক্রীতদাস প্রথা উঠে গিয়েও উঠে যায়নি; ছেলেরা এখনও আমাদের কাছে ক্রীতদাসের সামিল হ'য়ে আছে। তাদের প্রতি আমরা যে ব্যবহার ক'রে থাকি—তার প্রভাব শেষ পর্য্যন্ত তাদের জীবনে থেকে যায়!

সুখের বিষয়, শিশুজীবনের সমস্যা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন—এমন লেখকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। রম্যাঁ রলাঁ যেখানে জাঁক্রিস্তফের, শৈশব এবং বাল্যজীবন এঁকেছেন সেখানে শিশুমনের অনেক কথাই তিনি চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতিতে' শিশুজীবনের বহু দুঃখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। গর্কির মা যখন পাঠ করেছিলাম তখন তার মধ্যে শিশুজীবনের বেদনায় পরিচয় পেয়েছিলাম বালক প্যাভেলের চরিত্রের মধ্যে। লরেন্সের একখানা বই পড়েছি, তার নাম 'Sons and Lovers' এই বইখানিতেও শিশুজীবনের বেদনার ছবি তিনি শিল্পীর নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সব লেখকদের অভিনন্দিত করি—কারণ তাঁরা এমন শ্রেণীর অসহায় জীবের প্রতি আমাদের সমবেদনা জাগিয়েছেন—যাদের নিগূঢ় বেদনা সম্পর্কে আমরা এখনও অচেতন হ'য়ে আছি।

স্বাধীনতা আর আনন্দের মধ্যে শিশুদের জীবনকে যদি আমরা ফুলের মত ফুটিয়ে তুলতে পারতাম—এ জগতের চেহারা ফিরে যেতো। কিন্তু সারা জগতের শিক্ষার ব্যবস্থা আজ ধনকুবেরদের হাতে। তারা তো সর্ব্বহারাদের বুঝতে দেবে না—স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শিশুদের মুক্তির মধ্যে—মানুষ করবার উপর। চপেটাঘাতের পর চপেটাঘাতে ছেলেমেয়েদের কোমল গণ্ডদেশ যদি স্ফীত হ'য়ে যায়—সে তো ভালো কথা! মার খেতে খেতে মার খাওয়াটা তাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। ছেলেবেলাতেই তারা বুঝতে পারবে—মার খেতেই তারা এসেছে জগতে—মার খেতে খেতেই তাদের পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে! বড় হ'য়ে জীবন যখন তাদের কেবল্ই আঘাতের পর আঘাত দেবে, তখন সে আঘাত তাদের শান্ত পোষমানা প্রাণকে আর বিচলিত করতে পার্‌বে না। তাদের চামড়া হ'য়ে যাবে গণ্ডারের চামড়া।

হায়! শিশুদের মনে আর দেহে যারা আঘাত করে তারা যদি বুঝতে পারতো—অপরাধের গুরুত্ব তাদের কতখানি! ছেলেবেলায় যারা আমাদের আঘাত করে, তাদের আমরা কখনও ক্ষমা করিতে পারি না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আমাদের আহত হৃদয় চিরদিন বিদ্বেষের বিষ উদ্গীরণ করতে থাকে। বাপ-মাকে বড় হ'য়ে অনেক ছেলেমেয়ে ভালবাস্‌তে পারে না। যে আঘাত শৈশবে তারা পেয়েছে তার স্মৃতি কিছুতেই মরতে চায় না। আজীবন সেই স্মৃতির বিভীষিকা আমাদের জীবনের সাথী হয়ে থাকে। অনেক বছর আগে একজন আত্মীয় আমাকে মেরেছিলেন। সেই মারের কথা আমি এখনও ভুলতে পারিনি। ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন—কিন্তু তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণা এখনও আমার মন থেকে যায় নি। গায়ের জোরে পারতাম না বলেই সেদিন প্রতিশোধ নিতে পারিনি। বাপ-মা শিক্ষক যখন ছেলেকে মারবেন তখন যেন মনে রাখেন—শিশুর জীবনে কি প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের অবতারণা করছেন তাঁরা আপনাদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের দ্বারা। মারের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মনে মার ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছে জাগে। কিন্তু অক্ষম সে। প্রতিহিংসা মনের মধ্যে ফুলে ওঠে। ওদিকে কর্ত্তব্যবোধ ব'লে দেয়—পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের বিরুদ্ধে বৈরীভাব পোষণ করা পাপ। শিশু আপনাকে অপরাধী বলে মনে করতে আরম্ভ করে। এই যে আত্মগ্লানি, এই আত্মগ্লানি জীবনের আনন্দ নেয় কেড়ে।

দেহের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে শিশুর উপর যেমন অত্যাচার করা হয়—তার বুদ্ধির দুর্ব্বলতার

সুযোগ নিয়েও তার উপর তেমনি অত্যাচার হ'য়ে থাকে। শিশুর মন যে কত স্পর্শকাতর সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। কত অকারণে তাদের মনে আমরা কত গভীর আঘাত দিয়ে থাকি। বাজারে গিয়ে ছেলে যদি টাকা হারিয়ে এলো—তার লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। মা তাকে বলতে থাকে বোকা; বাবা তাকে বলতে থাকে নির্ব্বোধ। এই গালাগালির ফলে বেচারায় আত্মবিশ্বাস যায় খর্ব্ব হ'য়ে। সে সত্যি সত্যি নিজকে নির্ব্বোধ মনে করতে আরম্ভ করে। তাড়াতাড়িতে চলবার সময় অসাবধানে মেয়েটা চায়ের কাপটা ভেঙে ফেলেছে। অমনি সে হয়ে গেল পৃথিবীর মধ্যে একটা অতি অপদার্থ জীব। একটি মেয়ে পরম আগ্রহের সঙ্গে মায়ের জন্মদিনে তাঁকে গান শোনালো। গানটি অনেক দিন ধরে সে অভ্যাস করেছিল মায়ের কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার লোভে। গান হয়ে গেলে মেয়েটি শুনতে পেলো তার মা একজন অতিথিকে বকেছেন, "শোনবার মত গান গাইতে হ'লে অনেকদিন গান অভ্যাস করতে হয়!" সেই কথা শোনার পর থেকে মর্ম্মাহত বালিকা গান গাওয়া ছেড়ে দিলে। জীবনের একটি প্রকাণ্ড সম্পদ থেকে সে বঞ্চিত হোলো। এমনি ক'রে ছেলেমেয়েদের আত্মসম্মানবোধকে পদদলিত করে কত তরুকে আমরা অঙ্কুরেই বিনষ্ট ক'রে দিই। মামা বালক ভাগনের বুকে লাথি মেরেছে আর মা সেই দৃশ্য দেখেছে—এমন ঘটনাও জানি। বালকের জীবনে সে যে কত বড় ট্রাজেডি—মা যদি সে কথা বুঝতো—তার ভায়ের পিঠে চাবুক মারতো। অনেক বছর কেটে গেছে—কিন্তু বালক ভোলেনি সে দিনের সেই আহত হৃদয়ের দুঃসহ বেদনার স্মৃতি। জীবনের প্রথম প্রভাতে চলবার পথ যদি চোখের জলে ভিজে ওঠে, কি অপরিসীম সেই দুর্ভাগ্য! শিশুর জীবনে সেই ট্রাজেডি সৃষ্টি করবার কোন অধিকার নেই তো আমাদের। সে যদি কোন অন্যায় কাজই করে, সেই অন্যায় কাজ থেকে তাকে নিবৃত্ত করা কি এমনই কঠিন কাজ? ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে তার হৃদয় জয় করতে কতক্ষণ?

পৃথিবীতে দিন এসেছে ছেলেদের মনস্তত্ত্ব ভাল ক'রে বুঝবার। Spare the rod and spoil the child—এই সব পুরানো যুগের কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। যে রকম সময় এসেছে তাতে ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের ঠিক প্রতিধ্বনি অথবা ছায়া হবে এমন সম্ভাবনা কম। গোঁড়া হিন্দুর ছেলে স্কুলে শুনছে—অস্পৃশ্যতা মহাপাপ। বাড়ীতে যা শেখে—ইস্কুলে শেখে তার উল্টো। ঘরের বাইরে এমন সব আইডিয়া তার মগজে ঢুকছে যার সঙ্গে বাপমায়ের শেখানো সংস্কারের কোন মিল নেই। আমরা মধ্যযুগের গ্রাম্য জীবনের সীমানা পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর কোলাহলময় জীবনের বিপুল দ্বন্দ্বের মধ্যে এসে পড়েছি। নেই চণ্ডীমণ্ডপ, নেই গো-যান, সেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আর মনুসংহিতার শ্লোকের আবৃত্তি। এসেছে এরোপ্লেনের যুগ; জগতের দেশগুলি নিতান্তই কাছাকাছি এসে পড়েছে। রেডিও এসেছে, সিনেমা এসেছে—এসেছে পশ্চাত্যের সাহিত্যরথীদের নব নব চিন্তার প্রবাহ। মিশনারী সাহেবদের ইস্কুলে ছেলে পাঠাচ্ছি। মাইনে কম আর ইংরেজী প'ড়ে সে চাকরী পাবে ব'লে। সাহেব শেখাচ্ছে—প্রতিমা পূজা করিও না; এদিকে বাড়ীতে ছেলে সন্ধ্যা-আহ্নিক না করলে তার উপর রাগ! মোটের উপর আমাদের জীবনে এসেছে প্রবল দ্বন্দ্ব। ঘরের সঙ্গে বেধেছে বাইরের বিরোধ। ইস্কুলের সঙ্গে নেই গৃহের যোগ। এমন অবস্থায় বাপ-মা যদি মনে করেন, ছেলেটী হুবহু তাঁদের নিরাশ হতে হবে। নব নব ধারণা তার মনের মধ্যে বাসা নিয়ে তার মধ্যে জাগাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সকলের কাছে বাঞ্ছনীয় না হ'তে পারে—কিন্তু উপায় নেই। চারিদিকের আবহাওয়ার মধ্যে এমন কিছু আছে—যার ফলে ছেলেমেয়ের

ঠিক ছাঁচে-ঢালা পুতুল হবে না। এমন অবস্থায় বাপ-মা শিক্ষক ও অভিভাবকের পক্ষে কর্ত্তব্য হবে ছেলেমেয়ের মনকে বুঝতে চেষ্টা করা। বেত হাতে নিয়ে যদি বলি, তোদের শুনতে হবে আমাদের কথা, তবে ফল হবে উল্টো। মতের অনৈক্য চরম বিচ্ছেদের ট্রাজেডি আনবে। এর থেকে একথা যেন না বুঝি যে, ছেলেমেয়ে নূতনের চাকচিক্যে ভুলে যা চাইবে—তারই সঙ্গে বাপ-মাকে সায় দিতে হবে। ছেলে বিষ চাইছে ব'লে তো তার হাতে বিষ দিতে পারি না। আসল কথা হচ্ছে—সেই দিন এসেছে যখন বাপ মা আর ছেলেমেয়ে উভয় পক্ষকেই পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। হুকুম নয়—ভালবাসা; আঘাত নয়—আলিঙ্গন। অভিমান ক'রে কোন লাভ নেই। ঝড়ের উপর যেমন অভিমান করতে পারি না—ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনের উপরও তেমনি অভিমান করতে পারি না। দুইটাই অমাদের ক্ষমতার বাইরে! ছেলেটিকে যদি বাইরের সমস্ত সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ঘরের মধ্যে বন্দী ক'রে রাখতে পারতাম, বাইরের কোন চিন্তাধারা তার মগজে ঢুকতে না দিতাম, তবে হয়তো তাকে নিজের ছায়া করা সম্ভব হতো। কিন্তু তা অসম্ভব। যখন অসম্ভব তখন এসহে অভিভাবকগণ, হৃদয়ের দরদ দিয়ে বোঝ তোমাদের সন্তানগণের জীবনের বিপুল সমস্যাগুলিকে! তারা হারিয়ে ফেলেছে তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের সংস্কার। তোমরা তাদের নিয়ে এসেছো এমন একটা যুগের মধ্যে যখন আদর্শের সঙ্গে আদর্শের লেগেছে সংঘাত, সব ভেঙেচুরে যাচ্ছে তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে; হাজার দিক থেকে হাজার রকমের আইডিয়া আসছে তাদের মগজের মধ্যে। এতো রাগ করবার সময় নয়, বেত মারবার সময় নয়,—এ যে হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে অনুভব করবার সময়; এ যে অন্তরের অনুভূতি দিয়ে অন্যকে বুঝবার দিন। এ যে নূতনের সঙ্গে পুরাতনের বোঝাপড়ার সুপ্রভাত। অনুদার হ'য়ে, ক্রুদ্ধ হ'য়ে, আত্মাভিমানে অন্ধ হ'য়ে এই সুপ্রভাতের জ্যোতির্ম্ময় সন্তানকে কি বিনষ্ট করবো?

নবশক্তি

গান

শ্রীরমা দে

(অনুভাবে)

স্বপনে বন্ধ ছিলো প্রাণ মোর,
ছিলোনা কো কোনো ভয় মানবীয়ো,
দেখে শুধু মনে হ'তো নাহি ওর
চেতনার লক্ষণ কোনটাও।
পার্থিব বর্ষের সপর্শ
জাগায় না তাঁর কোনো হর্ষ,
প্রতিবার ব্যর্থ-সে বর্ষ
কেঁদে কয়, জাগিবেনা কীও?

আজি তাঁর গতি নাই, নাহি বল,
শ্রবণ নীরব আজি নাহি চোখ;
কোথা আসে মুছাবারে আঁখি জল
ব'সে যদি তাঁর কাছে করি শোক?
পাহাড়-পাথর-তরু-গুলি সনে
ঘুরিতেছে সে কারণে-অকারণে
পৃথিবীর আহ্নিক মহায়ণে,
হারাণো মানসী মোর নিরীন্দ্রিয়ো।

ভারতের মৌলিকতা

শ্রীমতি দিবা মৈত্র ও শ্রীবটুক সান্যাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত্র" নামক সংস্কৃতগ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং স্যর অয়েল ষ্টেনের কথনানুসারে ইহা অবিকৃত অবস্থায় চীনাতুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। বাল্মীকির রামায়ণও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। যবদ্বীপ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে বাণিজ্য বিস্তৃতির সাথে সাথে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যও প্রসারলাভ করিয়াছিল। তথাকার কলানিদর্শনসমূহ ভারতীয় কলার প্রাণস্বরূপ এখনও বিরাজমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষাও সংস্কৃত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের অনেকগুলি পংক্তি এখানকার মন্দিরসমূহের প্রাচীরগাত্রে খোদিত পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণই হইতেছে এদেশের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ ও রামসীতা যবদ্বীপবাসীর আরাধ্য দেবতা। যবদ্বীপবাসীরাই রামায়ণকে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; ভারতে কিন্তু বিভিন্ন লেখকের হস্তে রামায়ণের বহু পাঠান্তর ঘটায় মূল পাঠ লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। যবদ্বীপবাসীরা মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যগুলিও অবিকৃত অবস্থায় রাখিয়াছে।

এখানে একটা আশ্চর্য্য বিষয়ের উল্লেখ যুক্তিযুক্ত মনে করি। বছরখানেকের বেশী নয়, যুক্তপ্রদেশের জনৈক পণ্ডিতের মিঃ এ-পোস্‌কা (A. Poska—মে মাসের Modern Review তে Lithuania সম্বন্ধে ইঁহার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে) নামে একজন লিথুয়ানিয়ান্ পণ্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। মিঃ পোস্‌কা তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার দেশ লিথুয়ানিয়ায় সংস্কৃত হইতেছে কথ্য ভাষা রাম এবং কৃষ্ণ তাঁহাদের দেবতা, বেদের সমস্ত দেবতার পূজাই তাঁহাদের দেশে হইয়া থাকে, গঙ্গা ও যমুনা তাঁহাদের দেশেরও নদীর নাম। গোজাতিকে তাঁহারাও শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখিয়া থাকেন। আমাদের ভারতীয় পণ্ডিতটী বরোদায় প্রাচ্য-পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে এবিষয়ে আলোচনা করেন কিন্তু অনেকেই তাঁহার একথা বিশ্বাস করেন না। পরে তিনি ইংরাজী বিশ্বকোষ Encyclopaedia Britanicaয় Lithuanian সম্বন্ধে মিঃ পিঃ এ ক্রেপোট্‌কিনের রচনা পাঠ করিয়া মিঃ পোস্‌কার উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। ক্রপট্‌কিন্ তাহাতে লিখিয়াছেন,—

"Their language has great similarities to the Sanskrit. It is affirmed that whole Sanskrit phrases are well understood by the peasants of the banks of the Niemen.—pp 703 First Column."—লিথুয়ানিয়ান্দের

ভাষার সংস্কৃতের সাথে খুব সাদৃশ্য আছে এবং নীমেন্ নদীতটের অধিবাসী কৃষকগণ সংস্কৃত বাক্যাংশের অর্থ বেশ চমৎকার বুঝিতে পারে। মিঃ পোস্কা তাঁহাদের ভাষার কিছু উদাহরণ দেন—যেমন, নক্তগণ (লিথুঃ)=নক্তংগণ (সংস্কৃত)=রাত্রিগোষ্ঠী বা রাত্রে fireplace এর চারিদিকে যে আড্ডা বসে; 'তব ক্যানাম' (লিথু)=তোমার নাম কি? ইত্যাদি। লিথুয়ানিয়ানদিগের ভিতর একরকম গান প্রচলিত আছে; এই গানগুলিকে 'রৌদস্' বলে। "The elegies (Raudas) are very melancholy ; and of a rare beauty-Ibid."

গানগুলি খুব করুণ; গাহিবার সময় গায়ক ও শ্রোতা না কাঁদিয়া পারে না, তাই ইহাদিগকে 'রৌদস্' (সংস্কৃত রুদ্) বলে। এই রকম সংস্কৃতের সাথে তাহাদের ভাষার অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এনসাইক্লোপিডিয়ায় তাহাদের শারীরিক গঠন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে তাহারা আর্য্য বলিয়া প্রমাণিত হয়—"The Lithuanians are well built ; the face is mostly elongated, the features fine, the very fair hair, blue eyes and delicate skin distinguish them from poles or Russians—I bid" সুদূর বালটীক্ সাগরের তীরে অবস্থিত এই ছোট্ট দেশটীর ভারতের সহিত যে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান, তাহা আর্য্যদের নিস্ক্রমনের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই।

বিদেশীদিগের উপর উপনিষদের প্রভাবও বড় একটা কম পড়ে নাই। সাহজাহানের পুত্র দারাশিকোহ স্বয়ং সংস্কৃত হইতে পারসী ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ করেন, যাহার ফলে মুসলমানেরা তাঁহাকে ঘৃণাস্পদ কাফের আখ্যা প্রদান করে। ইউরোপীয় ভাষায় উপনিষদের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ বোধহয় দারার পারসী অনুবাদের মধ্যদিয়াই হইয়াছে, কেননা দারার গোয়া বন্দরের খৃষ্টানদিগের সহিত বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহারাই যে ফরাসী হইতে লাটিনে উপনিষদের অনুবাদ করেন নাই, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। ইউরোপীয় ভাষায় উপনিষদের আধুনিক অনুবাদগুলি অবশ্য ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী মূলসংস্কৃত হইতেই করিয়াছেন। ফারসী হইতে লাটিনে অনূদিত উপনিষৎ পাঠ করিয়া জর্মন দার্শনিক শোপেনহর (Schopenhaur ইহার গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি এই গ্রন্থের ভিতর এমন কি পাইয়াছেন যে ইহা লইয়াই সমস্ত দিবারাত্রি কাটাইয়া দেন; ইহার উত্তরে শোপেনহর বলেন "Opanishads have been the solace in my life, they will be my solace in death."! কেহ কেহ এমনও বলেন কান্ট ও হেগেলের দার্শনিক মতবাদের উপর ভারতীয়তার সুস্পষ্ট ছাপ বর্ত্তমান। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদের মৌলিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না; কেননা ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম এবং দার্শনিক মত ও বিচারের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে কাণ্টের সময় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নসমূহের সহিত পরিচিত হইতেছিলেন ও তাহাদের সম্বন্ধে

সময়ে সময়ে অনুশীলন ও করিতেন। সর্ব্বপ্রথম ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক শ্লেগেল (Friedrich schlegal) তাঁহার Language and wisdom of the old Hindus গ্রন্থের ভিতর দিয়া হিন্দু অধ্যাত্মের সহিত ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় ঘটান। অবিলম্বে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন আরম্ভ হইয়া গেল এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের এক বিরাট মণ্ডলী এই কাজে ব্যাপৃত হইলেন। কিছুদিন পর তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হইল যে এ সমস্ত মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র, প্রকৃতপক্ষে এ সবের ভিতর কিছুই নাই। কিন্তু শীঘ্রই ম্যাক্সমূলর, যিনি প্রথমে ঋগ্বেদকে "মেষপালকের গীতি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কথন প্রত্যাহার করিয়া ঋগ্বেদের এতখানি গুণগান করেন যাহা একজন ভক্তের দ্বারাই সম্ভব। পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদকে "মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রথম জ্ঞাত রচনা" বলিয়া ঘোষণা করেন; এবং ম্যাক্সমূলর তাঁহার India and what she can teach us পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিদেশে ভারতের স্থান গৌরবময় ও সুদৃঢ় করেন। তারপর তিনি এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শত শত গ্রন্থ রচনা করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন; এবং অবিলম্বে ভারতীয় বিষয় সমূহের অধ্যয়নের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নূতন নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইল। এক জার্ম্মাণীতেই কেবলমাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য ২৯টী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অধুনা বৌদ্ধরাও ইউরোপে স্থানে স্থানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও লণ্ডনে মহাবোধী সোসাইটীর একটী শাখা লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিছুদিন হইল আর্য্যসমাজ তথায় একটী মন্দির স্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহার বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে অনার্য্যদিগকে আর্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মধ্য এশিয়া, ফীজী, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছেন। হিন্দু অধ্যাত্মপ্রচারে রামকৃষ্ণমিশনের কার্য্যও উল্লেখযোগ্য। অধুনা পৃথিবীতে থিয়োসফী বা যোগশাস্ত্রের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। এই নবধর্ম্মের উপাসকগণের আচরণ ভারতীয় আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা ভারতীয় বেশভূষা পরিধান করেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে গীতা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রভুতা সুপরিস্ফুট। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সিকাগোতে যে সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে স্থির করা হয় যে সমগ্র ধর্ম্মের প্রতিনিধিবর্গের নিকট হইতে তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ভগবৎ প্রার্থনা সমূহ আনয়ন করাইয়া তাহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে হইবে সেই প্রার্থনা স্তোত্রটী গাহিয়াই সভার উদ্বোধন করা হইবে। প্রার্থনাসমূহ আসিয়া পৌঁছিলে সনাতনধর্ম্মেরই একটী প্রার্থনাগীতি সকলের মতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয় ও এইরূপে পৃথিবীতে সমগ্র ধর্ম্মের উপর ভারতীয় সনাতনধর্ম্ম নিজের বিজয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। প্রার্থনাটী আমাদের অতি পরিচিত—

অসতো মা সদ্গময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়।

মৃত্যোর্মামৃতং গময়
আবিরাবির্ম এধি ॥

আমায় অসত্য হতে সত্যে নিয়ে যাও ;
আমায় আঁধার হতে আলো মাঝে নাও ;
আমায় মৃত্যু হতে তুলে অমৃতে ডুবাও ;
আমাময় হয়ে প্রকাশিত হও।

সকলেই বলিবেন, ইহাতে একদেশীয়তার ও এক ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই ; যে কেহ যে কোন স্থানে এই প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকারী।

এখন আমরা কয়েকটী বিশিষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিব, বিশ্বসাহিত্যের উপর যেগুলির যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। (১) আনাতোল ফ্রাঁস রচিত 'তে' (Thais)—এই 'তে' রচনা করিয়া ফ্রাঁস সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এই উপন্যাসটী দণ্ডিকবি-বিরচিত "দশকুমার চরিতের" অন্তর্গত একটী কথিকার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। (২) রাইডার হাগার্ড রচিত "She" উপন্যাসটীর উপর বাণভট্টের "কাদম্বরী"র প্রভাব পড়িয়াছে। (৩) জার্ম্মানীর বিশ্বকবি গ্যেটে (Goethe) রচিত "Faust" নাটকের উপর কালিদাসের শকুন্তলার যে প্রভাব পড়িয়াছে (অথবা শকুন্তলাই যে কাব্যের আধার) কবি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু এই তিনটীর আলোচনাই যথেষ্ট মনে করি।

ফ্রাঁসের "তে" উপন্যাসটীর আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ—

মিশর দেশের অধিবাসী জনৈক প্রথিতযশা মিশনরী গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী কোন নগরের অধিবাসিনী জনৈকা পতিতার কাহিনী শুনিয়া তাহাকে পাপের পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গ্রীসের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া পতিতা নারীর ভৌতিক ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তিনি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। দেখিলেন, নগরীর প্রতিষ্ঠা-ভাজন ধনকুবেরগণ তাহার সামান্য অঙ্গুলিহেলনে না করিতে পারে এমন কাজ নাই। গণ্যমান্য রূপবান্ ধনশালী যুবকগণ সারাক্ষণ তাহার প্রাসাদে যাতায়াত করিতেছে ও ক্রমশঃ অবনতির অন্ধকারময় গহ্বরের দিকে নিজেকে চালিত করিতেছে। মিশনরী তথায় অবস্থান করিয়া নিজের কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু যতই তিনি তাহার চরিত্রের সংস্কার সাধন করিয়া তাহাকে মুক্তির পথে চালাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন, ততই স্বয়ং তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন, এবং অবশেষে সে যখন সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধি ও নির্ম্মলতা লাভ করিল, তখন তিনি সেই নারীর প্রেমের অচ্ছেদ্য জালে জড়িত হইয়া উন্মাদ হইয়া গেলেন। ইহাই "তে" র মর্ম্মকথা।

অপরপক্ষে, "দশকুমার চরিতের" পূর্ব্ব পীঠিকার দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসের "অপহারধর্ম্ম চরিতে" মহর্ষি মরীচি সম্বন্ধে কথনিকাটী এইরূপ—

দেব, যখন আমি জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে খুঁজিতে লাগিলাম, তখন লোকেরা বলিল, গঙ্গাতীরে ত্রিকালদর্শী মরীচি নামে এক মহর্ষি বাস করেন, সেই মহাত্মাই কুমারের সন্ধান বলিয়া দিবেন। যখন আমি সেখানে পৌঁছিলাম, তখন একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে মরীচি নামে কোন ত্রিকালদর্শী মহর্ষি বাস করেন? সে বলিল—হাঁ, বাস করিতেন বটে, কিন্তু এখন আর করেন না। তিনি উগ্রতপস্বী ছিলেন, তপোবল ছিল তাঁর অসাধারণ! একদিন তিনি তাঁহার কুটীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে নগর হইতে কামমঞ্জরী নামে এক অনিন্দ্যসুন্দরী বারনারী মুক্তকেশে শিথিলবসনে চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার মাতা ও অনুচরগণ আসিয়া পৌঁছিল। সে ও তাহার মাতা—উভয়ের কথা শুনিয়া মহর্ষি অবগত হইলেন যে কামমঞ্জরী তাহার মাতা ও আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার নিজ জীবনের বর্ত্তমান ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া ভগবৎসাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসুক। কামমঞ্জরীর কাতর প্রার্থনায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া মহর্ষি তাহাকে তাঁহার নিকট বাস করিবার অনুমতি দিলেন এবং প্রতিদিন ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ কামমঞ্জরী চতুর্ব্বর্গ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল। একদা নির্জ্জনে মঞ্জরী মহর্ষিকে বলিল, মূর্খ মানুষ কিরূপে ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া অর্থ ও কামে রত হয়? মহর্ষি তাহাকে সুধাইলেন,—বৎসে, তোমার মতে কিরূপে কাম ও অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ? ব্রীড়াবনতমুখী মঞ্জরী ধর্ম্ম ও কামের বিশদ ব্যাখ্যা মহর্ষিকে শুনাইল। পূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে মহর্ষির হৃদয় মঞ্জরীর রূপের মোহে আকৃষ্ট হইতেছিল, এখন তাঁহার আত্মসংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তপস্যা ছাড়িয়া মঞ্জরীর সাথে নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ইত্যাদি। পরে যখন তাঁহার চৈতন্য হইল তখন তিনি বিনষ্ট বিভূতি ফিরিয়া পাইবার জন্য গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু তখন তাহা অসম্ভব। লোকটী কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল,—সেই মরীচি আমিই; কিন্তু এখন আমার না আছে পূর্ব্বের সেই তপোবল, না আছে পুনরায় তপস্যায় রত হইবার শক্তি!

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আনাতোল ফ্রাঁসের উপর দশকুমার চরিতের শুধুপ্রভাবই পড়ে নাই, বস্তুতঃ তিনি নিজের উপন্যাসে এই গল্পের বিস্তার সাধন করিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, তাহা তাঁহার "তে" হইতেই প্রমাণিত হয়। "তে"র কোন অধ্যায়ে যখন মিশনরী গ্রীসের অভিমুখে চলিয়াছেন, তখন টাইবার নদীর তীরে উপবিষ্ট জনৈক সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুটী মিশনরীকে নানাবিধ

জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন এবং বলেন যে তিনি গুরু এবং সত্যের সন্ধানে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে

"ভারতে গঙ্গাতীরবাসী" এক ঋষির মধ্যে তাঁহার অভীপ্সিত গুরু ও সত্যের সন্ধান্ পান। সমস্ত গল্পাংশটুকু মিলিয়া যাইবার পর "ভারতবর্ষে" গঙ্গাতীরে স্থিত দশ কুমার চরিতে বর্ণিত মরীচি-আশ্রমের আভাষ কি এই "তে"র বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় না? আমাদের মনে হয়, টাইবার নদীর ঋষির উল্লেখ করিবার মধ্যে লেখকের এই কথাই বলিবার প্রয়াস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে যদি মিশনরী নিজের মিথ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া, বেশ্যার জীবনের সংস্কারের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া; নিজের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত না করে, তাহা হইলে তাহার পরিণাম গঙ্গাতীরের ঋষির মতই হইবে এবং তাহা না করায় তাহার জীবনের সেই দশাই ঘটিয়াছে।

রাইডার হেগার্ড প্রাচ্যবিষয়ক অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। আফ্রিকা সম্বন্ধেও তাঁহার অনেক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কতকগুলি গ্রন্থে ভারতীয়গণেরও বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ভারতীয় বিচার ও সাহিত্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার রচনার উপর বাণের কাদম্বরীর যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। সমগ্র ইউরোপের Mysteries of the court of London রচয়িতা Reynoldsই শুধু বাণের চিত্রণ-পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু হেগার্ড ও তাঁহার উপন্যাসের গল্পাংশের স্থানে স্থানে বাণের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার She উপন্যাসের নায়িকা নায়ককে পুনরায় ফিরিয়া পাইবার জন্য ঠিক্ সেইরূপে তাহার প্রিয়ের সমাধি পূজা করিত যেরূপে কাদম্বরীর মহাশ্বেতা চিরজীবন নায়কের পুনর্জ্জন্মের প্রতীক্ষা করিয়াছে। এইরূপ আরও অনেক স্থানে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

জার্ম্মাণ কবি গোটে কালীদাসের একজন বড় ভক্ত ও শকুন্তলার একজন খুব বড় প্রশংসক ছিলেন। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" পড়িয়া তিনি যে উল্লাসোক্তি করিয়াছেন তাহা ভারতীয় সাহিত্যের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

Wouldst thou see spring's blossoms and the fruits of its decline,
Wouldst thou see by what the souls enruptured feasted fed
Wouldst thou have this earth and heaven in one sole name combine,
I name thou, Oh Sakuntala! and all at once is said.

উপসংহার। ভারতের গৌরব করিবার মত আরও অনেক কিছু আছে। অতীতকে লইয়া গৌরব করিয়া কি লাভ? অতীতের ভিতরই আমরা আমাদের নিজস্ব বস্তুর সন্ধান পাইব ও তাহাই আমাদের স্বাদেশিকতার স্বজাতীয়তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

"পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে
খাঁটি ধন যা সেথাই পাবি আর কোথাও পাবিনারে।"

সত্য ও মিথ্যা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আধো আলো আর আঁধারের মাঝে
লেগেছিল যাহা ভালো,
তার সে সত্য রূপটী ফুটায়ে
দিয়াছে উজল আলো।
রূপের পূজারী রূপ খুঁজে ফেরে
অরূপের মাঝে দেখেছে নিজেরে
চমকিয়া উঠি চায়
স্বপন কেননা রহিল স্বপন
ভরা চির নিরাশায় ?

বাদলের ধারা পর্দ্দা রচেছে নয়নের চারিধারে,
ও পারে তাহার কি যে আছে নাহি জানি,
সচল মায়ায় জড়ায়ে পড়েছে অচল কণ্ঠ হারে
মিথ্যা আজিকে সত্যকে অনুমানি।
দূরে যাহা থাকে তাই বড় ভালো,
কাছে এলে শুধু জেগে ওঠে কালো
স্বরূপ তাহার প্রকাশিছে আলো
করে তার রূপ হানি।

আধো আলো আর আঁধারের বুকে
যে ছবি রয়েছে—থাক
মিথ্যারে জানি ভালো।
কল্পনা রচি মানুষের মন গভীর শান্তি পাক,
দরকার কিবা আলো ?
আঁধার রজনী, আঁধার আকাশ
বুকে জেগে থাক মৃদুল বাতাস
রূপ তারা দেবে—জানি
মিথ্যাই থাক সত্য হইয়া চিত্তে হরষ দানি।

জাপানে বিরাট পরিকল্পনা

দেশরক্ষার জন্য যে পঞ্চ বার্ষিক বিমানপরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান সরকার অ-সামরিক বিমান চলাচলের সাহায্য করিবার জন্য এক বিপুল পরিকল্পনা খাড়া করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে প্রাথমিক ব্যয় হইবে এক কোটী কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড। বিমান অবতরণের স্থান সমূহ প্রস্তুতের জন্য অবিলম্বেই ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিমান যাহাতে সম্পূর্ণরূপে জাপানেই প্রস্তুত হয় তজ্জন্য জাপ-সরকার বিমান-প্রস্তুতকারকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন।

নারী-শিক্ষা

নারীরক্ষা কার্য্যে অর্থসাহায্য করিবার জন্য হিন্দুমিশনের একটি আবেদনপত্র গত সংখ্যার 'ভারতে' প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা লিখিয়াছেন—গত দশ বৎসর যাবৎ বাংলার নানাস্থানে বিপন্না হিন্দু-নারীদিগের রক্ষা-কার্য্যে হিন্দু-মিশনের কর্ম্মিগণ ব্রতী আছেন।

কলিকাতার 'নারীকল্যাণ-আশ্রম'ও নিরাশ্রয় হিন্দু-নারীদের আশ্রয় দিয়া সাধ্যমত তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং বিবাহেচ্ছু কুমারীগণকে সৎপাত্রে দান করিবারও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

নারী-রক্ষা কার্য্যে এই দুই প্রতিষ্ঠানের উপর আমাদের বিশ্বাস আছে কারণ, অবিশ্বাস করিবার মত কোন নিদর্শন এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাংলাদেশে এবং বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ অসংখ্য নারীরক্ষা সমিতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা অনেকেই সৎকর্ম্মের আবরণে অসৎকার্য্য করিয়া থাকেন এইরূপ শোনা গিয়াছে। এইরূপ শোনা থাকিলেও ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু যখন আমাদের জানা নাই, তখন ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমরা বলিতেও পারি না। তবে, নারী-রক্ষা কার্য্যে ঐরূপ যে কোন সমিতির সহায়তা লইবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে ভালরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য জন সাধারণকে আমরা অনুরোধ করিতেছি। কারণ শোনা যায়—ঐরূপ অনেক প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় লইয়া মেয়েদের অসৎপথ নাকি আরো প্রশস্ত হয়। পুলিশের কর্ত্তব্য—এইরূপ দোষদুষ্ট প্রতিষ্ঠানের (প্রবঞ্চ—অনুসন্ধান করিয়া যদি দোষ বাহির হয়) উচ্ছেদসাধন করা।

তবে—'হিন্দু মিশন' ও 'নারীকল্যাণ-আশ্রমের নারীরক্ষা কার্য্যে জনসাধারণের উদ্বেগের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়া বিপন্না হিন্দু-নারীদের সহায়তা করিতে পারেন।—কন্যা বাঞ্ছনীয়।

ভারত

বেতারের ভবিষ্যৎ

বেতার আবিষ্কর্ত্তা মার্কনী নাকি গোপনে এক ভীষণ বিভ্রাট সৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি সহসা সমগ্র পৃথিবীকে চমকিত করিয়া দিবেন। মার্কনী অনুমান করেন, সমগ্র জগতের সকল স্থানের শব্দ এক স্থান হইতে শুনা যাইবে এবং সকল স্থানের দৃশ্য একস্থানে বসিয়া দেখা যাইবে, বেতার সেই সুদিন আনয়ন করিতেছে। মার্কনী মনে করেন,—বেতার পদ্ধতিতে বায়ু হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া বড় বড় কারখানা ও যানবাহন চলিবে এবং স্থলে ট্রেণ ও জলে জাহাজ এই বেতার বলেই পরিচালিত হইবে। সে শুভদিনের নাকি বেশী বিলম্ব নাই।

আজ-কাল

জাপান ও চীন

১৯২২ সালে নয়টী শক্তি মিলিতভাবে স্বীকার করিয়া লন যে চীনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে এবং চীনের স্বার্থে আঘাত দিয়া নিজেদের কোন স্বার্থ লইয়া চীনকে বিব্রত করিবেন না। যে নয়টি শক্তি এই সর্ত্ত মানিয়া লইয়াছিলেন জাপান তাহাদের অন্যতম। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে দেখা গেল জাপান এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া চীনের মাঞ্চুকো প্রদেশ দখল করিয়া লইল কিন্তু ইউরোপের শক্তিবৃন্দ এ ব্যাপারে কোন আপত্তি জানাইলেন না।

চীনের তরুণ সম্প্রদায় কিছুদিন পূর্ব্বে রাশিয়ার সহিত একযোগে দেশের মধ্যে রাশিয়ার ভাবধারা প্রচার করিতেছিলেন কিন্তু চিয়াং-কাই-শেক ঐ নূতন দলকে ধ্বংস করিয়া দেন।

রাশিয়ার সহিত চীনের এই যোগসূত্র ইউরোপের শক্তিবৃন্দ কোন দিনও সুনজরে দেখেন নাই। অনেকে মনে করেন জাপান যখন সমগ্র মাঞ্চুকো প্রদেশ দখল করিয়া লইল তখন ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ তাহাকে বাধা দেওয়া দূরের কথা রাশিয়ার সহিত চীনার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইল মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

চীনের অবস্থা কতকটা ভারতবর্ষের মত। সামরিক শক্তির গর্ব্বে জাপান দিনের পর দিন চীনের উপর নূতন নূতন অপমানজনক সর্ত্ত চাপাইতেছে আর দুর্ব্বল নিরুপায় চীন ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে দগ্ধ হইয়া তাহা মানিয়া লইতেছে। ইহার ফল এই হইতেছে যে চীনের অনেক দেশপ্রেমিক আজ রাশিয়ার সহিত একটা যোগসূত্র স্থাপন করিয়া নিজেদের স্বাধীনতার পথের সন্ধান করিতেছে।

মহিলার উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি

শ্রীমতী রমা বসু এম্, এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে এম্, এ পাশ করিয়া বিলাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার অব ফিলজফী পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠ করিতেছেন। তাঁহার পারদর্শিতা ও মেধাশক্তির প্রভাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বেচিলার অব্ লিটারেচার পরীক্ষা না দিয়া ডক্টরেট পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বেহারী লাল ট্রাষ্ট ফণ্ড, হইতে ২৪০০৲ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার বৃত্তিতে হিন্দু মহিলার উচ্চ শিক্ষার অত্যন্ত সহায়তা করিবে।

শ্রীমতী রমা বসু ব্যারিষ্টার এস এম বসুর কন্যা ও স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পৌত্রী।

পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ

সম্প্রতি ফরাসী দেশ 'নরমাঁদা' নামক একখানি জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার দৈর্ঘ্য ১০২৮ ফুট, প্রস্থ ১১৯ ফুট, টনেজ ৭৯০০০ টন। তলদেশ হইতে চোঙের মাথা পর্য্যন্ত উচ্চতা ১৮৩ ফুট! ইহাকে একখানি

ভাসমান সহরও বলা যাইতে পারে। ইহাতে আছে দুইটী পুষ্করিণী, একটী বাগান এবং তন্মধ্যে ৫টি পক্ষিশালা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, গির্জ্জা, খেলার ডেক, অসংখ্য দোকান, ছেলেদের আমোদ-প্রমোদের জায়গা ইত্যাদি। এই জাহাজে যাত্রীদের স্থান আছে প্রথম শ্রেণীর ৯০০, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬০০, তৃতীয় শ্রেণীর ৫০০। তা ছাড়া নাবিকের সংখ্যা ১৩৪৫; ইহার বেগ ঘণ্টায় প্রায় ৩০ মাইল। বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ ফরাসী জলের উপর সহর ভাসাইতে সক্ষম হইয়াছে। দেশ যত বিজ্ঞানে উন্নত হয় তার কার্য্যাদিও হয় এই ধরণের।

বিমানপোত চালকরূপে মান্দ্রাজ মহিলা

মিস্ কুমুদাম্মল ও মিস্ আঙ্গুলিয়া বাই বিমানপোত পরিচালন শিক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা 'এ'ক্লাস পাইলট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য মান্দ্রাজ ফ্লাইং ক্লাবে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বয়স যথাক্রমে ১৯ ও ১৬ বৎসর। বিমানপোত পরিচালনে মান্দ্রাজ মহিলার এই প্রথম উদ্যম।

খনির অভ্যন্তরে নারী শ্রমিক

বেগম শা নওয়াজ জেনেভা আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদলের পরামর্শদাত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রমিক সম্মিলনের অন্যান্য অধিবেশনে খনির অভ্যন্তরে নারী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। নারী শ্রমিক নিয়োগ তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কমিটির পক্ষ হইতে সম্মিলনের পূর্ণ বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত করিবার সম্মান বেগম শা' নওয়াজ লাভ করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ খনি অভ্যন্তরে নারী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিবার পর এই সম্পর্কে নিয়মাবলীর যে অংশ যে ভাবে কমিটিতে সংশোধন করা হইয়াছে, বেগম শা' নওয়াজ তাহা বিবৃত করিয়া বলেন,—ভারত-সরকার পূর্ব্বে ভারতের খনিসমূহে নারী শ্রমিক নিয়োগ পর্য্যায়ক্রমে হ্রাস করিয়া ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র বাঙ্গলা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কয়লার খনি ও পাঞ্জাবের লবণের খনির অভ্যন্তরে কার্য্য করিবার জন্য নারী শ্রমিক নিয়োগ প্রচলিত আছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র কয়লা খনির অভ্যন্তরে অন্যূন ২৮ হাজার ৪ শত ৮ জন নারী শ্রমিক কাজ করিত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ২১ হাজার ৮ শত ৮০; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ১৮ হাজার ২ শত ৮৭ ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ১৬ হাজার ৬ শত ৩২ জনে দাঁড়াইয়াছে। ভারতসরকার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমিতির প্রশ্নের জবাবে বর্ত্তমান বৎসর এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন; তাহাতে নির্দ্দিষ্ট কোনও সময় নির্দ্দেশ না করিলেও সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারত-সরকার যথাসম্ভব সত্বর খনি অভ্যন্তরে নারী শ্রমিক নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার পক্ষপাতী বেগম শা' নওয়াজ কমিটীর রিপোর্ট উপস্থাপিত করিবার পর রিপোর্ট সম্বন্ধে যথানিয়ম আলোচনার পর সম্মেলনের অধিবশনে সর্ব্ববিধ কাজে খনির অভ্যন্তরে নারী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র

দেশবাসী শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে সুভাষ বাবুর শরীরে অস্ত্রোপচারের পর তিনি সুস্থ শরীরে ইউরোপের নানাস্থানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারত সম্বন্ধে যে কিরূপ জঘন্য প্রচার কার্য্য হয়, সিনেমায় ভারতকে কিরূপ কদর্য্য ভাবে চিত্রিত করা হয় তাহা তিনি সবিস্তারে জানাইয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সব কোম্পানী ভারতের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের কুৎসা রটনা করে তাহার প্রতীকার করা কিছু অসম্ভব নয়। ভারত সরকার এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও

ভারতবাসী নিজেরাই ইহার প্রতীকার করিতে পারেন। দেশবাসী একযোগে যদি বিদেশী ফিল্ম্স্ দেখা বন্ধ করেন, তবে ঐ বিদেশী কোম্পানীরা বাধ্য হইয়া ভারতের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য স্বদেশে আন্দোলন করিবে। এ বিষয়ে দেশে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালান কর্ত্তব্য। প্রদীপ

শব্দের গতি

বাতাসের ভিতর দিয়ে শব্দ চলে যায় প্রতি সেকেণ্ডে ১০৯০ ফুট কিন্তু বরফের মধ্য দিয়ে যায়, ১১০০০ ফুট।

আবার গরমের দিনে শীতের দিন অপেক্ষা শব্দের গতি দ্রুততর হয়। কারণ গরমের দিনে বাতাসের অণু গতিশীল হয় বেশী। তাইতে শব্দও দ্রুত বহন করে।

যন্ত্র সাহায্যে যোগ বিয়োগ

নর্থ লণ্ডন্ ফ্যাক্টরির শিল্প ইঞ্জিনীয়ার ফ্রাঙ্কগাই অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, সে যন্ত্র সাহায্যে অঙ্কের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সর্ব্ব কার্য্য সুসম্পাদিত হয়। বৈদ্যুতিক শক্তিযোগে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়। যন্ত্রটির কলকব্জার কোনো জটিলতা নাই। টাইপরাইটারের মত কয়টা কী বোর্ড আছে। সেই কী বোর্ড টিপিয়া যান্ত্রিক উপায়ে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ফুলে মাছ খায়

কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও—সত্য। বিলাতের Black-Pool Towerএর বাগানে এক জাতের পুষ্পতরু আনা হইয়াছে—সে তরুতে জল দেওয়া হয়—আর সে জলে থাকে ছোট ছোট মাছ। ফুলগুলা—এই মাছগুলিকে—পাপ্‌ড়ির মধ্যে চাপিয়া রাখে—তারপর আবার যখন পাপড়ি মেলে- তাতে মাছের কোন চিহ্নই থাকে না।

অবন্তিকা

৪০ জন দারোগার নামে মামলা

"ইণ্ডিয়ান নেশন" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, সারণ জেলার ৪০ জন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার এবং অন্যান্য কতিপয় পুলিশ কর্ম্মচারীর নামে আদালতে মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা গুরুতর রকমের অপরাধ চাপিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি স্থলে ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করে নাই। সারণ জেলায় কয়েকটি ডাকাতি হইয়াছিল; কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে তাহার কোন উল্লেখ নাই। অপর কয়েকটি স্থলে ডাকাতির অভিযোগকে চুরির অভিযোগ বলিয়াই তদন্ত করা হইয়াছে। অভিযোগ এই যে, কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সম্মতিক্রমে এইরূপ করা হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মচারী ইতিমধ্যে অপর জেলায় বদলী হইয়া গিয়াছে। সি-আই-ডি ইন্সপেক্টার মিঃ মেহতা নাকি এই সকল বিষয় তদন্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন।

করাতের গুঁড়ি হইতে খাদ্য প্রস্তুত

চারিদিকের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘটনা কখন যে কি ভাবে বৈজ্ঞানিককে কোন্ কাজে মাতাইয়া তোলে তাহা কে বলিতে পারে! সামান্য ঘাস ইত্যাদি খাইয়া গো মহিষাদি কি ভাবে মানব-দেহধারণোপযোগী খাদ্য সরবরাহ করে এই প্রশ্নের উন্মাদনায় সম্প্রতি জার্ম্মানি রাসায়ণিক Dr. Friedrich Bergins করাতের গুড়ি হইতে রাসায়ণিক প্রক্রিয়া দ্বারা গো-মহিষাদির জীবনধারণোপযোগী একপ্রকার খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

কোন দিন হয়তো শুনিব যে বিজ্ঞাপনের কৃপায় করাতের গুঁড়ির ন্যায় এইরূপ কোনো চির অনাদৃত লতাগুল্ম হইতে মানবদেহ ধারণ ও পুষ্টিকরণোপযোগী খাদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিবর্দ্ধন

কোয়েটায় শ্রীহট্টের নারী কুমারী মৈত্রেয়ীর সেবাকার্য্য

শ্রীহট্টবাসী সুপরিচিত স্বর্গীয় রাজচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী চৌধুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোয়েটা নগরীতে আর্ত্তদের সেবায় গমন করিয়াছেন এবং তথায় তাহার কার্য্য নিপুণতায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

দিল্লী হইতে কোয়েটাতে একদল নার্স সহ কতিপয় ডাক্তার প্রেরিত হন, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী আর্ত্ত সেবায় আগ্রহ প্রকাশ করায় এতদসহ কোয়েটাতে প্রেরীত হন তখন তিনি দিল্লী লেডী হার্ডিং নারী হাসপাতালের সার্জ্জেনর কার্য্য নিযুক্ত ছিলেন। কুমারী মৈত্রেয়ী চৌধুরী এম, বি, ও বি, এস উপাধিধারিণী। গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিংডন ও লেডী উইলিংডন যখন কোয়েটার অবস্থা পরিদর্শন করিতে যান তখন শ্রীমতী মৈত্রেয়ীকে তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং তাঁহার কার্য্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। কোয়েটার এ সময় ভীষণ অবস্থা, সাধারণের পক্ষে নিরাপদ নয় বলিয়া কর্তৃপক্ষ এমন কাহাকেও তথায় যাইতে দেন না। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের কন্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ীর সৎকার্য্য সাহসীকতা প্রদর্শনের জন্য আমরা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

প্রথম হিন্দু মহিলা ব্যারিষ্টার

মিঃ কে পি জসওয়ালের কন্যা শ্রীমতী ধরমশীলা লাল ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পাটনা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবেন এবং প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন। তিনিই প্রথম হিন্দু মহিলা ব্যারিষ্টার। মহিলাগণ পুরুষের মত উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে পুরুষের ন্যায় মনীষা প্রদর্শন করেন, শ্রীমতী ধরমশীলা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের অভিমত

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের ডেপুটী প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

এতদিনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তি দেওয়া হইল। ভালকাজ একেবারে না করা অপেক্ষা দেরীতে করাও অনেকটা ভাল—এই দিক দিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তিতে আমরা সন্তুষ্ট, আনন্দ প্রকাশ বা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনেরও ইহাকে নিশ্চয়ই একটা উপলক্ষ বলা যাইতে পারে কিন্তু সে শুধু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে—কিন্তু জাতীয়তার দিক হইতে দেখিলে এই মুক্তিতে আমি গবর্ণমেণ্টকে, জনসাধারণকে এমন কি শ্রীযুক্ত বসুকেও সম্বর্দ্ধনা করিবার কোন ক্ষেত্র দেখি না। শ্রীযুক্ত বসুকে মুক্তি দানের জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে অবিরত দাবী জানান হইয়াছে; কিন্তু সরকার তৎপ্রতি বরাবর উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টার জন্য জনসাধারণকেও আমি সম্বর্দ্ধিত করিতে পারি না। আমরাও পরিষদের মারফৎ শরৎবাবুকে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু আমাদের সমস্ত চেষ্টা অরণ্যে রোদনেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। শরৎ বাবুকেও আমি এই জন্য সম্বর্দ্ধিত করিতে পারি না। ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতে বিচারের জন্য শরৎ বাবু যে দাবী জানাইয়াছিলেন তাহাও গ্রাহ্য হয় নাই। এখন সরকারের মর্জ্জি হইয়াছে তাই তাঁহারা শরৎ বাবুকে মুক্তি দিয়াছেন। একথা কেহই বলিতে পারিবেন না যে, জনমতের দাবীর চাপে বা শরৎবাবু যে বৈপ্লবিক কর্ম্ম প্রচেষ্টার সহিত 'ঘনিষ্ঠভাবে' বা কোন ভাবেই সংশ্লিষ্ট নহেন তাহা শরৎ বাবুর দৃঢ়তা সহকারে জানানোর ফলেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আপনারা আমাকে যতই কুটিল

প্রকৃতির লোক বলিতে হয় বলুন না কেন,—আমি একথা না বলিয়া পারিব না যে, বিনা বিচারে সুদীর্ঘ ৪২টী সপ্তাহ আটক করিয়া রাখার পর শরৎ বাবুকে এই মুক্তি দানে আমি আনন্দে বা কৃতজ্ঞতায় মোটেই অভিভূত হইয়া পড়ি নাই। শরৎবাবুকে মুক্তিদানের কারণ মুক্তিদাতা সরকার ছাড়া আর কেহই জানেন না, কেননা শরৎবাবুকে গ্রেপ্তার করিবার এবং আটক করিয়া রাখিবার কারণ, সরকার ছাড়া আর কেহই জানে না। সরকার যদি দয়া করিয়া জানান যে, পরিষদের সুস্পষ্ট অভিমত অবগত হইবার পরও কেন শরৎবাবুকে মুক্তি দেওয়া হইল না বা ইতিমধ্যে এমন কি ঘটিল যাহাতে শরৎবাবুকে মুক্তিদানের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে সরকার তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বাধ্য হইলেন—তাহা হইলে আমরা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব। সরকার কি শ্রীযুক্ত বসুকে এবং তাঁহার দেশবাসিগণকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন যে, এতদিন তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখার কি কারণ তাঁহাদের ছিল ? এক্ষণে সরকার নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, শরৎবাবুকে মুক্ত রাখিলে সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার কোনই হানির আশঙ্কা নাই। এক্ষণে কি সরকার স্বীকার করিয়া লইবেন যে, শরৎবাবু কখনও কোন অন্যায় করেন নাই বরং তাঁহার উপরই অন্যায় করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতেও একজন লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কি কোন সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট এমন করিয়া খেলা করিতে পারেন ? শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তি করিয়া দিবার জন্য আমি গবর্ণমেণ্টকে সম্বর্দ্ধিত করিতে পারি না বটে, কিন্তু এই জন্য আমি গবর্ণমেণ্টকে সম্বর্দ্ধিত করিতে পারি যে, ভারতে বৃটিশরাজ ২৬শে জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ১৫ মিনিটের পূর্ব্বে যেরূপ নিরাপদ ছিল এখনও তদ্রূপই আছে। আমি কখনই মনে করি না যে, ভারতের শান্তি শৃঙ্খলা বা নিরাপত্তা ও শ্রীযুক্ত বসুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী বিষয়। —ইউ, পি

মহাসমরের পরে

গত মহা সমর শেষ হয়েছে ১৬ বৎসর আগে। কিন্তু ওতে যারা আহত হয়েছিল তাদের তিন হাজার এখনও পড়ে মরছে হাসপাতালে। ৪৫০০ কাঠের হাত পা নিয়ে জীবন যাপন করছে।

নয়া বাংলা

শিক্ষানুরাগিণী মহিলা

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ গাভা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ মহাশয়ের পত্নী। তিনি এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য, তাঁহার প্রায় ১৭ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছে এবং তিনি ৫টী সন্তানের জননী। কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় এবং প্রাইভেট পড়িয়া তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার এই বিদ্যানুরাগ প্রশংসনীয়। কায়স্থ পত্রিকা

জগতশান্তি মহাসভায় ভারতের প্রতিনিধিগণ

আগামী ১১ই নবেম্বর ইউরোপের কোন প্রধান নগরে জগতের শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। মহাত্মা গান্ধী ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উহার সেবা করিতে সম্মত হইয়াছেন। ফরাসী দেশের সাহিত্যিক মঁসিয়ে হেনরী বারবুসী যুদ্ধবিরতির জন্য এইরূপ কংগ্রেসের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ বিষয়ে কলিকাতার শ্রীযুক্ত সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট একখানি চিঠি দিয়া জানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা।

মহাত্মাজীর নিকট পত্র

'হিন্দুস্থান টাইমসে'র শ্রীযুক্ত চমনলালের মারফত নিউ ইয়র্কের 'বিশ্ব শান্তি সঙ্ঘ' নিম্নলিখিত পত্রখানি মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

"১৯২৭ সনে এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতেই এই সঙ্ঘ বিশ্বব্যাপী শান্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেছেন।

"এই সঙ্ঘই সর্ব্বপ্রথমে ইহা উপলব্ধি করে যে, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে মানব সমাজের প্রগতির জন্য সমস্ত জগতে অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্যের স্থায়িত্ব সাধন করিতে হইবে।

"নানাদেশের রাজনীতিবিদ্‌গণের নিকট সঙ্ঘ তাঁহাদের এই ভাবধারা উপস্থাপিত করেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, নানাদেশের শাসক, অর্থনীতিবিদ্‌ ও সংবাদপত্রের উপর এই ভাবধারার প্রভাব প্রড়িয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সঙ্ঘের এই ধারণা সত্য।

"এই সঙ্ঘের সভাপতি কর্ত্তৃক লিখিত 'শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য স্থায়িত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। এই সঙ্ঘ আশা করেন যে, আপনি আপনার মূল্যবান সময়ের কতকাংশ ইহার গুণাগুণ বিচারে ব্যয় করিতে পারিবেন।

"আপনি উহা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিলে এই সঙ্ঘ কৃতার্থ বোধ করিবেন। আপনার ও আপনার অনুগামিগণের যে কোন প্রয়োজনের জন্য ঐ প্রবন্ধটি আপনি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

"ভারতবাসীদিগকে শান্তি, সুখ ও উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য তাহাদের ভিতরে ঐক্য স্থাপনের যে চেষ্টা আপনি করিতেছেন, আপনার সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হউক।" ইউনাইটেড প্রেস

হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ

ব্যবহারিক হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ একটী উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে—এবং আমরা দেখিতেছি ইদানীং অনেকগুলি হিন্দু দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া পত্নীর পুনর্ব্বিবাহ হইতেছে। উপায়টী এই...বিচ্ছেদ প্রয়াসী স্ত্রী প্রথমে বিধর্ম্ম যথা ইসলাম কবুল করে। এতদ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। তৎপর শুদ্ধি করিয়া পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণে স্ত্রী আবার বিবাহ করে। এই জঘন্য উপায় দ্বারা যেমন একদিকে নির্য্যাতিতা নারী পশুপ্রকৃতি স্বামী দেবতার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া পুনর্ব্বিবাহ করিয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে...অপর দিকে, আবার চরিত্রহীনা পথভ্রষ্টা নারী ব্যাভিচারেরও সুযোগ পায়। বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পুনর্ব্বিবাহের উদ্দেশ্যে বিধর্ম্মের ভান অতি জঘন্য ব্যাপার। ধর্ম্ম এত খেলো জিনিষ নহে...যে, তাহাকে নিয়া ছিনিমিনি খেলা চলে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান...ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপারে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবে। অথচ ইহা বন্ধ করা যায় না এবং এই পথ দ্বারা কতকটা উপকারও যে সমাজের না হইতেছে...তাহাও নয়।

ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই সমবেত চেষ্টা করা উচিত যাহাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় হিন্দুর বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন হইতে পারে। এই প্রকার বিবাহ বিচ্ছেদের ঢেউ আমাদের দেশেও আসিয়া পৌছিয়াছে · দু'একটী ঘটনা দ্বারা তাহা উপলব্ধি হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রাদেশিক আইন হওয়ার কোন অন্তরায় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। আসাম কাউন্সিলের সদস্যগণের এবিষয়ে আলোচনা কর্ত্তব্য—এই সম্পর্কে জনমত প্রকাশিত হওয়াও আবশ্যক।

সর্ব্বহারা

শ্রীমাধুরী সেন

আজ সারা বিকেল ধ'রেই বৃষ্টি প'ড়ছে। এ বৃষ্টির যেন আর বিরাম নেই। দুঃখিনী বসুন্ধরার পুঞ্জীভূত দুঃখরাশি যেন মেঘে পরিণত হ'য়েছে এবং দয়াময়ের একটু আন্তরিক সহানুভূতিতে তার সেই দুঃখ গ'লে বৃষ্টি আকারে তারই বুকে ফিরে এসে তাকে যেন প্লাবিত ক'রে দিচ্ছে। পাঁচটার সময় মাসীমার ওখানে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। বৃষ্টি থামবার আশায় খানিক অপেক্ষা করলুম। শেষে শ্রাবণের এ বাদলা বিকেলটায় বাইরের কাজ হ'তে অবসর পেয়ে সবে মাত্র আমি চয়নিকাটা খুলে 'নববর্ষা' কবিতাটি মনে মনে আবৃত্তি ক'রছি এমন সময় গৌতম আমার হাত হতে বইটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। তার এ আকস্মিক কার্য্যে প্রথমটায় আমি নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছিলুম। সে চেঁচিয়ে ব'ললে, "কি হা ক'রে চেয়ে র'য়েছিস যে বড়? আজকের এ বাদলা দিনে সারাক্ষণই কি ঘরের কোণে ব'সে থাকতে হয়? চল্ শীগ্গির—শুনবি চল্। কৈলাসদা আজ তার গত জীবনের কাহিনী বল্‌তে রাজি হয়েছে।" একথা শুনে তাকে একটু তিরস্কারের সুরে ব'ললাম "কেন তোমরা এ লোকটাকে নিয়ে এত টানা হেচড়া কর? ওর অতীত যে একটুকুও আনন্দময় নয় তা কি তোমরা ওর ম্লানিমায় ভরা মুখখানা দেখে বুঝতে পারোনা?" কিন্তু গৌতম একটুও না দ'মে ব'ললে, "না ভাই রাগ করিস নে। আমরা আজ কেউ ওকে বিরক্ত করিনি। সে-ই কেন যেন সে কথা শুনবার জন্য আমাদের সবাইকে আহ্বান ক'রেছে। শুনতে যদি চাস তো শীগ্গির আয়। —আমি চ'ললুম।"

সে আজ প্রায় মাস ছয়েকের কথা। গড়ের মাঠে সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে এস প্লানেডের মোড়ে এসে ট্রামের অপেক্ষায় দাড়িয়েছি—হঠাৎ রাস্তার অপর পার্শ্বে একটা গোলমাল শুনতে পেলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি পথের মাঝখানে দাড়িয়ে গেলো। সেখানে গিয়ে দেখলুম একটা লোক রক্তাক্ত দেহে প'ড়ে আছে আর তার পাশেই একখানা যাত্রীপূর্ণ ট্যাক্সি। লোকটীর সংজ্ঞাহীন মুখখানা নিরীক্ষণ ক'রেই বুঝতে পারলুম একেই খানিক আগে গড়ের মাঠে মাথা গুজে ব'সে থাকতে দেখেছি। অনেক প্রশ্ন করেও কৈলাস ব্যানার্জ্জি তার নাম এছাড়া তার কাছে হ'তে কোনও কথা জানতে পারিনি। শীঘ্রই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'লো। হঠাৎ কেমন যেন একটা কৌতুহল হ'লো হয়তো তার ব্যথাভরা মুখখানা দেখে প্রতি সহানুভূতিও জেগেছিলো। আমিও হাসপাতালে গেলাম। ডাক্তারগণ তাকে পরীক্ষা ক'রে ব'ললেন যে আঘাত গুরুতর নয়—জীবনের আশা আছে। সে রাত্রে হোষ্টেলে ফিরতে প্রায় দশটা বেজে গিয়েছিলো।

এর পর হ'তে প্রত্যহ না হ'ক দু' তিন দিন পর পরেই হাসপাতালে গিয়ে এ হতভাগ্য লোকটীর একটু খোঁজ খবর নিতুম।

দীর্ঘ ছমাসকাল কষ্টভোগের পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে হাঁসপাতাল হ'তে যখন বেরিয়ে এলো তখনও আমি তার সঙ্গে। হাসপাতালে থাকাকালীন তার বাড়ীর ঠিকানা বা তার পরিচয় কিছুই জানা জায়নি।

• ফটকের বাইরে এসে "আপনার গাড়ী ফেরবার পথ খরচাটা দিচ্ছি আপনি বাড়ী যান।" এই ব'লে বুক পকেট হ'তে মানিব্যাগটা হাতে নিলুম। তার ম্লানমুখখানিতে একটু হাসির রেখা টেনে এনে সে ব'ললে, "বাড়ী আমার কোথায় যে তার পথ খরচা দেবে ?" এসংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু দিতে তার হৃদয় হ'তে যে কতখানি দুঃখ ঝরে প'ড়েছিল তা আমি অন্তর দিয়ে অনুভব ক'রেছিলাম। তাকে আমি টেনে এক প্রকার জোর ক'রেই আমাদের হোস্টেলে নিয়ে আসি। সে হ'তে এচার মাস আমাদের 'কৈলাসদা' হ'য়ে সে আমাদের কাছেই আছে। কিন্তু তার পরিচয় জানবার জন্য আমার কৌতুহলী বন্ধুগণ যখন তাকে বিরক্ত ক'রে তুলে তখন সত্যিই আমি হৃদয়ে বড় ব্যথা অনুভব করি।

'হ্যারে সমীর, ব'সে ব'সে কী এত ভাবছিস্? শেষটায় তুই ও কি কালিদাসের বিরহী যক্ষের মত কোন পরিচিতার ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে গেলি ? তা পরে হবে—এখন চল্, তুই না গেলে কৈলাসদা যে তার অতীত জীবন ব'লতে পাচ্ছে না' ব'লে অসমঞ্জ আমায় টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চ'ললো।

গিয়ে দেখলুম কৈলাসদাকে ঘিরে আমাদের হোস্টেলের দশবারোটি ছেলে ব'সে আছে। আসন্ন বিষাদের ম্লানিমায় সবার মুখই যেন ছেয়ে গেছে, তবু তাদের শুনবার কৌতুহল ও কম নয়।

কৈলাসদা কোঁচার খুঁটে তার চোখ দুটা একবার মুছে নিয়ে বলতে সুরু ক'রলে :—

সে বহুদিন আগেকার কথা। আমি সবে মাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের থার্ড ইয়ারে ঢুকেছি রঙিন আশা আর মধুকরী কল্পনায় মন আমার ভরপুর। যৌবন তার নীল অঞ্জন দিয়ে আমার চোখ দু'টী ছুপিয়েছে। এ বিশ্ব চরাচরের যাবতীয় জিনিষের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য যেন আমায় মুগ্ধ করে ফেলেছে। রঙিন প্রজাপতির মতই আমি ও এসংসার সমুদ্রে হালকা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি। ঠিক এমনি এক বাদলা রাতে মুমুর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্বে আমার ডাক পড়লো। চির-আরাধ্য পিতা আমার সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে দুদিন যাবৎ শয্যাগত। আমায় দেখে পিতার চোখ দুটা ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। চোখ হতে দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্তিমিত চোখদুটি চিরতরে বুজে গেলো।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পরে সংসারের গুরুভার আমার ওপর এসে পড়লো। পড়াশুনা আমার আর অগ্রসর হলোনা। হাজার খানেক টাকা ঋণ এবং ছোট্ট একটা বাড়ী ছাড়া তিনি আর কিছুই রেখে যেতে পারেন নি।

বছর দুই ঘোরাঘুরি করেও কোন অফিসে একটা চাকরী যোগাড় করতে পারলুম না। মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে একটি টুইশনি পেয়েছিলুম। কিন্তু কদিন হল তারও জবাব হয়ে গেছে। দুর্ভাগা ভাইবোন আর মাকে নিয়ে দাঁড়াবার ওএকটু যায়গা রহিলনা। বাড়ীটি দেনার দায়ে পূর্ব্বেই বিক্রী হয়ে গেছে।

বিনা চিকিৎসায় দশবৎসরের রুগ্ন ভাইটিকে চিতায় বিসর্জ্জন দিয়ে এসে কদিন যাবৎ মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত। এ জীবনে কত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই করেছিলুম—কত আকাশ কুসুম রচনা করে মনকে আমার উদ্দীপিত করে তুলেছিলুম। সে সব কথা মনে করলে এত দুঃখেও আমার হাসি পায়। তাসের প্রাসাদ যেমন যাদুকরের এক ফুৎকার হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যায় তেমনি কার যেন তপ্ত শ্বাসে আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেলো। নির্ম্মম অদৃষ্ট যে আমায় কতখানি উপহাস কচ্ছে বসে বসে তাই শুধু ভাবছি এমন সময় বুভুক্ষু ছোট ভাই বোন দুটির করুণ ক্রন্দন মর্ম্মে প্রবেশ করে হৃদয়ে আমার আগুণ ধরিয়ে দিলে। জানি আমি কাল এরা একবেলা শুধু দুমুঠো আহার্য্য পেয়েছিল, কিন্তু আজ এতটা বেলা হয়ে গেলো কিছুই ওরা খেতে পায়নি। শতছিন্ন পাঞ্জাবীটা কাঁধে ফেলে উন্মত্তের মত বাড়ী হতে ছুটে বেরিয়ে গেলুম। তখন যে আমায় দেখেছে পাগল ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে নি।

সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ালুম। লোকের কাছে হাত পাত্‌তেও দ্বিধা বোধ করি নি। কিন্তু প্রত্যেক বারেই আমায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতে হলো। ক্ষুধিত ভাই বোন দুটীকে দিতে পারি এমন কোন আহার্য্য সামগ্রীর সংস্থান করতে পারলুম না। হঠাৎ সম্মুখে একটা মাতালকে দেখতে পেলুম। তার হাতের হীরের আংটিটা দেখে চোখ আমার জ্বলে উঠলো। পথ তখন নিস্তব্ধ জনশূন্য। নিজেকে কিছুতেই সংবরণ করতে পারলুম না। মাথায় যেন আমার খুন চড়ে গেলো। মাতালটাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে তার হীরের আংটিটা জোড় করে ছিনিয়ে নিয়ে গেলুম। কিন্তু একটা পাহারাওয়ালার দৃষ্টি কিছুতেই এড়াতে পারিনি। অধিক দূর না যেতেই সে আমার পথ রোধ করলে।

বিচারে আমার সাতবছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'লো। শুনতে পেলুম প'ড়ে যাবার সময় হতভাগ্য মাতালের মাথাটা একটা পাথরে জোরে ঠুকে যাওয়ায় দু'দিন পর হাসপাতালে তার মৃত্যু হ'য়েছে।

দীর্ঘকাল দণ্ডভোগের পর মুক্তি পেয়েই আমার দুঃখিনী মা এবং ভাই বোনের অনেক অনুসন্ধান ক'রলাম; কিন্তু কেউ তাদের খোঁজ দিতে পারলে না। তাদের সন্ধান না পেয়ে আমি যেন উন্মত্ত হ'য়ে গেলুম। নিরাশ হ'য়েও তাদের অনুসন্ধান হ'তে ক্ষান্ত হ'লুম না। এর প্রায় দুই মাস পরে একদিন সঠিক সংবাদ পেলুম যে আমার প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশের কথা জান্‌তে পেরেই মা আমার তাঁর সন্তান দুটি সহ গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পরেন। এখবরে হৃদয় আমার গভীর নৈরাশ্যে ছেয়ে গেলো। সর্ব্বহারা হ'য়ে আমি ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে গড়ের মাঠে যেয়ে উপস্থিত হই। সেখানেই সমীর বাবুর সঙ্গে আমার দেখা”

এ পর্য্যন্ত ব'লে সে বাইরের ঘনঘটাচ্ছন্ন কালো আকাশ পানে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। বন্ধুদের প্রতি আমি একবার চোক ফিরিয়ে নিলুম—দেখলুম সবারই চোখে দু'বিন্দু অশ্রু চক্‌চক্ ক'রছে।
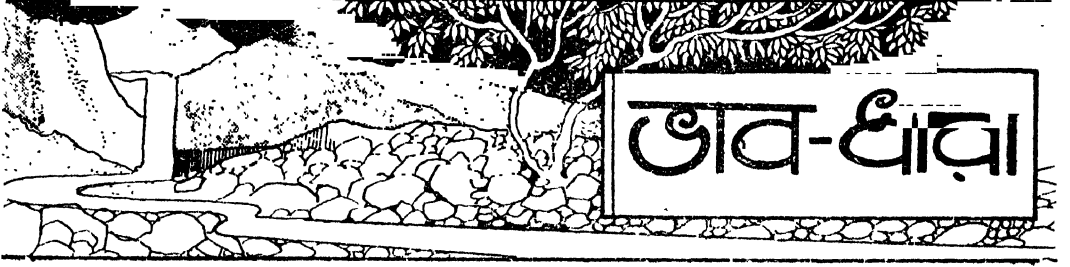
সহশিক্ষা

(কেন চাই ?)

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার মজুমদার

সহশিক্ষার বিপক্ষে যারা বলেন, যারা সহশিক্ষা পছন্দ করেন না, তাদের সহশিক্ষা না পছন্দ করবার কারণ তারা যা দেন, তা মোটামুটি এই।

(ক) সহশিক্ষা অবাঞ্ছনীয় প্রেম বা অবৈধ প্রেম বা যৌনমিলনে সাহায্য করে এবং অনুসাঙ্গিকভাবে

(খ) শিক্ষার প্রসারে নানারূপ বাধা দেয়। যেহেতু সহশিক্ষা অবৈধপ্রেম প্রশ্রয় দেয়, সেইহেতু সহশিক্ষা অবাঞ্ছনীয়, এই যদি সহশিক্ষাব বিরুদ্ধে চরম কথা হয় তবে শুধু সহশিক্ষা নয়, অনেক কিছু, বিশেষভাবে বিবাহের পূর্ব্বে নর ও নারীর যৌবন প্রাপ্তিই অন্যায়। কারণ সহশিক্ষা যেখানে নাই সেখানেও অবৈধ প্রেম আছে এবং সেখানে তার কারণস্বরূপ "নন্দ ঘোষ" সহশিক্ষা যখন নাই তখন শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতেই হবে, তার কারণ বিবাহের পূর্ব্বে অপরাধী বেচারীদের যৌবন প্রাপ্তি এবং এ সমস্যার সমাধান হতে পারে বোধ হয় একমাত্র এইভাবে--(ক) হয় যৌবন প্রাপ্তির আগে সকলের বিয়ে দিয়ে দেওয়া না হয় (খ) কিশোর কিশোরী হতে ঊর্দ্ধ বয়স্ক ও বয়স্কা অবিবাহিত এবং অবিবাহিতা সমস্ত নর ও নারীকে পৃথক পৃথক খাঁচায় পূরে ফেলা। তবে তাতেও সন্দেহ আছে একে রোধ করা যাবে কিনা।

উপরের কথার সমালোচনায় কেউ হয় তো বলবেন সহশিক্ষা ব্যতীতই সংসার অবৈধ প্রেমের উৎপাতে অস্থির, এর উপর সহশিক্ষার প্রচলন হলে সংসারে বৈধপ্রেম আর থাকবে না। অর্থাৎ সহশিক্ষা যন্ত্রণাময় সংসারের যন্ত্রণা বৃদ্ধির আর একটি কারণ হবে মাত্র।

একবার উত্তরে আমরা বলি—একথা মিথ্যা, একথা যারা বলেন—তাদের আপনার সত্তার উপর বিশ্বাস নাই। শিক্ষিত নর ও নারীর মর্য্যাদাবোধ এবং সৎবুদ্ধির উপর তাদের বিশ্বাস নাই।

তবু যদি মেনেই নি, সহশিক্ষার প্রচলন হলে অবৈধপ্রেম বৃদ্ধি পাবে, তবুও, আমরা বল্‌ব—সহশিক্ষা প্রচলন করা কর্ত্তব্য। কারণ সহশিক্ষার প্রচলন না হলে নারীর শিক্ষা নরের শিক্ষার ঠিক সমান ভাবে, এবং সমান তালে পা ফেলে চল্‌তে পারবে না এবং পৃথিবীর বৃহত্তম কল্যাণের জন্য নরের নারীকে এবং নারীর নরকে পূর্ণভাবে এবং স্পষ্টভাবে জানা আবশ্যক।

এই যে অবৈধপ্রেম বৃদ্ধির কারণ হলেও সহশিক্ষার প্রচলন হওয়া দরকার বল্‌ছি, এর কারণ এ নয় আমরা অবৈধপ্রেম অনুমোদন করি। নানা কারণেই অবৈধপ্রেম অবশ্য বর্জ্জনীয়। কিন্তু এও আমরা বিশ্বাস করি প্রথম যৌবনের ২।১টি স্খলন এত বড় পাপ নয় যে তার জন্য মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের পথকে রোধ করা যেতে পারে। বরং আমাদের বিশ্বাস প্রথম যৌবনের ২।১টি স্খলন ভবিষ্যৎ জীবনে এবং বৃহত্তর জীবনে অতিশয় আলোকময় জ্ঞানের মশালের কাজ করে। যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করি, তবে আমরা প্রত্যেকেই বল্‌ব, প্রথম জীবনের ২।১টি স্খলন আমাদের বৃহত্তর এবং পরবর্ত্তী জীবনে পরম সত্য তো হয়ে ওঠেই নাই—পরন্তু ঐ ছোট স্খলনই পরবর্ত্তী জীবনে অতি বড় স্খলন ত্রুটির মুখ থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছে।

এবিষয়ে এতগুলি কথা এইজন্য বল্লাম—কারণ আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা মেয়েদের একটু স্খলনের নামেও চম্‌কে ওঠেন একথা তাদের জন্য। আমাদের উপদেষ্টারা উপদেশ দেন পরের জীবন দেখে নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে কিন্তু আমরা জানি জীবনে পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই। আমরা বলি—প্রত্যেক জীবনকে পরমভাবে আস্বাদ কর। জীবনে যা দরকার তা বহুকষ্টে বাঁচান একটু ঠুন্‌কো দৈহিক পবিত্রতা নয়, জীবনে দরকার অসৎ থেকে সৎ, কুৎসিৎ থেকে আনন্দময় জীবন বেছে নেবার শক্তির বিকাশ। আমাদের বিশ্বাস পৃথক শিক্ষার চেয়ে সহশিক্ষাই এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার শক্তি বেশী রাখে।

এই হ'ল সহশিক্ষার বিরুদ্ধের এক নম্বর অভিযোগের উত্তর। দুই নম্বর অভিযোগ—সহশিক্ষা অবৈধপ্রেমে প্রশ্রয় দিয়ে শিক্ষার গতিরোধ করে—এর উত্তর এই যে সহশিক্ষা প্রত্যেকের গতি রোধ করে এ কথাটা সত্য নয়। কারণ দেখা গেছে যে সব কলেজে বা স্কুলে সহশিক্ষা প্রচলিত, সে স্কুল বা কলেজ থেকে ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে Brilliant Result করে। এতেই প্রতীয়মান হবে যে সহশিক্ষা সকলের নয়, ২।৪টি 'মূর্খ' এর শিক্ষার গতিরোধ করে। এবং আমাদের হচ্ছে, সেই সব অর্ব্বাচীন যারা ক্লাশে ১৫।২০টি সমবয়স্কা মেয়ের 'ডোজ' (doze) সহ্য করিতে পারে না। সেই সব Over Strung Nervous System এর রোগীদের শিক্ষার গতি রুদ্ধ হয়ে, যে রোগে তারা পীড়িত সেই রোগের ঔষধরূপ শিক্ষা তারা যত শীঘ্র পায়, ততই সংসারের পক্ষে এবং তাদের নিজেদের পক্ষেও মঙ্গলজনক।

সহশিক্ষার বিপক্ষে যারা তাদের মতামত খণ্ডনের চেষ্টা আমাদের এইখানেই শেষ। এখন আমরা সহশিক্ষা কেন আবশ্যক এবং অবশ্য প্রচলনীয়, সেই কথা বল্‌তে চেষ্টা করব।

আমাদের বিশ্বাস, সহশিক্ষাকে আর্থিক বা অম্‌নি একটা ছোটখাট লাভের দিক থেকে বিচার করলেই যে এর চরম বিচার করা হয় তা নয়। আমরা সহশিক্ষাকে বিচার করি সম্পূর্ণ অন্য থেকে। সহশিক্ষাকে আমরা অনুমোদন করি এই জন্য যে সহশিক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর মানুষ গড়ে তুলবার একটি বিশিষ্ট প্রাথমিক সোপান।

আশাকরি সকলেই আমাদের সঙ্গে স্বীকার করবেন—নারীও মানুষ। পুরুষ যেমন মানুষ নারীও তেমনি মানুষ। পুরুষের বুকে যে অমর সত্বা আছে, নারীর বুকেও ঠিক তেমনি অমর সত্বা আছে। পুরুষের যেমন আপনাকে বিকশিত করবার অধিকার আছে—সর্ব্বতোভাবে দেহে, মনে, প্রাণে—তেমনি নারীর তার আপনাকে বিকশিত করবার অধিকার আছে, ঠিক পুরুষেরই মত পূর্ণমাত্রায় দেহে মনে প্রাণে।

এইখানে কেউ হয়তো বলবেন—নারীর ঠিক পুরুষেরই মত আপনাকে বিকশিত করবার অধিকার আছে সত্য, তবে নারীর জীবনের বিকাশ আর পুরুষের জীবনের বিকাশ এক নয়। নারীর জীবনের ধর্ম্ম এক আর পুরুষের আলাদা। সুতরাং উভয়েরই জীবনের বিকাশে অধিকার আছে সত্য কিন্তু উভয়ের বিকাশ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি। কিন্তু আমরা একথা অস্বীকার করি। আমরা অস্বীকার করি না নারীর জীবনের ধর্ম্ম এক আর পুরুষের জীবনের ধর্ম্ম অন্য। আমরা বলি উভয়ের জীবনের ধর্ম্ম কেন এক নয়। প্রকৃতি নারীকে পুরুষের থেকে কি একফোঁটাও কম "মানুষ" করে তৈরী করেছেন? একমাত্র শারীরিক শক্তির সম্ভাবনার ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন যায়গায় নারী পুরুষের চেয়ে কম? একমাত্র Reproductive Process এ তাদের Function আলাদা কিন্তু তাই বলে কি তারা কম মানুষ? সব জীব জগতের দিকে তাকালে কি দেখি—সিংহ, সিংহী; কোকিল, স্ত্রী-কোকিল; Stamen Pistel এদের Function প্রজননের ক্ষেত্রে পৃথক কিন্তু তাই বলে কি সিংহী সিংহ অপেক্ষা কম পশু, স্ত্রী-কোকিল পুরুষ-কোকিলের চেয়ে কম পক্ষী।

না। তেমনি মানুষের বেলায়ও দেহের সামর্থ্যের ঠিক উপর স্তর থেকে নারী আর পুরুষ সমানভাবে 'মানুষ' ধর্ম্মী। সুতরাং পুরুষের আপনাকে বিকশিত করবার যেটুকু অধিকার এবং যে পথ নারীরও ঠিক ততটুকু অধিকার এবং পথও ঠিক তাই কেন নয়? Supreme Bliss যদি মানি, তবে পুরুষের Supreme Bliss পাবার, পেতে চেষ্টা করবার যতটুকু অধিকার এবং আবশ্যক নারীরও ঠিক ততটুকুই অধিকার এবং আবশ্যক। "পতির পুণ্যে সতীর পূণ্য" এ যে কত বড় মিথ্যাকথা এবং কত বড় ফাঁকীবাজি তা কেবলমাত্র অনুভব করবার।

নারী আর পুরুষের মধ্যে যে বিরাট প্রাচীর এক্ষণে বর্ত্তমান সে প্রাচীর গড়ে উঠেছে

একটি কারণের উপরে, তা হচ্ছে মানুষের Sex এর বিলাস। Reproductionটাকে আমরা একটা বিলাস করে তুলেছি, একটা নেশা করে তুলেছি।

এই Sex এর বিলাসের অঞ্জন চোখে পরে আমরা কোটি পুরুষ কোটি নারীকে আমাদের দেহের ক্ষুধার খাদ্যরূপেই দেখি 'মানুষ'রূপে দেখি না। তেমনি এই Sex এর বিলাসের অঞ্জন চোখে দিয়ে কোটি নারী কোটি পুরুষকে তার দেহের ক্ষুধার খাদ্যরূপেই দেখে, 'মানুষ' ভাবে দেখে না বা ভাবে না। এইজন্য ছেলেরা আমরা ছেলেবেলা থেকে বৃহত্তর জীবনের যে স্বপ্ন চোখের সামনে রেখে জীবনে অগ্রসর হতে থাকি মেয়েরা আমাদের বোনেরা তার কোন খোঁজই পায না; তারা গড়ে ওঠে—সমাজ তাদের গড়ে তোলে পুরুষের সুন্দর খাদ্য করে। অথচ আমরা যেমন মানুষ আমার বোনও ঠিক আমারই মত মানুষ। আমার জীবনের চরম লক্ষ্য যা তার জীবনের চরম লক্ষ্যও কেন তাই হবে না? আমার জীবনের চরম এবং পরম আনন্দ যা তার জীবনের চরম এবং পরম আনন্দ তো আলাদা নয়। অথচ আমরা আমাদেরই কোটি বোনকে 'পতির পায়ে সতীর স্বর্গ' নামক একটা কথার ধোঁকায় তাদের কোটি সত্ত্বাকে চরম এবং পরম আনন্দ থেকে কতদূরে এনে ফেলে রেখেছি। নীরো মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন বলে আমরা তার নামে চমকে উঠি কিন্তু এই যে কোটি নারীর প্রাণের পরম সত্ত্বাকে মিথ্যা কথার জালে ফেলে আমরা ফাঁকীর পূজা করাচ্ছি, এর তুল্য হৃদয়হীনতা আর অমানুষতা কোথাও আছে? পুরুষ কতখানি অমানুষ হবার পর তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল 'পতি পরম গুরু' এই কথা।

আজ এই যে পাশ্চাত্য জগতের নারীর উচ্ছৃঙ্খলতা এর মূলে নারী কোটি বৎসর পরে আপনাকে চিনেছে আপনার সত্ত্বাকে চিনেছে আর সঙ্গে ধরে ফেলেছে পুরুষের পরম এবং চরম মিথ্যাচার। আজকের এই উচ্ছৃঙ্খলতা এই নারীর সত্য পরিচয় নয় এ উচ্ছৃঙ্খলতা নারীর আপন স্বাধীন সত্ত্বাকে চিনে তার বন্ধনের নিগড় পুরুষের Bastile ভাঙ্গার উদ্দামতা। এই স্বাধীন নারীর নূতন নারীর সত্যকারের রূপ নয়, যেমন ফরাসী বিপ্লবের উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষেব স্বাধীনতার এবং স্বাধীন মানুষের রূপ নয়। এ বন্ধনমুক্ত স্বাধীনতা স্রোতের ফেনিল উচ্ছ্বাস। স্বাধীন নারী, মুক্তনারী, মানুষ নারী এই ফেনিল উচ্ছ্বাসের নীচে। সে নারীর কাছে ইবসেনের স্বপ্ন—স্বপ্ন, মেটার লিঙ্ক এর মোনাভানা ছায়া, সিনক্লেয়ার লুইয়ের ক্যারোল ছোট্ট খুকী মাত্র। সে "মানুষ" নারী পুরুষের Parasite নয়, পুরুষের শয্যাসঙ্গী নয়, পুরুষের মোহ নয়—সে আপনার পায়ে দাঁড়ানো পুরুষের সমান মানুষ। এই পৃথিবীর বুকে স্বর্গ তৈরী করবার পুরুষের সঙ্গী এবং সমকক্ষ মজুর।

পৃথিবীর বুকে এই "মানুষ" নারী এবং 'মানুষ' পুরুষ সৃষ্টি করবার জন্য সহশিক্ষা পরম প্রয়োজনীয়। পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাম্য আনতে হলে প্রথম প্রয়োজন তাদের উভয় সম্বন্ধে উভয়ের যে মোহ আছে এবং না জানার অস্পষ্টতা আছে, তা দূর করা। অতি শৈশব থেকে ধনীর

ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে স্কুলে পড়তে পড়তে যেমন তাদের পার্থক্যের কথা ভুলে যায়, তেমনি আশৈশব ছেলে ও মেয়ে যদি একসঙ্গে পড়ে এবং থাকে, তবে তাদের মধ্যের মোহ এবং অস্পষ্টতা নিশ্চয়ই কমে যাবে। ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের কাছে খেলায়, পড়ায়, জিতে হেরে ছেলেদের তাদের নিজেদের সম্বন্ধে আত্মম্ভরিতা এবং Superiority complex কিছু কমবে এবং মেয়েদের তাদেরি সমান মানুষ ভাবতে শিখবে। এক কথায় নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য আনতে সহশিক্ষার জোড়া নেই।

বর্ত্তমানে বিবাহপ্রথা, বর্ত্তমানে প্রচলিত পুরুষ ও নারীর জীবন যাপন প্রণালী যে মানুষের জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে একথা চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই স্বীকার করেন। মানুষের জীবনের এই ব্যর্থতার বীজ এই বিবাহ প্রথা এবং পুরুষ ও নারীর জীবন যাপন প্রণালীর মধ্যে লুক্কায়িত এ কথাও তো আজ আর চিন্তাশীল মানুষের অজানা নাই। তাই দিকে দিকে নূতন মানুষ এবং নূতন পৃথিবী গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা চলেছে। এই নূতন এবং মহত্তর মানুষ এবং সুন্দরতের নূতন পৃথিবী তৈরী হতে পারে একমাত্র 'মানুষ' নারী আর 'মানুষ' পুরুষের চেষ্টায়। এই সেই নূতন এবং মহত্তর নারী ও পুরুষ গঠন করবার জন্য সহ-শিক্ষা অত্যাবশ্যক। তাই মনে হয় বর্ত্তমানে সহশিক্ষার ছোট খাট শত দোষ ও ত্রুটি সত্বেও সহ-শিক্ষাই আমাদের দেশে এবং সর্ব্বত্র প্রচলন করা উচিৎ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ফরিদপুর শাখার কোন অধিবেশনে পঠিত।

'বন্ধু'

শ্রীশান্তি দেবী

আষাঢ় মাসের ৩রা, ৪ঠা তারিখ হবে। কিরণ তা'র ঘরের জানালার কাছে বসে ছিল। হাতে তা'র একখানা ইংরাজী উপন্যাস। তারি মধ্যে সে ডুবে ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে তা'র মুখে চোখে পরশ করে গেল। তা'র সঙ্গে উড়ে এ'লা দু'একটি শুক্‌নো পাতা আর এক মুঠা ধুলো। সে চোখ তুলে তাকালো। যেন আচমকা কা'র ডাক শুনেছে। সে জানালা দিয়ে ঐ দিগন্তবিস্তৃত সুদূর প্রান্তরে চেয়ে রইল—চারিদিক যেন ঝল্‌মল্ ক'রে হাসছে। ঐ দূরে যতদূর চোখ যায় শ্যামল বনানীরাজি এ যেন শরৎকালের অলক মধ্যাহ্ন। সে মনে মনে হেসে ভাব্‌লে প্রকৃতি দেবীর সবই বিচিত্র। এই আষাঢ় মাস-ভরা বর্ষার দিনে—এ কি? কোথায় বর্ষার জলদগম্ভীর মেঘডম্বরু,—কোথায় অবিরাম ঝরঝর বাদল ঝরার শব্দ না তার বদলে

শরতের অমল মহিমা চারিদিক বিস্তার করে রয়েছে। কিরণ মুগ্ধচোখে চেয়ে চেয়ে প্রকৃতির এই বিরুদ্ধ লীলার বিশ্লেষণ করতে লাগলো। হাতের বই রইলো হাতে—চেয়ে রইল ঐ নীলাকাশে ঐ সুদুর প্রান্তরে। মন তার হয়ে উঠল উদাস। ঐ যে এক ঝলক বাতাসে তাকে কার খবর দিয়ে গেলে? যেন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর খবর। মন তার বাইরে ছুটল। সে দু'একবার তার মন কৃষ্ণ কুঞ্জ কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'রে উঠে দাঁড়ালো। বইখানা পড়ে রইল টেবিলের উপর। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পথে নেমে পড়লো। সোজা চল্ল তাদের বাড়ীর সামনের লাল রাস্তাটা বেয়ে সেটা মিশেছে নদীর পাড়ে। পাঞ্জাবির পকেটে একটি ঝর্ণা কলম। আর কতকগুলি স্কেচিংকার্ড। সে মাঝে মাঝে ছবি আঁকে বাঁশী বাজায়। খেয়ালী সে গুণ্‌গুণ্ করে গান ধরল—

"—রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়,
তরু মর্ম্মর ছায়ার খেলায়
কি মূরতি তব নীল গগনে
নয়নে উঠিছে আভাসি—"

ক্ষীণতোয়া নদীটি। পাহাড়ে নদী। বছরের বেশীর ভাগ সময়ই থাকে শুকনো। বর্ষার সময় জলে ভরে ওঠে। কিন্তু এবার বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্যে ছিল শুক্‌নো। আজ যেন মনে হ'লো তাতে একটি হাসির ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। শীর্ণ একটু জলের রেখা চলেছে বয়ে সাদাবালুর পারে। যেন শুভ্র সাড়ীর জরির পাড়। কিরণ মুগ্ধ চোখে রইলো। ধীরে নেমে গেলে নদীর মধ্যে। এই যেখানে একটা মস্ত পাথর পড়েছিল, তা'রই উপর ব'সে পড়ল জলে পা দুটী ঠেকিয়ে। চারিদিক কি শান্ত সুন্দর। তা'র মনে পড়ে গেল কীট্‌সের সেই কবিতাটি—"ওড্ টু অটাম্?" ওই পাহাড়টারে ধারে যে প্রকাণ্ড মাঠ তাতে কতকগুলি গরু চরছিল। তা'দের গলার ঘণ্টার আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। সেই শব্দের ফাঁকে হঠাৎ তা'র কাণে এলো অতি মিঠে সুরে রাখালিয়া বাঁশরী আওয়াজ। তা'র মন নেচে উঠল। কে এ রাখাল? এই মধ্য দিনে একাকী বেণু বাজাচ্ছে? এই বুঝি তা'র বন্ধু। এর খবরই বাতাস দিয়েছিল! সে ছুট্‌ল নদী পার হ'য়ে ওপারে। দেখলো ওপারের শিব মন্দিরটার পাশে যে প্রকাণ্ড বট গাছটা তারই ছায়ায় বসে এক শ্যামবর্ণ বালক বাজাচ্ছে বাঁশী—তা'র বাঁশের বাঁশীটী। কিরণ ধীরে ধীরে তা'র পাশে গিয়ে বস্‌ল। রাখাল বালক চম্‌কে বাঁশী দিল থামিয়ে। কিরণ বল্ল—'কি সুন্দর থামালে কেন?' রাখাল বালক সলজ্জ হেসে বল্ল "বাবু তুমি কত ভালো জানো বাজাতে।" কিরণ জেদ্ করল। তখন সে আবার বাজাতে লাগল। ঘুরে ফিরে সেই একই সুর—তবু কি সুন্দর। শুনে শুনে যেন তৃপ্তি হয় না। তারপর রাখাল বালক থামালো তার বাঁশী! কিরণ যেন আর এলোকে নাই চলে গেছে কোন্ অজানা সুরলোকে। সেখানে সুরপরীরা সব নৃত্য করছে তাঁকে ঘিরে সে তার বাঁশীতে অপূর্ব্ব সুরলহরীর ঝঙ্কার তুলে বাজিয়ে চলেছে। তা'র মন অনির্ব্বচনীয় আনন্দভরা।

তার চমক্ ভাঙ্‌ল রাখাল বালকের স্পর্শে "কি বাবু কী ভাবছ?" কিরণ চম্‌কে যেন জেগে উঠল। বল্ল "সত্যি কি সুন্দর বাজাও তুমি। কোথা থেকে শিখ্‌লে?" রাখাল বালক উত্তর করলো "কোথা থেকে শিখবো বাবু? নিজে নিজেই বাজাই।" হঠাৎ সে ব'লে উঠল "বাবু আমার বাড়ী যাবে?" কিরণ বল্ল "চল—তোমার কে আছেন?' "এক বুড়ী মা—আর কেউ না বাবু।" তারপর সে আস্তে আস্তে নিজের কাহিনী শোনাল। ত'ারা পাঁচটী ভাই বোন ছিল আর তাদের বাপমা, কেমন সুখে তাদের দিন কাটতো। তারপর হঠাৎ বন্যায় কী করে সব ভেসে গেল। শুধু বাকী রইলো সে আর তার মা। কিরণের মন ব্যথায় ভরে উঠল। সে চাইলে এই সরল রাখাল বালকটীর ব্যথা ঘুচিয়ে দিতে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে বল্ল, "ভাই এসো আজ থেকে আমরা বন্ধু।" রাখাল বালক তাকে নিয়ে চল্ল তার মায়ের কাছে। কিরণ চল্ল ধীরে ধীরে তার সঙ্গে। তার ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাটির ঘর। দেয়ালে দেব দেবীর ছবি অাঁকা। তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করেছে উঠানটি। একদিকে ছোট্ট একটি শাকসব্জীর বাগান। একদিকে একটী তুলসী মণ্ডপ। আর এক দিকে একটু ঘেরা জায়গা তাতে গরু ছাগল থাকে। একটী পেঁপে গাছ আর একটি পেয়ারা গাছ। সেই ছোট্ট ঘরের একটি কোণে ব'সে এক বুড়ী চরকা কাটছে। সেই হচ্ছে রাখালের মা। বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে মা বল্লেন—

"কিরে মনিয়া এখন যে?" 'মা দেখ্‌বি আয় বাইরে।' মা এসে দেখলেন সামনে এক বাবু। "কিরে এই বাবুকে আবার ধরে আন্‌লি আমাদের এই কুঁড়ে ঘরে?" রাখাল আর তারমা কিরণকে সমাদর ক'রে বসাল। তাকে জল খেতে দিল। ঠাণ্ডা, পরিষ্কার, মিঠে জল। তার প্রাণ শীতল হয়ে গেল, শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর গাছ থেকে পেড়ে খেতে দিল ডাঁসা পেয়ারা আর কিছু পেঁপে। কিরণের মন ভরে গেল। এই রাখাল বালকের সমাদর, এই প্রকৃতির শান্তশ্রী এযেন তার মনের পটে ছবি এঁকে দিল। তার হৃদয় প্রাণ মন জুড়িয়ে গেল। কী অনাড়ম্বর, সুন্দর জীবন এদের কোথাও ভার নাই কোন চাক্‌চিক্য নাই। আছে অন্তরের গভীরতা, আছে তৃপ্তি আছে শান্তি।

তারপর সে মণিয়ার সঙ্গে কতো ঘুরে বেড়াল, কতো গল্প করল। ক্রমে রোদ পড়ে গেল। সূর্য্যমামা পাটে বসলেন। পাখীরা কুলায় ফিরল। কিরণ ফিরে চল্ল তার বাড়ী মণিয়া তার সঙ্গে এলো নদীর ওপার পর্য্যন্ত। তার হাতে তুলে দিল বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ একটি বাঁশী। কিরণ নদী পার হয়ে চলে এলো এপারে। এপারে এসে ফিরে দেখলো মণিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে ওপারটিতে তারই পানে চেয়ে। কিরণ ফিরে দাঁড়াইতেই সে হাত তুলে ছোট্ট একটি নমস্কার করে ফিরে চল্ল গরুর পাল নিয়ে। গোধূলির ধূসরিমার মধ্যে কিরণ দেখ্‌তে পেল রাখাল বালক চলেছে ঐ লাল অাঁকাবাঁকা মেঠো রাস্তা ধরে তার কুটীর পানে। কিরণ মুগ্ধনেত্রে সেদিকে তাকিয়ে একটি

নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে চল্ল বাড়ীর পানে। তার মন তখন ভাবে ভোলা। একটি মধুর তৃপ্তি তার মনকে ভরিয়ে ফেলেছে।

ঘরে ঘরে তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠছে। ঐ ওপারের শিবমন্দিরে আরতি ঘণ্টা বেজে উঠল। যেন বহু দূর হতে তার সেই বন্ধু তাকে আহ্বান করেছে। সে বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখল তার মা তখন সন্ধ্যাদীপ হাতে তুলসী তলায় প্রণাম করে শাঁখ বাজাচ্ছেন তার মনে এক অনির্ব্বচনীয় সুর বেজে উঠল। সে ছুটে গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরে ডাকলো, 'মা'।

তার মনে হলো তার আজকের পাওয়া রাখাল বন্ধুর মাও এখন হয়তো তুলসীতলায় প্রণাম করছেন আর তার বন্ধু ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার ঘরে পাশটিতে।

শারদ-গীতি

হোসনে আরা বেগম

(গান)

শারদ শশী জ্যোছনা বিলায়
আঁধায় আঙনে।
ক্ষান্ত হল বাদল বাউল
চপল নাচনে॥
সাঙ্গ হল মেঘের খেলা
কুঞ্জে ফোটে টগর বেলা
শিউলি যূঁয়ে হর্ষ ফোটায়
ধরার আননে॥
ঋতুর রাণী আঁচল খানি
শিউলি রঙে রঙিয়ে আনি
দুলায় সুখে সন্ধ্যা উষায়
সুনীল গগণে॥
সবুজ ঘাসে অঙ্গ ঘিরে
বাঙলা মাতা সাজ্‌ল ফিরে
আনন্দেতে ফুল ফোটে তার
হৃদয় কাননে॥
এ-আনন্দে বরণ করে
লওরে সবে লওরে ঘরে
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল বাধায়
সকল বাঁধনে॥

গ্রন্থ-পরিচয়

আপদ—(ত্রি-অঙ্কিকা) শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌, মূল্য ১॥০ টাকা ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। বইখানিতে দুইখানি নাটক আছে—আপদ ও জলাতঙ্ক।

যে অপরূপ বৈশিষ্ট নিয়ে দিলীপ রায় আত্ম প্রকাশ কোরেছিলেন তাঁর 'আগামী' 'মনের পরশ' 'দুধারা' ও 'রঙের পরশ' এ সে বৈশিষ্ট সে স্বাতন্ত্র্য তাঁর এই প্রথম নাটক খানাতেও আছে যথেষ্ট পরিমাণে। প্রকৃত নাটক লেখা যে কত শক্ত তা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দিলীপ বাবুর প্রথম প্রয়াসেই সাফল্য এসেছে অকৃপণ হোয়ে। অপূর্ব্ব শিল্পী গলসওয়ার্দ্দির টেক্‌নিকের প্রভাব খানিকটা বাংলা নাটকের টেক্‌নিকে এনে তিনি যে নূতনত্বের সৃষ্টি কোরেছেন তা বাস্তবিকই উপভোগ্য। দুটো বিভিন্ন টেক্‌নিকের মিলনের মাঝে কোনো ফাঁকই নেই চমৎকার মিশে গেছে ওরা। আর্টের এমন সহজ ও স'বলীল বিকাশ স্রষ্টার লেখনীকে যে সার্থক সুন্দর কোরে তুলেছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

বড়বৌ জ্ঞানদার অন্তরে 'নিষ্কৃতির' যে 'সিদ্ধেশ্বরী' বাস করেন তাঁকে খুঁজে পেতে আমাদের একটুও বেগ পেতে হয় না। একেবারে চোখের সামনে এসে প্রতিভাত হয় সেই মহান মাতৃস্নেহের অমৃত নির্ঝর।

সৎসাহস সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও নারীত্বের মাধুর্য্যমিশ্রিত কঠোরতার অপূর্ব্ব সুন্দর বিকাশ হোয়েছে সুলতা চরিত্রে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই যে কদর্য্য ধারণা পোষণ করেন তাঁদের বদ্ধমূল ধারণার গতি ফিরাবার পক্ষে সুলতা যথেষ্ট। তবে একে দেখেও যাঁরা তাঁদের নাসিকা কুঞ্চিত করেন তাঁদের দ্রুত পা চালিয়ে সেই দু'এক শতাব্দী আগের যুগে চলে যাওয়াই হয়তো শ্রেয়।

সর্ব্বশেষে অমর আর শরণ। লেখকের দরদী অন্তর্দৃষ্টি এখানে চরমে এসে দাঁড়িয়েছে। আপদ নাটিকার আপদকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরিয়ে তিনি যে মর্ম্মন্তুদ বেদনার সৃষ্টি কোরেছেন তা সবাইর অন্তরের সুপ্ত-গুপ্ত তন্ত্রীগুলির মাঝেও জাগায় অফুরন্ত কান্না। শরণ—চলার প্রতিপদে যার মিলেছে নিষ্ঠুরতা, অভাব ও বঞ্চনা; ব্যর্থতাই যার জীবনে এসেছে পরম হোয়ে, তার দুঃখময় জীবনের মাঝেও এইটুকু সান্ত্বনা যে তার বহু বাঞ্ছিত বহু অভিলষিত ইচ্ছাটুকু জীবন-সায়াহ্নে হোলো পরিপূর্ণ। অমরকে চিনতে পেরে তার পায়ের উপর লুটিয়ে পরে অসীম আনন্দের অধিকারী হোয়ে শরণের মহাযাত্রা কি আশ্চর্য্য রূপসৌষম্য নিয়েই না আমাদের অভিভূত কোরে ফেলে—মৌন বিস্ময়ে তাই শুধু চেয়েই থাকি।

জলাতঙ্ক—(একাঙ্কিকা) মাথাটাকে সদাই নানাপ্রকার সুকঠিন সমস্যা ও নীরস চিন্তাধারা দিয়ে ভরে রাখলে মানুষের সহজ সাবলীল জীবন যাত্রার মধ্যে আসে অসহজতা, তার চলা হোয়ে ওঠে দুষ্কর। মাঝে মাঝে তাই মাথার বোঝা কিছু হাল্কা কোরে নিতে হয় ঐ সব জিনিষ দিয়ে যা মানুষকে চিন্তার খোরাক না জুটিয়ে তার নির্ম্মল হাস্যরস দিয়ে মুষড়ে যাওয়া প্রাণকে সঞ্জীবিত কোরে তুলবে যে রসে তার চলার উষর হোয়ে উঠবে সবুজের সমারোহে সুন্দর। নূতন কোরে তখন সে আবার সমস্যাপূর্ণ সাহিত্যকে কে নেবে বরণ কোরে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের অভাব যথেষ্ট।

লিখ্‌তে অনেকেই পারেন—কিন্তু রসের উৎস টেনে এনে তার সন্ধান যিনি দিতে পারেন তিনিইতো প্রকৃত রসস্রষ্টা।

দিলীপ বাবুর এ প্রহসনটী বাস্তবিকই অতি উপাদেয় হোয়েছে। নেহাৎ অরসিক ব্যক্তিও এখানকার সৃষ্ট নরনারীর স্বরূপ ও মিঃ গসের অদ্ভুত জলাতঙ্কের চিত্র দেখে না হেসে থাক্‌তে পারবেন না। রসগুলো বেশ সহজ সুন্দর হোয়েছে। ভেবে হাস্‌তে হয় না হেসে আবার পড়তে হয়।

হোমশিখা—শ্রীরঘুনাথ মাইতি কাব্যতীর্থ বৈদ্যশাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা ২০৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে বি, সিংহ এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত।

সর্ব্বহারার দল—যাদের রবিবাবু তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে প্রদীপের পিলসুজের সাথে তুলনা দিয়েছিলেন তাদের অপরিসীম দুঃখের পসরা উজার কোরে লেখক আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। চলার পথে নির্ম্মম কঠোর বাস্তবের সাথে এদের সদাই হয় রূঢ় পরিচয় দুনিয়ার মাঝে সব কিছু হারিয়ে এরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব। নিজের অস্তিত্ব ভুলে এদের বাঁচা এদের জীবন ধারণ করা যে কতটা মর্ম্মান্তিক কতটা দুর্ব্বহ তা কবিতা কয়টিতে সুন্দর ফুটেছে।

উচ্চ শ্রেণীর যে অমানুষিক বর্ব্বরতা অত্যাচার এদের ঘাড়গুলো সাপ্‌টে ধরে মাথাশুদ্ধ মাটির নীচে গুঁজে রেখেছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আন্‌বার তরে দুনিয়ার সকলের সাথে সমতালে পা ফেলবার তরে প্রবল অভিযান আনার ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন যথেষ্ট জোরে।

কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিতে অবশ্য কবিত্ব শক্তির বিশেষ বিকাশ হয়নি তবে উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হোয়েছে সব কটাতেই।

ধানের মঞ্জরী—মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন এম্, এ প্রণীত, প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩৷১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১॥০

সাহিত্য-সমাজে লেখক অপরিচিত নন। কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও দুচারটে কবিতা দিয়ে তিনি ধানের মঞ্জরী সাজিয়েছেন।

অধিকাংশ মানুষের মনেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা যায় না। কারণ তাঁরা ভাবেন যে কতগুলো দুর্ব্বোধ্য অকেজো চিন্তা নীরস ও কর্কশ ভাষার গণ্ডির মধ্যে বন্ধ কোরেই প্রবন্ধের সৃষ্টি। অবশ্য পূর্ব্বে অনেক লেখকই ভাবতেন যে সহজ সুন্দর ভাষায় যদি চিন্তাধারার রূপ দেওয়া যায় তাহোলে তার গাম্ভীর্য্য থাকে না। কিন্তু এ ধারণা যে কত অযৌক্তিক তা আজকাল প্রমাণিত হোয়েছে।

মনসুরউদ্দিনের ভাষার গতিভঙ্গিমা যেমনি সহজ ও প্রাঞ্জল তেমনি মধুর। লেখক তাঁর সমাজের পিছিয়ে পরা দেখে গভীর বেদনা পেয়েছেন। সমাজকে সকল বিষয়ে ঊর্দ্ধে টেনে তোলবার আগ্রহ প্রাচুর্য্যে যে সব কথা তিনি লিখেছেন তা সবাইর পড়ে দেখা ভাল। বিশেষ কোরে মুসলমানগণ এ পড়ে অনেক কিছু জান্‌তে ও শিখ্‌তে পার্‌বেন এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতির পথের ইঙ্গিত পাবেন।

লেখক কবি নন তবে কবিতা কয়টি হোয়েছে এক প্রকার। সাহিত্য সম্বন্ধে এঁর লেখাগুলো আমাদের ভালই লেগেছে।

ওগো কল্পময়ী—শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত প্রকাশক – ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট মূল্য ১৲

উদীয়মান তরুণ কবি দিলীপ দাশগুপ্তকে আজকাল অনেকেই জানেন। প্রথম থেকেই যথেষ্ট শক্তি ও বৈশিষ্ট নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব ও তা প্রকাশ কোরবার তরে তাঁর যে সতেজ সুন্দর ভাষা ও ছন্দ তা আমাদের আনন্দ দিয়েছিল।

এই বইখানাও তাঁর নিজস্ব ভাষা ছন্দ ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী হোয়ে উঠেছে।

প্রথমেই কবি লিখেছেন—

"কে প্রেয়সী শুধাইছ? যারে সৃষ্টি নিজে করিলাম।"

স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে—কল্পময়ীকে নিয়ে যে ভাবরসের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তা আমরা উপভোগ কোরেছি।

কবির নিজ হাতের আঁকা প্রচ্ছদ পটটি সহ ছাপা বাঁধাই সবই সুন্দর হোয়েছে।

বাংলায় নারী নির্য্যাতন

শ্রীগৌরী দেবী

বাংলাদেশে নারী নির্য্যাতন হয় ঘরে—বাইরে। আমরা 'নারীকে' মাতৃজাতি বলিয়া পূজা করি বলিয়া গর্ব্ব করিলে বাংলার অসংখ্য নারী নির্য্যাতনের মধ্যে অনেকগুলি ঘরের লোকদের ব্যবহারের জন্যই সম্ভব হয়। আমার ধারণা ঘরের অবমাননা না থাকিলে বাইরের গুণ্ডারা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতে এতটা সাহসী হইত না। ঘরের নির্য্যাতনের ফল দুই প্রকারের হইতে পারে। নির্য্যাতিতা যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কু পথে যাইতে পারে। অথবা ঘরের নির্য্যাতনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাইরের অসৎ লোক তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করিতে পারে।

ঘরের নির্য্যাতনে কতদূর কুফল হইতে পারে তাহাই আলোচনা করিব।

বিবাহ নারীর জীবনে একটী প্রধানতম অধ্যায়। বিবাহের পূর্ব্বে অনেক আশা ও কল্পনা লইয়া দিনের পর দিন সে ভবিষ্যতের ছবি 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া থাকে। কোন এক অজ্ঞাত পুরুষের প্রেমের আলোতে তাহার হৃদয় কমল ফুটিয়া উঠিবে, তাহার সাহায্যে জীবনের দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে হইবে; সংসারের শত শত দুঃখ ও লাঞ্ছনায় যখন চারিদিকে আঁধার করিয়া আসিবে বাস্তব জগতের কঠোরতার সাথে যখন মুখোমুখি হইতে হইবে তখন হয়ত সবাই তাহাকে ত্যাগ করিবে কিন্তু যার সাথে তার বন্ধন সেই ত তাহাকে বিপদ সাগরের পরপারে দুর্দ্দিনের ভিতর দিয়া লইয়া যাইবে। সে হইবে একান্ত ভাবে তাহারই। প্রেমের দেবতার মহামন্দির তলে সে আপনাকে প্রদীপ শিখারূপে কল্পনা করে তাহারই আলোতে আরতি করিবে দেবতাকে—'দুর্গম মন্দিরে'। সেই 'স্তব্ধ নীরব' মন্দিরে লোকচক্ষুর অগোচরে সে অসীম ব্যাকুলতা লইয়া পূর্ণভাবে আপনাকে উৎসর্গ করিতে চায়।

বলে 'পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তা'রে গিয়া কী দিয়ে।'

সেখানে দিনের পর দিন নিঃশেষে পুষ্পের মত আপনাকে বিলাইয়া দেয় তার কথা কেউ জানিতে পারে না।

"আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা"

পুষ্প যেরূপ আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠে নারীর অন্তরেও সেরূপ—

'এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব
কে পারে রাখিতে মোরে
কে আমারে পারে আকড়ি রাখিতে
দু'খানি বাহুর ডোরে'.

এই তীব্র বাসনাটী মূর্ত্তিমতী উষার মত দেখা দেয়। প্রত্যেক নারীই ঐ আবেগ অনুভব করে সেই রবীন্দ্রনাথ ব্রাউনিংই পড়ুক অথবা গ্রাম্য বালিকাই হউক গ্রাম্য বালিকাও ভালবাসিতে চায় এবং প্রতিদানে ভালবাসা চায়। যেখানে তাহা পায় না সে বলে—

ফুলের মালা গাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ্ করে সবে করে না স্নেহ।'

ভালবাসা না পাইলে তাহার জীবন নিষ্ফল মনে হয়। জীবনের সর্ব্বপ্রকার মাধুর্য্য মরীচিকার মত মিলাইয়া যায়। দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষার পর যখন তাহার আশা পূর্ণ হইল না তাহার কোমল সুন্দর অর্ঘ্য উপেক্ষিত হইল তখন বড় দুঃখেই বলে।

"দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো,
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।"

বিবাহের পর যদি স্বামী শ্বশুর শ্বাশুরী প্রভৃতি দ্বারা তাহার এতদিনের আশা ধূলিসাৎ হইয়া যায় তখন তাহার মন একবারে ভাঙ্গিয়া যায়, এযে জীবনের মোটে আরম্ভ! কেমন করিয়া সে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিবে? দুঃখের দিন ফুরাইতে চায় না এক একটী দিন দীর্ঘ বৎসরের মত মনে হয়। কিন্তু তাহার মনে তাহার আকাঙ্খাগুলি গুমরিয়া কাঁদিতে থাকে চির ক্রন্দিত সাগরুর্ম্মির মত।

সংসারে তখন সে নিজেকে বড়ই অসহায় মনে করে। স্বামী যদি স্ত্রীকে অবহেলা করে তাহা হইলে সকলেই তাহাকে অবমাননা করিতে সাহস পায়। সকলেই তাহাকে পথের কাঁটা মনে করে।

অপর দিকে বাপের বাড়ীতে তাহার স্থান সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বাংলাদেশে মেয়ের বিবাহ দেওয়াই একটী বড় সমস্যা। অনেক কষ্টে বিবাহ দেওয়া হইলে পুনরায় তাহার ভার গ্রহণ করা পিতার পক্ষে কষ্ট কর। বাপের বাড়ীর অনেকে ক্রমশঃ তাহাকেই সব দোষের কারণ বলিয়া মনে করে। এইভাবে দুইদিকের চাপে তাহার জীবন দুর্ব্বিহ হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অনেক মেয়ের কথা জানি যাহাদের জীবন এইভাবে ব্যর্থ হইয়া গেছে। একটীর কথাই বলি।

সে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। লেখাপড়া বেশ শিখিয়াছিল। বোধ হয় ১৬।১৭ বৎসরের সময় বিবাহ হয়। মেয়েটী তেজস্বী ছিল, তাহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে যে সাধারণ মেয়ের মত তার চরিত্র গঠিত হয় নাই। তার স্বামী বিদেশে চাকুরি করিত। তার শ্বশুর বাড়ীর লোকদের চরিত্র কী রূপ হইতে পারে পূর্ব্বে তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই সুতরাং ভাবিয়া ছিলাম যে ঐ মেয়েটীর জীবন দুঃখময় হইবে না। অদৃষ্টের পরিহাস, প্রায় দুই বৎসর পরের কথা। একদিন শুনিলাম তাহার স্বামী তাহার কোন খবরাখবর রাখে না। যদিও সংসারে কর্ম্মক্ষম অনেক লোক আছে, তথাপি একলা তাহাকেই যাবতীয় কার্য্য করিতে হয়। ইহার উপর অকথ্য ভাষায় তাহাকে প্রথম অপমান করা হইত তারপর প্রহার চলিল, একদিন ত মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কয়েকদিন পর কথা প্রসঙ্গে ঐ মেয়েটীর কথা উঠে। একজন ভদ্রলোক তখন বলিলেন, 'ইহাদের শাসন না করিলে ইহারা ঠিক থাকে না।'

যে সমাজে সে বাস করে তাহারা ত ব্যবস্থা একেবাক্যেই দিল। সমাজের সকলের মত তাহা না হইলেও ইহা কঠোর সত্য যে যে সেই ছেলেটী বা তাহার আত্মীয়স্বজন কেহই তাহাদের—অপরাধকে অপরাধ মনে করে নাই এবং সমাজে মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে লজ্জিত হয় নাই কারণ সমাজ ও ইহাদের মত লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বের মতই তাহারা দশজনের একজন। ঐ ছেলেটী অন্য মেয়েকে ভালবাসিতে পারে বিবাহ করিতে পারে—পূর্ব্বের স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে—সমাজ তাহাকে বাধা দিবেনা—তাহার কার্য্যে কোনরূপ অন্যায় দেখিবে না। কিন্তু ঐ মেয়েটী যদি অন্য একটী ছেলেকে ভালবাসে তবেই সর্ব্বনাশ। আমার মনে হয়—ঐ অবস্থায় তাহার পক্ষে অন্য কাহাকেও ভালবাসা। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সমাজ তাহাকে অসতী বলিবে কিন্তু তাহার সেই পরিণতির জন্য কাহারা দায়ী? বাংলায় একমাত্র সাবিত্রীরাণীই নির্য্যাতিতা হন নাই তাঁহারই মত ঘরে ঘরে বহুমেয়ে প্রতিদিন নির্য্যাতিতা হইতেছে।

ঘরে যখন এইভাবে দৈনিক নির্য্যাতন চলিতে থাকে তখন বাইরের গুণ্ডাজাতীয় লোকেরা তাহাকে হরণ করে অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে নির্য্যাতিতার নিকটআত্মীয় পর্য্যন্ত গুণ্ডাদের সাথে যোগদান করিয়াছে। নারীহরণের পর প্রায়ই শুনা যায় যে মেয়ে ইচ্ছা করিয়াই গিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে দুচারটী ঘটনা ঘটে যাহাতে মেয়ে স্ব-ইচ্ছায় কূল ত্যাগ করে অপরগুলিতে উপরোক্ত কারণগুলিই প্রযোজ্য। বাংলার মা, বোন, মেয়েদের গুণ্ডারা লাঞ্ছিত করিতেছে—আর তাদেরই স্বামী, পুত্র, ভাইরা মজলিসে একথা জানাইতে লজ্জাবোধ করে না যে মেয়েরা স্বইচ্ছায় চলিয়া যায়। শুধু বড় বড় সহরের বড় বড় বক্তৃতাদ্বারা বিচার করিলে সব বুঝা যাইবে না। দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে থাকে সেই গ্রাম্য-মজলিসে উপস্থিত হইলে বুঝা যাইবে—বাতাস কোনদিকে বহিতেছে।............

লাঞ্ছিতাদের উদ্ধার করিবার পর সমাজে তাহাদের স্থান দেওয়া যায় না। তখন তাহার সম্মুখে দুটীমাত্র পথ থাকে। নারীহরণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। হিন্দু-সমাজে স্থান না পাইয়া মুসলমান হইলে কাহারওবা কাহারও স্ত্রীরূপে গণ্য হইতে পারে। অথবা পতিতা হইতে পারে। লাঞ্ছিতা হওয়ার পর তাহাকে সবাই ঘৃণা করে—তাহার বিষাক্ত সঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যজ্য একথা—কত শ্লোকে প্রচার করে। তখন লাঞ্ছিতা দেখে যে পতিতা হইলে সমাজের অনেক ধ্বজাবাহী তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া 'বহু চাটু কথা' বলে, বলে তাহাকে যে চাই-ই—সমাজের পক্ষে সে যে একান্ত প্রয়োজনীয়। সমাজের একজাতীয় লোকের আনন্দ উপভোগের জন্য—তাহাদের হীন প্রবৃত্তিনিবৃত্তির জন্য তাহার প্রয়োজন।

অনেক সময়ই ছলেবলে কৌশলে পতিতার সৃষ্টি হয়। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে একজাতীয় লোকের জন্য অপর একদল লোক নিজেদের বিক্রয় করিতেছে তবু সমাজ বলে না যে সে ভাল হউক। তাই একদিনে না হউক দশদিন পরে দরিদ্রতার নিষ্পেষণে অথবা নানাপ্রকার প্রলোভনের নিকট সে পরাজিত হয়। সে পতিতা হয় কারণ তাহার নারীর মহিমাকে অভিনন্দিত করিবার কেহই নাই। পতিতা বলে—

"মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি"

পূর্ণিমার প্রশান্ত জ্যোৎস্নাকে কালো মেঘ যেরূপ আবৃত করিয়া রাখে ঐ সব পশুদের ঘৃণ্য প্রবৃত্তিও লাঞ্ছিতাকে সর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখে। তাহার অন্তরের দেবতাকে কেহই চায় নাই চাহিয়াছে তাহার দেহকে। বড় দুঃখেই সে বলে—

'দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা'

পতিতা হওয়া অপেক্ষা ধর্ম্মান্তরিত হইয়া সমাজভুক্ত হইয়া থাকা অনেক ভাল।

বাংলাদেশে বহু হিন্দুমেয়ে এইভাবে পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদের সন্তানও প্রতি বৎসর কম হইতেছে না। সাক্ষাৎভাবে দু'একজন লোক ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু-সমাজের পুনরুত্থানকারী বহু ঝাণ্ডাবাহী জেহাদ ঘোষণা করিতে চায় আর এইভাবে পরোক্ষভাবে কত লোক যে ভিন্ন ধর্ম্মাশ্রয়ে যাইতেছে কেউ তার সন্ধান রাখে না।

বাংলায় নারীনির্য্যাতনের সংখ্যা কম নয়—যতটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী অপ্রকাশিত থাকে। আজ বাংলার মেয়ের পক্ষে নির্ব্বিঘ্নে চলাফেরা করা বিপদজনক। আমাদের মেয়েরা আমাদেরই দেশে এরূপ বিপদের মধ্যে আছে—এ যে কত বড় কলঙ্কের কথা তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এশিয়ারই আর একটী দেশ জাপান। সে

দেশের মেয়েরা কর্ম্মোপলক্ষে দিকে দিকে চলিয়া যায় মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের আশঙ্কা নাই কারণ তাহারা জানে তাহাদের সম্মানের জন্য প্রত্যেকটী জাপানী জীবন দিবে।

নারীর মহিমাকে এত বড় অর্ঘ্য দিতে পারে বলিয়াই জাপান পোর্ট আর্থারে নবীন এশিয়ার বিজয় কেতন উড়াইয়াছে।

আর আমাদের মেয়ে একান্ত নিঃসহায় তাকে রক্ষা করিবার কেউ নাই।

নিজের শক্তি না জানিলে বিরুদ্ধপক্ষের সাথে শক্তির পরীক্ষা করা যায় না। আমাদের একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা বড় অসহায় বড় দুর্ব্বল। মিথ্যা মোহে আবদ্ধ থাকিলে আত্ম-বঞ্চনা হয় মাত্র।

আমাদের কী হইতে হইবে? দেহ ও মনে শক্তিময়ী হইতে হইবে। তাহলেই আমাদের সন্তানেরা মানুষ হইবে। তাহারা মানুষ হইলেই সমাজের পঙ্কিলতা কমিবে।

সঙ্গীতে কাব্য-রসের স্থান

শ্রীমমতা মিত্র

"গানাৎ পরতরং নহি" সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় শিক্ষা দীক্ষাহীন নর-নারী গান গেয়ে আনন্দ লাভ করেছে, সভ্যতার শৈশব কালে আর্য্য ঋষিরা দেবদেবীর বন্দনাচ্ছলে গান রচনা করেছেন, সাক্ষী তার সামবেদ। তারপর কেটে গেছে কত যুগযুগান্তর। সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের প্রসার হ'য়েছে। কত প্রতিভাবান কলাবিদের আপ্রাণ চেষ্টায় ও সাধনায় সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সঙ্গীত পেয়েছে আশ্রয়। দিনে দিনে হয়েছে তার নানা উন্নতি। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে ভদ্র-সমাজের মধ্যে গানের প্রচলন হয়েছে বেশি দিনের কথা নয়। আমি যত দূর জানি সুন্দরের উপাসক সুবিখ্যাত ঠাকুর বাড়ীর গুণীরাই এ-বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন, এই সুকুমার কলাটিকে পঙ্কিল স্থান থেকে উদ্ধার করে সমাদরে বরণ করে নেন সর্ব্ব প্রথম তাঁরাই। এমন দিন ছিল যখন কোন ভদ্রসন্তান সঙ্গীত চর্চ্চা করলে লোকে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও কালিমা-লিপ্ত মনে করেছে। এই ভুল ধারণা থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদেই। আজ বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে শুধু পুরুষ কেন অন্তঃপুরচারিণীদেরও স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠের স্বর-লহরী ধ্বনিত হচ্ছে। সঙ্গীত-কলা হীন নয়। এর আছে মোহিনী শক্তি। শোকে এদের সান্ত্বনা, দুঃখ ভোলায়, সুখের মুহূর্ত্তকে করে মধুরতর, এমনই মহান্ জিনিস এ। শ্রেয় ও প্রেয় কিছুই নেই গানের চেয়ে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রভৃতি গীত-শিল্পীদের অজস্র দানে ভরে উঠেছে গানের সাজি। সুর-লক্ষ্মীর কানন কোকিল

পাপিয়া দোয়েল শ্যামার সুমধুর ঝঙ্কারে মুখরিত। লক্ষ লক্ষ লোক সেই সব গান গেয়ে, শুনে অনাবিল সুখ লাভ করছেন। দীর্ঘকালের অনাদর ও অবজ্ঞা মনের মালঞ্চে আজ কুসুম ফুটিয়েছে। সঙ্গীতকে তার প্রাপ্য গৌরবময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে আমরা আনন্দ বোধ না করেই পারিনে।

আজ আমার বক্তব্য হচ্ছে সঙ্গীতে কাব্য-রসের স্থান আছে কি না এবং থাক্‌লে তা কতখানি। আধুনিক বাঙলা গান সম্বন্ধে বল্‌বার জন্যই আপনাদের সামনে এসেছি সাধারণতঃ যাঁরা গান করেন ও সঙ্গীতে যাঁদের আছে অনুরাগ তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই খোঁজেন মিষ্টিকথা, তাঁদের কাছে সুরের স্থান কথার নীচে। কিন্তু তা ঠিক নয়, এ ধারণা অনেকটাই ভুল। বল্‌বার সময় এসেছে এবং বোঝাবার দরকার হয়েছে যে গানে প্রধান হচ্ছে সুর, ভাষা গৌণ। এই কথাটিই আজ আমি বোঝাবার চেষ্টা করব। কথা প্রধান কাব্যে ও কবিতায়, গানে নয়। লতা যেমন তরুকে জড়িয়ে থাকে আশ্রয় পাবার আশায় তেমনই কথা চায় সুরকে আশ্রয় করতে। একা থাক্‌লে সে গান নয়, শুধু ছন্দোবদ্ধ বাণী-সমষ্টি গানের এলাকায় পড়ে না, সে হয়ে যায় কবিতা। যাঁরা কাব্য-রস-পিপাসু গান না শুনে তাঁরা কবিতা পড়তে পারেন, তাতে তাঁরা পাবেন পরিতৃপ্তি। কবিতায় কাব্য-রস প্রধান, গানের প্রাণ সুর। সঙ্গীতে সুর বলিষ্ঠ আশ্রয়দাতা, রক্ষক, বাণী তার পদ-তল-লীনা আশ্রিতা সেবিকা। সুর তা'র বৈচিত্র্য, তান, আলাপ প্রভৃতি দিয়ে জয় করবে শ্রোতার চিত্ত, অপূর্ব্ব সুন্দর সুর-লীলায়, রাগের সূক্ষ্মতম বিকাশে মন মুগ্ধ করবার শক্তি তার আছে। শ্রীমতী মায়া দেবী এ-ধরণের একটি গান গাইছেন এখনই, তাতে বিষয়টি সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আজকাল চ'ল্‌ছে কথাপ্রধান গান। দু'চারটে মিষ্টি কথার সমাবেশ আছে এই রকমের গান শেখ্‌বার আগ্রহই দেখা যায় বেশি। গানে তাই জন্য একটা করে সুর বলে জিনিস থাকে নাম মাত্র, সুরের সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় না, মন মুগ্ধ করে দেয় শুধু কথার মাধুর্য্য, শব্দের ঝঙ্কার। এখানে সুরকে বলি দেওয়া হয় কথার পায়ে। কথার মোহ অনেকেরই মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে কথার প্রতি মমতাবশতঃ তাঁরা করেন সুরকে উপেক্ষা। সুরেরই রাজ্যে তাঁরা সুরকে অবহেলা দেখান। এর চেয়ে পরিতাপের কারণ আর কি হ'তে পারে?

কিন্তু সুর-রাজ্যে কি কথার স্থান একেবারেই নেই? কথা কি তবে উপেক্ষার জিনিষ? কথা-শিল্পীরা ধৈর্য্যহারা হয়ে নিশ্চয় বল্‌বেন, "কথা যদি এতই অকিঞ্চিৎকর তবে কথা বাদ দিয়ে সুরের বিকাশ সাধন করলেই ত' হয়, তুচ্ছ কথার সঙ্গে সুরের গ্রন্থি-বন্ধন কেন তবে?" এ-হলো ক্রোধের উক্তি। কথারও স্থান আছে সুর-লোকে, সুর বড় নিজের রাজ্যে, কিন্তু কথাকে চায় সে, কথা বিহনে সে অসম্পূর্ণ। মানুষের যেমন দেহ ধারণ করতে হলে

পরিচ্ছদের প্রয়োজন সুরের তেমনই আবশ্যক কথাকে। গাত্রাবরণ ভাল না হলেও তাতে সুরের ক্ষতি হয় না, সুর- আপন সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ। মনোহর পোষাক সুন্দর দেহকে করে সুন্দরতর, তেমনই উচ্চ শ্রেণীর সুরের অলঙ্কার কবিত্বময় ভাষা, কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রাণ নয়। বাঙ্গালী কাব্যপ্রিয় জাত, সুর-নির্ঝরিণীতে অবগাহন করে সম্পূর্ণ আনন্দ সে পায় না, সেই সঙ্গে চায় সে কথার সৌন্দর্য্য। এদিকটা কাজেই একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, কিছু কাব্য-রস পরিবেশন সুরের ভিতর দিয়ে কর্‌তেই হবে। শ্রেষ্ঠ সুর ও হৃদয়গ্রাহী কথার সমন্বয়ে আমাদের সুর-রসিক এবং কাব্য-প্রেমিক চিত্ত লাভ করে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। শ্রীমতী মায়া দেবী গানের দ্বারা আপনাদের বুঝিয়ে দেবেন আমার কথা।

আশা করি আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করতে পেরেছি, প্রবন্ধের অন্তর্গত গানগুলি গেয়ে দেখানতে সকলের বোঝবার পক্ষে সুবিধা অবশ্যই হয়েছে। পরিশেষে বিদায় নিচ্ছি এই ব'লে যে আপামর সকল লোকে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের রস গ্রহণ করতে পারবেন এমন দুরাশা মনে পোষণ করি নে। সব জিনিসই বোঝ্‌বার জন্য সাধনার প্রয়োজন। প্রথমে মনে রাখতে হবে সুর মুখ্য সঙ্গীতে, কিন্তু ভাল করে চর্চ্চা না করলে তার রস পাওয়া যায় না, সুর-বোধ জাগ্রত হলে তবে সুরের রসে মন হবে অভিষিক্ত।

সুর প্রধান, তাই বলে অশ্লীল বাণী, অসুন্দর ভাষা অনায়াসে চালানো হবে সুরের দোহাই দিয়ে এমন কথা প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সঙ্গীতে কাব্য-রসের স্থান আছে, কিন্তু কবিতায় তা'র আসন যত উঁচুতে সুরের কাছে তা' নয়, এখানে সে ধন্য হয় সুরের সেবা করে, এতেই তা'র আনন্দ। সুরের সঙ্গে কথা সমান আসন দাবী ক'রতে পারে না, স্থান তা'র প্রিয়ের পদ-প্রান্তে। যার যেখানে স্থান তা'কে দিতে হ'বে সেই আসন। কথার সঙ্গে বিরোধ নেই আমার, আমি কেবল চাই সে থাকুক তার নিজের জায়গায়, সুরকে যেন সে আচ্ছন্ন না করে। আর আমাদের দেশের সুরকারেরা উচ্চ শ্রেণীর সুর সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করুণ, সুর-ভাণ্ডার ভ'রে তুলুন বৈচিত্র্যময় নব নব দানে, তবেই সঙ্গীত-কলা হ'বে সার্থক।

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃক অনুষ্ঠিত কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত

সাহিত্যের স্বরূপ

শ্রীসরলা বালা সরকার
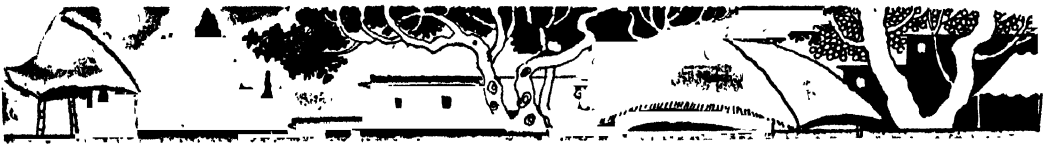
তালতলা সাহিত্য সম্মেলনের আজিকার মহিলা সভায় কেবল সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা নয়, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল এবং শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ক আলোচনা হইয়াছে। আপাতঃভাবে সাহিত্য সভায় এই সকল বিষয়ের আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই সকল আলোচনা সাহিত্য-সীমার বহির্ভূত নয়।

"সাহিত্য" বলিতে এমন একটি বিষয় বুঝায় যাহার সহিত মানুষের মনোবিকাশের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মানবের অবচেতন মনে যে সকল গভীর ভাবের অনুভূতি সংগুপ্ত থাকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেইগুলি বিকশিত হইয়া একের ভাবময় চেতনা অপরের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে। এইরূপে শক্তিশালী সাহিত্য সমস্ত জাতির জীবনে এক নূতন ভাবের আলোক প্রতিফলিত করিয়া জাতির বিকাশের অভিমুখে অগ্রসর হইবার সহায়ক হয়।

মানুষের জীবন যন্ত্রের মত কেবল অবিরাম কর্ম্মের গতি নয়, সেই গতির মূলে প্রাণ আছে, ও সেই গতির মূলে সরসতার অনুভূতিও আছে। মানুষ অনেক মহাকার্য্যে জীবন দিয়াছে, কেননা সেই জীবনদানের মধ্যে সে রসের আস্বাদন লাভ করিয়াছে। সাহিত্য—যদি তাহা যথার্থ সাহিত্য হয়—মানুষের নিকট রসের উৎসস্বরূপ। সকল খণ্ডতা সকল অনৈক্যের বিরসতা সাহিত্যের ভিতর দিয়া যেন অখণ্ড রস স্বরূপে প্রকাশ পায়। যাহা ব্যক্তিগত চেতনা ও ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুভূতি মাত্র ছিল সাহিত্যের সংশ্রবে আসিয়া তাহাই এমন এক সার্ব্বজনীনরূপে প্রকাশ পায় যাহা জাতিগঠনের মূলে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান স্বরূপ হয়।

"সাহিত্য দর্পণে" দর্পণকার সাহিত্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।" অর্থাৎ প্রকৃত সাহিত্যের আস্বাদে কোন ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদের বিচ্ছিন্নতা নাই। সাহিত্য এমন একটি বস্তু যাহা সকল "সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী", সকল হৃদয়বান ব্যক্তিই তাহা নিজহৃদয়ের সহিত এক করিয়া অনুভব করিতে পারেন।

এখানে এই "সহৃদয়" শব্দের উল্লেখ দ্বারা সাহিত্যের সহিত মানুষের মনোজগতের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা অনেকটা বিশদ হইয়াছে। যেন এই "সহৃদয়" শব্দের ইঙ্গিত দ্বারা বলা হইয়াছে "সাহিত্য" কেবল বুদ্ধির দ্বারা বুঝিবার বস্তু নয়, তাহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়।

মানুষমাত্রেরই ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া পরস্পরের সহিত বিভিন্নতা আছে, প্রত্যেক মানুষই অন্য হইতে স্বতন্ত্র একটি ব্যক্তি। আবার মানুষ মাত্রেরই অন্তঃপ্রকৃতির ভিতর পরস্পরের সহিত সংযোগের একটি উপলব্ধিও আছে। মানুষ যখন জন্মায় তখন সে কেবল ব্যক্তি হইয়া জন্মগ্রহণ

করে না, তাহার জন্মের চেতনার সহিত জাতির ও বিশ্ব-মানবের চৈতন্যের একটি যোগসূত্র লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। এই বৃহত্তর চৈতন্যের ব্যক্তিগত চেতনার উপর যে প্রভাব, সহজ জ্ঞানের মধ্য দিয়া সে প্রভাবের স্বরূপ সকল সময় ধরা যায় না। সাহিত্য, কলাশিল্প ও ধর্ম্মবোধ মনের অবচেতন গভীর স্তর হইতে উৎসারিত হয়, সেইজন্য সাহিত্য কলাশিল্প ও ধর্ম্মবোধের মধ্য দিয়া আমরা এই সংযোগ অনুভব করি। যথার্থ সাহিত্য কেবল সমকালে বা নিজের দেশে নয়, সকল দেশের সকল কালের মানবের মনে নিজ হৃদয়ের সমবাদী ভাব জাগ্রত করিতে পারে। কলা শিল্প ও ধর্ম্মবোধের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। এই যে বৃহতের সহিত সংযোগের উপলব্ধি—, ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্বের সার্থকতা নিহিত আছে, ইহার ভিতর দিয়াই বৃহত্তর জীবনের বিকাশ হয় এবং ইহার ভিতর দিয়াই মানুষ বিশ্বের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিয়া ধন্য হয়।

মানুষ ক্রমশঃ নব নব ভাবে বিকাশ লাভ করিতেছে ইহাই সৃষ্টির ধর্ম্ম এবং ইহাই সৃষ্টির তাৎপর্য্য। যথার্থ সাহিত্যের লক্ষণ এই যে তাহার দ্বারা সৃষ্টির সেই বিকাশ রূপ উদ্দেশ্য সফল হইতেছে। আমরা সাহিত্য কলাশিল্প ও ধর্ম্মবোধ এই তিনটি পৃথক শব্দ উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এই তিন বস্তু একেরই ত্রিবিধভাবে বিকাশ। বেদই হিন্দুধর্ম্মের মূল, সেই বেদকে যদি আদি সাহিত্য বলা যায় তাহা অযথার্থ হয় না। বেদে ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে; আরও বলা হইয়াছে 'সে রস যে কি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যায় না, যে সে রস আস্বাদরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়াছে সেই তাহার মর্ম্ম জানে।' সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ, মহাভারত রামায়ণ পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি, এগুলি কি সাহিত্য নয়?

ক্রৌঞ্চ মিথুনের বিরহ দুঃখ অনুভূতির করুণা বিগলিত হইয়া আদি কবি বাল্মিকীর প্রথম শ্লোক অমৃত বিন্দুর ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল। সেই শ্লোকে নিখিল জগতের বিরহী জনের বিরহ দুঃখ ক্রৌঞ্চ-দয়িতার বিরহের সহিত এক হইয়া রহিয়াছে, তাই নিখিলের সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী-এই শ্লোক আজিও জগতে অমর হইয়া রহিয়া গিয়াছে। কাব্যরসিক এই শ্লোকের করুণা বিগলিত গভীর দুঃখের মধ্যে কেবল দুঃখ নয় গভীরতর আনন্দের অনুভূতিও লাভ করেন। দুঃখ যখন করুণার রূপ ধারণ করে তখন তাহার যে অপরূপ মাধুর্য্য হয় এই শ্লোকে সে মাধুর্য্য যেন মুর্ত্তিধারণ করিয়াছে। যাহা কবিগণ এইভাবে রচনা রূপে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পৃথিবীকে দান করিয়া যান।

ঐ শ্লোকের সহিত যদি কোন বিখ্যাত চিত্র বা ভাস্কর্য্যের তুলনা করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় সেই চিত্র বা ভাস্কর্য্যে খ্যাতির একই কারণ যে তাহারা নিখিল সহৃদয়-হৃদয়—সংবাদী। ভূমার সহিত একত্বানুভূতির আনন্দ উপভোগে তাহারা সহায় বলিয়াই তাহারাও

জনমনের চিরানন্দ দায়ক। তথাপিও মনে হয়, চিত্র ও শিল্প অপেক্ষা মানবমনের উপর সাহিত্যের প্রভাব আর ও অধিক।

সমাজের সহিত মানুষের জীবন এমন ভাবে এক হইয়া আছে, যে সমাজকে বাদ দিয়া মানুষের জীবনের আলোচনা চলেনা। সুতরাং সাহিত্যের সামাজিক ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে ইহা নিশ্চিত। সাহিত্যের কশাঘাতে অনেক সময় সমাজের দুর্নীতি এমন ভাবে সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে অনেক উপদেশ ও বিতর্কেও তাহা হইতে পারিতনা। Mrs. Harriet Bitcher Stow, Uncle Tom's Cabin নামে একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। একখানি উপন্যাস মাত্র! কিন্তু তাহাই আমেরিকায় অতি দৃঢ় দাসত্ব প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল ইহা অনেকেই বোধহয় জানেন। সমাজ যখন নিজের ভুল ভ্রান্তির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অন্ধভাবে নিজের বেগে ধ্বংসের পথে চলে তখন সাহিত্যের দর্পণ প্রতিবিম্বিত নিজের প্রতিচ্ছায়ায় নিজের যথার্থ রূপ দেখিয়া অনেক সময় তাহার চৈতন্য হয়। সমাজ যখন একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মমূর্ষুর পক্ষে উত্তেজক ঔষধির ন্যায় সাহিত্য তাহার বল বিধান করে। জাতি যখন অবসাদ ও ক্লৈব্যে অভিভূত হয়, সাহিত্য বীরগাথা রচনা করিয়া অবসাদগ্রস্ত জাতির জীবনে বীর্য্য-সঞ্চার করে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া একত্বের অনুভূতি সমস্ত জাতিকে এমনভাবে সঞ্জীবিত করে যে জাতি তখন আর নিজেকে একক, অসহায়, মৃত্যু বিপদ ভয়ভীত ও দুঃখার্ত্ত বলিয়া অনুভব করে না। সাহিত্যই জাতিকে স্বাধীনতা সাধনায় দীক্ষা দান করে। ইতালীতে ম্যাট্‌সিনি জন্ম গ্রহণ না করিলে গ্যারিবল্ডীর অভ্যুত্থান সম্ভব হইত কিনা কে বলিতে পারে।

যখন যে যে দেশে মহাকবি বা মহা সাহিত্যিক জন্ম গ্রহণ করেন তখনই বুঝা যায় সে দেশ উন্নতির পথে চলিয়াছে। আমাদের দেশের শত দুর্ভাগ্য সত্ত্বে ও সৌভাগ্য এই যে, সাহিত্যিকের আবির্ভাবে এ দেশ এখন ও বঞ্চিত হয় নাই। অমর বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে জাতীয়ভাবে অণুপ্রাণিত করিয়া জাতির মধ্যে এক নূতন ভাবধারা আনিয়া দিয়াছিলেন। আর ও অনেক স্বর্গগত মনিষী সাহিত্যকে বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি নানা খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন।

বাঙ্গলা সাহিত্য এখন ও রবির উজ্জ্বল কিরণে প্রদীপ্ত রহিয়াছেন। আরও সুখের বিষয় এই সাহিত্যের সাধনা কেবল পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ নাই। এই সভার মূল সভানেত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্ত অনুরূপাদেবী তাঁহার অমর উপন্যাস গুলির মধ্যদিয়া ভারতবর্ষের ও হিন্দুরমণীর মৌলিক বিশেষত্বের যে আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে কেবল যে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নহে, আমাদের জাতির গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে।

দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতি যেমন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখারূপে গৃহীত হইয়াছে শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল বিষয়ক আলোচনা ও সেইরূপ সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া তালতলা সাহিত্যসম্মেলন যেন বিশেষ ভাবে ইহাই জানাইয়াছেন, মাতৃজাতির মঙ্গলেই জাতির

প্রকৃত মঙ্গল। জাতির ভবিষ্যৎবীজ ধারণ ও বিকাশের গুরুভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাঁহাদের কল্যাণ আলোচনা যদি সাহিত্যের অঙ্গীভূত না হয় তবে সাহিত্যের বিকাশের সার্থকতাই বা কি, আর কোন্ অবলম্বন আশ্রয় করিয়াই বা সাহিত্যের বিকাশ হইবে।

মাতৃমঙ্গলের সহিত শিশুমঙ্গল অভিন্ন। মা নিজের জীবনের প্রদীপ দিয়া শিশুর জীবন দীপটি প্রজ্জ্বলিত করেন—স্বাস্থ্যে বীর্য্যে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে বলীয়ান নূতন জাতি গড়িয়া তুলেন মায়ের হাতে এই ভার আছে। জন্মের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর কাছে ঋণী আছি, আমাদের জন্মকে অর্থযুক্ত করিতে হইলে পৃথিবীর জন্য জাতির জন্য কিছু দান করিয়া নিশ্চয় যাইতে হইবে। আজিকার সম্মেলনে সমাগতা জননীগণের মনে যদি এ চিন্তা সত্যকার ভাবে জাগে তবে এই মহিলা-সভা সার্থক হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

শেষ কথা, যাহাতে কু-সাহিত্যের প্রচার বন্ধ হইয়া যথার্থ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় সেজন্য প্রত্যেক সাহিত্য-সভা ও সাহিত্য-সম্মেলনের চেষ্টা করা উচিত। সৎ-সাহিত্য যেমন জাতিকে উন্নত করে, কু-সাহিত্যের ও সেইরূপ জাতিকে অবনতির দিকে লইয়া যাইবার শক্তি আছে। তালতলা সাহিত্য সম্মেলনে এই চেষ্টা বিশেষ ভাবে হইতেছে এজন্য এই সম্মেলন বঙ্গবাসীর আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

তালতলা সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত

স্বর্গীয়া মনোরমা দেবী

শ্রীসুকন্যা দেবী

বিগত শ্রাবণ মাসে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মনোরমা দেবী পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন।

তিনি বাঁকুড়া জেলার কুমার ডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় হারাধন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা। ১২।১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বাল্যকালে পিতৃগৃহে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। বিবাহের পর স্বামীর নিকট হইতে ইংরাজী এবং বাংলা ও আরো কিছু শিখিয়াছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়স হইতেই উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর মত স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সম্পদে বিপদে শক্তি ও উৎসাহ দিতেন। মনোরমা দেবীর চরিত্রে একটা অসামান্য তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা ছিল। এই তেজস্বিতা তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ও অক্ষুন্ন ছিল। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন তখন ও মনোরমা দেবী সমস্ত বিরুদ্ধবাদের মধ্যে স্বামীকে শক্তি ও সাহস দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট দৈহিক ও মানসিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল কিন্তু তিনি স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের বলে সে সমস্ত তুচ্ছ করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের দুই কি আড়াই বৎসর পরে যখন শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় প্রয়াগের প্রিন্সিপালের পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পরিচালনার কার্য্য গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার এই কার্য্যে মনোরমা দেবী প্রধান উদ্যোক্তা হন। আজ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে মনোরমা দেবীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

মনোরমা দেবী শুধু আদর্শ গৃহিণী ছিলেন না, তাঁহার চরিত্রে আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব স্নেহশীলতার এবং আদর্শ মাতার কি চমৎকার সমাবেশ দেখিতে পাই।

প্রয়াগে এবং বাঁকুড়ায় ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বহু অতিথি তাঁহার গৃহে আহার করিয়াছেন। শুধু তাহাদের ভোজন করাইয়াই তিনি তৃপ্ত হন নাই; আবশ্যক মত যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতে ও কুণ্ঠিত হন নাই। সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা সঞ্চয় করিতেন তাহা দিয়া দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনের সাহায্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

তিনি নিজের সন্তানদের এবং পৌত্রী দৌহিত্রীদের অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও বলিয়াছিলেন, "নাতনীর দেওয়া শাড়ীটা আমার পরিয়ে দাও।"

তিনি সংসারের সমস্ত কাজে খুবই ব্যস্ত থাকিতেন কিন্তু ইহারই ভিতর তিনি সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ইত্যাদি শিখাইতেন। ছেলে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সংসারের অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হইলে ও তিনি তাঁহার বড় ও মেজ ছেলেকে কেম্ব্রিজে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। সাংসারিক অস্বচ্ছলতা সত্বেও তিনি পুত্র ও কন্যার শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা শুধু মনোরমা দেবীর মত স্নেহশীলা মাতার পক্ষেই সম্ভব।

সারাটা জীবন তাঁহাকে সাংসারিক নানা বিপর্য্যয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যও তাঁহাকে কর্ত্তব্য বিমুখ করিতে পারে নাই। তিনি "আত্মীয় বন্ধু কাহারও সেবা সহজে গ্রহণ করেন নি"। কি অর্থ কি সেবা তিনি কখনও পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গ্রহণ করেন নাই।

'প্রিয়-বিচ্ছেদ দুঃখই তাঁহার সব চেয়ে বড় ছিল—' জীবনে আর কোন দুঃখই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। কনিষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত সে স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া আসিল না।

"পর মুখাপেক্ষী না হওয়া কোন অপমান বরদাস্ত না করা" বিপদে অসীম ধৈর্য্য তাঁহার যথার্থ জীবন ছিল। যশ ও ঐশ্বর্য্যের মোহ তাঁহার ছিলনা। অভাব তাঁহাকে কোনদিন বিচলিত করিতে পারে নাই। সুখে দুঃখে অভাব ঐশ্বর্য্যে তাঁহার সর্ব্বজয়ী শুভ ইচ্ছা ও কল্যাণ হস্তে এবং কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় তিনি এক আদর্শ পরিবার গঠন করিয়া গিয়াছেন। আজ সংসারের কাজে তাঁহার অভাব খুবই অনুভূত হইবে কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন, চিরহাস্যময় কল্যাণ দৃষ্টি তাঁহার অসীম স্নেহের পরিবারবর্গকে ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুরে গুপ্তচরের কুকীর্ত্তি

জরুরী আইন সমূহ যাহাতে স্থায়ী আইনে পরিণত করা যায় সরকারের দিক হইতে সে বিষয়ে একটা চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ, দেশের অবস্থা বর্ত্তমানে যেরূপ, তাহাতে অনেক মনস্বী অস্থায়ীভাবে এই আইন থাকিলেও ইহার অনেক অপব্যবহারের আশঙ্কা করেন, সম্প্রতি মেদিনীপুরের বোমার মামলায় তাঁহাদের আশঙ্কার যে ভিত্তি আছে, উহা সপ্রমাণিত হইয়াছে।

তিনজন পুলিশের গুপ্তচর বোমা তৈয়ার করিয়া এবং কোন সরকারী কর্ম্মচারীর জন্য উহা প্রস্তুত, লিখিয়া এক ভদ্রলোকের বাগানে রাখিয়া দেয়, পরে ভদ্রলোকের বাড়ী খানাতল্লাস করাতে বোমা আবিষ্কৃত হয় এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় ধৃত হয়, বিচারে সৌভাগ্যবশতঃ গুপ্তচরদের কীর্ত্তি প্রকাশ পায় ও যুবকদ্বয় খালাস পান।

জরুরী অস্ত্র আইন অনুসারে এই মামলার ষড়যন্ত্র ধরা না পড়িলে যুবকগণের প্রাণদণ্ড হইতে পারিত, সুতরাং গুপ্তচরগণের কার্য্যে যে কতদূর ঘৃণিত ও ভয়াবহ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ ঘটনা কত যে অপ্রকাশে থাকিয়া যাইতে পারে তাহাও ভাবিবার বিষয়।

বিচারে গুপ্তচরগণের দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে, অপরাধের তুলনায় অতি লঘুদণ্ড হইয়াছে।

নাবালক ও নাবালিকার বিবাহ

দিল্লীর বদ্রীদাস শেঠ নাবালিকার সহিত তাহার নাবালক পুত্রের বিবাহ দিয়া সারদা আইনের কবলে পড়েন, বিচারে দেড়শত টাকার অর্থদণ্ড দিয়া তিনি অব্যাহতি পান। শেঠ মহাশয় লক্ষপতি, এই দণ্ড তাহার নিকট প্রহসন মাত্র। ধনী আইন ভঙ্গকারীগণ কিরূপে অনায়াসে সারদা আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে পারেন, ইহা তাহার একটী উদাহরণ, বৃটিশরাজ্যের সীমান্তের বাহিরে গিয়াও অনেকে এইরূপ নাবালকের বিবাহ দিতে পারে। নিঃসন্দেহে সারদা আইনের পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তিলাভ

১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে বন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তিন বৎসর বন্দীজীবন যাপন করার পরে তাঁহার আকস্মিক মুক্তিলাভে দেশবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন, যে সব রাজবন্দী এখনও জেলে আছেন/সরকার তাঁহাদের কথা বিবেচনা করিতেছেন মনে করিয়া দেশবাসী এই ঘটনায় আশান্বিত হইয়াছেন।

পরলোকে নিবারণ দাশগুপ্ত

৺ নিবারণ দাশগুপ্তের মৃত্যুতে দেশ একজন অকৃত্রিম স্বদেশপ্রাণের সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল ও কর্ম্মী লোক বাংলা দেশে অতি কমই দেখা যায়। পুরুলিয়ার বিদ্যালয় ও শিল্পভবন তাহার সেবা-দানে পরিপুষ্ট। আমরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি।

জাপানী ব্যবসায়ীর প্রতারণা বুদ্ধি

কাপড়ের ব্যবসায়ে ট্রেড্ মার্কের ফাঁকি দিয়া জাপানীগণ লাভবান্ হইতে চেষ্টা করিয়াছে, মোহিনীমিলের কর্ত্তৃপক্ষ সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের আর একটী নূতন প্রতারণার কথা জানা গিয়াছে। বিদেশাগত রেশমীবস্ত্রের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসে, এই শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য জাপানী ব্যবসায়ীগণ 'ফেণ্ট' নামে প্রচুর বস্ত্র এদেশে আমদানী করিতেছে। 'ফেণ্টের' জন্য ছেঁড়া বা কাটা বস্ত্র হিসাবে শুল্ক মাত্র গজ প্রতি দুই পয়সা দিতে হয়, অপর পক্ষে কৃত্রিম রেশমী বস্ত্রের শুল্ক তিনখানা। ইহাতে ব্যবসায়ীগণ প্রচুর লাভ করিতেছে কারণ বস্তুতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, 'ফেণ্ট' নামে প্রেরিত অধিকাংশ বস্ত্রেই কোন কাঁটা ছেঁড়া বা দাগ নাই।

দেশের বস্ত্রশিল্প রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে এই প্রতারণা নিবারণ করা প্রয়োজন।

হাসপাতালে প্রসূতির দুরবস্থা

বিগত ৪ঠা শ্রাবণের আনন্দবাজারে ৪।১নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র হালদার এবং এ পত্রিকার-ই পরবর্ত্তী এক সংখ্যায় ৪৬নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শীল মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের আত্মীয়াদিগকে কলিকাতার কয়েকটী হাসপাতালের সূতিকাগারে ভর্ত্তি করাইতে কিরূপ অবর্ণনীয় কষ্ট পাইয়াছেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলায় কয়েকটী অমূল্য প্রাণ কিরূপে অকালে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে জানাইয়াছেন এরূপ কত ঘটনা যে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই, খবরের কাগজে আমরা দুই একটীর সংবাদ মাত্র জানিতে পারি। ঘটনাগুলি অত্যন্ত শোকবহ, বাঙ্গালী মায়েরা এখনও হাসপাতালে অভ্যস্ত হইয়া ওঠেন নাই, সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সূতিকাগারে কেহ আত্মীয়াকে ভর্ত্তি করিতে যান না, তাঁহাদের ভর্ত্তি করিতে অযথা বিলম্ব করা ও তাহাদের ফেরৎ দিয়া নানাস্থানে যাইতে বাধ্য করা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। সভ্য-জগতে শিশু ও প্রসূতি শ্রেষ্ঠ যত্ন ও সেবা পাইয়া থাকে, আমাদের দেশে এক চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ব্যতীত এদিকে আমাদের গর্ব্ব করিবার হয়তো কিছু নাই, অধিকাংশ হাসপাতালেরই এ বিষয়ে ঔদাসিন্য দেখা যায়; প্রত্যেক হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ যদি মনোযোগী হন, তাহা হইলে অবস্থার তবুও অনেক উন্নতি হইতে পারে।

দেশে যাহাতে আরও অধিক সংখ্যায় প্রসূতি ও মাতৃ-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, সে দিকে ও জন সাধারণের সচেষ্ট হইতে হইবে।

পরলোকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিপান্ন বৎসর বয়সে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যু মুখে পতিত হন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরের ও গানের ভাণ্ডারী ছিলেন, কবির প্রতি অনুষ্ঠানে তিনি তাঁহার পরম সহায়ক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গান বাংলাদেশে যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে তাঁহার মূলে ছিলেন এই সুরশিল্পী। তাঁহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য ও ছিল অপরিসীম। বাংলার সঙ্গীত জগৎ তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

শ্বেতাঙ্গের আবদার

সিমলায় দুইজন [illegible] কর্ম্মচারী মিঃ টি এম্ পাল ও মিঃ ফোড প্রতিবেশী রূপে অবস্থান করেন। মিঃ পালের বাড়ী কোন উৎসবে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় নৃত্যগীতের ব্যবস্থা ছিল, প্রকাশ মিঃ ফোর্ড তাঁহার পুত্রের ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া প্রতিবেশীর বাড়ীর ছাদে প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। এবং এই বিষয়ে অনুযোগের উত্তরে জানান যে তিনি শ্বেতাঙ্গ, সুতরাং কৃষ্ণাঙ্গের নৃত্যবাদ্য বন্ধ করিবার অধিকার তাঁহার আছে। প্রস্তর নিক্ষেপেই যে তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন, ইহাও আশ্চর্য্য।

কালীঘাটে ছাগহত্যা নিবারণে অনশন

জয়পুর রাজ্যের পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা দেবদেবীর নিকট কু-সংস্কারবশে যে সমস্ত নিরীহ পশুদের বলি দেওয়া হয়, তাহা বন্ধ করিবার জন্য তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ২৩ দিন যাবত অনশন করিয়া তিনি কাথিয়াড়ের মাংবোল নামক স্থানে গো-হত্যা নিবারণ করিয়াছেন। আগামী ১৪ই আগষ্ট তিনি কলিকাতায় আসিয়া অনশন আরম্ভ করিবেন। এবং যদি কালীঘাটে জীবহত্যা বন্ধ না হয়, তাহা হইলে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অনশনব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তিনি দেহত্যাগ করিবেন। বলির নৃশংস প্রথা বন্ধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা মহাপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। নিরীহ জীবদের হত্যা করিয়া অধর্ম্মই হয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব ও পরে শ্রীচৈতন্য, ধর্ম্মের নামে নিরীহ পশু হত্যা বন্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আজও তাহা বন্ধ হইল না। এই নৃশংস প্রথা ধার্ম্মিকের প্রাণে আঘাত করে। ধর্ম্মের নামে এরূপ অধর্ম্ম যাহাতে উঠিয়া যায় সকলেরই দেখা কর্ত্তব্য।

সহিদ্‌গঞ্জে মুসলমানগণ

শিখগণ হাইকোর্টের আদেশের পর লাহোরের গুরুদ্বার সংলগ্ন মসজিদটী ভাঙ্গিয়া ফেলে, এই মসজিদের পরিবর্ত্তে শাহ চেরাগ মসজিদ সরকার মুসলমানদের প্রদান করেন। কিন্তু মুসলমানগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া গুরুদ্বার দখলের সংকল্প করে, বর্ত্তমান সহিদ্‌গঞ্জ ব্যাপারের এই কারণ। পাঞ্জাব সরকার যথেষ্ট দৃঢ়তার সহিত ব্যবস্থা করিতেছেন কিন্তু দিন দিনই অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান ভেদ নীতির ইহাই বিষময় পরিণাম। প্রশ্রয়ে অসঙ্গত আবদার বাড়িয়াই চলে।

পূজার সংখ্যা

আশ্বিন সংখ্যা জয়শ্রী ২০শে ভাদ্র ও কার্ত্তিক সংখ্যা জয়শ্রী পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। লেখিকাগণ ও বিজ্ঞাপন দাতাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধ বিজ্ঞাপনাদি আশ্বিনের জন্য ১০ই ভাদ্রের মধ্যে ও কার্ত্তিকের জন্য ২০শে ভাদ্রের মধ্যে আমাদের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

ডাকমাশুল

আমাদের কার্য্যালয়ে প্রায়ই বহুসংখ্যক চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদিতে যথোচিত টিকিট থাকে না, উহাতে আমাদের অতিরিক্ত ডাকমাশুল দিতে হয়, সাধারণতঃ বুকপোষ্টেই এরূপ হইয়া থাকে, যাঁহারা প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্র প্রেরণ করেন তাঁহারা একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলে আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উন্নতি

এই ব্যাঙ্কের ১৯৩৫ সনের ষান্মাসিক একটী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে গত বৎসরের আনীত ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৭ শত ২৪ টাকা সহ এই ছয় মাসে এই কোম্পানীর মোট লাভ হইয়াছে ১৭ লক্ষ, ৪৭ হাজার ৬ শত ২২ টাকা। ইহা হইতে কোম্পানী অংশীদারগণকে শতকরা ৬৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দিয়া বাকী ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার ২ শত ২৬ টাকা তহবিলে জমা রাখিবেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এই উন্নতিতে সকলেই আনন্দলাভ করিয়াছে।

নাছোড়বান্দা

বিজ্ঞানের যুগের আমরা লোক। আমরা চাই তথ্য। আমার চাই শুষ্ক হিসাব। পরিচিত সত্যেরও অনেক সময় আমরা প্রমাণ দাবী করি। অবশ্য অত্যন্ত কষ্টার্জ্জিত হলেও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অন্ধবিশ্বাসের চেয়ে সব সময়েই মূল্যবান ; সে অন্ধবিশ্বাস যত গভীরই হোক, রূঢ় বাস্তব সত্যকে জানবার এই আগ্রহ আমাদের যুগের মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য।

চা-পান সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তার গুণগান করবার জন্যে দীর্ঘ কোন প্রবন্ধের প্রয়োজন হয় না। নিজগুণেই সে সমাদৃত। এ বিষয়ে চা-রসিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তা না হ'লে এ দেশে বৎসরে বৎসরে হাজার হাজার নতুন লোক চায়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'ত না।

চা সম্বন্ধে কুসংস্কারের বশে যারা নিন্দা করে তাদের কথা শুনে সাধারণ দেশবাসী একটু বিস্মিতই হয়। সন্দেহ হয় যে এই সমস্ত সমালোচক বোধ হয় কোনো দিন একটু কষ্ট করে ভালো দেশীয় চায়ের স্বাদ জানবার চেষ্টা করে নি। সুখের কথা এই যে এ-সমস্ত নিন্দুকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং তাদের বাতিকগ্রস্ত বলেই ধরা হয়। শুধু একবার যদি তারা সুস্বাদু ভারতীয় চা পান করে বুঝত, বিশুদ্ধ ও মধুর পানীয় হিসাবে চা আমাদের জীবনে কি সৌভাগ্য এনে দিয়েছে।

মনে একবার স্থান পেলে কোন ধারণাকে দূর করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু চা-পানের অভ্যাস ভারতবাসীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর কিনা এ প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন চায়ে উপকারিতায় যথেষ্ট সুবিদিত প্রমান থাকা স্বত্বেও, সে বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা এখনো নির্ম্মূল হয়নি দেখে বিস্মিত হতে হয়। পানীয় হিসাবে ভারতীয় চায়ের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকা কি সম্ভব ? যে ফুটান জলে চা তৈরী হয় সে জল ত ফোটাবার দরুণই সমস্ত রোগ,বীজাণু থেকে মুক্ত হয়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে শরীরযন্ত্রের জন্য বিশুদ্ধতম জল গ্রহণের সব চেয়ে ভাল উপায় হ'ল দিনে-রাতে নিয়মিতভাবে কয়েক বার চা পান করা। কৃষিজাত আর কোন জিনিষকে মানুষের গ্রহণযোগ্য করার জন্যে এত সূক্ষ্মভাবে যত্ন যে নেওয়া হয় না, এ কথা ত সবাই জানে।

কুসংস্কারের বশে চায়ের যারা অখ্যাতি করে, সহজে তাদের বিলোপ না হ'লেও, যুক্তি বা সত্য কিছুই তাদের পক্ষে নেই। চা-পান সম্বন্ধে যে উৎসাহের বন্যা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল

বেগে ছড়িয়ে পড়ছে তার বিরুদ্ধে বৃথাই তারা দুর্ব্বলভাবে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞানের আলোকে কুসংস্কারের অন্ধকার দূর হবেই। সত্যকে কেউ প্রতিষ্ঠা থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

রোগের রাজা কে?

পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশ আমাদের বাংলা দেশের মত অজ্ঞতা ও রোগদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অযথা জনশক্তি ও জাতির জীবনীশক্তি নষ্ট করে না। শুধু বাংলা দেশে ৯০ হাজার গ্রামের তুলনায় ১৩৫টী মাত্র সহর হইলেও পল্লীর লোকেরা রোগে প্রপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ সহরের দিকে দৌড়াইতেছে। এরূপে ছোট ছোট সহরগুলি রুগ্ন লোকদ্বারা পূর্ণ হইয়া পীড়িতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নগরে ৩২ লক্ষ লোক বাস করে, বাকী সব গ্রামে। আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তার পল্ রাসেল অন্যান্য রোগ অপেক্ষা কেবলমাত্র ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষে ১০ লক্ষ নরনারীরা মৃত্যুর কারণ বলিয়া, ইহাকে রোগ সমূহের রাজা বলিয়াছেন।

মশা না থাকিলে ম্যালেরিয়া হইতে পারে না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের ন্যায় ইহা বাতাসের দ্বারা বিস্তারিত হয় না, যক্ষ্মার ন্যায় ধূলিকণার দ্বারা ইহা সংক্রামিত হয় না, টায়ফয়েডের ন্যায় ইহার বীজাণু জলের মধ্যে চলা ফেরা করে না। ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের জন্য ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মশার উপরে নির্ভর করিতেই হইবে। স্যার রোনাল্ড রস ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মশার সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ প্রথম আবিষ্কার করেন। বাংলার বিভিন্ন জলাভূমিতে শত শত প্রকারের মশা জন্মায়। রসের পর আর একজন ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্রাসি দেখান যে, অধিকাংশ মশা ম্যালেরিয়া বিস্তার করিতে পারে না। বরং ইহারা ম্যালেরিয়া বীজাণুযুক্ত রক্তপান করিলেও এই বীজাণুগুলি ইহাদের শরীরের মধ্যে মরিয়া যায়। কেবলমাত্র এনোফিলিস জাতীয় মশার দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তার হয়।

এই এনোফিলিস জাতীয় মশা বহু বিভাগভুক্ত হইলেও তাহাদের জন্মস্থান, রীতিনীতি ও প্রকৃতিতে স্বাতন্ত্র্যভাব দৃষ্ট হয়। ফিলিপাইন দেশে বদ্ধ জলে, বা ধান ক্ষেতে বা ২ হাজার ফুট উর্দ্ধস্থানে এনোফিলিস মশা জন্মায় না। কেবল মাত্র পাহাড় হইতে নির্গত ছোট ছোট ঝরণাগুলিতে জন্মায়। বোম্বাই প্রদেশে পাতকুয়া বা চৌবাচ্চা, বদ্ধ ঘর বা বদ্ধ জলের মধ্যে স্ত্রী এনোফিলিস ডিম পাড়ে। লঙ্কা দ্বীপে গ্রীষ্মকালে নদীর জলে কম হইলে বালুভূমি বা পাহাড় জমিতে ইহারা ডিম পাড়ে। এজন্য ইহাদিগকে Pool breeder বলে। গত বৎসর ঐ দ্বীপের একটী স্থানে ভয়ানক জল কষ্ট হওয়ায় নদনদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে নদী গহ্বরে এরকম পুল সৃষ্টি হওয়ায় অত্যধিক সংখ্যায় এনোফিলিস মশা জন্মায়। ইহার পরিণাম যে কি ভীষণ হইয়াছিল, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বাংলা দেশে সব জেলায় ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ দেখা যায়। বিশেষতঃ বর্ষার পর পরে ঘরে সকলের মধ্যে এ রোগের প্রাবল্য হেতু রোগীরা রক্তহীন, নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য

হইয়া পড়ে। বহুকাল রোগ ভোগের পরও পুনরায় আক্রমণের ভয় থাকে। যখন আমাদের সমস্ত ম্যালেরিয়া বীজানুবাহী মশা মারিবার ক্ষমতা নাই, তখন আমাদের এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিৎ যাহাতে আমরা এ রোগের পুনরাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাই "রচিটোন" একার্য্যে অতুলনীয়। ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াশক্তি ও অনেক প্রকার সুবিধা আছে। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর "রচিটোন" ব্যবহারে রক্তের লাল কণিকা পুষ্ট হয় বলিয়া রক্তাল্পতা দূর হয়, স্নায়ুমণ্ডলী পুষ্ট ও সতেজ হয়। ইহাতে শরীরে স্ফূর্ত্তির ও বলের সঞ্চার হয়। অন্ত্রনালীর ক্রিয়া ভাল করে বলিয়া ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। "রচিটোন" নিয়মিত সেবনে নষ্ট জীবনীশক্তির পুনরুদ্ধার তো হয়ই, উপরন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের পুনরাক্রমণ ভয়ও নিবারিত হয়।

ডাঃ কে, মুখার্জ্জি, এম্-বি

Printed & Published by Bibhabati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

শারদ-প্রভাত

শ্রীঅসীমা বন্দ্যোপাধ্যায়
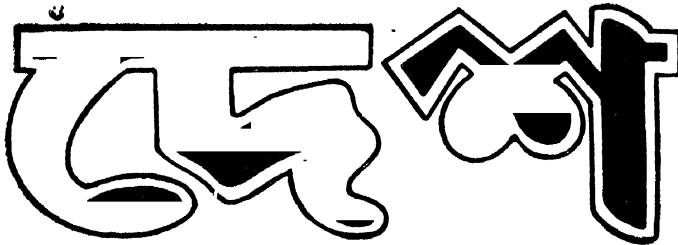
পঞ্চম বর্ষ || আশ্বিন, ১৩৪২ ষষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ

জগতের অন্তরে বাহিরে আনন্দের সৌন্দর্য্যের এক চিরন্তন স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই 'মন্দাকিনী নির্ঝর শীকরেই' প্রত্যেক পদার্থ সজীব হইয়া পূর্ণতার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে।

পৃথিবীর ভিতরে বীজ লুকান থাকে। বর্ষার বৃষ্টি ও সূর্য্যালোক যখন ধরিত্রীর দ্বারে আঘাত করে তখন সে আর লুকাইয়া থাকিতে পারে না। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসে। সেদিন হইতে তার আর চলার পথের শেষ নাই। মানুষের হৃদয় দ্বারেও সহসা একদিন আঘাত আসে। কোথা হইতে কে তাহাকে রুদ্ধ গৃহ হইতে বিশ্বের সাথে যোগ করিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছে· সে তাহা বুঝিতে পারে না সে সব দিক হইতে একটা আকর্ষণ অনুভব করে আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতই আনন্দালোকে তাহার মন উদ্ভাসিত হয়।

কিন্তু কে তাহাকে আনন্দ দিতেছে, সেই আনন্দ স্রোতের উৎসই বা কোথায় সে তাহা বুঝিতে পারে না।

স্রষ্টা 'রস' পূর্ণ করিয়া দিতেছেন জলপূর্ণ কুম্ভের মত, সকলে চক্ষু দিয়া দেখিল, মন দিয়া কেহ তাহা জানিল না।

"উর্দ্ধংভয়ন্তমুদকং কুম্ভেনেবোদহার্য্যম্।
পশ্যন্তি সর্ব্বে চক্ষুষান্ সর্ব্বে মনসাবিদুঃ —অথর্ব্ববেদ

মনদিয়া আত্ম-সমাহিত ভাবে জানিতে পারে ভাবুক কবি।

রাত্রির তমসা বরণ ভেদকরিয়া ঊষা যেরূপ বাহির হইয়া আসে সেইরূপ ভাবুকের অন্তর্জগতের সীমার আবরণ একদিন খসিয়া পড়ে। তাঁহার সম্মুখে অসীমের রাজ্য উদ্ঘাটিত হয়। সে স্পষ্ট দেখে দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপীয়া এক অপরূপ আলো ঝলমল করিতেছে; আনন্দ ও রূপের বন্যা উদ্দাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে আর মহেশ্বরের মহান পাগল করা গানের সুর 'তপন তারা চন্দ্রে' বাজিয়া উঠিয়াছে, ছয় ঋতু সেই গানে নৃত্যে মাতিয়া উঠায় ধরাতে বর্ণের গন্ধের প্লাবন বহিয়া যায়, মানবের মন তখন 'ময়ূরের মত নাচিয়া উঠে' তাহার 'শত বরণের ভাব উচ্ছাস কলাপের মত' বিকশিয়া উঠে।

এই সব ভাবুকের নিকট জগৎ মিথ্যা নয় নিশার স্বপন বলিয়া তাহারা ইহাকে উপেক্ষা করেন না। ইহার সুখ দুঃখ আশা নিরাশা প্রেম বিরহকে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করেন কিছুকেই বাদ দেন না। কারণ সকলের মধ্যেই তাঁহারা আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করেন। বিশ্বের সাথে নিজের অস্তিত্বের যে নিবিড় যোগসূত্র আছে একথা মনপ্রাণ দিয়া বিশ্বাস করেন।

রবীন্দ্রনাথ ও এইরূপ একজন ভাবুক কবি। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ভাবুক আছেন যাঁহাদের নিকট জীবন রাত্রির একটী দুঃস্বপ্নের মত, পৃথিবী তাঁহাদের নিকট দুঃখময়। পৃথিবীর কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিবার সময় যখন তাঁহারা ক্ষত বিক্ষত হন তখন তাঁহাদের অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। অবিশ্বাসের কালোছায়া তাঁহাদের আবৃত করিয়া রাখে চতুর্দ্দিকেই অগণিত পদার্থ আছে যখনই তাহা গ্রহণ করিতে যান তখনই দেখেন তাহা ব্যথায় পূর্ণ, দুঃখের বিষে তাহাদের কণ্ঠনীল হইয়া যায়। স্রষ্টার বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না এই সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি মাঝে তাঁহাদের আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাকে তাঁহারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গ্রহণ করেন। অনেকে আত্মহত্যা করিয়া সবজ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছেন।

তাঁহাদের কানে অবিশ্রান্ত বাজিতে থাকে,

"Time fleets, youth fades, life is an empty dream;
This is the echo of Time"

রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদের কবি। কিন্তু কবি প্রথমে সেই অপরূপের সাথে অসীমের সাথে যোগ স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি আপনাতে আবদ্ধ থাকিয়া আলোর রাজ্য হইতে আঁধারে

আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু একদিন সেই গভীর আঁধারে, বিজন হৃদয়ে বৃহতের আহ্বান আসিল। কবির সুপ্তচিত্তের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কবি 'অহং' এর বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভূমার মহিমা উপলব্ধি করিলেন, তাঁর জাগ্রত প্রাণ বলিয়া উঠিল,

"আজি এ-প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল 'প্রাণের' পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!
নাজানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ!"

জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের সাথে সাথেই যাহাকিছু পূর্ব্বে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ছিল তাহাই সেদিন বৃহৎ বলিয়া ধরা দিল, সেদিন গভীর ভাবে উপলব্ধি করিলেন, এক সর্ব্বব্যাপী আত্মার মহিমা নিজেকে আর কিছুতেই দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিলেন না। কবির সেদিন জীবন-প্রভাত হইল আনন্দে তাঁর নবজন্ম হইল, কবি বলিলেন,

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলো খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরার আছে যতো মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।"

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে ভালবাসিয়াছেন। পৃথিবীকে মিথ্যা বলিয়া বৈরাগ্যকে গ্রহণ করেন নাই। তাই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ইহার মানুষগুলি ও তাহাদের প্রেম তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে; কবি তখন পৃথিবী 'প্রাণহীন মাটি' মনে করেন নাই, তাহার ভিতরেও যে সেই স্রষ্টার লীলা চলিয়াছে তাহা অনুভব করিয়াছেন।

তখন বলিয়াছেন—

"হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা,
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা!"

কখনও বলিয়াছেন,

'আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,

বিপুল অঞ্চল তলে ! ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত ;—

* * *

তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃ মণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্তর ধরি ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ ক'রেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধ রেণু ;—"

নিজের স্বাতন্ত্র্য দুর করিয়া বিশ্বের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া কবি বলেন,

"মানব আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধ শ্যাম মাতৃমুখ পানে ;
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।"

কবির সাথে পৃথিবীর সম্বন্ধ ত একজীবনের নয় জন্মজন্মান্তরব্যাপী। ধরিত্রীর প্রতি ধূলি-কণার সাথে প্রতি তৃণলতার সাথে তাঁর যে কত বড় নিবিড় বন্ধন তাহা নিম্নের পত্র খানি হইতে জানিতে পারি।

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজঘাস উঠ্‌ত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য্য কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোম-কূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাক্‌ত, আমি কত দূর দূরান্তর, দেশ দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে' উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাক্‌তেম, তখন শরৎ সূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটী আনন্দ রস, যে একটী জীবনী শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধ-চেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এযেন এই প্রতিনিয়ত, অঙ্কুরিত মুকুলিত, পুলকিত সূর্য্য-সনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব, যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক মাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌চে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্ থর্ করে কাঁপছে।" কবি পৃথিবীকে তীর্থ

স্থানের মত মনে করিয়া বলিয়াছেন, 'দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ ধরণীর ব্যর্থতম প্রাণ।"

তাই কবি বাঞ্ছিত অমৃতময় স্বর্গের মায়া ত্যাগ করিয়া সুখদুঃখময় পৃথিবীতে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

স্বর্গ ভূমিতে দুঃখ নাই কারণ সেখানে পূর্ণতা আছে তাই সেখানে চিরন্তন আনন্দ আছে সুতরাং সেখানে কেহই কিছুরই অভাব বোধ করেনা। স্বর্গের দেবতারা শোকহীন হৃদিহীন উদাসীন দেবলোক হইতে যখন পরপারের ঢেউ মানবকে ধরিত্রীর উদার বক্ষে ভাসাইয়া আনে তখন জীর্ণতম খসেপড়া পাতার জন্য অশ্বত্থ শাখার যতটুকু ব্যথা বাজে ততটুকুও স্বর্গ অনুভব করেনা।

এই জন্যই কবি চির-যৌবনা 'অপূর্ব্ব শোভনা' উর্ব্বশীর নৃত্যমুখরিত সুর-সভাতল ত্যাগ করিয়া প্রেম-পূর্ণ পৃথিবীর কোলে ফিরিতে চাহিয়া বলিয়াছেন,

"থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান,
দেবগণ, স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান
মোরা পরবাসী, মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে-যে মাতৃভূমি—তাই তা'র চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু-দিনের পরে
কেহ তারে—ছেড়ে যায় দু-দণ্ডের তরে,
যতো ক্ষুদ্র যতো ক্ষীণ যতো অভাজন
যতো পাপী তাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গনে
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর! স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত,
মর্ত্তে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চির শ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি!"

কবি পৃথিবীর প্রেম বিশ্বাস করেন। নারীর প্রেমে তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে কিন্তু কবি নারী প্রেমের ভিতর দিয়া অসীমের স্পর্শ অনুভব করিলেন।

কবি প্রিয়াকে বলিলেন—

"যখন তোমার পরে পড়েনি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন"

ধীরে ধীরে যখন সে মনোমন্দিরে প্রবেশ করিল তখন কি আশ্চর্য্য! প্রিয়ার সাথে বিশ্বের যে একাকার হইয়া গেছে।

"তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে"

বিশ্বকে শুধু যে বুঝিতে পারিলেন তাহা নহে, প্রিয়ার মুখে জগদীশ্বর স্বীয় রূপ দর্শন করিতেছেন,

"নিত্যকাল মহাপ্রেম বসি বিশ্ব-ভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্ম-প্রতিরূপ।"

প্রিয়ার বিরহে আকুল ভাবে বলিতেছেন,

"আজি সে অন্তর বিশ্বে আছে কোন্ খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়নে"

প্রিয়ার প্রেম ইন্দ্রধনুর মত একদিন অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আজ সে কোথায়? তাহার সৌন্দর্য্য সান্ধ্যকালীন মেঘের মত তাঁহার চিত্তাকাশে কত ভাবেই না রঞ্জিত করিয়াছিল তার অভাবে জীবন "গীত শূন্য" অবসাদপুরে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

কিন্তু কবির এই ভাবনা সহসা টুটিয়া গেল দেখিলেন,

"যেন তার আঁখিদুটি নভ নীলভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।"

এই ভাবেই কবি প্রেমের ভিতর দিয়া অসীমের সাধনা করিয়াছেন।

এ প্রেমকে তিনি কোনমতেই তুচ্ছ করিতে পারেন না ধরিত্রী যে সৌন্দর্য্যের আনন্দের পরিপূর্ণ ভোগের পাত্রখানি উপস্থিত করিয়াছে কবি তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না। ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ।

পৃথিবীর প্রেমের মধ্যদিয়াই ভূমার পরিচয় পাওয়া রূপের মধ্যেই অপরূপকে প্রত্যক্ষ করা তাঁহার মুক্তি সাধনা। বৈরাগ্যের প্রেরণা তাঁহাকে উদ্বোধিত করিতে পারে নাই।

"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধকরি, যোগাসন, সে নহে আমার,
যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দরবে তা'র মাঝখানে।

মোহমোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেমমোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া"

অনন্তকে উপলব্ধি করিতে হইলে বিশ্বকে প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না। যে মহাতরিতে কোটি কোটি যাত্রী যাত্রা করিয়াছে সেখান হইতে সাঁতার দিয়া অসীম সাগর পার হওয়ার কল্পনা বৃথা।

"হে বিশ্ব, হে মহাতরি, চলেছ কোথায় ?
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে !
একা আমি সাঁতারিয়া পারিবনা যেতে !
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে !
যেপথে তপন শশী আলো ধরে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে !
... ...
পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া ;
যত ওড়ে—যত ওড়ে, যত উর্দ্ধে যায়,
কিছুতে পৃথিবী তবু পারেনা ছাড়িতে
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে !"

পৃথিবীতে এমন অনেক খ্যাত অখ্যাত লোক আছেন যাহারা ক্ষণেক জীবনের দিনগুলিকে অলীক মনে করিয়াছেন। পৃথিবী তাহাদের নিকট নশ্বর।
জগতের চতুর্দ্দিকে তাঁহারা মায়ার জাল দেখিতে পান এবং আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকারে উহা এড়াইয়া চলেন। কিন্তু কবি যখন পৃথিবীর নীলাকাশ, পৃথিবীর আলো, সিন্ধুতীরের সুদীর্ঘ বালুকা তট, বিচিত্র শোভা শস্য ক্ষেত্র, গ্রহ তারাময়ী নিশি, 'তরু শ্রেণীর মাঝারে নিঃশব্দ অরুণোদয়' দেখিয়াছেন তখন তাহার মধ্যে দেখিয়াছেন বিশ্বেশ্বরের বিভূতি।

কবি তখন মুগ্ধভাবে বলিয়াছেন

"আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ওকে ?
সে-সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা ভ'রে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধ'রে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখীরা পাখায় তা'রে নিল এঁকে।"

'বিশ্ব জুড়ে উদার সুরে' যিনি আনন্দ গান শুনিয়াছেন তাঁহার নিকটত কিছুই তুচ্ছ নহে মায়া বলিয়া যাহারা সেই অচ্ছেদ্য জালকে ছেদন করিতে চাহিয়াছেন কবি তাহার ভিতরেই ধর্ম্মের অনুভূতি পাইয়াছেন—

"বুঝিলাম ধর্ম্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ,—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্ব্বাদ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্ব্ব সমর্পণ। ধর্ম্ম বিশ্ব লোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেম ক্রোড়ে—সে মহা বন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে!"

আমরা ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম মানে যাগ নয়, পূজা নয়, ধর্ম্ম মানে যজ্ঞ বা ভোগ দেওয়া নয়, ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি, ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে বিশ্বসত্বার অনুভূতি ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের প্রতিচ্ছবি দর্শন।"

ধর্ম্ম পিপাসায় ভক্ত জীবনেশ্বরের খোঁজে সংসার ত্যাগ করিলে তিনি বলেন,

"হায়
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?"

কবি জীবন তরী বাহিয়া দীর্ঘ দিন পরে পরপারের অস্পষ্ট ক্ষীণ রেখা দেখিতে পাইয়াছেন, সেখানে পূরবীতে অতি করুণভাবে 'শেষ রাগিণীর বীণ' বাজিয়া উঠিয়াছে—

ধরণীতে প্রাণের খেলায় যারা 'আপন হিয়ার পরশ দিয়ে' কবির হৃদয়ে "সাঝ সকালে গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো" সেই অতি প্রিয়তম মানুষগুলির নিকট হইতে অসীমের পথে মহা সুদূরে যাত্রার পূর্ব্বে স্তিমিত আলোকে কবি বলিয়াছেন,

"এই যে দেখা এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়,
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে

পূণ্য ধরার ধূলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালোরে ফলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

তার পর মৃত্যু দেবতাকে চরম দিনে 'জীবনের সব সঞ্চিত ধন'—'সব আয়োজন' উপহার দিবার পূর্ব্বে কবি পূর্ণ তৃপ্তির সহিত বলিলেন—

"যাবার দিনে এই কথাটি
ব'লে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি—
তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃ সমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্মরাজে
তা'রি মধু পান ক'রেছি
ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি—
জাগিয়ে যেন যাই।"

... ...

রবীন্দ্রনাথ যে সর্ব্বভূতে বিশ্ব দেবতার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাতে উপনিষদের প্রতিধ্বনি শুনি।

"সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।
তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ।
—তৈত্তিরীয়

এক অদ্বিতীয় অন্তরাত্মা সর্ব্বভূতে কিরূপ ভাবে আছেন তাহা কঠোপনিষৎ বলিতেছেন,

"অগ্নির্থ থৈকো ভুবনংপ্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতি রূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

আমরা যা কিছু দেখি বা শুনি তাহার ভিতরেই নারায়ণ আছেন

"যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতেশ্রূয়তেঽপিব্য
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্যনারায়ণঃ স্থিতঃ॥
—নারায়ণ উপনিষদ

কবি যে জগৎব্যাপী আনন্দের গান শুনিয়াছেন তাহাতেও উপনিষদের বাণী আছে

"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। এষ হ্যোবানন্দয়াতি।"

—তৈত্তিরীয়

রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িতে পড়িতে আমাদের কাণে বাজিয়া উঠে ভগবানের অপূর্ব্ব বাণী—

"যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যহিং ন প্রণশ্যামি সচমেন প্রণশ্যতি।"

—গীতা—

যাত্রা

শ্রীবাসন্তী সেন

শুভ লগনেতে নহে নহে মোর যাত্রার আয়োজন—
অশুভ লগনে বিষাদের রাতে চলা মোর প্রয়োজন।
ধূসর উষর—বন্ধুর পথ হাতছানি দেয় মোরে;
পাগল নদীর মাদল আমার হৃদয় দিয়াছে ভরে।
শুভ লগনের সুন্দর রাতে তোমার পরশ নাহি।
বিপদের রাতে নিবিড় করিয়া তোমারি আশীষ চাহি।
তোমার ভাবনা অরূপের পথে রূপলেখা দেয় আঁকি;
মলিন রজনী অমলিন হ'য়ে তাই মোরে ওঠে ডাকি।
আমার লাগিয়া জীবনের পথে সাজান রহেনি রথ—
পাহাড়ী নদীর আঁকা বাঁকা গতি হয়েছে আমার পথ!—
আমার লাগিয়া আকাশের ভালে নাইবা জ্বলিল আলো
আলোকের লাগি অবিরাম চলা সেই হবে মোর ভালো।
তোমার চরণ-চিহ্ন-উতল যেই পথ নিরঞ্জন—
সেই পথে আমি করিয়াছি মোর যাত্রার আয়োজন।

স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা ও তাহার প্রতীকার

শ্রীশ্যামমোহিনী দেবী

আজকাল দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে সকলেই অল্প বিস্তর আলোচনা করিতেছেন। দেশে সাধারণ শিক্ষার হার কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইলেও অন্যান্য উন্নতিশীল সভ্যদেশের তুলনার ইহা কিছুই নহে। ভারতবর্ষের শিক্ষার হার পুরুষদের শতকরা পাঁচ ও মেয়েদের প্রায় দুই। ইহা জাতীয় জীবনে কম দুঃখের বিষয় নয়। আজকাল বঙ্গদেশের সহরগুলিতে শিক্ষার আগ্রহ প্রবল হইয়াছে তাহার ফলে সহরে বহু স্কুল স্থাপিত হইতেছে কিন্তু পল্লীগ্রামের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিলেই চলে। অথচ জন সংখ্যায় বহুলাংশ পল্লীতেই বাস করে। কাজেই দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করিতে হইলে পল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষার দিকেই সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

এই বাংলাদেশের প্রায় ৫ কোটী লোকের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধাংশ নারী। ইহাদের মধ্যে শতকরা ২।৩ জন মাত্র লিখন পঠনক্ষম। শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে প্রায় ১৮ হাজার মেয়েদের এবং ছেলেদের প্রায় ৪৫ হাজার।

ঐ বিদ্যালয় সমূহের নিম্নতম শ্রেণীতে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ থাকে। এই বিপুল দেশের তুলনায় এই শিক্ষা কত সামান্য।

দেশে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে কেবল গভর্ণমেণ্টের প্রতি নির্ভর করিলে চলিবে না। কারণ কোন পরমুখাপেক্ষী জাতি কখনও উন্নত হইতে পারে না। এ বিষয়ে শিক্ষিত নরনারীগণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সমষ্টিগত ভাবে প্রতি সহরে সহরে ও পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

আশার কথা এই দেশের অনেকেই এবিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। মেয়েদের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাও যেমন প্রবল হইয়াছে তেমনই বহু শিক্ষায়তনও গঠিত হইতেছে। কিন্তু দরিদ্রতার জন্য আগ্রহ থাকা সত্বেও বহু মেয়ে এই সুযোগ লইতে পারিতেছে না। এজন্য বহু অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। শ্রীযুক্তা লেডী বসু মহাশয়া বিদ্যাসাগর বাণীভবন নামক এইরূপ একটী অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশে একটী মহান্ আদর্শের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৭২টী অসহায়া বিধবা শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষয়িত্রী হইয়া স্ব স্ব জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। বাংলা দেশের হিন্দু বিধবা প্রায় ২৫ লক্ষের মধ্যে ৫ লক্ষের বয়স ১৫ হইতে ৩০এর মধ্যে। ইহাদের শিক্ষা দিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিলে সমাজের একটী বিরাট অংশ দুঃখ দৈন্য হইতে মুক্ত হয় এবং দেশের বহু কল্যাণ কর্ম্মের পথ সুগম হয়।

শুধু বিধবাদের কথা ভাবিলে চলিবে না। সধবা ও কুমারীদের সমস্যাও গুরুতর। দেশব্যাপী আর্থিক দুরবস্থার জন্য মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের ক্লেশের কথা কাহারও অবিদিত নাই।

এতদ্ব্যতীত যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও বেকার। এই সকল কারণে সাংসারিক অসচ্ছলতা দুরীকরণে মানসে সধবা ও কুমারীগণও শিক্ষাক্ষেত্রে আগমন করিতেছেন। তাহা ছাড়া এখন আর কেহই সেকালের গতানুগতিক শিক্ষাদীক্ষাবিহীন অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার সন্তুষ্ট নহেন। সকলেই উন্নততর প্রণালীতে জীবন যাত্রার অভিলাষিনী। যৌথ পরিবারের ভিত্তি শিথিল হওয়াতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুত্র পরিবার লইয়া ব্যস্ত। অসমর্থ আত্মীয় আত্মীয়াগণের ভার বহন করিতে অনেকেই ক্লেশবোধ করেন। যাহা হৌক পূর্ব্বে রাজা জমিদারগণ অসহায়া আত্মীয়াগণকে যাবজ্জীবন মাসিকবৃত্তি প্রভৃতি দিয়া ভরণ পোষণ করিতেন এখনও যে না করেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারা যদি বৃত্তি না দিয়া ঐ সব মেয়েদের অর্থকরী শিল্প বা বিদ্যাশিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বিনী করিয়া দেন তবে ঐ অর্থদ্বারা অনেক বেশী জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন।

অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের কুমারী কন্যাগণের জন্য সহরে বহু উচ্চ ও মধ্য-বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। তথায় মধ্য ইংরাজী ৭ বৎসরে ও ম্যাট্রিক ১০।১১ বৎসরে শেষ হয়। উহা বহু সময় ও অর্থসাপেক্ষ বয়স্থা কুমারী সধবা ও বিধবাগণের ঐ প্রকার স্কুলে শিক্ষালাভ করা কঠিন। বয়সের পূর্ণতা ও শিক্ষায় আগ্রহ থাকা বশতঃ তাঁহাদের অত সময় দরকার হয় না। সকলের যত অধিক অর্থব্যয়ে করারও সঙ্গতি-ত নাই-ই বরং শীঘ্র অর্থোপার্জ্জন করা প্রয়োজন।

মেয়েদের পক্ষে অর্থোপার্জ্জনের জন্য শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্ম ব্যতীত আর কোন সম্মানজনক পন্থা নাই বলিলেই চলে। আর শিক্ষয়িত্রীর চাহিদাও খুব বেশী। কারণ বর্ত্তমানে বাংলাদেশে ইউরোপীয়ান স্কুলের শিক্ষয়িত্রীসহ মোট ৬৫০০ শিক্ষয়িত্রী আছে তন্মধ্যে ট্রেনিং পাশ ১২।১৩ শতের বেশী নাই। অথচ ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের জন্য শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজনীয়তাই বেশী ইহা আজকাল প্রায় সকল দেশের মনীষি ব্যক্তিগণের মত। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে এই প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি হইবে।

এই সব কারণে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে কয়েকজন কর্ম্মী ও অধ্যাপকের সহায়তায় বাণীপীঠ নামে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন করি। যাহাতে অল্পসময়ে ২।৩ বৎসরের পাঠ সমাপন করা যায় এইরূপ ভাবে শিক্ষাদান প্রণালী স্থির করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ঐ বৎসরেই খুব অল্প লেখাপড়া জানা ৩০টী মেয়েকে ট্রেনিং কোচিং ক্লাশে অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াইয়া বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পাঠানো হয়। তথায় ইহারা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ভর্ত্তি হইয়াছে ও ট্রেনিং পড়িতেছে। অন্য ক্লাসের মেয়ে সহ গত বৎসর মোট ৭২ জন ও এবার ৬০।৬৫ জন মেয়ে পড়িতেছে। ট্রেনিং কোচিং ক্লাশে এবার ৩৬ জন মেয়ে পড়িতেছে। নিম্নতম শ্রেণী হইতে ম্যাট্রিক ক্লাশের কোর্সকে ৬।৭ বৎসরে বিভক্ত করিয়া ম্যাট্রিক ক্লাশ ও খোলা হইয়াছে। কারণ ম্যাট্রিক পাশ না হইলে সিনিয়র ট্রেনিং পড়িয়া শিক্ষয়িত্রী হওয়া যায় না। এই স্কুলে গত বৎসর ১৫টী ও এবৎসর ১৫টী লোক।

অর্দ্ধবেতন ও বিনা বেতনে পড়ার সুবিধা পাইয়াছে। বিনাবেতনে পড়ার আবেদন বহু, কিন্তু অর্থ ও স্থানাভাবে আর লওয়া সম্ভব হয় নাই।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন, হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম, সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বহুদিন হইতে বিনাব্যয়ে ও অল্প ব্যয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া দেশের মহৎ অভাব দূর করিয়াছেন। কিন্তু এই বিরাট দেশের তুলনায় ইহা খুব কম। এইরূপ আরও বহু প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ও মফঃস্বলে হওয়া উচিত।

কলিকাতায় এই সব কাজে অর্থব্যয় বেশী হয় কিন্তু মফঃস্বলে এতদপেক্ষা কম ব্যয়ে বেশী মেয়ে তৈরী করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বাণীপীঠের কর্ম্মীগণ শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভা-নেত্রীত্বে "নারী-শিক্ষা-পরিষদ্" নামে একটী সমিতি গঠন করিয়া দেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতের বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষালয় ও একটী মহিলা পাঠাগার স্থাপন করার চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত কর্ম্মী ও অর্থ সাহায্য পাইলে এই কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

মহাপ্রাণ বিহারী লাল মিত্র মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে বার্ষিক ৪৮ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। ঐ অর্থ দ্বারা কয়েকটী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাকে ইউরোপ হইতে ট্রেনিং শিক্ষা দিয়া আনা হইবে শুনা যাইতেছে। ইহা মন্দনয় কিন্তু আমার মনে হয়, ঐ অর্থের কিয়দংশ ঐ কার্য্যে ব্যয় করিয়া বেশী অংশ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কল্পে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতের জন্য যদি ব্যয় হয় তবে বৎসর বৎসর শতাধিক শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হইয়া যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। লজ্জাজনক শিক্ষার হার বর্দ্ধিত হইয়া দেশ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়া যদি দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূর হয় দেশে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয় তবেই এই দেশব্যাপী অর্থসঙ্কটের সমাধান হইতে পারে।

দেশের সুশিক্ষিতা নরনারীগণ সকলে এইদিকে অবহিত হইয়া কাজ করুণ এই প্রার্থনা করি।

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী মহিলা শাখার অধিবেশনে পঠিত

গান

ওহে সুন্দর তব আবাহন তরে অপরূপ আয়োজন।
মঙ্গল গীত গাহে পিককুল—বিমোহিত প্রাণমন ॥
কুসুম সাজায় পূজার ডালি, শিশির মুছায় পথের ধূলি,
নবকিশলয়-বিজয়-কেতন উড়াল যে উপবন।
আহ্বান-বারতা লয়ে নিজ করে, পবন বিলায় প্রতি ঘরে ঘরে,
তটিনী নটিনী নাচে, তার সাথে চাঁদ নাচে অগণণ ॥

কথা—শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী   সুর ও স্বরলিপি—কুমারী গায়ত্রী দেবী

মিশ্র খাম্বাজ

তাল—একতালা

০   ১   +   ৩

II { র্রা পা জ্ঞা | পা পা পা | জ্ঞা পা ধপা | মা গা সা I
সু ০ ন্দ র ত ব আ বা হ ০ ত রে

সা গা গা | গা মা পা | গমপা গমা রগা | ন্ সা —া } I
অ .প রূ প আ য়ো জ ০ ন ০ ও হে

পা না —া | না —া না | র্সা র্সা না | ধা ক্ষা পা I
ম ০ ঙ্গ ল গী ত গা হে পি ক কু ল

সা গা গা | মা ধা পা | গমপা গমা রগা | ন্ সা —া II
বি মো হি ত প্রা ণ ম ০ ন ০ ও হে

II গা মা পা | মা না র্সা | ধা না র্সা | র্সা —া র্সা I
কু সু ম সা জা য় পূ জা র ডা ০ লি

র্সা র্সা র্সা | না ধপা পা | গমা গা মা | র্সা না —া I
শি শি র মু ছা য় প থে র ধূ ০ লি

র্সা নর্রা র্সা | ণধা পা —া | পধা গা পা | মা গা —া I
ন ব কি শ ল য় বি জ য় কে ত ন

সা গা গা | মা ধা পা | গমপা গমা রগা | ন্ সা —া I
উ ড়া ল যে উ প ব ০ ন ০ ও হে

সা —া —া | পা —া —া | ক্ষা পা গা | মা গা —া I
আ হ্বা ন বা র তা ল য়ে নি জ ক রে

গা মা পা | না —া র্সা | ধনা ধর্সা না | ধা পক্ষা পা I
প ব ন বি লা য় প্র তি ঘ রে ঘ রে

র্সা নর্রা র্সা | ণা ধা পা | পা ধা গা | পা মা গা I
ত টি নী ন টি নী না চে তা র সা থে

সা গা গা | মা ধা পা | গমপা গমা রগা | ন্ সা —া II
চাঁ দ না চে অ গ ণ ০ ণ ০ ও হে

ভারতের ধর্ম্ম

শ্রীসুলতিকা পাল

ভারতের ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করা ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, কবীর, দাদু, চৈতন্য, নানক, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রত্যেকেই ভারতের ধর্ম্মের মহিমা মন্দ্ররবে ঘোষিত করিয়াছেন। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছে। এইখানে রাজার ছেলে, রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহারই উদ্দেশে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, এবং মানবজাতির মোক্ষলাভের বাণী ঘোষণা করিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসের কথা জানি না, তবে পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত একমাত্র ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। এ দেশেরই জনক রাজা সমস্ত রাজকার্য্য করার অন্তরালে তাঁহারই শরণ লইয়াছিলেন। অতীত যুগের কথা যদি ছাড়িয়া দিই, মাত্র তিন শত বৎসর আগেকার কথা আলোচনা করি তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই, ছত্রপতি শিবাজীর হিন্দুস্থানে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল গুরুর আজ্ঞা। গুরু রামদাসের প্রতিনিধি হইয়াই তিনি শাসনকার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। এদেশের শিক্ষার আদর্শ অর্থোপার্জ্জন কোন কালেই ছিল না। পরমার্থ লাভই শিক্ষার আদর্শ ছিল, সেই জন্যই সমাজের শ্রেষ্ঠ জাতি অর্থ ত্যাগ করিয়া পরমার্থের ধ্যানে কালাতিপাত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহনের জীবনেও সকল কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ছিল প্রভুরই গুণ গাওয়া। আমরা দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নেতাগণও তাঁহাদের সকল কর্ম্মের অন্তরালে তাঁহারই আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশের যে কোন নেতারই জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার কর্ম্মজীবনের অন্তরালে রহিয়াছে বিরাট ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা।

আর ইউরোপের দিকে চাহিলে আমরা কি দেখিতে পাই, দিক্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার রাজ্যজয়ে মত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'একটী পৃথিবী ত জয় করিলাম, আর একটী পৃথিবী পাইলে তাহাও জয় করিতাম। বিশ্ববিজয়ী বীর নেপোলিয়ান্ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি ছয় ঘণ্টার জন্য ইংলিশ চ্যানেলের আধিপত্য পাই, তাহা হইলে আমি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারি।' ইঁহারা পৃথিবী জয়টাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের রাজা অশোক কি ঘোষণা করিলেন? 'রাজ্য জয় আমি চাই না, চাই আমি মিত্রতা।' ভারতের উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বৌদ্ধপ্রচারকগণ কোনপ্রকার পাশবিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বৌদ্ধপ্রচারকগণ দীনভাবে মানবের মনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইতেন। আর্ত্ত, দীন, দুঃখী, ব্যথিত আত্মারই গোপন

ব্যথা উপশম করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য কোন আইনের আবশ্যক হয় নাই, বা জিজিয়া করের উদ্ভাবন হয় নাই, বা য়িহুদীদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার মত আয়োজনের প্রয়োজন হয় নাই। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের বাণী ঘোষিত হইলেও, এখনও পৃথিবীর অধিকসংখ্যক লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধদেব অহিংসার যে পরম বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যের মনমাতোয়ারা প্রেমানন্দে ভারতকে প্লাবিত করিল। শ্রীচৈতন্য জগাই, মাধাই কর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। এমন প্রেমের ধর্ম্ম পৃথিবীর কোন্ দেশে সম্ভব? ইহা ভারতেই সম্ভব।

চৈতন্যদেবের এই বাণীই মহাত্মা গান্ধী অহিংসা নীতিরূপে ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেম আখ্যা দিয়া বর্ত্তমানে বিশ্বে প্রচার করিতেছে। ইউরোপেও যে এইরূপ বিশ্বপ্রেমের দৃষ্টান্ত নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহিনা। ইউরোপের বর্ত্তমান চিন্তা-নায়কগণ যেমন, রমা রঁলা, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমের বাণী প্রচার করিতেছেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত ইউরোপ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত নন্।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মে, ঈশ্বরকে পিতা ও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মানব বলিয়া ধারণা করা হয়। কিন্তু তিনি যে শুধু আমাদের পিতা নন্, তিনি মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী ও বন্ধু হিসাবেও আমরা তাঁকে ধ্যান করিতে পারি এই ধর্ম্ম ভাব ভারতের জমিতেই সম্ভব। তাঁহার অস্তিত্ব আমরা গন্ধে, বর্ণে অনুভব করিতে পারি। তাই কবি গাহিয়াছেন—

'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে,
এস গন্ধে বরণে, এস গানে।'

আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যেই পরম পিতাকে আহ্বান করিয়াছেন। এই সকল আধ্যাত্মিক ভাব যখন গানেতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তখন ঐ সকল গানের অনুবাদ পাঠ করিয়া ইউরোপের পণ্ডিত মণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের উৎস আমাদের দেশের মাটীতেই বিদ্যমান্। আমাদের দেশের বাউলদের মুখেই এইরূপ সখ্য ভাবের গান সর্ব্বদাই শুনা যায়। আমাদের দেশের এই বাণী ঘোষণা করিয়া আমাদের দেশের সন্তানগণ পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বৎমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। আমাদের দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে কোন বিদেশীই অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই আমাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। ইউরোপের মধ্যে অক্লান্ত কর্ম্মী জার্ম্মাণ জাতি, আমাদের দেশের ধর্ম্ম গ্রন্থের স্বাদ পাইয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা বর্ত্তমানে ইউরোপীয় কৃষ্টির প্রতিঘাতে নিজের কৃষ্টি বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। ইউরোপীয় কৃষ্টি যে আমাদের দেশে কুফলই দিয়াছে এমন নহে। ইউরোপীয় কৃষ্টি ও ভারতীয়

কৃষ্টির ঘাত প্রতিঘাতে উভয়েই উপকার হইয়াছে। উভয়েই উভয়ের মহিমাতে মুগ্ধ হইয়াছে। আমাদের রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীগণ আমাদের দেশের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ইউরোপে যাহা করিয়াছেন, তাহাতে ইউরোপবাসীগণ নূতন রসাস্বাদ পাইয়া উন্নত হইয়াছিল।

আমরাও সেইরূপ মিল, ক্যাণ্ট, সোপেনহর প্রভৃতি দার্শনিকগণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া এক নূতন আলোক লাভে বর্ত্তমানের এই কর্ম্ম প্রেরণা লাভ করিয়াছি। ইউরোপের আধুনিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণের নূতন চিন্তার ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাদের সমস্যার সমাধান আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে পাই। দর্শনের একটী জটিল সমস্যা 'মানুষের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত না তাহা তাহার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল,' ইহা যুগ যুগ ধরিয়া দার্শনিকগণকে আলোড়ন করিতেছে। ইহা বর্ত্তমানে পুরুষকার ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ফ্রয়েড্ বলিতেছেন, মানুষের সকল কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত, মানুষের কর্ম্মানুগতি একটী শৃঙ্খলে বাঁধা। এই প্রসঙ্গে মনে হইতেছে, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের একটী শ্লোকের কথা। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

ঈশ্বর! সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

ঈশ্বর সর্ব্বজীবের মধ্যে অবস্থান করিয়া সর্ব্বজীবকে কলের পুতুলের ন্যায় ঘুরাইতেছেন্।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র গীতা এরূপ একখানি পুস্তক যাহাতে সকল রকম দার্শনিকের মতবাদের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ। আমরা বিদেশী সভ্যতার মোহে মূঢ় হইয়াছি। পিত্তলকে আমরা স্বর্ণ বলিয়া ভ্রম করিয়াছি, কাঁচকে আমরা হীরক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমরা নিজেদের ঘরের কথা ভুলিয়াছি। আমাদের নিজেদের গৃহ হইতে আমরা যে বস্তু লাভ করিব, তাহা দেশ দেশান্তরে বণ্টন করিয়াও আমরাই কৃতার্থতা লাভ করিব। আমাদিগকে আর পৃথিবীর আসনে হেয় মনে হইবে না। আমরাই পৃথিবীর সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সক্ষম হইব। তাই একবার বিবেকানন্দের ভাষায় বলি, 'উঠ জাগো, ভারতবাসী।'।
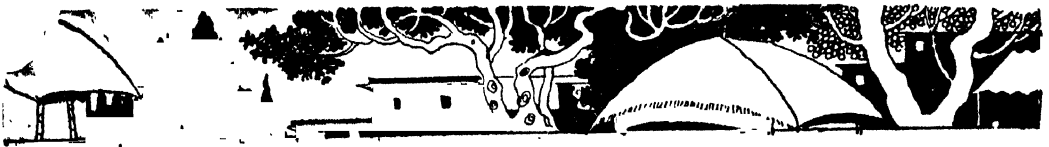
নববধূ

শ্রীআশালতা সিংহ

৬

কমলার বড় দাদা এম এ পাশ করিয়া ল'ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছেন, হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থাকেন। ধরণ ধারণ সৌখীন গোছের। মাস তিনেক হইতে শিবেশ্বরের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। এই তিনমাসে তাহা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। কমলার বড়দা ধীরেনবাবুর সহিত শিবেশ্বর একত্রে পড়ে। দু'জনেরই প্রাথমিক আইন পরীক্ষা দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং মধ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া চলিতেছে। শিবেশ্বরের পিতা পশ্চিমের কোন একটা সহরে ওকালতী করিয়া অগাধ পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছেন, বর্ত্তমানে তিনি পাটনা হাইকোর্টে জজীয়তি পাইয়াছেন। তিন ছেলের মধ্যে শিবেশ্বর বড়। তাঁহাদের পরিবারে অগাধ স্বচ্ছলতা এবং অপরিসীম বিলাসিতা। শিবেশ্বর কলিকাতায় থাকিয়া পড়ে, সে যেন এক এলাহিকাণ্ড। মাসের মধ্যে পনের দিন বন্ধুদের লইয়া ফারপোতে ডিনার খাইতে যায়। বাজারের মধ্যে সবচেয়ে দামী সিল্কের মত নরম আর মসৃণ বায়ান্ন ইঞ্চির ধুতি তাহার সুকুমার চরণের কাছে লুটাইয়া থাকে। চেহারাটা তাহার বাঙ্গালী ঘরের সাধারণ ছেলেদের চেয়ে অতিরিক্ত একটু ভালো। তাহার উপর সর্ব্বদাই মাজা ঘষা, প্রসাধন এবং পরিপাটি পরিচ্ছদে আরও সুন্দর লাগে। পূজার ছুটিতে কলেজ বন্ধ হইতে আর দিন দুই বাকী। দ্বিপ্রহর বেলায় শিবেশ্বরের কক্ষে বসিয়া ধীরেন আর শিবেশ্বরের গল্প চলিতেছিল। সেদিন কলেজের সকাল সকাল ছুটি হইরাছে। শিবেশ্বর কহিল, "আমার বোন শিবানী লিখ্‌চে এবারে পূজোর ছুটিতে আমাদের বাড়ীর সকলে দার্জ্জিলিং যাবে।......" মুখটা একটু বিকৃত করিয়া কহিল, "এই নিয়ে চার বার হলো। কত আর ভালো লাগে। দেখে দেখে পুরোণ হয়ে গেচে।" ধীরেন মৃদু হাসিয়া কহিল, "দার্জ্জিলিং যদি এতই পুরোণ হয়ে থাকে অন্য কোথাও যাও। শিলং আছে, মুসৌরি রয়েচে...বিন্ধ্যাচল যেতে পারো।" "নানা, ওসব আর ভালো লাগেনা। সেবারে মাসীমার সঙ্গে নিয়ে দু'বার শিলং গেছি। মুসৌরি বার কয়েক গিয়েছি। তা ছাড়া কি জানো ধীরেন, এমনই অভ্যেস হয়েচে, একলা কোথাও যেতে ভালো লাগেনা। দল বলের সঙ্গে মিলে মিশে আমোদ হৈ চৈ করে যাওয়ার তবু একটা মানে আছে।"

"তাহলে কোথায় যাওয়া এবারে ঠিক করলে ?"

"তাই তো ভেবে পাচ্চিনে। তোমায় বোলব কি, দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা চিঠিতে পড়ে অবধি মনটা আমার একেবারেই ভালো নেই।"

ধীরেন হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "এমন জন্ম নিয়েচ বন্ধু যে দার্জ্জিলিং যেতে হবে এই দুঃখ ছাড়া জীবনে আর কোন দুঃখ নেই। কিন্তু দুঃখ করে আর কি হবে, আমি বলি কি এবারে ছুটিতে

আমাদের দেশ চলোনা। গরীবের কুঁড়ে ঘরে অনেক কষ্ট হবে জানি কিন্তু দার্জ্জিলিং অনেকবার দেখেচ আর বাংলা দেশের পল্লীগ্রাম হয়তো একবারও দেখনি।"

শিবেশ্বর সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয় যাব। আমাকে তোমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ করবে এ কথা আগে বলোনি কেন? তাহলে কি আমি মন খারাপ করে থাকি?"

সেইদিনই ধীরেন মাকে চিঠি লিখিল,

"মা,

আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে পূজোর ছুটিতে সঙ্গে নিয়ে যাব। সে যে শুধু বড়লোক এমন কথা বললে ভুল বলা হয় তাদের বাড়ীর ঝি চাকরের অবধি যে মার্জ্জিত রুচি এবং সুমার্জ্জিত ভদ্রতা জ্ঞান পাড়াগাঁয়ে হয়তো অনেক ভদ্র লোকেরও তা নেই। কিন্তু আমার বন্ধু শিবেশ্বর অত্যন্ত বিনয়ী, যার কোটের ছাঁট প্যারিসের ক্যাটালগ দেখে হয় এবং যে মাসের মধ্যে বিশ দিন ফারপোতে খায় সে নিজে যেচে সানন্দে আমাদের ওখানে যাবার নিমন্ত্রণ নিয়েচে। এই কথাটা বুঝে শুধু সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখো। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেচি, আমরা বুধবার সকাল আটটার গাড়ীতে পৌঁছাব। বাবুদের মোটরটা যেন কিছুক্ষণের জন্য চেয়ে নিয়ে সরকার মশায় যথাসময়ে ষ্টেশনে হাজির থাকেন।"

যে ব্যক্তির কোটের ছাঁট প্রস্তুত হয় অত্যন্ত বড়দরের দোকানে এবং যে মাসের মধ্যে অমন বিশ দিন ফারপোতে খায় সে যে কী দরের বড় মানুষ, ছেলের চিঠি পড়িয়া মা আদৌ আন্দাজ করিতে পারিলেননা। কমলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোর বড়দার এই চিঠিখানা একবার পড়ে দেখ দেখি কমল কী লিখচে, চিঠির মধ্যে অমন একশোটা ইংরিজী কথা লিখবে। বুঝব কি করে।"

কমলা পত্রখানা পড়িয়া স্মিতমুখে কহিল, "তোমার না বুঝতে পারার মত কোন কথাই এতে নেই। দাদার এক বন্ধু সঙ্গে আসবেন। খুব বড়লোক আর সৌখীন মানুষ। আর...আর ধরণ ধারণ বোধহয় একটু সাহেবি গোছের।'

"ওমা, তাহলে এখানে এসে পড়লে কেমন করে কি হবে। হাজার হোক, গোপীনাথের মন্দির রয়েচে, সাঁঝ সকালে আরতি হয়; সাহেব সুবোর কাণ্ড এখানে চলবে কেমন করে।

কমলা একটু ভাবিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, "না না, দাদা কি না বুঝেই তাঁকে আনচেন। তেমন কিছু হবেন। তবে আমি বলি সরকার দাদাকে কাল একবার রাণীগঞ্জ পাঠাও। এক ডজন সোডাওয়াটার আর একসেট্ ভাল চায়ের বাসন নিয়ে আসুন। কি জানি হয়তো দাদাবলে বসবেন, এখানকার জল খেলে অসুখ বিসুখ হবে। সোডা আনিয়ে রাখা ভাল। হ্যাঁ, আর দার্জ্জিলিং চা এক পাউণ্ড আর একটা ভালো ল্যাম্প। তারপরে যদি দু'একদিন মাংস কি ডিম হয় বাইরে ষ্টোভে হবে। অমন তো দাদারা মাঝে মাঝে খান। তার আলাদা বাসন পত্র আছে।"

কমলার মা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "আমি আজই সরকারকে রাণীগঞ্জ পাঠাই। কমল তুই একটা ফর্দ্দ করে হিসেব মত টাকা বার করে দে।"

পুত্রদের সকল আদর আব্দার এবং আতিথ্যের দায় প্রমীলা সানন্দে বহন করেন। তিনি গর্ব্ব করিয়া ভাবিলেন, তাঁহার ছেলের বন্ধু ভাগ্য ভালো। এমন বন্ধু ক'টা লোকের কপালে জোটে।

৭

কিন্তু যাহার আতিথ্যের জন্যে এত আয়োজন এত দুশ্চিন্তা সেই শিবেশ্বর যখন আসিয়া পৌঁছিল, তাহার পানে নিমেষমাত্র চাহিয়াই প্রমীলা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। আহা, এমন রাজপুত্রের মত চেহারা বিধাতা বোধকরি নির্জ্জনে বসিয়া গড়িয়াছিলেন। শিবেশ্বর আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, নারিকেলকোরা আর মুড়ি চাহিয়া চাহিয়া খাইল। এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় মাছ মাংস ফেলিয়া প্রমীলার হাতের তৈয়ারী মোচার চপ এবং নিরামিষ তরকারীর প্রতি অতিশয় লুব্ধতা প্রকাশ করিল। বারংবার বহিল, অনেক নামজাদা হোটেলে খাইয়াছে কিন্তু এমন সুন্দর রান্না কখনো খাই নাই। যত খরচ করিয়া প্রস্তুত হোক এবং যে যাহাই বলুক আমাদের দিশী রান্নার কাছে কিছুই লাগেনা।

মেয়েদের যেখানে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা শিবেশ্বর সেইখানেই ঘা দিল। নিজের হাতের রান্নার প্রশংসায় প্রমীলা মহাখুসী হইলেন। বিকাল বেলায় নূতন কেনা চায়ের সাজ সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া কমলা যখন শঙ্কাকুল চিত্তে ভাবিতেছিল, কেমন চা হইবে, দাদার মহামান্য অতিথির উপযুক্ত তাহা হইবে কি না, সেই সময়ে বাহিরের ঘর হইতে বড়দা হাঁক দিয়া কহিলেন,

"কমল, চা হোল ?"

কমলা, ক্ষিপ্রহস্তে পেয়ালা দুই চা প্রস্তুত করিয়া ভাবিতেছিল সে নিজে যাইবে কেমন করিয়া, কোন চাকরকে ডাকিয়া তাহার হাতে পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু ধীরেন আবার উচ্চ গলায় ডাকিয়া কহিল, "কমল, নিয়ে আয়। এত দেরী কিসের বোন ? আর তুই নিজের হাতে করে নিয়ে আয়। আমার বন্ধু বলেই শুধু নয়, শিবেশ্বরের সামনে তুই আসবিনে, এও কি একটা কথা!"

কমলা লজ্জাবনতমুখী হইয়া যেখানে তাহার দাদা এবং শিবেশ্বর বসিয়াছিল সেখানে আসিয়া পেয়ালা দুই চা নামাইয়া রাখিল।

শিবেশ্বর নমস্কার করিল।

কমলা সঙ্কুচিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এমন কখনো অভ্যাস নাই। একজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে সহজ আবরণ এবং নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা সে জীবনে কখনো করে নাই। ভূমিলগ্ন দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া একবার সে চাহিল। বিকালবেলাকার কোমল আলোতে এই লজ্জানম্র অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরীর পানে একবারমাত্র চাহিয়াই শিবেশ্বর

মুগ্ধ হইয়া গেল। এ জীবনে সে অনেক জিনিষ দেখিয়াছে। ধনীর সন্তান, যখন যাহা সখ হইয়াছে তখনই সে না চাহিতে না বলিতে আপনা আপনি তাহা মিটিয়াছে। লোকে সৌন্দর্য্য বলিতে যাহা বোঝায়, সর্ব্বপ্রকারে তাহার স্বাদ লইয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে তাজমহল দেখিয়াছে, যমুনার উপর তরী বাহিয়াছে। সমুদ্রের মুখরফেনিলোম্মত্ততা এবং পর্ব্বতরাজীর স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য উপভোগ করিয়াছে। কলিকাতায় এমন কোন নামজাদা থিয়েটার, সবাকচিত্র, আর্ট এগ্‌জিবিসন্ হয় নাই, যেখানে সে না গিয়াছে। সভ্য সমাজের মেলা মেশায়, নানা নিমন্ত্রণ, পার্টি, জলসা প্রভৃতিতে পরিচিত নারী মণ্ডলীর মধ্যে শিষ্ট এবং মিষ্ট ব্যবহার করিয়াও সে যথেষ্ট প্রশংসা পাইয়াছে। লিলি গাঙ্গুলী এবং রেখা ব্যানার্জ্জির দলকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, হ্যাঁ, শিবেশ্বর বাবু সৌন্দর্য্যের উপাসক এবং এ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বটেন। তাহাতে কোন ভুল নাই। শিবেশ্বরের নিজেরও যথেস্ট আত্মপ্রসাদ ছিল। কিন্তু আজ সে প্রথম নিজের ভুল টের পাইল। জলে না নামিয়াই যেমন অনেকে মনে করে খুব সাঁতার শিখিয়াচি, আজ তাহার মনে হইল ভুলটা তাহার হইয়াছে অনেকটা এইরূপ। মৃদুস্বরে কমলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

বড়দা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এত লজ্জা কিসের কমল?"

"......তাছাড়া আমি তো বাঘ কিংবা ভালুক নই যে সদ্যঃ সদ্যঃ আপনাকে ধরে গিলে ফেলবো। কিন্তু এমন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচেন যে তাই মনে হচ্চে।" শিবেশ্বর এবারে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া সহজ পরিহাসের সুরে কহিল।

কমলা একটুখানি দূরে একটি ছোট বেতের চেয়ারের উপর আসিয়া বসিল।

ধীরেন বন্ধুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন চা হয়েচে?"

"আমি তো অনেক বিখ্যাত জায়গার চা খেয়েচি, আমার নিঃসন্দেহই মনে হচ্চে এ খুব পাকা হাতের তৈরী।"

"শুনলি কমল। তোর দুর্ভাবনার কারণ এবারে মুছে গেল।" আর ভাবনা নেই। প্রশংসা পেয়েছিস্। কমলা অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "কী যে বলো, আমি আবার কখন ভাবনা করতে গেলুম।"

"না যাস্‌নি কিন্তু এখন একটা কাজের কথা বলি শোন। চা খেয়ে আমরা বেড়াতে বার হব। এরই মধ্যে চট্ করে তৈরী হয়ে আয়, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।" কমলা আপন ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রসাধন শেষে যখন বাহির হইয়া আসিল তখন তাহাকে দেখিয়া সত্যই চোখ ফেরানো যায় না। তাহার ঘষা মাথার ঈষৎ রুক্ষ চুলে, পরণের নীল শাড়ি এবং জড়ির কাজ করা নীল চটিতে তাহাকে এমন সুন্দর মানাইয়াছিল যে একবার চাহিয়া দেখিলে আরও চাহিতে ইচ্ছা করে। কমলার মা তখন পুকুর ঘাটে কাপড়

কাটিতে গিয়াছেন। আপন কক্ষের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া কমলা একবার চাহিল। একবার মনে করিল মাকে বলিয়া যাইবে। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তখন আর সে অপেক্ষা করিতে পারিল না।

৮

মাঠের মধ্যভাগে আলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে ধীরেন বলিল, "ক'লকাতায় এবারে যে সাহিত্য-সম্মিলন হোল, কাগজে তার বিবরণ পড়েছিলি আর সেখানে পঠিত প্রবন্ধর মধ্যে কাল তোকে গোটাকতক এনে দিলুম। রাত্রিতে নিশ্চয় পড়েছিস? কেমন লাগ্‌লো?

যদিচ কমলার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পড়ার চাইতে হাল্কা নাটক নভেল অনেক ভালো লাগে, তথাপি সে মাথা নাড়িয়া কহিল, "চমৎকার সাহিত্য নিয়ে এই ধরণের আলোচনা যত হয় ততই ভালো।"

শিবেশ্বর মুখে কিছু বলিল না কিন্তু মনে মনে বিস্মিত না হইয়া পারিল না। পল্লীগ্রামের মেয়েরা সে সাধারণতঃ লেখাপড়ার ধার দিয়াও যায় না, এই কথাটাই সে জানিত।

তাহার পর আরও নানা উপলক্ষ্যে দেখা হইল। সকালে চায়ের পেয়ালা হইতে সুরু করিয়া রাত্রিতে লুচি খাইবার সময় অবধি কমলার অশ্রান্ত সেবা নিত্য নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। অনেক দিনের পরে ছুটিতে তাহার দাদারা বাড়ীতে আসিলে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব যেমন আনন্দে ভরিয়া যায়, একমনে একপ্রাণে তাঁহাদের এতটুকু সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সারাক্ষণ অবহিত হইয়া থাকে এখনও সে তাহাই আছে। কিন্তু বেশির ভাগ এবারে যেন আরও একটু মাধুর্য্য আসিয়া ইহারই সহিত মিশিয়াছে। আরও একটা নূতন উন্মাদনা, অন্য এক ধরণের আবেগ মিশ্রিত সুর। শিবেশ্বর যখন বড়দার কাছে তাহার সুখ্যাতি করে কিংবা অকৃত্রিম বিস্ময়ে বলে, 'এমন কখনও দেখি নাই', তখন আড়ালে কোনখান হইতে শুনিতে পাইয়া কমলার চোখে জ্যোতির স্পন্দন আসিয়া লাগে, অধরে মৃদুসলজ্জ হাসির রেখা ভাসিয়া উঠে।

এই কয়দিনে আলাপও হইয়াছে ভালো করিয়া। বিকালে কমলা প্রায় রোজই শিবেশ্বর এবং তাহা দাদাদের সহিত বেড়াইতে যায়।

মা একদিন মৃদু আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, এটা কি তেমন ভালো হইতেছে হাজার হোক পল্লীগ্রামের গৃহস্থ ঘরের রীতিনীতির মাঝে দাদার বন্ধুর সঙ্গে খোলাখুলি এতটা। মেলামেশা নাই বা হইল। তাঁহারা যেমন করিয়াই বুঝুন, বাহিরের লোকে তো আর ভিতরের কথাটা বুঝিতে পারিবেনা।

তাহার উত্তরে ধীরেন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "শিবেশ্বরকে তুমি জানোনা মা। যদি জানতে তাহলে এমন কথা বলতেনা। তাছাড়া, তোমার মত মায়েও যদি এমন কুসংস্কার পূর্ণ গোঁড়ার মত কথা বলে, লোকে কি বলবে আর কি বলবেনা সেই ভেবে নিজেদের

প্রত্যেকটি কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহলে আমি আর কী বলব বলো ? আমার কিছুই বলবার নেই।" এমন কথার পরে প্রমীলা আর কিছু বলিতে পারেন নাই। বরঞ্চ পুত্রবৎসলা মাতার মনে নিজের প্রতি পুত্রের এমনতরো উচ্চ ধারণায় বেশ একটু গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছিল।

কয়েকটা দিন বেশ আনন্দের মধ্যে কাটিয়া গেল। শিবেশ্বর যেদিন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে, সেদিন রাস্তায় খাবার সঙ্গে দিবার জন্য টিফিন কেরিয়ারে লুচি, কপিভাজা, সন্দেশ সযত্নে প্রস্তুত করিয়া কমলা আপন হাতে সাজাইল, ফ্লাস্কে চা তৈয়ারী করিয়া রাখিল। তাহার পরে সেই দু'টি পাত্র হাতে করিয়া নিজেই লইয়া যেখানে শিবেশ্বরের বিছানা বাঁধা হইয়া এবং স্যুটকেস সজ্জিত হইয়া আসন্ন যাত্রার জন্য যেন অপেক্ষা করিয়াছিল, তথায় আসিল। শিবেশ্বর টাইম টেব্‌ল্ খানা উল্‌টাইতেছিল। চমকাইয়া উঠিয়া দুয়ারের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। তাহার পর দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "এখনই চললুম। ভেবেছিলুম পাঁচটা পঁয়ত্রিশে ট্রেন, কিন্তু এখন টাইম টেবিল খানা খুলে দেখছি, তানয়। ট্রেণ চারটের এদিকেই। বিদায়ের নমস্কার করলুম আপনাকে। আর সময় নেই। কিন্তু হয়তো এবিদায়ের মাঝেও আসন্ন মিলনের পালা সূচিত হয়ে রইল। বলা তো যায়না কিছু জোর করে সংস্কারে। আর আপনাদের এখানে যা রেখে গেলুম, তা যে কত বড় নিজেও হয়তো ভালো করে টের পাচ্ছিনে। বুঝব ভালো করে যখন অভাবের বেদনা বোধ তীব্রতর হবে।"

কমলা লজ্জিত মুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। সমস্ত কথার মানে সে বুঝিতে পারিলনা। ধীরেন জমিদার বাড়ীতে গাড়ীর জন্য বলিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিল। শিবেশ্বর বলিল, "ধীরেন, তুমি অত ব্যস্ত হ'ও কেন ? আর এত ফর্ম্ম্যালিটির দরকারই বা রয়েচে কোনখানে ? এইটুকু পথ অনায়াসে হেঁটে যেতে পারি।"

ধীরেন বন্ধুকে পৌঁছাইয়া দিতে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। রাস্তায় কিছুদুর আসিতেই গ্রামের শেষ বাড়ীটিও আস্তে আস্তে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেল। নিস্তব্ধ পথের চারিদিকে ঘন পল্লবিত আম্র বৃক্ষের শাখা ছায়া বিস্তার করিয়া আছে। মাঠের পর মাঠে সবুজ আর সোনালি রঙ্গের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে। সবুজ গাছের শীর্ষদেশে সোণার বরণ ধানের শীষ বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। সঙ্গে যে লোকটা বাক্‌স ও বিছানা বহিয়া আসিতেছিল সে অনেক আগাইয়া গেছে। শিবেশ্বর ধীরে ধীরে বন্ধুর হাতখানি আপন হাতে তুলিয়া লইল। তাহার পরে মুগ্ধ, ত্রস্ত, অর্দ্ধস্ফুট উচ্ছ্বসিত ভাষায় যাহা বলিয়া গেল, তাহা শেষ হইলে অকৃত্রিম বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ধীরেন কহিল, "তুমি কী বলচ শিবেশ্বর ? কমলাকে তুমি বিয়ের প্রস্তাব ক'রলে, এমন সম্ভব হোল কেমন করে ? মানলুম তোমরা আমাদের স্বজাতি, কিন্তু তাতে কী এসে যায় ? তোমাদের আর আমাদের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

"তফাৎ কোথায় ধীরেন? জানি ভগবান টাকাটা আমায় একটু বেশি পরিমাণে দিয়েচেন। কিন্তু টাকা থাকাটা অপরাধ নয়। অন্ততঃ আমার তাই মত। আর তাও যদি হয়, এতে আমার হাত নেই। কারণ ওটাকা আমি নিজে উপার্জ্জন করিনি। দৈবাৎ পেয়েচি।" ধীরেন বন্ধুর মুখে এমন কথা শুনিয়া এত অবাক হইয়া গিয়াছিল যে বেশি যুক্তিতর্ক করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিলনা। তাহা ছাড়া তাহারা ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, কথার সময় কম। ট্রেনের সিগ্‌ন্যাল্‌ পড়িয়া গেছে।

ট্রেণ যখন ছাড়িল তখন শিবেশ্বর আবেগভরে বন্ধুর দুই হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি যে কথাটা বলে গেলুম, সময় মত ভেবে দেখো। কবে আসচ ক'লকাতা? শীগ্‌গীর এস। তোমার পথ চেয়ে থাকব।" সারা পথটা অভিভূতের মত কাটাইয়া ধীরেন যখন বাড়ীতে পা দিল তখন সেই সবে মাত্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। গোধূলির আলোতে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কমলা প্রদীপের সাজ করিতেছিল। তাহার দিকে চোখ পড়িয়া যাইতে অকস্মাৎ সে যেন অনেক জিনিষই বুঝিবার কিনারায় আসিল।

কমলাকে সে অনেকবার অনেক ভাবে দেখিয়াছে কিন্তু তাহার প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্য আজ যেমন করিয়া চোখে পড়িল অন্যদিন যেন তেমন করিয়া পড়ে নাই। মনে পড়িয়া গেল অনেকদিন আগে সে সংস্কৃত পদাবলীর একটা কবিতা পড়িয়াছিল, ঠিক গোধূলি বেলায় রাধিকা মন্দিরে পূজা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছেন, সন্ধ্যার স্তিমিত ধূসরতায় তাঁহার উজ্জলরূপের দীপ্তি যেন ঘন মেঘের মাঝে দীপ্ত বিদ্যুৎ।

এইটুকু বর্ণনা লইয়া কবিতা। তখন সে ভাবিয়া পায় নাই এমন একটা তুচ্ছ বিষয় বস্তু লইয়া কবিতা লেখা হয় কেমন করিয়া। কবিদের উচ্ছ্বাস অহেতুক। কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য যে মানুষকে অকারণে কেমন করিয়া আবিষ্ট, বিস্মিত করে সে কথা আজ একটিবার কমলার পানে চাহিবামাত্র বুঝিতে পারিল। আজ কমলার সম্বন্ধে তাহার চেতনা অতি জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়াই বোধকরি তাহার চোখে সবই নূতন ঠেকিল।

ক্রমশঃ
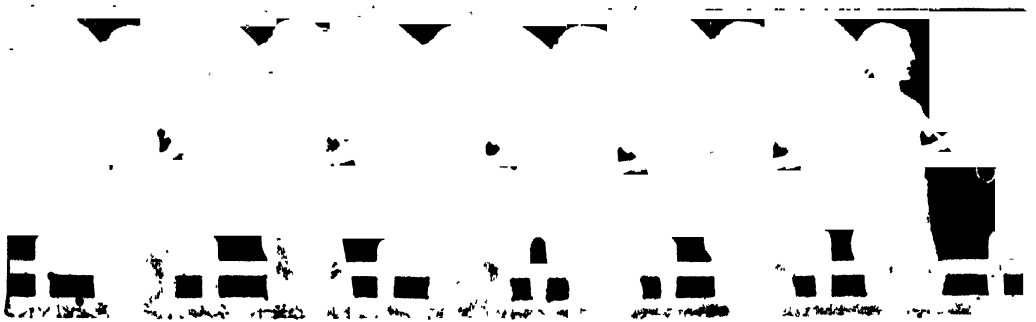
(১)

রাশিয়ার-বন্দীশালা

শ্রীসুবোধকুমার রায়

"আজ্‌কের-রাশিয়া" পুস্তকের লেখক সোবিয়েট্ শাসন তন্ত্রাধীন বন্দী-শালা দেখিতে গিয়াছেন।—তিনি দেখিলেন সারি সারি দ্বিতল ও প্রশস্ত হর্ম্ম্যরাজি শোভা পাইতেছে; সেখানে বিভিন্ন কর্ম্মশালার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগার ও মানুষের মনের খোরাক সংগ্রহের সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জাম ও আয়োজনের কোনও অভাব নাই। অপরাধীগণকে শুধু বলদের ন্যায় খাটাইয়া লইয়া তাহাদিগকে আরও অমানুষ করিয়া তোলার ব্যবস্থা কোথাও তিনি দেখিতে পাইলেন না। উচ্চ প্রাচীর অথবা বৈদ্যুতিক লৌহ তারের বেষ্টনী হইতে এই অভিনব বন্দীশালা মুক্ত—এই চিত্রটি সম্পূর্ণ অভিনব। টলষ্টয়ের Resurrection এ রাশিয়ার বন্দী-নিবাসের যে দুর্নীতির ছবি আমরা দেখিতে পাই, ডেষ্টয়-ভস্কির House of the Dead or Prison-life in Siberiaতে যে নির্য্যাতনের কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি—গর্কির Mother পুস্তকে কারা-জীবনের যে গ্লানিময়রূপ আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠে, আজ্‌কের বন্দীনিবাসগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে হয় যেন কত পরিবর্ত্তন!

আজ্‌কের রাশিয়া বা 'রাশিয়া টুডে'র লেখক অন্যান্য দেশের বন্দী-শালার সহিত ইহার অদ্ভুত পার্থক্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন—তিনি তাঁহার পথ প্রদর্শনকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকি বন্দীশালা?" উত্তর হইল "হাঁ।"—এই ভারতীয় সোবিয়েট্ তীর্থপর্য্যটক—এক দল কর্ম্মনিরত অপরাধীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এখানে কেমন আছ?"—জনৈক অপরাধী উত্তর করিল, "এখানে সর্ব্বপ্রকার সুবিধাও প্রয়োজনীয় স্বাধীনতার মধ্যে আমরা আছি"—ভারতীয় পর্য্যটক বলিলেন,—"তবে তো এই সুখ ভোগের আশায় পুনরায় তোমরা এখানে আসিতে চাহিবে।" এইবার বন্দীগণের মুখ গাঢ় বেদনায় আচ্ছন্ন হইল;—জনৈক বন্দী উত্তর করিল, "তথাপি আমাদের দুঃখ অসহনীয়।" "আজ্‌কের রাশিয়া" পুস্তকের লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কিসের দুঃখ তোমাদের?" বেদনাবিজড়িত কণ্ঠে বন্দী বলিল,—"আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে অপরাধ করার দরুণ আমাদিগকে নাগরিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অধিকার ভোট প্রদানের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। পরন্তু আমাদের দেশে মেয়েরা পর্য্যন্ত প্রকাশ্য

ক্রীড়াস্থলে প্রতিবেশীগণের ছেলে মেয়েদের সহিত খেলা-ধুলা করার অধিকার হইতে বঞ্চিত!"—বন্দীনিবাসের আর এক স্থলে মেয়ে বন্দিনীরাও কাজ করিতেছিল। ভারতীয় আগন্তুক তাঁহার 'গাইড্' এর মুখে অবগত হইলেন যে মেয়েদের বাসের ব্যবস্থা আলাদা তবে পরস্পরের মেলামেশার মধ্য দিয়া ভালবাসা স্থাপিত হইলে বিবাহিত হইবার পক্ষে কোনও বাঁধা নাই।

উপরোক্ত চিত্রটি হইতে রাশিয়ার বন্দীশালার প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই। রাশিয়ার জনসাধারণের নাগরিক জীবনের প্রতি এই প্রগাঢ় মমত্ববোধ সকল জাতির অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। তাই এই অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকাকেই রাশিয়াবাসী আজ গুরু দণ্ড বলিয়া মনে করে। প্রাচীরাবৃত ভয়াবহ স্থানের দৈহিক পীড়ন দ্বারা যে অপরাধীর মনকে সংযত অথবা সংস্কৃত করা যায় না—তাহা আজ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় শক্তি অপেক্ষা রাশিয়াই ভাল রকমে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

অপরাধীকে তাহার দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনকে সুস্থ রাখিবার সকল প্রকার সুযোগ দিয়া এমন একটি দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—যাহা তাহার মনকে স্পর্শ করে—রাশিয়ার অপরাধী শয়নে স্বপনে মনে করে যে সে দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হইতে পৃথক, সর্ব্বক্ষণ তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—তাহার সন্তান সন্ততি শৈশবের আনন্দ কোলাহলপূর্ণ প্রকাশ্য ক্রীড়া ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত। এই অনুভূতি তাহাকে দ্রুত লইয়া চলে—সংযমের পথে। সর্ব্বক্ষণ তাহার মনকে শুধু একটি অন্তর্দাহিনী চিন্তা বার বার পীড়িত করিয়া তোলে যে সে আজ রাশিয়ার অধিবাসী হইয়াও রাশিয়ার প্রত্যেক নর-নারী বিধি সঙ্গত দাবী হইতে বিচ্যুত! রাশিয়ার কারাগারের স্থলে প্রতিষ্ঠিত এই অভিনব সংশোধনাগার কি অন্যান্য সভ্য জাতির উদাহরণ স্বরূপ হইবে না কোন দিন?...কে জানে!

জনশক্তি

(২)

বাঙ্গালী হিন্দু ধ্বংসোন্মুখ

শ্রীকেশ দাস

গত চৈত্র সংখ্যায় 'হিন্দু ও মুসলমান' প্রবন্ধে বলিয়াছি যে হিন্দু সমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে তাহার সংখ্যা বাহুল্যের জন্য, বাঙ্গালী হিন্দু যে ক্রমশঃ ক্ষীয়মান তাহার প্রধান লক্ষণ হইতেছে এই যে—বাঙ্গালী মুসলমান যে হারে বাড়িতেছে, হিন্দু সে হারে বাড়িতেছে না।

১৮৭২ সালে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১ কোটী ৭১ লক্ষ ও মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১ কোটী ৬৭ লক্ষ। আর ১৯৩১ সালের লোক সংখ্যা গণনায় পাওয়া যায় বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটী ১৫ লক্ষ ও বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা ২ কোটী ৭৫ লক্ষ অর্থাৎ ৬০ বছরে হিন্দু বাড়িয়াছে ৪৫ লাখ, আর মুসলমান বাড়িয়াছে ১ কোটী ৮ লাখ।

বাঙ্গালী হিন্দুরা মনে করিতে পারেন আর কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধকোটী লোক যদি তাঁহাদের থাকিত তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে তাঁহারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইতেন না। অধিকতর অর্থশালী হইলেও জনসংখ্যা

অল্পতার দরুণ বাঙ্গালী হিন্দুর অনেক কিছু দাবী অস্বীকৃত হইতেছে। সেইজন্য অনেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আশু প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন।

ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালীতে ইউরোপীয় নেতারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত—আর আমরা শুনিতে পাই আমাদের দেশ দরিদ্র—আমাদের ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা নাই, অতএব আর বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন নাই।

দেশে দারিদ্র্য অত্যধিক—শিক্ষিত যুবকেরা শিক্ষিত বলিয়াই বেকার, বেকারের বংশবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে—তাই শিক্ষিত বেকারের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা ও গৌণ বিবাহের দৃষ্টান্ত অত্যধিক। আর অশিক্ষিত ভদ্র যুবকেরা বিবাহ করিয়াছে এবং বংশ বৃদ্ধি করিতেছে কিন্তু সম্ভ্রম নাশের ভয়ে দৈহিক পরিশ্রমের কাজ না করিতে পারিয়া চরম দারিদ্র্যের দ্বারা পিষ্ট হইতেছে। কিন্তু নিম্নস্তরের লোকেরা—যারা দৈহিক পরিশ্রমে কাতর নয়, কন্যাপণের জন্য তাদের বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহ হয় না এবং যখন হয়, তখন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বয়সের এত পার্থক্য থাকে যে তাহাও বংশ বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নহে। এই সকলের মিলিত ফল এই হইতেছে যে হিন্দুর বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ইহার প্রমাণ লইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে না—যেখানে বাঙ্গলা দেশের সর্ব্ববৃহৎ ষ্টেশনে একটীও বাঙ্গালী কুলী নাই। আমরা গ্রামে বসিয়াই দেখিতে পাই যে বর্ত্তমানে পুষ্করিণী খননের সময়, ইমারত নির্ম্মাণের সময় সাঁওতাল পরগণা হইতে লোক আসিয়া কাজ করিয়া যায়। বাঙ্গলার গ্রামে দুলে বেহারার স্থান আজ উড়ে বেহারা দখল করিয়াছে, চাষবাসের কাজেও অনেক সময় জন-মজুরের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং সাঁওতালীর দ্বারা কাজ চালাইতে হয়। এসব নির্দ্দেশ করিতেছে যে, তথাকথিত নিম্নস্তরের বাঙ্গালী হিন্দুর বংশ-লোপ ঘটিয়াছে—তা সে ম্যালেরিয়ার জন্যই হউক কিংবা খাইতে না পারিয়াই হউক, কিংবা উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না করিতে পারিয়াই হউক। দীর্ঘকাল তাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই বটে, কিন্তু এখন আর চোখ বুঁজিয়া থাকিবার উপায় নাই।

মুসলমান তাহার বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ লইয়া এরূপ শনৈঃ শনৈঃ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে যে, তাতে সকলের তাক্ লাগিয়া যায়—মনে হয় যেন সংখ্যা বৃদ্ধিই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই হিতাহিত বিবেচনা বর্জ্জিত সংখ্যা বৃদ্ধির আকুল প্রচেষ্টা হিন্দুরও মন টলাইয়া দেয়—হিন্দুও সময়ে সময়ে মনে করে সংখ্যা বৃদ্ধিই তার আশু সমস্যা। অনেকে হয়তো মনে করেন যে একই দেশে যখন বাস অথচ মুসলমান যখন দারিদ্র্যকে ভয় করে না, তখন শুধু হিন্দুর মাথায় ম্যাল্থসের ভূত চাপিয়ে বসে কেন? এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যে দেশে গড়পড়তা মাসিক আয় মাত্র ২৷৩ টাকা, সেখানে দারিদ্র্যকে অত্যধিক ভয় নিরর্থক। তাহা হইলেও জন সংখ্যার বৃদ্ধির জন্যই যে হিন্দুকে বিবেচনা শূন্য হইয়া মুসলমানের সঙ্গে পাল্লা দিয়া দৌড়াইতে হইবে, ইহা স্বীকার করা যায় না।

আসল কথা হইতেছে এই যে, মানুষের সমাজ অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের সব কাজেই অর্থের প্রয়োজন অত্যধিক। ব্যষ্টির পক্ষে যাহা খাটে, সমষ্টির পক্ষেও তাহাই; কাজেই আর্থিক সমস্যার সমাধান না করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে দুঃখ কষ্ট আরও বাড়িবে বই কমিবে না।

তা আর্থিক বিকাশেরই কোন আশা আছে কি? ব্যবসা গেল, কৃষি গেল, রাজকর্ম্ম গেল, এখনকার ঢেউ হইতেছে কুটীর শিল্প! ছাতা সেলাই আর জুতা বুরুষ—এই উঞ্ছবৃত্তিতে আর কতটুকু পেট ভরিবে? শোনা

যায় ইংরাজ রাজত্বের সুরুতে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ইচ্ছা করিলে ব্যবসা বাণিজ্য আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিতেন—তাঁদের সে সুবিধা ছিল কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সে পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহাই যদি প্রকৃত ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমরা বাঙ্গালীরা যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্যের জন্য গর্ব্বানুভব করি, সে সম্বন্ধে সন্ধিহান হইতে হয়। একটা বুদ্ধিমান জাতির কি এতটুকু দূরদর্শিতা থাকিবে না, যদ্দারা সে ব্যবসা ও চাকরীর তফাৎ বুঝিতে পারে? এই সামান্য কথা বুঝিবার জন্য যদি ২।৩ পুরুষ কাটাইতে হয়, তাহা হইলে অত বুদ্ধিরই বা গরব কিসের?

আসল কথা হইতেছে ব্যবসা করিবার মত বিত্ত অতি অল্প সংখ্যক বাঙ্গালীরই ছিল এবং বিত্তহীনের ব্যবসা নাই। আমরা আজ রাগ করিয়া বলি বটে—মাড়োয়ারী লোটা কম্বল লইয়া আসিয়া মুলুকের মালিক হইয়া যায় কিন্তু সেই লোটা কম্বলের মধ্যে যে টাকা লুক্কায়িত আছে, তার কথা আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক ভুলিয়া যাই। কথাটা খোলসা করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, নিঃস্ব লোটা কম্বলওয়ালা মাড়োয়ারীকে সাহায্য করিতে ধনশালী মাড়োয়ারী যত্নবান এবং এই সাহায্যই মূলধনের কার্য্য করে, কিন্তু ইহা ত নূতন কথা নয়—ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে আলিবর্দ্দি সময়েও জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, আর্ম্মানিয়াণ খোজা ওয়াজিদ এবং আগা ম্যানুয়েল বাঙ্গলার সর্ব্বোচ্চ মহাজন। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন দেশবাসী বণিকেরা বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। আচার্য্য রায়ের Life and Experiences গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, আলিবর্দ্দির সময় বাঙ্গলার ব্যবসা (১) তুরাণী (২) পাঠান (৩) আর্ম্মানিয়াণ (৪) মুঘল (৫) অবাঙ্গালী হিন্দু (৬) ইংরাজ কোম্পানী (৭) ফ্রেঞ্চ কোম্পানী ও (৮) ডাচ কোম্পানীর হস্তগত ছিল।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে আর এত বহুসংখ্যক চাকুরী ও তার মোহ ছিল না। তবু আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ব্যবসা ক্ষেত্রে নাম রাখিয়া যাইতে পারেন নাই কেন? আর যদিই বা কোথাও কচিত দু'একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহা হইলেও জাতিগত ভাবে ব্যবসা আমাদিগকে কোন দিন আকর্ষণ করে নাই কেন?

বাঙ্গালীর এই আর্থিক দুরবস্থা আজিকার নয়। বাঙ্গালী প্রজা ও জমিদার এ বিষয়ে কোন ভেদাভেদ নাই। খাজনা দিতে না পারায় মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাঙ্গালী ভূম্যাধিকারীরা লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইতেছেন ও অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিতেছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এতৎ সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, তখন প্রায় সমস্ত প্রদেশেই রাজস্ব প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গলা তখনও নিয়মিত ভাবে রাজস্ব প্রদান করিতেছে এবং ইহাই তখন সম্রাটের রাজকোষের প্রধান এবং একমাত্র অবলম্বন ছিল। 'Mandeville writing in 1750 states that the payment of the Emperor's revenue sweeps away almost all the silver—coined or uncoined, which comes into Bengal. It goes to Delhi from which it never returns to (lower) Bengal; so that after such treasure is gone from Muxadabad (Murshidabad), there is hardly currency enough left in Bengal to carry on any trade, or even to go market for provisions and necessaries of life till the next shipping to bring a fresh supply of silver.'

বহুদিন পরাধীনতার ফল যাহাই হয় তাহাই হইয়াছে—রাজসভার অতুল ঐশ্বর্য্যের নীচে বাঙ্গালী প্রজার অরুন্তুদ মর্ম্ম-কাহিনী চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তার উপর দীর্ঘকাল মোগল পাঠানের ও নবাবদের নবাবীয়ানার খরচ জোগাইবার ফলে বাঙ্গালী প্রজা একদম নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালা হইতে যে অর্থ দিল্লীর রাজকোষে যাইত তাহার ভগ্নাংশ ও বাঙ্গলা ফিরিয়া পাইত কিনা সন্দেহ। রাজসভার ও রাজ-অন্তঃপুরের বিলাস ব্যসন,

দিল্লী, ফতেপুরসিক্রী, ও আগ্রার মর্ম্মর প্রাসাদ নির্ম্মাণ, পাঠান ও মোগল সম্রাটদের নিরন্তর যুদ্ধাভিযান—এসব ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার পর যাহা কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকিত তাহা তৈমুর লঙ্গ, আমেদসা আবদালি, নাদীর সাহ প্রভৃতির জন্যই সঞ্চিত থাকিত।

তারপর বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই যে, পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৫৭ হইতে ১৭৮০ পর্য্যন্ত এই কয় বৎসরে তিন কোটী ত্রিশলক্ষ পাউণ্ড নিষ্কাষিত হইয়া বাঙ্গলা হইতে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। এখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পরবর্ত্তী জীবনে ক্লাইভের নামে যখন দোষারোপ হইয়াছিল যে তিনি বাঙ্গলা দেশ হইতে প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছেন—তখন তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে অগণিত মণিমাণিক্য স্বর্ণরাজি পরিপূরিত নবাবের রাজকোষ হইতে তিনি এত কম অর্থ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি করিয়া—ইহা ভাবিয়া তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যান!

তাছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে যখন বাঙ্গলার শাসনভার ন্যস্ত হইল তখন সারা দেশের বিশৃঙ্খলতার জন্য বাঙ্গলা দেশকেই ভারতবর্ষীয় যাবতীয় যুদ্ধাভিযানের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে। আরও কতভাবে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাঙ্গলা দেশ হইতে টাকা স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহার পুরাবৃত্তান্ত আচার্য্য রায়ের Life end Experiences গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। হাণ্টার সাহেব বলেন, "Bengal from the very first seems to have the milch-cow from which the other provinces drew their support."

এই সকলের মিলিত ফল এই হইয়াছে যে বাঙ্গলা অর্থশালী দেশ হইয়াও বাঙ্গলার প্রজার অর্থ নাই। সেই জন্য অকথ্য নির্য্যাতনেও বাঙ্গলার প্রজা পড়িয়া মার খাইয়াছে কিন্তু খাজনা দিতে পারে নাই। সেই জন্য ইংরাজ রাজত্বের সুরুতে যখন চাকরীর প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন বাঙ্গালী যেন হাতে চাঁদ পাইয়া বাঁচিয়া গেল। এখানে ওখানে যদি দু একজন বাঙ্গালীর কিছু সঞ্চিত বিত্ত থাকে, তার দিকে নজর দিলে চলিবে না, কারণ তা হইতেছে জাতির সমস্ত উদ্‌বৃত্তের ধ্বংসাবশেষ—বাড়ী ঘর বিক্রয় হইবার পর স্ত্রী কন্যার অলঙ্কারের সামিল।

বাঙ্গালী যেরূপ ঘর ছাইবার সুযোগ পাইয়াছিল, এরূপ আর কেহ পায় নাই। পেশোয়ার হইতে বর্ম্মা—সিমলা হইতে মধ্য প্রদেশ পর্য্যন্ত হাজার হাজার বাঙ্গালী, পঙ্গপালের মত, সমস্ত হিন্দুস্থান ছাইয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু সাহেবদের অনুকরণে জীবন যাত্রার আদর্শ উচ্চ করিতে গিয়া খাইয়া দাইয়াই বাঙ্গালী ফতুর হইয়া গেল। আমি অধিকাংশের কথাই বলিতেছি, ব্যতিক্রম অবশ্য সব বিষয়েরই থাকে।

নিছক লম্বা লম্বা কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। যে জাতির হাজার হাজার লোক একান্ত বেকার, সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন হইলেই যাহারা সন্তুষ্ট—তাহাদিগকে লক্ষপতি হইবার কথা বলা উপহাস মাত্র। অথচ ১০০।১৫০ টাকা মাহিনা আজকালকার বাজারেও নেহাৎ তুচ্ছ নয়। এক জন বাঙ্গালীর ১০০ টাকা মাহিনা হইলে খুব কম পক্ষেও সে ১১০ টাকা খরচ করিবে। আর একজন হিন্দুস্থানীর ১০০৲ আয় হইলে খুব কম পক্ষে সে অন্ততঃ মাসিক ২০ টাকা জমাইবেই—ইহা ত প্রত্যক্ষের বিষয়।

হিন্দুস্থানী উপার্জ্জন করে, খরচও করে, আবার সঞ্চয়ও করে। আর বাঙ্গালী উপার্জ্জন করে, খরচ করে, আবার ঋণও করে। তাদের মধ্যে যাদের লাইফ ইনসিওর্যান্স কিংবা অন্য কোন ভাবে বিত্ত গচ্ছিত থাকে, মৃত্যুর পর তাদের ঋণ শোধ হয়, আর যাদের তা থাকে না, তাদের ঋণের টাকাও মহাজন পায় না।

মনে রাখিতে হইবে যাঁহারা চাকুরী করেন তাঁহাদের অবস্থাই অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। কোন্ গ্রামের অবস্থা

কিরূপ সচ্ছল তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমরা পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকি—গ্রামে কয়জন সরকারী চাকুরিয়া আছেন।

কৃষিজীবিদের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে। ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গলার ঋণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—১৯৩৩ সনের শেষভাগে বাঙ্গলার কৃষিজীবিদের ঋণ সুদে আসলে ১৫০ ক্রোর হইয়া উঠিয়াছে এবং বাঙ্গলার অধীবাসীগণের মধ্যে শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবি এবং তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই ঋণ জালে আবদ্ধ। অর্থনীতি তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা নানারূপ হিসাব করিয়া ৫৫ টাকা হইতে ২৫৬ টাকা প্রত্যেক পরিবারের ঋণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই ঋণ প্রায় বংশ পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। কৃষিজীবিরা যা কিছু পরিশ্রম করিয়া উৎপন্ন করে, তাহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ অধিকাংশই কুসীদজীবিদের পেটে গিয়া পড়ে এবং পুনরায় তাহাদের ঋণ করিয়া কার্য্য চালাইতে হয়। (ডাঃ বসুর 'বঙ্গের পুনর্গঠন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

আজকাল চাকুরী মিলে না—তবুও এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী পিতা মাতা আশা করিয়াছেন যে ছেলে এই বার পাস্ করিল—এইবার সংসারের ভার নিবে। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যা দাঁড়াইয়াছে যে পাস করিবার পরও চাকুরী জুটে না।

দেশের এই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য যে কবে আমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে সে কথা আজ অনুমান করাও কঠিন।

Life and Experiences গ্রন্থে যাহা পাই তার সার মর্ম্ম হইতেছে এই যে—ব্যবসা, বাণিজ্য বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়াছে তার সাহস, সাধুতা এবং কর্ম্মপটুতার অভাবে। ইহাই যদি সমগ্র কারণ হয়—তাহা হইলে আমাদের উন্নতির আর কোন আশা নাই। যদি কোন জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি উক্ত অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে জাতি ভূপৃষ্ঠ হইতে যত শীঘ্র নির্ম্মূল হইয়া যায়—পৃথিবীর পক্ষে ততই মঙ্গল।

তারপর বাঙ্গালী শ্রমজীবিদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ যাহা লোকমুখে অহরহ শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এই যে, তাহারা শ্রমবিমুখ অলস। একজন হিন্দুস্থানী মজুরকে দিয়া যে কাজ পাওয়া যায়, একজন বাঙ্গালী মজুরের কাছে ততটা কাজ আদায় করা যায় না। অভাবের চেয়ে ভাল শিক্ষক আর নাই, তা সেই অভাবগ্রস্ত বাঙ্গালী মজুর যদি অলস এবং শ্রমবিমুখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা শিক্ষার দোষ না রক্তের দোষ—ইহা বিশেষ করিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

ব্যবসা করিবার অর্থ নাই, চাকুরী নাই, কৃষিকার্য্যের জন্য লোকপিছু দেড় বিঘার বেশী জমিও নাই। তবু রাজনৈতিক নেতারা মাঝে মাঝে হুজুক্ তুলেন যে সহর ছাড়িয়া সব গ্রামে ফিরিয়া চল। সহরে যে লোক দুই মুঠা খাটিয়া খুটিয়া খাইয়া বাঁচিতেছে, গ্রামে গেলে যে সে বেচারা উপবাস করিয়া মরিবে! সে খেয়াল তাঁহাদের আছে কি?

গ্রামে গেলেই যদি লোকের দুঃখ দারিদ্র্য সব ঘুচিয়া যায়, লোকে দুবেলা দুমুঠো খাইয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তাহা হইলে সহরে যে দুদশ লাখ লোক চলিয়া গিয়াছে তাহাদের আশা ছাড়িয়া দিয়া গ্রামের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টাই হউক না কেন? কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই।

অর্থবান লোকেরা সহরের বিলাসিতার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, কিংবা কাজের অজুহাতে গ্রামে যাইবেন না। সে ক্ষেত্রে অর্থহীন ও ভূমিহীন লোকেরা গ্রামে যাইয়া জীবন ধারণের কোন সুযোগ পাইবে কি?

শিক্ষিত হিন্দু বেকার যুবকেরা আজ বিবাহ করিতে চাহেন না দায়ে পড়িয়া! সে একান্নবর্ত্তী পরিবারও নাই, অভিভাবকেরাও বেকার পোষ্যের বিবাহ দিয়া আর অধিক দায়গ্রস্ত হইতে চাহেন না। একান্নবর্ত্তী পরিবারের অভাবে লোকে স্বাবলম্বী হইয়া বিবাহ করিবে—ইহাই যুক্তি সঙ্গত কিন্তু লোকে কাজাকাজের বিচার করিয়া যে বয়সে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে সেই বয়সে অপরের গলগ্রহ হইয়া হেলায় কাটাইতেছে। এতে লোকে স্বাবলম্বীই বা হয় কি করিয়া এবং দার পরিগ্রহ করিয়া বংশ বৃদ্ধিই বা করে কেমন করিয়া?

সমাজের মধ্যে দৈহিক পরিশ্রমই যাহাদের একমাত্র উপজীব্য, তাহাদের সম্বন্ধে এসব কথা পুরাপুরি খাটে না। প্রথমতঃ তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সাতিশয় উচ্চ নয়, দ্বিতীয়তঃ শারীরিক মেহনতের কাজ করিতে পারিলে বাঙ্গলা দেশে তার যে কিছু অভাব আছে তাও নয়। কিন্তু ঘরকুণো বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে তো পারিল না! যে গৃহে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, পরন্তু পাঁচ ভাগারীর খুঁটিনাটী লইয়া নিরন্তর কলহ কিচি কিচি লাগিয়াই আছে, সেই গৃহ বাঙ্গালী শ্রমজীবিকে এমন কি মধু দিল তা সেই—জানে! তবু সে গৃহ কোণ ছাড়িয়া বাহিরের সংগ্রামে লিপ্ত হইতে পারিল না।

কিন্তু ইহাই সব নয়। প্রদেশান্তর হইতে আগত, দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষের দল বাঙ্গলার আভ্যন্তরীণ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালী শ্রমজীবির অন্নে দিনরাত হানা দিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাঙ্গলার গ্রামে দুলে বেহারার স্থান আজ উড়ে বেহারা দখল করিতেছে। অপেক্ষাকৃত সস্তায় সোয়ারী লইয়া মিথ্যা সম্ভ্রমের মোহে যে দুলে বেহারা হঠিয়া যাইতেছে তা নয়, দুলে বেহারারা স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘরসংসার করে—কাজেই যে জায়গায় তাহারা সাড়ে চারিটাকা পারিশ্রমিক দাবী করে, স্ত্রী পুত্র হীন উড়ে বেহারারা সেই জায়গায় তিন টাকায় সন্তুষ্ট। দাম কমাইবার ও একটা সীমা আছে। দুলে বেহারারা যতই দাম কমাক, উড়ে বেহারারা তার চেয়ে নীচে নামিবেই। কাজেই এরূপ অসমপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙ্গালী মজুর বাঁচিতে পারে না।

নিম্নস্তরের বাঙ্গালী হিন্দুকে রক্ষা করা যে উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালী হিন্দুর দায়, এ ধারণা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দুর নাই, তার উপর বাঙ্গালী জনসাধারণের পয়সারও সচ্ছলতা নাই।

অন্যান্য দেশে ঠিক এরূপ ক্ষেত্রে ভিন্ন দেশাগত অধিবাসীদের নিষ্কাষণের ব্যবস্থা চলিতেছে! আমেরিকায় যাহাতে জাপান, চীন ও ভারতবর্ষের লোক অবাধে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য নানারূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ভারতবাসীদের নিষ্কাষণ নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেও ঐ একই কারণে—কিন্তু কেবলমাত্র বাঙ্গলা দেশকেই কি যোগ্যতমের জয় দেখাইতে হইবে?

কিন্তু এই যোগ্যতা লইয়া কড়াকড়ি করাটা নিতান্ত ধাপ্পাবাজী ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই-যে Literary education অধিক বিস্তৃতি লাভ করার ফলে আজ হাজার হাজার বেকার অলস, ভবঘুরে ব্যক্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই যথেষ্ট শিক্ষিত। কাজেই ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, কর্ম্ম সামর্থ্যও তাঁহাদের যথেষ্ট আছে। কাজেই যদি তাঁহারা দাবী করেন যে তাঁহারা যথেষ্ট কম বেতনে অধিকাংশ সরকারী চাকরী গুলির কাজ করিয়া দিতে রাজী আছেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান পদস্থব্যক্তিগণের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়? বর্ত্তমান পদস্থ ব্যক্তিরা যাঁহারা পুত্র কলত্র লইয়া ঘর সংসার করিতেছেন, তাঁহারা কি দাম কষাকষিতে বেকারের নীচে নামিতে পারেন? কিছুতেই পারেন না। কিন্তু সরকার আশ্রিত-কর্ম্মচারীদের মঙ্গল অনুধাবন করেন বলিয়াই এরূপ অসম প্রতিযোগিতার নীতি মানিয়া লয়েন নাই।

কাজেই বাঙ্গলার মজুর যে দাম কষাকষিতে বেশী নামিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা দোষ হইয়াছে তা নয়, দোষ হইয়াছে যে বাঙ্গালী বাঙ্গালী বলিয়া জনসাধারণের নিকট তেমন কোন বিশেষ সহানুভূতি পায় নাই।

শিক্ষিত হিন্দুর কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা যে কাজের জন্য শিক্ষালাভ করিয়াছেন সে কাজ কোথাও খালি নাই। খবরের কাগজে পড়া যায়—সে দিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৮০টা অস্থায়ী চাকরীর জন্য দশহাজার প্রার্থী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—শেষে পুলিশ ডাকিয়া জনতা সরাইতে হয়। বেকার সমস্যার ব্যাপকতা ও তীব্রতা ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে।

শিক্ষিত বেকারের দুঃখের আর কুলকিনারা নাই। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, শিক্ষিত বেকারদের মধ্যেই মাঝে মাঝে কর্ম্মহীনতার জন্য আত্মহত্যার কথা শোনা যায়। ইহা জাতিকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধির পথে লইয়া যাইতেছে না। নিম্নস্তরের বাঙ্গালী হিন্দুর বংশ লোপ ইতিপূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। এখন উচ্চস্তরের মধ্যেও উহা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া বাস্তবিকই আশঙ্কার কারণ হইয়াছে।

আমরা কি চাই ?. আমরা চাই সবল সুস্থ লোক। জন বল একটা মস্ত বড় বল। মোটামুটি অন্নবস্ত্রের সংস্থানের পর জীবন যাত্রার আদর্শ না বাড়াইয়া হিন্দু যত বাড়িতে পারে বাড়ুক—অন্যথা একপাল রুগ্ন ও মলিন শিশু সৃষ্টি করিবার কোন আবশ্যকতা নাই যাহা জাতির কর্ম্মশক্তি ক্রমাগত ব্যাহত করিবে—যাহা জাতির অগ্রগতিকখানি পিছাইয়া দিবে।

কিন্তু উপায় কিছু আছে কি ? অনেকে আশা করেন বাঙ্গলার জমিদার ও অর্থশালী লোকেরা অগ্রসর হইয়া দুচারটে লিমিটেড কোম্পানী ও কল কারখানা খুলিলেই সমস্যা সরল হইয়া যাইবে—যদিচ আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশের অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে কল কারখানা বেকার সমস্যা সমাধান করিতে পারে নাই কিন্তু এ প্রশ্ন এখানে স্বতন্ত্র। মনে রাখিতে হইবে অর্থশালী লোকদের মধ্যে জীবন সংগ্রাম প্রকট নয়—কষ্ট হচ্ছে জনসাধারণের—সমস্যা তাহাদেরই। কাজেই কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে তাহাদের আর চলে না। আর বাঙ্গলার জমিদারের কথা খবরের কাগজে যেরূপ পড়া যায়, তাহাতে মনে হয় সব জমিদারীগুলিই বা অচিরে কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাইবে। সকলেই নিজের জ্বালায় অস্থির—কে কাকে দেখে ?

'হিন্দু ও মুসলমান'প্রবন্ধে যে কথা বলিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিতে হইতেছে যে, জাতি বিভাগ ও আনুসঙ্গিক বৃত্তি বিভাগ ভিন্ন বেকার সমস্যা সমাধানের আর কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। কিন্তু নানা কারণে কেহই আজ স্ব স্ব বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেছেন না। কুম্ভকার মৃন্ময় পাত্র তৈয়ার করিবে কিন্তু আমরা কিনিব জার্ম্মানীতে প্রস্তুত এ্যালুমিনিয়মের বাসন। দেশী কামারের মোটা ছুরী কাঁচি ভোঁতা মনে হয়—তাহাতে বিংশ শতাব্দীর কাজ চলে না—কাজেই সেফিল্ডের ছুরী কাঁচি কিনিতে হয়। সুতরাং স্ব স্ব বৃত্তিতে দিন চলে না দেখিয়াই সর্ব্বলোকে লেখা বৃত্তিগুলির প্রতি অত্যধিক ঝোঁক দিয়াছিল কিন্তু তাহাতেও শেষ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা হইল না।

কাজেই আজ যদি বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব না হয়, যদি সমগ্র জাতির মধ্যে একটা একাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব পর না হয়, যদি জাতির একাংশ আঘাত লাগিলে অন্য অংশ ব্যথা অনুভব না করে, যদি নিম্নজাতির বৃত্তিলোপে উচ্চজাতি নির্ব্বিকার থাকে, তাহা হইলে মহাকাল তাকে ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠ হইতে

অপসারিত করিবে—ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে। বংশ বৃদ্ধি এবং বংশ রক্ষা করিতে অপারগ হইয়া অনেক প্রাচীন সভ্যতা এই ভাবেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—বাঙ্গালী জীবনেও তাহার লক্ষণ সমূহ দেখা যাইতেছে—সমগ্র জাতি দিন দিন ক্ষয়িষ্ণু।

অন্নসমস্তাই বাঙ্গালী হিন্দুর একমাত্র সমস্তা নয়, সংখ্যা বৃদ্ধিও তাহার অন্ততম প্রধান সমস্তা। আজ সকল জাতিই লেখ্যবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট বলিয়া অন্নসমস্তার পথ কণ্টক সঙ্কুল। জাতিবিভাগ যে জীবন দ্বন্দ্ব সরল করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই জাতি বিভাগের মূলনীতি রাজশক্তি দ্বারা স্বীকৃত না হওয়াতে উপস্থিত ইহা কোন কাজেই লাগিতেছে না, পরন্তু জাতিবিভাগের ভেদবুদ্ধি প্রকট হইয়া হিন্দুর সংহতি শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই জন্য যে, পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন যতই কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইবে দাম্পত্য জীবন (Sex-life) ততই জটিল হইয়া পড়িবে।

যে জাতিবিভাগ আজ অন্নসমস্তাকে সরল করিতে পারিতেছে না, পরন্তু সংখ্যা বৃদ্ধির পথে এবং একাত্ম বোধের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যে জাতি বিভাগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট উপজাতি বিভাগ ঘনিষ্ট পরিধির মধ্যে আদান প্রদান সীমাবদ্ধ করিয়া সুস্থ সবল লোক সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে না—পরন্তু অলস শ্রমবিমুখ লোকেরই সৃষ্টি করিতেছে—তাহার আজ মূলোৎপাটন আশু প্রয়োজন এবং তাহা সম্ভব হইতে পারে যদি প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দধিচির মত নিজের অস্থি দিয়া সমাজের পুনর্গঠন করেন।

এই জাতিভেদের নিরসন হইলে তবেই বাঙ্গালীর মধ্যে সত্যিকারের প্রাদেশিক সংকীর্ণতা আসিবে যাহা হয়ত বাঙ্গালীকে বাঁচাইলেও বাঁচাইতে পারে—কারণ জাতিভেদও থাকিবে এবং যুগপৎ Provincialism, Socialism কিংবা Communism এর প্রবর্ত্তন হইবে—ইহা হইতেই পারে না। **বাস্তবিক পক্ষে এইসব ism গুলি আর্থিক দুঃখের চরম মহৌষধ কিনা—সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।**

সুলক্ষণ কিছুই নাই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গালী হিন্দু যে মুমূর্ষু এ বিষয়ে মতদ্বৈধতার স্থান নাই। বাঙ্গালীর অর্থ নাই, কাজেই ব্যবসাও নাই, তার চাকরী নাই, তার কৃষি নাই, সমাজ শৃঙ্খলার দাবী মিটাইতে গিয়া তার আষ্টে পৃষ্ঠে সহস্র ক্ষত। তাই মৃতের নিশ্চলতা তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে—আজ না হয় কাল সে লোপ পাইবেই—শুধু তার মরিতে কতটা সময় লাগিবে এ বিষয়ে তর্ক করা যাইতে পারে। আজ তাই চতুর্দ্দিক হইতেই তার ক্ষীণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে—মরিবার সময় এত গোলমাল কিসের—যে নীরবে ভাল মানুষের মত মরিতে চলিয়াছে তাহাকে একটু শান্তিতে মরিতে দাও।

—পূর্ব্বাচল

আমেরিকায় "লিঞ্চিং"

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

যদি ইংরাজি অক্ষরের "এন্" (N)কে ধরা যায় নিগ্রো, এবং "আর"কে (R) ধরা হয় Rape (পাশবিক অত্যাচার), তবে এই দুই এর যোগে হয়ঃ অর্থাৎ N+R= Lynching। যুক্তরাজ্যের লোকেরা, বিশেষতঃ যুক্তরাজ্যের দক্ষিণের লোকেরা সকলেই এ কথাটী বেশ ভাল করে বোঝে। এই লিঞ্চিং কথাটার মানে হয়তো জয়শ্রীর পাঠিকারা সকলে বুঝতে পারবেন না; তাই এখানে একটু বিবরণ না দিয়ে পারছি না।

যুক্তরাজ্যের কালো নিগ্রোরা যখন সাদা মেয়েদের প্রতি অত্যাচার করে, অথবা সাদারা কোনও নিগ্রোকে ঐজন্য সন্দেহ করে, তখন নগরবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কালো অপরাধীকে যেখানে পায় সেখান থেকে, এমন কি, জেল থেকে জোর ক'রে টেনে বের করে রাস্তার উপর নানারকম অমানুষিক যন্ত্রণা দেয়। পরে দোষীর গায়ে আগুণ লাগিয়ে আস্তে আস্তে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়ে পুড়িয়ে মারে। এই নিষ্ঠুর, নির্ম্মম অত্যাচার এখনো প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আইন ক'রে যাতে এই পাশবিক অত্যাচার বন্ধ হয় তার বহু চেষ্টাও হ'য়েছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার কোনও ফল হয় নাই। বর্ত্তমানে Costigan—Wagner Anti-lynching bill,* পাশ করার চেষ্টা হচ্ছে। হবে কি, না, তা এখনো বড় কেউ জানে না।

যদিও আমেরিকার Lynching আগের চেয়ে বহু পরিমাণে কমে গেছে, তবু এখনো এমন মাস বোধ হয় যায় না যখন অগত্যা ২।১টা লিঞ্চিং না হয়। এই বর্বরতা নির্ম্মূল করার একমাত্র উপায় বোধ হয় কড়া আইন। ১৯৩১ সালে আমেরিকার দক্ষিণদিকে Maryville নামক একটা জায়গাতে একটা স্কুল শিক্ষয়িত্রীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। এজন্য সেখানে মহা হৈ, চৈ উঠে। দু'দিন পরে গান (Gunn) নামক একটী নিগ্রো এই শিক্ষয়িত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার ও হত্যা করার দোষ স্বীকার করায় তাকে অচিরাৎ জেলে রাখ্‌বার জন্য জেলকর্ত্তৃপক্ষ বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু এই সংবাদ জনসাধারণের নিকট এত দ্রুত প্রচার হয় যে তার বিচার কার্য্য হওয়ার আগেই ঐ নিগ্রোকে জোর ক'রে জেল থেকে বের করে

* The Costigan—Wagner Anti-lynching bill; the strongest yet introduced, is again waiting the Senate's pleasure. It provides heavy fines or imprisonmet or both, for officers failing to be deligent in apprehending and prosecuting lynchers; for those conspiring to kill a prisoner, and for those who allow a prisoner to be taken from them. In the event of a lyncing, the state is given thirty days' grace in which to act against the lynchers. After the U. S. District Court has jurisdiction. Counties in which lynchings occur. will be fined R. 2,000, to 10.000 the money payable to the victim's family. At its last session the Senate failed to act on this bill".

লিঞ্চ্ করা হয়। সে সময়ে একটী ট্রেণের কণ্ডাক্টর একজন মেয়ে যাত্রীকে মেরিভিল এ যেতে দেখে বলেছিল, "আপনি ঠিক সময়েই বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন; এখানকার লোকেরা "নিগার"টাকে লিঞ্চ্ করার জন্য বিরাট আয়োজন করছে। আপনি ঠিক সময়েই এই উৎসব দেখতে পাবেন"। এই লিঞ্চিং "উৎসবের" কথা এত তাড়াতাড়ি প্রচার হয় যে সংবাদ পত্রের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের ভীড় সেদিন Marysvilleএ যেমন হ'য়েছিল এমন বড় সচরাচর হয় না।

এই নিষ্ঠুর বর্ব্বর প্রথার রেকর্ড বা হিসাব সর্ব্ব প্রথম রাখা হয় ১৮৮২ সালে। এবং এই রেকর্ড অনুযায়ী দেখা যায় যে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত মোট ৪,৯৯৮ জন হতভাগ্য আমেরিকার এই বর্ব্বর প্রথায় জীবন দিয়াছে। বাদ পড়েনি কেউ—পুরুষ, স্ত্রী, সাদা, কালো। এই ৪,৯৯৮ মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল সর্ব্ব সমেত ৯৪ জন।

সব সময় যে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করার জন্যই লিঞ্চিং করা হয় তা যেন কেউ মনে না করেন। Maryvilleএর এই দুর্ঘটনাটীর দুই মাস পরে Alabama নামক একটী স্থানে একটী নিগ্রোকে একদল সাদা খুন করে। প্রকাশ যে হতভাগ্য নিগ্রোর অপরাধের মধ্যে ছিল, যে সে, কালো নিগ্রো, এবং অবস্থাপন্ন নিগ্রো জমিদার। নিগ্রো যতদিন গরীব নিগ্রো থাকে, এবং স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, ততদিন তার দোষ তেমন নয়। তবে সে যদি সাদাদের মত জমিদার হয়, সাদাদের মত সুখ ভোগ ক'রতে চায়, সে হয় অন্য কথা। Alabamaর সাদারা তার সুখ ও সম্পদ সহ্য করতে না পেরে তাকে খুন করতে দ্বিধা করেনি।

১৮৯২ সালে যুক্তরাজ্যে মোট ২৫৫টী নিগ্রোকে লিঞ্চ করা হয়। এর তুলনায় ১৯৩২ সালের মাত্র ১০টী অনেক ভাল। তুলনায় লিঞ্চিংএর সংখ্যা বহু পরিমাণে কমে গেলেও যে বর্ব্বরতা অবলম্বনে হতভাগ্যদের প্রাণ লওয়া হয় তা বাস্তবিকই অমানুষিক, এবং বোধহয় একমাত্র আমেরিকাতেই তা সম্ভব। ১৯১৯ সাল হ'তে এ পর্য্যন্ত ৪৫টী হতভাগ্যকে আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এই ৪৫টীর মধ্যে দু'টী শ্বেতাঙ্গকেও এই প্রথায় মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়েছে। আমার এই প্রবন্ধ লিখ্তে লিখ্তে একই দিনে আরো দু'টী নিগ্রোর লিঞ্চিংয়ের খবর সংবাদপত্রের মারফতে চোখে পড়ল, কাজেই মনে হয় যে এ পৈশাচিকবৃত্তি সহজে বন্ধ হবার নয়।

এই পৈশাচিক "উৎসব" কেমন সমারোহে হয়ে থাকে, জয়শ্রীর পাঠিকারা একবার মন দিয়া শুনুন। এ অত্যাচারের কথা ভাবলেও যে গা শিউরে উঠে। কেবলই মনে হয় সভ্য বলে এরা এত গর্ব্ব করে কোন মুখে? কয়েক বছর আগে সাউথ জর্জ্জিয়ার অধিবাসীরা এক লিঞ্চিংএর সময়ে ছুরি হাতুড়ী ছুঁচালো কাঁঠি ইত্যাদি দিয়ে প্রথমে হতভাগ্যের সমস্ত ক'টি দাঁত তুলে নেয়; পরে তার যন্ত্রণা "নিবারণের" জন্য ক্ষত স্থানে দিয়াশালাইএর সাহায্যে আগুন

জ্বালিয়ে দেয়। আর একবার একটী লিঞ্চিংএ নিগ্রোটীর দাঁতগুলি ৫ ডলার মূল্যে নিলামে বিক্রী হয়; শুধু তাই নয়, তার হাতের আঙ্গুল, কাণ, হাড় ইত্যাদিও বিক্রীর জন্য নিলামে উঠে, এবং প্রচুর দামে কিন্‌বার লোকেরও অভাব হয় নাই। বীভৎস মৃতদেহের ফটোগ্রাফও ৫০ সেণ্ট্ দামে প্রচুর বিক্রী হয়েছিল। মানুষের চরম বর্ব্বরতা আর এর চাইতে বেশী কি হতে পারে? এই সব বর্ব্বর দর্শকদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাও কম থাকে না। ছেলে কোলে নিয়া অনেক মা এই "তামাসা" দেখ্‌তে আসেন। ১৯৩০ সালে Marion, Indiana নামক জায়গাতে যখন লিঞ্চিংএর "মহোৎসব" কয়েক হাজার লোকের উৎসাহে খুব জোর চল্‌ছিল, এখন একটী তরুণী মোটর গাড়ীর ছাদের উপর ব'সে উচ্চৈঃস্বরে "Hang that nigger, hang that nigger" বলে সেই বিরাট পিশাচ দলকে উত্তেজিত করছিল। "অবলা" (!) নারীর এই উৎসাহে আমেরিকার নর্‌ডিক্ (Nordic Blood) রক্ত তখন কেমন গরম হ'য়ে উঠেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

উৎসাহ অফুরন্ত! রেল কোম্পানী অনেক সময় "Lynching Special" ট্রেণ করে বেজায় লাভবান হয়। ছেলে বুড়ো সকল বয়সের যাত্রীই ট্রেণ বোঝাই করে "তামাসা" দেখ্‌তে যায়। ১৯২৫ সালে একখানি পাসেঞ্জার ট্রেণ Excelsior springs, missouri নিকটে থেমে রেল রাস্তার ধারে একটী নিগ্রোকে লিঞ্চকরা দেখে তবে আবার রওনা হয়।

যদি যুক্তরাজ্যে কড়া আইন হ'ত তবে এই রকম পশুবৃত্তি দমন করা আদৌ কঠিন হতনা। কিন্তু যুক্তরাজ্যের দক্ষিণে তা সম্ভব নয়—কারণ সেখানে সব সাদাই কালোদের বিরুদ্ধে প্রাণভরা বিদ্বেষ নিয়ে বাস করে, কাজেই যখন লিঞ্চ করার সুযোগ হয় তখন সকলেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এ কাজটী "সুসম্পন্ন" করে। সব সাদাই যদি নিগ্রোদের বিরুদ্ধে হয়, এবং একমাত্র সাদার হাতেই দেশের আইন হয় তবে কালোরা কি করতে পারে? তাদের না আছে অর্থ, না আছে সামর্থ্য? পৃথিবীর চোখে ধূলো দিবার জন্য যখন লিঞ্চিংয়ের পর ষ্টেট্ থেকে তদন্ত কমিটি বসে, তখন সকলেই অপরিচিত জানোয়ার বিশেষ। কেউ কারো জানা নয়; এবং একমাত্র লোক যার এই লিঞ্চিংএর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে, বা কিছু জানা আছে, সে হ'ল একমাত্র সেই হতভাগা, যার ঘাড় তারা ভেঙ্গে গেছে।

নিউইয়র্কে "Stevador" নামক একটী সামাজিক নাটক কিছুদিন আগে দেখতে গিয়াছিলাম। দক্ষিণে সাদা মেয়েরা নিজেদের কলঙ্ক চাপা দিতে কেমন ক'রে নিরীহ নিগ্রোদের "দোষী" করে ও লিঞ্চ করবার বন্দোবস্ত করে তা এই সামাজিক নাটকে ছিল। এই নাটকখানি নিগ্রোরা এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক করেছিল যে, নিউইয়র্কের সমস্ত সংবাদপত্রগুলির ভূয়সী প্রশংসাতে অনেক দিন এই নাটকখানি চলেছিল। যারা এই নাটকখানি দেখেছিল তারা কেউ চোখের জল না ফেলে ঘরে ফেরেন নি। নাটকখানিতে ৫।৭ জন সাদা নট ও

নটি ছাড়া বাকী সবই কালো ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে কালো বড় একটা ছিলনা, সবই সাদা এবং নিউইয়র্কের বাসিন্দা। নিউইয়র্ক উদার বলেই সাদার বিরুদ্ধে এ রকম নাটক চলা সম্ভব। যুক্তরাজ্যের দক্ষিণদিকের অন্য কোথাও হলে wholesale lynchingই বোধহয় স্বাভাবিক।

মানব চরিত্র জান্‌বার ও শিখ্‌বার অসীম কৌতূহল থাকার জন্য অনেক সময়ই অনেক রকম ভালমন্দ লোকের সংস্পর্শে আস্‌বার চেষ্টা করি। একবার একটী নিগ্রো social workerকে তার সাদা social workerএর সঙ্গে কতটা পার্থক্য জিজ্ঞাসা করায় তারা সাদা বিদ্বেষে বিকৃত মুখ আরো যেমন বিকৃত হয়ে উঠ্‌ল তাতে আমার মনে হয়েছিল যে সাদার প্রতি কালোর আর যাই থাক ভালবাসা নাই। সমান শিক্ষা পেয়ে সে সাদার মত সমান অধিকার পায় না, তাই সে বিদ্বেষে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। হওয়াটাও বোধ হয় নিতান্ত স্বাভাবিক।

আমেরিকায় নিগ্রো সমস্যা দেখে অনেক সময় ডাক্তার Kelly Millerরের লেখা একটী লাইন বিশেষ করেই মনে হয়, "The Negro must either get out, get white or get along." আমেরিকার কালো আমেরিকানরা কোন্‌টা বেছে নেবে কে বলতে পারে?

গান

শ্রীবেলা দেবী

মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়ে গো আছি তব পথ চাহিয়া!
ভাবে মোরে হায় দীন ভিখারী,—ফিরি গান গাহিয়া!
রুদ্ধ দুয়ার যেতে মোর মানা,
তাই কাঁদি বসি পথে গো অজানা,
খোল দ্বার খোল রুদ্র দেবতা এসেছি যে পথ বাহিয়া।

নিতি অপমান সয়েছি দেবতা তব মন্দির দ্বারে
কি কাজ তবে গো জড় প্রতিমার ভাবি শুধু বারে বারে,
ঘোর দুর্দ্দিনে রক্ষিবে কেবা
মিছে কেন করি আজি তার সেবা
দেবতা কোথায় থাকে সে যদি কাঁদে নাকি তারও পাষাণ হিয়া!

কাব্যী ছন্দী হাস্যী তর্কী
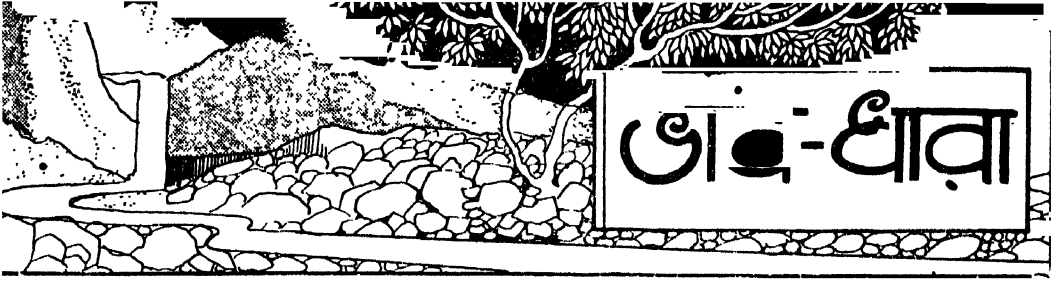
শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ছন্দের কৃত্রিমতা

সখীঃ প্রতিভা বলতে তুমি কি বুঝছ ঠিক বলবে ?

রসিক (হতাশ স্বরে) ঃ ঐ তো বৌদি—সংজ্ঞা নিয়ে টানাটানি করলে আমি নাচার। রস কী, কাব্য কী, প্রেম কী—এসব আলোচনা করার সময় মোটামুটি আবছা যে-সব ধারণা মন ছেয়ে থাকে তার ওপর বরাৎ দিয়ে আলোচনা করাই ভালো। বৈজ্ঞানিকদের মতন ডেফিনিশন নিয়ে গোলমাল করলেই ফ্যাসাদ। তবু প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন যখন তুললেই তখন একটা উত্তরও না দিলে মান থাকবে না। প্রতিভা বলতে আমি বুঝি—(ভাবিয়া) কী বুঝি ? সত্যি কি স্পষ্ট ক'রে বলতে পারি বৌদি ? মেঘের 'পরে পড়ে অস্তসূর্য্যের নানা রঙের হাসি-অশ্রুঃ এই-আছে-এই-নেই। তাদের এই সব ক্ষণলীয়মান আলোছায়ায় মনের আকাশেও বেজে ওঠে সে-হাসিকান্নার সাড়া। তাকে অনুভবে পাই, বলতে গেলেই যায় মিলিয়ে। প্রতিভার বেলায়ও তেমনি। তাঁর সৃষ্টি একটা জগত। একই বস্তু একই অনুভব একই রাগিণী তিনিও ফোটান, অ-প্রতিভাও। দুইয়ের মধ্যে মশলাও হয়ত অনুপাতে সমান—গড়ন ধরণধারণও হয়ত সমান অনবদ্য—যাকে বলো টেকনিক। কেবল একজনার সৃষ্টিতে ফুটে ওঠে ফুল, অন্যজনার—নকল-নৈপুণ্য—যাকে বলি আমি ক্ষিপ্রনৈপুণ্য—virtuosity ; প্রতিভা দেখেন ধ্যানে, শোনেন গহন শ্রুতিতে, স্বাদ পান গভীরতর স্তরের ; ফুটিয়ে তোলেন এ-সব অনুভব তাঁর উচ্ছল প্রাণশক্তিতে—অমনি পুতুল হ'য়ে ওঠে জীবন্ত, পাষাণী গালাটিয়া ভাস্কর পিগমালিয়নের আরাধনায় হয় তনুবর্তী রক্তমাংসে স্পন্দমানা। (থামিয়া) কিন্তু বড় বেশি রাস ছেড়ে দিয়েছি ছায়াময়ী রসনা-তুরঙ্গমার, না ? ফিরে আসি কায়ার কংক্রীটের রাজ্যে। শ্রীঅরবিন্দের ঐ কবিতাটিই নেও না কেন—ওর একটি লা'ইন মাত্রঃ যেখানে তিনি বলছেন ঃ

As some bright arch-angel in vision flies
Plunged in dream-caught spirit immensities

বুঝি যে, এ ভাব এ ছন্দ এ দৃষ্টি এক প্রতিভারই স্বায়ত্ত—অন্য কারুর নয়। অনুবাদ করতে গেলেই বুঝতে পারি নেই আমাদের সে মুক্তদৃষ্টি যে দেবদূতের পাখা মেলে মহাব্যাপ্তির বন্দী হ'য়েও মুক্তির গগনে চলে উড়ে। এই হ'ল প্রতিভা। একে বোঝানো যায় না দেখানো যায় না—কী বলব ?...ওকে যখন বুঝতে পারি না ব'লে চরম ভাবে বুঝি...তখনই যেন বোঝার কিনারায় আসি—ঈশোপনিষদের ব্রহ্মের মতন খানিকটা :

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

ধরতে পেরেছি যে ভাবে তারই কাছে তিনি থেকে যান অ-ধরা—যে বোঝে যে, তিনি অবুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সেই তবু আভাষ পায়—খানিকটা—তিনি কী বস্তু! ব্রহ্মের এই ধরণের paradoxical স্বতোবিরোধী সংজ্ঞা—আমার মনে হয় বৌদি—সবচেয়ে কাছে পৌঁছয় তাঁর। আর যে মহত্ত্ব যত বেশি তাঁর কাছে পৌঁছয়-যেমন মহৎ প্রতিভা—তাকে ততই এইভাবেই শিখতে হয় অনুভব করতে—পরমহংসদেবের ভাষায় "বোধে বোধ করতে।" আমার মনে বিপুল আনন্দ হ'ল শ্রীঅরবিন্দের দেবদূতের এই পাখা মেলে মহাব্যাপ্তির গর্ভে ঝাঁপ দেওয়ার ধ্যানে। ছন্দে এ-আনন্দ হ'ল আরও নিবিড় আরও অন্তরঙ্গ। এর বেশি বলা কঠিনও বটে, অনাবশ্যকও।

পবিত্র : ঐ দেখ্ কী কথা হচ্ছিল—এসে গেল কী কথা—কবিত্ব। হচ্ছিল ছন্দের বিচার এসে গেল ব্রহ্ম ব্রহ্মবিৎ কবি মনীষী পরিভূ স্বয়ম্ভূ।

রসিক (সাক্ষেপে) : মানি পবি, মানি যে, এসব কথা বলবার ভাষা পাই নে আমি খুঁজে ও এজন্যে দুঃখ হয় আমার। কেন না মানুষ কোনো আনন্দ পেলে স্বতই চায় তাকে পরিবেষণ করতে প্রিয়জনদের পাতে—আনন্দের ধর্ম্মই এই যে সে সংক্রামক—অথচ প্রকৃতির সংস্পর্শে, প্রতিভার সংস্পর্শে, কবির সংস্পর্শে, মহৎ হৃদয়ের সংস্পর্শে যে-শিহরণ জাগে তার কতটুকু ব্যক্ত করতে পারি বল্? তবু কিছু পারি—ছন্দে গানে বর্ণে কাব্যে। তাই তো ছন্দ আমার এত প্রিয় গান আমার এত প্রিয় কাব্য আমার এত প্রিয়। এসব যে এ-আনন্দের মন্দির—বহির্বাস। তাই এদের নিয়ে চেষ্টা দেয় সার্থকতা—পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চ্চায় জাগে শিহরণ। একটা মহান্ অনুভব কিভাবে নিজেকে মূর্ত্ত ক'রে তোলে বিলিয়ে দেয় দেখতে চাই বুঝতে চাই বিশ্লেষণ করতে চাই।

সখী : বুঝলাম। কিন্তু তোমার কথাটা একেবারে উধাও হ'ল।

রসিক : কী?

সখী : যে, ফর্ম্মাসী ছন্দেও বড় কাব্য রচিত হ'তে পারে।

রসিক : পারেই তো বৌদি। আর পারে ব'ল্লেই তো দিলীপের দেওয়া "বন্ধহীন | অম্বর | তব | চাই মহান্" এই ফর্ম্মাসে শ্রীঅরবিন্দের হাতে ঝর্ণার মতন উৎসারিত হ'ল "Thought the Paraclete" দিলীপের আর একটা সনেট—থার্ড পিয়ান ও মলোসাসে মেশানো—*

অমল্লী।

সুধারত্ন |	চিরস্বপ্ন |	চাই শঙ্কর।
সুখতন্ত্র	বীণামন্ত্র	বন্দন নয়!
আশারঙ্গ	সীমাভঙ্গ	ঢেউ— মন্থর:
চাহি সুপ্তি-	হারামুক্তি	বন্ধন-লয়।
শিবশান্তি	দীপকান্তি	চায় আজ প্রাণ
কাঁটাপন্থ	ছায়ানন্দ	দোল নয় আর
নীলস্বর্ণ	আলোপর্ণ	দাও সন্ধান:
মোহমর্ত্ত্য	ত্যজি' সত্য	ধ্যান-ঝঙ্কার।
মায়ানর্ম্ম	কায়াধর্ম্ম	বৈভব?—ধিক্!
যুগ-সূর্য্য	তব তূর্য্যস্বন-	উচ্ছল!
গৃহাসক্তি	নয়—ভক্তি	গৌরব দিক্:
নহে অল্প	হে—অকল্প!	মন বিহ্বল—
তব নৃত্য-	রাগ-দীপ্ত	অম্বর-ভায়!
নহে স্বার্থ	পরমার্থ	অন্তর চায়।

এর ফর্ম্মাসে শ্রীঅরবিন্দের কলমে ঝরল

In a flaming |	as of spaces |	Curved like spires
An epipnany	of faces	Long curled fires,
The illumined and tremendous		Masque drew near,
A God-pageant of the aeons		Vast deep-hued,
And the thunder of its paeons		Wide-winged, nude,
In their harmony stupendous,		Smote earth's ear.

আর তাই আমি বলছিলাম বৌদি, যে প্রতিভাকে কোনো ফরমাস করা চলবে না যে এমনি ভাবে সৃষ্টি করো এম্নি ভাবে কোরো না। তিনটে কথা জ্বালিয়ে সে হঠাৎ ফোটয়া

তারা—কী ক'রে—তা কি সে নিজেই জানে? কেবল এইটুকু সে জানে যে যে-কোনো অবান্তর বাহ্য ঘটনা আকাশের ডাক বা সমুদ্রের ঢেউয়ের নাচন তার বুকের মধ্যে দুলিয়ে তোলে আনন্দ বেদনা দৃষ্টি শ্রুতি ধ্যান কল্পনার। (হাসিয়া): ভয় পেয়ো না বৌদি—তর্কালোচনার ক্ষেত্রে ওধরণের মিস্‌টিক রাশ আমি ছেড়ে দেব না—মা ভৈঃ—একটু আধটু ছুটতে পারি সময়ে সময়ে শিরপা তুলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টাল সাম্‌লে নেবই নেব (কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া): আমি একথা আজ পাড়লাম তার একটা মানে আছে। আজই দিলীপ স্বীকার করেছে তার একটা পত্রে যে তার "ধনুর্দ্ধরী" মত বদলেছে।

পবিত্র: মানে ধনুর্দ্ধর বাবুর মত?

রসিক: হ্যাঁ ধনুর্দ্ধর বাবুর মতন আগে সেও যে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে তর্ক কিনা ছন্দ সম্বন্ধে সব প্ল্যাটিচিউড আওড়ে। সে সবই যে ছিল তার ভুল—এখন স্বীকার করেছে।

সখী: প্ল্যাটিচিউড? কী ধরণের? আমরা যে এ সবের কিছুই জানি না ভুলে যাচ্ছ কেন ঠাকুরপো?

রসিক: বাঃ তোমায় বলি নি?

সখী: কী?

রসিক: যে দিলীপও ছন্দচর্চ্চার প্রথম দিকটার সব বাজে বুলি আওড়াত গড়পড়তা ধনুর্দ্ধরী ক্রিটিকদের প্রতিধ্বনি ক'রে?

সখী: অথ কোন্ ধ্বনির?

রসিক: এই ধ্বনির যে, ছন্দের ফর্ম্মাসে কবিতা লেখা যায় না—ছন্দকে হ'তে হবে—

স্বতঃস্ফূর্ত্ত—spontaneous—ছন্দ ছন্দ করলে কাব্য যান মাঠে মারা—এই ধরণের আরও কত সব বাজে প্ল্যাটিচিউড—যা দুপাতা প'ড়ে যে কোনো ক্রিটিক আওড়াতে পারে। সাধে শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে লেখেন নি: "It is the easiest to be a a critic"—অর্থাৎ তথাকথিত ক্রিটিক অবশ্য।

সখী: যে সব কথা বললে ঠাকুরপো তাদের মধ্যে প্ল্যাটিচিউড কিছু থাকতে পারে—কারণ বলতে না জানলে সব সত্যই এমন ভাবে বলা যায় যাকে প্ল্যাটিচিউডের মতনই শোনায়—কিন্তু তাই বলে কি এরা সত্যিই তাই? মানে—বাজে?

রসিক: একদম বাজে বৌদি, একরকম বাজে। যাঁরা সত্যিকার কবি তাঁরা হ'লেন ঐন্দ্রজালিক যাদুকর। কোনো ছন্দের নক্সা তাঁদের সাম্‌নে ধরলেই সে কাঠামোতেই তাঁদের হৃদয়ের নানা রসাল অনুভব ফোটে। ইচ্ছামাত্রই আলো ফুটে ওঠে তাঁদের অন্তরে—সৌন্দর্য্য-চমক ফুটিয়ে তোলেন তাঁরা—যেমন নিশিকান্তের এই অতি কঠিন মডেলেও শ্রীঅরবিন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন।

সখী: কিন্তু তোমার মনে হয় না কি ঠাকুরপো যে, ছন্দের কঠিনতা বেশি বাড়লে এই সৌন্দর্য্যচমক, কাব্য-অনুভব, রসদোল একটু চাপা প'ড়ে যেতেও পারে?

রসিক : হয়, কিন্তু কোথায় কোন্‌খানে যে কোন্ ছন্দের কঠিনতায় একজন কবির রসাবেশ যাবে ঢেকে তা কি কেউ আগে থেকে ব'লে দিতে পারে? প্রবোধ যেন এই কথাই লিখেছিলেন দিলীপকে সে-সময়ে—বলছিলাম না?

পবিত্র : কিন্তু কী লিখেছিলেন বল্‌লি কই? বাঃ।

রসিক : ওহো, ঐ দেখ আসল কথাটাই গেছি ভুলে। এই-ই হয় তর্কে, বুঝলি না? যাক্ বলি শোন্ প্রবোধ সেন যা লিখেছিলেন দিলীপকে। দিলীপ লিখেছিল—সে-সময়ে ছন্দের সূক্ষ্ম-বিচারের সে বিশেষ কিছু জানত না ব'লেই বৈ কি—যে, প্রতি কবিকে দেখতে হবেই হবে ছন্দ কৃত্রিম না হয়। আরে, একি একটা কথা হ'ল? যেমন ড্রয়িং রুমের বেসুরা ভাব ঢুলুঢুলু বিবাহযোগ্যা কুমারীরা বলেন দেখতে হবে গানের তানে কৃত্রিমতা না আসে, গাইতে হবে পাখীর মতন সহজে। হায়রে হায়, পাখী গানের কী জানে বলো তো? এসব সেন্টিমেন্টাল কথা শুনলে পরে আমার আসে ভালুকে জ্বর। হাজারো বুলবুলের তান কি একজন আবদুল করিমের সূক্ষ্ম শ্রুতির গমক ও বিজ্‌লি তানের কাছে দাঁড়াতে পারে বা লাখো বউ কথা কও-য়ের কূজন একজন ৺রায় বাহাদুর সুরেন মজুমদারের একটি মাত্র মিড়ের কাছে? কেন পারে না? না, এঁরা গানের বহু সাধনা ক'রে সুরের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে পেরেছেন ধরতে। কিন্তু বুলবুলের তরফ যেতে এঁদের তাল মিড় মূর্চ্ছনা-যে কৃত্রিম একথা মান্‌তেই হবে বৈকি।

সখী : কিন্তু কৃত্রিমতা তো আর তাই ব'লে—

রসিক : আমি কৃত্রিমতার ওকালতি করছি না। আমি বলছি তার মাপকাটি, তৌল প্রকৃতি থেকে মিলতে পারে না। আর্টের কৃত্রিমতার বিচার করতে হ'লে আগে আর্টের অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন করতে হবে। কেননা আর্টের যে-অন্তর্নিহিত বিধান, law, আছে সেটা ধরা সহজ নয় এধরণের বিশুদ্ধ প্ল্যটিটিউড আওড়ে। কোন্ তান সুরেলা ও কোন্ তান শুধু চমকপ্রদ সেটা বিচার করার অধিকারী নয় রঙীনহৃদয়, তর্কবিলাসী তরুণ বা ভাববিলাসিনী বেসুরকণ্ঠী রোমান্টিক তরুণী—সে-অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হ'লে চাই বহু সুরের সাধনা। ছন্দের কৃত্রিমতার বেলায়ও ঐ কথা। প্রবোধ সেন হেসে দিলীপকে যা লিখেছিলেন তার ভাবখানা এই : "রায় মশায়, এক হিসাবে সব কঠিন ছন্দই তো কৃত্রিম। হয়ত বলবেন শঙ্করাচার্য্যের "মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বম্। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্" এ পজ্ঝটিকা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু সেটাও স্বাভাবিক মনে হয় এছন্দে কাণ একটু তৈরি হ'লে তবেই—নৈলে নয়। কিন্তু আবার যাদের কাছে এছন্দ কৃত্রিম মনে হয় না তাদের কাছেও প্রথমটায় কালিদাসের "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা বৃত্তি চেতঃ" মন্দাক্রান্তার কদমটা লাগ্‌বে কৃত্রিম। বল্‌বে এ কী রে বাবা! প্রথম পর্ব্বে "মেঘালোকে"—উঃ চার চারটে গুরুস্বর বা যুগ্মধ্বনি! দ্বিতীয় পর্ব্বে "ভবতি সুখিনো"—ওঃ—পাঁচ পাঁচটা লঘুস্বরের পরেই গুরুস্বর, তৃতীয় পর্ব্বে—এ আবার কী রে?—প্যা ন্য থা বৃৎ—একটা গুরু তারপর একটা লঘু তারপর দুটো

পর পর গুরু।' শেষে তি চে তঃ একটা লঘু তারপর দুটো গুরুঃ। শার্দ্দূল বিক্রীড়িতে, কৃত্রিমতায় তো চক্ষু আরও চড়কগাছ! অথচ ভবভূতি কালিদাস জয়দেব কত সুন্দর চরণই লিখেগেছেন।

ধরো ভবভূতির গম্ভীর শার্দ্দূলবিক্রীড়িত—এ তস্মিন্ প্র চ লা কিনাং প্র চ ল তা মু দ্বেজিতাঃ কূ জি তৈঃ কিম্বা জয়দেবের সুললিত ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি অথবা ভর্ত্তৃহরির শিখরিণীঃ য দা কিঞ্চিৎ কিঞ্চি দ্বু ধ জ-ন স কা শা দ ব গ তং একটা লঘু পরে পাঁচটা গুরু পরে বাপ্‌রে পাঁচটা লঘু ইত্যাদি ছন্দে—কবিতা লেখা? স্বাভাবিকপন্থীরা তো আঁৎকে উঠেন রে পবি! বলবেন এরকম ছন্দের শেকল গড়িয়ে অষ্টেপিষ্টে পায়ে জড়ালে কাব্যরাণীর কমল-চরণ হবেই রক্তাক্ত। কারণ বাস্তবিকই এসব ছন্দের দোল কাণে ও মনে রসের ঢেউ তোলে বহু সাধনায় তবে। কিন্তু তা ব'লে কি মেনে নিতে হবে এসব নামঞ্জুর - রসের পংক্তিভোজনে? হায়রে হায়, তাহ'লে কবিদের লিখ্‌তে হবে শুধুই আলা দীনবন্ধু

মালতী মালতী মালতী ফুল
মজালে মজালে মজালে কুল,

বা সংস্কৃতে "পংক্তি" ধরণের সহজ কদমের ছন্দ—"কৃষ্ণসনাথা তর্ণকপংক্তিঃ। যামুনকচ্ছে চারুচচার"?

সখী: তুমি কি তাহ'লে বলো ঠাকুর পো, যে কাব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে কঠিন ছন্দে কৃতিত্ব দেখানোর ওপর?

রসিক: না আর্য্যে, তা বলি না। ভালো কবি পয়ারছন্দে লঘুত্রিপদীতে ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতিতে চমৎকার কাব্যের দীপ্তি জাগাতে পারেন কে না মান্‌বে? আমি সেই সঙ্গে শুধু এইটুকু জুড়ে দিতে চাই যে কঠিন ছন্দেও ভালো কাব্য দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে তার কাঠামোর ধরা-বাঁধা অত্যন্ত কড়া হওয়া সত্ত্বেও। না, তার চেয়েও একটু বেশি বলা যায়। সেটা এই যে, ছন্দের দুরায়ত্ততাকে অতিক্রম করাটা যে সব সময়েই একটা বাহাদুরি দেখানোর জন্যে—tour de force জাহির করতে—তা বলা চলে না। বড় শিল্পী অনেক সময় উচ্চাশীও হন রসের দিক্ দিয়ে। কঠিন ছন্দে অনেক সময়ে ফুটে ওঠে বড় মনোহর গাম্ভীর্য্য – ও তার কঠিনতাকে অতিক্রম করায় আছে পরম আনন্দ। সুইডবার্ণ যে এদিকে কত শিখিয়েছেন ছন্দজ্ঞদের তা ব'লে শেষ করা যায় না। এই দেখ্ (তাঁর কবিতাবলী খুলিয়া Evening in the Broads হইতে) তাঁর বিখ্যাত Elegiacs, অর্থাৎ প্রথম লাইন hexameter, দ্বিতীয় pentameter:—

Over two | shadowless, | waters, ‖ a | drift as a | pinnace in | peril
Hangs in a | heavy sus | pense, ‖ charged with ir | resolute light |
Softly the | soul of the | sunset up | holden a | while on the | sterile
Waves and | wastes of the land ‖ half repos | sessed by the | night

এখানে ॥ দাগটা হ'ল caesura বা পদমধ্যের বিরতি। কিন্তু সেযাক্ ঃ দেখ্‌তো একঠিন ছন্দ কী সুন্দর শুনিয়েছে সুইনবর্ণের হাতে? সাধে কি একজন ক্রিটিক ব'লেছেন সুইনবর্ণ "wielded a magican's rod over all metres"? এই যে এখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের pentameter-এ (॥ চিহ্নের কাছে) রয়েছে caesura বিরাম—এতে এ দীর্ঘছন্দ dactylএ কী অপূর্ব্ব মাধুর্য্য এসেছে বলো তো বৌদি!

সখী ঃ হাঁ, আমার বড় ভাল লাগে সুইনবর্ণের এই ধরণের কল্লোলিত ছন্দের কবিতা।

রসিক (উৎসাহিত) ঃ এই এই শোভানাল্লা!—le mot juste—কল্লোল—কল্লোল—ঐ হ'ল ঠিক সেই কথাটা যা আমি খুঁজছিলাম। দীর্ঘছন্দে কঠিন ছন্দের দিকে ভালো কবিরা যে প্রায় ঝোঁকেন তা বাহাদুরি দেখাবার জন্যে না সব সময়ে—দীর্ঘছন্দের মধ্যে ঐ দীর্ঘতর কল্লোল মেলে ব'লে।

সখী ঃ তাছাড়া আরও একটা কারণ বোধ হয় আছে ঃ ছন্দে বৈচিত্র্য আনতে হ'লে চাই contrast—বৈরূপ্য। ছোট ছন্দের সুন্দর লঘু ঝঙ্কার দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—গুরুছন্দের গম্ভীর কল্লোলের পরে। আমার সেদিন এত ভালো লেগেছিল হারীন্দ্রনাথের সেই চমৎকার কল্লোলিত আবেগময় কবিতাটি সেই Vaporous nursling কবিতাটির পরেই তাঁর লঘুছন্দের সেই কবিতাটি মনে আছে?

পবিত্র ঃ কো কী? পড়্‌তো।

রসিক (শেল্‌ফ হইতে একটি খাতা টানিয়া পড়িলেন হারীন্দ্রনাথের Bird of Fire হইতে) ঃ কল্লোলিত সত্যিই একবিতাটি নয়?

"Vapourous nurslings of sound calling out to me
Under the new creations plangent and plastic stress :
What have I to do with them who have naught to de with Thee ?
Lord, let them pass even out of my last forgetfulness.
Gaudy hues surround the path that is yet untrod
Towards the Light that is beckoning out of the deeps of beings
What have I to do with them who never know Thy Hue, my God !
Let them pass, let them pass even out of my unseeing !
Clouds of hovering faces covering the sky
Like blotches of rust trying to stain Thy garment hem
What have I to do with them who have long passed me by
Let me forget that I have even forgotten them."

সখী : হাঁ। কিন্তু মনে আছে এ কল্লোলের পরেই এত ভাল লেগেছিল সেই কবিতাটা তাঁর—সেই যে কবিতাটি তুমি ক'রেছিলে অনুবাদ, সেই The lamp is ready—মনে আছে ?

পবিত্র :—সেটা কী রে ? কই আমাকে তো শোনাননি, না মূলটা, না তোর অনুবাদ।

রসিক : রাগ করিস নে ভাই, ভুলে গিয়েছিলাম! তবে শোন্ না হয় এখনই বিশেষতঃ যখন আজকের আলোচনায় ছন্দবৈরূপ্যে বৌদি contrastএর কথাটা বড় সুন্দর তুলেছে—যথাস্থানে। শোন্ (খাতা খুলিয়া) :

The Condition. — সর্ত্ত

The lamp is ready !	দীপ তো উছল—জ্বলিতে !
But you forget	শুধু, তুমি আছ ভুলি' :
Yor flame is not steady	শিখা তব চায় কাঁপিতে
As yet.	এখনো দুলি'।
The shore is ready !	বেলা তো উছল—বরিতে !
But you are caught	শুধু, তুমি দেছ ধরা
In the wild eddy	চিন্তা-তুফান আঁধিতে
Of thought.	ক্ষিপ্ত-স্বরা।
The hush is ready !	মৌন উছল – ডাকিতে !
When will you tire	শুধু, তুমি হবে কবে
Of your dark heady	শ্রান্ত তিমিরে রমিতে
Desire ?	বাসনাসবে ?

পবিত্র : এ বড় চমৎকার। কিন্তু দেখ্ দেখি কত সহজ ছন্দ—

রসিক : 'ধীরে—রজনী—ধীরে"। মনে করিস্ কি এসব ছন্দ আসলে সহজ ? ছেলের হাতের মোয়া দুচারটি কথায় ভাব প্রকাশ করা ? বড় ছন্দের—কল্লোলিত প্রবাহের মুস্কিল আছে বটে, কিন্তু ছোট ছন্দের চেয়ে তাদের সুবিধাও আছে অন্যদিকে—গুছিয়ে বলার অবসরও আছে বেশি—বড় কাঠামোর মধ্যে। সময় পেলে নানাভাবে একটা কথা ফুটিয়ে তোলা যায় নানারকম বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে, চমক লাগিয়ে। যেমন মিল্টনের প্যারাডাইজ লস্ট্ বা ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের প্রেলুড; কিন্তু অন্যদিকে অল্প কথায় অনল্পকে ফুটিয়ে তোলাও আবার সহজ নয় মোটেই—হংসৈর্যথা ক্ষীর·মিবাম্বুমধ্যাৎ—জলটুকু বাদ দিয়ে দুধটুকু চয়ন করা এ·ও বড় সামান্যি কীর্ত্তি নয়, বুঝলি ? বাস্তবিক art conceals art ব'লে যে-কথাটা আছে তার একটা মস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ছোট বহরেরই জিনিষে। (সখীকে) কিন্তু তাই ব'লে আবার আমাকে ভুল বুঝো

না যেন বৌদি। আমি ছোটকে বড়র চেয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে চাইছি না, বা বলছি না এপিকের চেয়ে লিরিক বড় হ'তে পারে। পারলে মহাভারত রামায়ণ ইলিয়াড আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকত না। আমি শুধু এইটুকু দেখাতে উঠে প'ড়ে লেগেছি যে ছন্দের ওপর অসামান্য কর্তৃত্ব না এনে এধরণের দৃশ্যত অতীব সহজ অথচ কার্য্যত দারুণ কঠিন ছোট্ট টলটলে কবিতা লেখা যায় না। হারীন্দ্রনাথ এটা পেরেছেন ছন্দের ভাবের 'পরে তাঁর অসামান্য কর্তৃত্ব আছে ব'লেই। (পবিত্রকে) বুঝলি? এটা তাই ভুলিসনে, বা মনে করিসনে শুনতে সহজ ব'লেই ওসব সৃষ্টি করাও সহজ। "তুলো যেমন শুনতে তুলো ধুনতে লবেজান" আর কি।

পবিত্র: বুঝলাম, কিন্তু যা বলছিলি তা গেল যে বেমালুম চাপায় প'রে।

রসিক: যাক্‌গে। আমি তো উকীল নই যে, অবান্তর প্রসঙ্গে যাব ফেঁসে। কিন্তু এটা অবান্তরও নয়, আমি এ-সূত্রে দেখালাম এই কথা যে ছন্দ বড় সহজ বস্তু নয়।

সখী: তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ধরাকাট খুব বেশি হ'লে কী হবে মনে হয় তোমার? কাব্যের ক্ষতি হবে না.? দেখ না কেন, উনিশ অক্ষরের শার্দ্দূল বিক্রীড়িতই প্রায় লিমিট হ'য়ে রইল সংস্কৃত কবিদের। বড় জোর একুশ অক্ষরের স্রগ্ধরা। কিন্তু মত্তাক্রীড় ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত, চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত প্রভৃতি দীর্ঘতর প্রবাহের ছন্দও তো আছে। তারা কল্‌কে পেল না কেন বল্‌বে আমাকে?

রসিক: একথা মানি বৌদি। একটা লিমিট আছে বই কি। পয়ার থেকে হ'ল অষ্টাদশী—তারপর বাইশ ব্যষ্টির—তারপর ছাব্বিশ—তারপর ত্রিশ। যেমন দিলীপের (অনামী খুলিয়া) অনুবাদ দান্তে থেকে:

বৈদূর্য্য ঝলক-ঝুরি জ্যোতিস্তম্ভ নিভ জ্বলো চিরদিশারিণি মাগো, করুণা-তারিণি!
নশ্বর মানবনেত্রে মৃত্যুহীন মুরছনা আশা-উৎসা সম ঝঙ্কৃ' চির-উৎসারিণি!
অয়ি বৃন্দ-বিভাবসু-বিনিন্দিতে ওঁ পাবকে পাবন না লভে যদি মরদেহধারী—
আরোহিবে কেমনে সে বন্দিত বৈকুণ্ঠে তব? পর্ণহারা কেমনে মা হবে ব্যোমচারী?

আমার মনে হয় যৌগিকছন্দে এর চেয়ে আর বাড়ালে চলবে না এই-ই লিমিট যেমন সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তে কার্য্যতঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত—বড় জোর একুশ অক্ষরের স্রগ্ধরা: "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসম্" হয়ে দাঁড়িয়েছে লিমিট্। তবে মুস্কিল কি জানো বৌদি? ছন্দও হ'ল বিজ্ঞানের মতনই খানিকটা পরীক্ষা বিকাশী—প্রয়োগসিদ্ধ—অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে empirical—আজ কোনো ছন্দের ধারার সেখানে সীমা মনে হয় পরে হয়ত অকস্মাৎ পর্ব্বতের চূড়া সহসা প্রকাশ—দেখা গেল—হঠাৎ সে-সীমা গেছেন ডিঙিয়ে কোনো এক নতুন কবির নয়া কাব্য-প্রতিভা। এ হ'ল অসাধ্য সাধনের খাসতালুক। তাই খুব জোর ক'রে কিছু না বলাই নিরাপদ যে, অমুক ছন্দে এতটা

অবধি কান সইবে—তারপর আর নয় ;—thus far and no farther নীতি মরালিষ্টের সাজে ছান্দসিকের নয়। তাদের কান মন রাখতে হবে খোলা সদাসর্ব্বদা। যে-ই একটা নতুন ছন্দ বেরুল যাতে দেখতে গেলাম কান খুসি হচ্ছে অথচ প্রচলিত ছন্দ-পদ্ধতির আইনকানুনে যায় না ধরা ছোঁওয়া—সে-ই ছন্দ-বিধানকেই দিতে হবে হাঁকিয়ে, বিদ্রোহী ছন্দকে নয়। অর্থাৎ, যদি এ বিদ্রোহী নতুন রস আনে তবে কিছুতেই তাকে বলা চলবে না 'ওহে বাপু, আমাদের ছন্দতত্ত্বে তোমারে খাপ খাওয়াতে পারছিনা, অতএব তুমি স'রে পড়ো। এ যদি না মেনে নাও তবে ছন্দের গতি হবে কূর্ম্মবৎ—তা-ও না—হবে সে আসন্নমৃত্যু। নতুন নতুন ছন্দের উদ্ভব তাই চাই-ই। শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকে একটি চিঠিতে এই কথাই বড় সুন্দর ক'রে লিখেছিলেন যে, মানুষের মনের এই এক ভারি মজা যে, নতুন-কিছুর উদ্ভবে সে ওঠে দারুণ ক্ষেপে অথচ তবুও ডি এল রায়ের ভাষায় (স্বর করিয়া) ঃ

> পুরোণো হোক্ ভালো হাজার হায় গো এম্নি কলির বাজার
> মাঝে মাঝে নতুন নতুন নইলে কারুর চলে না।
> নিত্যই পোলাও কোর্ম্মা আহার বলো ভালো লাগে কাহার ?
> আমার তো তা দু'দিন পরে গলা দিয়ে গলে না।
> ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল ডাকে হেন কুকুর শেয়াল
> প্রত্যহ অপ্সরা দেখ্‌লেও তাতে আর মন টলে না।

আর to crown all :

> এক স্ত্রীনিয়ে হ'লে কারবার ঝালিয়ে নিতে হয় দুচারবার
> বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।

বুঝলিরে uxorious !—সাবধান। (সকলের হাস্য)।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ভোট-প্রতিযোগিতা

শ্রীঅরুণা দাসগুপ্ত

সেদিন সকালবেলা খবরের কাগজ খুলেই নীলাচলের মুখ একটুখানি বিকৃত হল। অতীত দিনের কোন অন্যায় ঘটনার প্রতিবিধান আবশ্যক। কাগজে লিখেছে, কাউন্সিলের নতুন নির্ব্বাচনে ব্যারাকপুর থেকে দাঁড়িয়েছেন শ্রীরাধিকা রঞ্জন কর। এই রাধিকা করের ওপরেই নীলাচলের বেজায় রাগ! পুরাণো দিনের দুর্ব্ব্যবহার নতুন করে তার মনে পড়ল।

নীলাচলের বাবা হঠাৎ মারা যাওয়াতে তার অবস্থা হয়ে পড়ল ভয়ানক খারাপ। ক্রমে এমন দিন এল যখন উপোস করা নীলাচলের অনিবার্য্য মনে হল। সে ও রাধিকা বরাবর এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়েছে। শুধু এই ঘটনাটিকে বন্ধুতার আশ্রয়স্বরূপ দাঁড় করিয়ে দুর্দ্দিনে নীলাচল তার কাছে কয়েকটা টাকা ধার চেয়েছিল। কিন্তু বড়লোক বন্ধু উত্তর দিয়েছিল—আজকাল তো অনেক ভদ্রলোকের ছেলে মুটেগিরি করে বেশ দু'পয়সা রোজগার কর্‌ছে, তুমিও তাই করনা কেন? মুখ বুজে তখন সে অপমান সহ্য করেছিল, জানতো এমন দিন আসবে যখন রাধিকাকে নিজের কথা হজম করতে হবে।

নীলাচল ঠিক বড়মানুষ না হলেও এখন তার অভাব ছিলনা। সুতরাং সে ভাব্‌ল, এই সুযোগ। ব্যারাকপুর থেকে নির্ব্বাচনের জন্যে সেও দাঁড়াবে এবং রাধিকাকে পরাজিত করে কাউন্সিলের মেম্বার হবে। অবশ্য রাজনীতি সম্বন্ধে তার বিশেষ উৎসাহ ছিল না, কিন্তু দরকার হলে পলিটিসিয়ান হতেও পেছপাও হবে না, এই ছিল তার পণ।

কার্য্যসিদ্ধির প্রথম সোপান হিসেবে সেদিনই সে কতগুলি পোষ্টার ছাপতে দিল। তার কতগুলিতে লেখা ছিল; নীলাচল রায়কে ভোট দিয়া বাধিত করিবেন্; আর বাকিগুলিতে ছিল—Vote for Nilachal Roy and have yourself truly represented. পরদিন দুপুর রাত্রে পোষ্টারগুলি ব্যারাকপুরের প্রত্যেক রাস্তার উপরে দেয়ালের গায়ে মেরে দেয়া হল। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্যারাকপুরের ভোটাররা জানতে পারল, তাদের আসল প্রতিনিধি হচ্ছে একজন লোক যার নাম নীলাচল রায়। কেউ বললে এলোকটা আবার কে? কেউ বললে—সত্যি সত্যিই এ নামে কোন লোক আছে বলে তো শুনিনি; ইয়ার্কি করে হয়ত কেউ এগুলো লাগিয়ে রেখেছে। মোটকথা নীলাচল যে ব্যারাকপুর থেকে একটি ভোটও পাবে না, এসম্বন্ধে সেখানকার ভোটাররা নিঃসন্দেহ হল।

একটা দিন ধার্য্য হল যেদিন বেলা একটার সময় ব্যারাকপুরের রিটার্নিং অফিসারের কাছে

নমিনেশন পেপার দাখিল করতে হবে। যারা নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়াতে চায়, তাদের প্রত্যেককেই সেদিন যথাসময়ে একখানি করে নমিনেশন পেপার দাখিল করতে হবে। নমিনেশন পেপার সেদিন সেই সময়ের মধ্যে যে দাখিল করতে অসমর্থ হবে, সে দাঁড়াতেও পারবে না। তারপর পোলিংডে তে যে বেশি ভোট পাবে, সেই সদস্য নির্ব্বাচিত হবে।

সকলেই জানত কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত রাধিকা কর যখন দাঁড়িয়েছে, তখন ব্যারাকপুর থেকে আর কারু কোন আশাই নাই। সুতরাং অর্থ অপব্যয় করবার জন্য আর কেউ সেখান থেকে দাঁড়ায়নি। হঠাৎ ক্যাণ্ডিডেট্‌দের মধ্যে নীলাচলের নাম দেখে কেউ বিস্মিত হল, কেউ ব্যাপারটাকে একটা প্রকাণ্ড লেগ্‌পুল মনে করল।

এদিকে নমিনেশনের আগের দিন বেলা দুটোর সময় একটা প্রকাণ্ড মিটিংএ রাধিকাবাবুর বক্তৃতা দেবার কথা। রাধিকার জন্য যারা ক্যান্‌ভাস করত, যারা ভোট-ফর-রাধিকাবাবু বলে সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি চেঁচিয়ে সহরের লোককে পাগল করে তুলত, তারাই মিটিংএর জন্য আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। খেয়ে দেয়ে এগারটার সময় রাধিকা ব্যারাকপুরের একখানা লোকাল ট্রেণে উঠল। মতলব ছিল মিটিংএর কাজ শেষ করে, পরদিন নমিনেশনের পেপার দাখিল করে একেবারে কলকাতা ফিরবে। পেছন থেকে ধীরে-সুস্থে নীলাচলও রাধিকার সঙ্গে সেই ট্রেণে একই কামরাতে উঠল।

"নীলাচল যে," রাধিকা একটু লজ্জিতভাবে বলল। সেদিনের দুর্ব্ব্যবহারের কথা বোধহয় তার মনে ছিল।

"স্বয়ং," নীলাচল রূঢ়ভাবে রাধিকার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বল্‌লে।

"এটা ফার্ষ্ট-ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট," রাধিকা বলল। কণ্ঠস্বরের শুষ্কতা ও উৎসাহহীনতা দিয়েই সে বোধকরি নীলাচলকে বধ কর্‌তে চেয়েছিল।

"জানি, ফার্ষ্ট ক্লাসের নীচে কোন কামরাতে ওঠবার অভ্যেস আমার নেই।"

এই ধরণের সাদর-সম্ভাষণ শেষ হলে রাধিকা বললে, "জান বোধহয়, আমি ব্যারাকপুর থেকে দাঁড়িয়েছি নির্ব্বাচিত হয়েছি বললেও চলে, কেননা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে শুধু কে-একজন নীলাচল। কেউ কখন তার নাম পর্য্যন্ত শোনেনি।'

"তুমি শোননি, কিন্তু ব্যারাকপুরের সকলেই শুনেছে। যাই হোক জেনে রাখ যে আমিই সেই নীলাচল যে দয়া করে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।"

'তুমি?'

'হাঁ, আমি।'

"কিন্তু এযে পাগলামি। আমার বিরুদ্ধে তুমি পারবে কেন? তোমাকে কে চেনে?'

'আগে খুব কমলোকেই চিনত, এখন সকলেই চিনবে।'

নীলাচলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ ছেড়ে দিল, এবং সেই মুহূর্ত্তে সাহেবী পোষাক পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দরজা খুলে উঠতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে কামরার ভেতর ঢুকেই ধুপ্ করে পড়ে গেল। ভদ্রলোক বেশ শক্ত গড়নের, বেঁটে ও মাথায় একটি টাক। নীলাচল এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে তুলে একটা বেঞ্চিতে বস্তে সাহায্য করল।

'আপনার লাগেনি তো ?' ভদ্রভাবে নীলাচল জিজ্ঞেস করল।

'ধন্যবাদ, না আমার লাগেনি,' বলে ভদ্রলোক একদৃষ্টিতে নীলাচলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল আপনার চেহারাতে সামঞ্জস্য নেই। এখন দেখেছি সেটা আমার ভুল। আপনার চেয়ে স্বাভাবিক চেহারা আমি কয়েক বছরের মধ্যে দেখিনি।'

নীলাচল খুসি হয়ে বললে, 'যদি ধৃষ্টতা মনে না করেন, তাহলে আমার মতে আপনার চেয়েও—'

'না, না, ও কথা বলবেন না' ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন; 'আমার নীচের চোয়ালটা দস্তুরমত অস্বাভাবিক। এখানকার সব সেরা ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন যে এ রকম অস্বাভাবিক চোয়াল থাকা সত্ত্বেও আমি যে পাগল হইনি, এটা ভয়ানক আশ্চর্য্যের বিষয়।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে নীলাচল কাশি দিয়ে হাসি গোপন করল।

ভদ্রলোক তারপর দারুণ বিস্ময়ে রাধিকার মুখের দিকে তাকালেন—

"কি সর্ব্বনাশ!" তিনি বললেন, "এরকম চেহারা আমি জীবনে খুব বেশি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

"কেন বলুন তো?" খুসি হয়ে রাধিকা জিজ্ঞেস করল।

"আপনার চিবুকের অদ্ভুত গঠন নীচতার পরিচয় দিচ্ছে; কানদুটো যে রকম খাড়া তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আপনার মন কারুকে খুন করবার জন্য লালায়িত। দেখি, দয়া করে মাথাটা একটু এপাশে ঘোরান তো।"

"না, আমি মাথা ঘোরাব না। আপনার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়," রাধিকা মুখ লাল করে চেঁচিয়ে উঠল।

"কেমন, বলিনি?" ভদ্রলোক নীলাচলের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "আমরা—পাগলের ডাক্তাররা কে কি রকম লোক চেহারা দেখেই বলে দিতে পারি। ভদ্রলোক একেবারে ক্ষ্যাপা, কোনদিন কারুকে খুন করে জেলে যাবেন।"

"আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভেবে-চিন্তে কথা বলবেন। আপনি জানেন না আমি কে। আমার নাম রাধিকা কর; বলতে গেলে, ব্যারাকপুরের নির্ব্বাচিত কাউন্সিলের সদস্য।"

"আমার নাম ডাক্তার নির্ম্মল কুমার দেব। ব্যারাকপুর ষ্টেসন থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা খোলা মাঠের মধ্যে যে পাগলের হাসপাতাল আছে, আমি তারই ডাক্তার। দরকার হলে যাবেন," বলে ডাক্তার সাহেব চুপ করলেন।

ব্যারাকপুর ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছান পর্য্যন্ত তিনজনেই জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

নমিনেশনের দিন সকালবেলা উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে রাধিকার মনে হল, এ যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ। তার মত এত কম বয়সে কে কবে কাউন্সিলের সদস্য হতে পেরেছে। অনেক টাকা রেখে যাবার জন্য মৃত পিতাকে সে মনে মনে ধন্যবাদ দিলে। এমন সময় একটি লোক একখানা চিঠি এনে তার হাতে দিল। চিঠিটার ওপরে লাল কালিতে লেখা ছিল: Secret and confidential. খামটা ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি চিঠিটা বের করে সে পড়তে লাগল। চিঠিটা ইংরেজীতে লেখা, এখানে তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল।

প্রিয় মিষ্টার কর,

আমরা ভয়ানক বিপদে পড়েছি। শেষ মুহূর্ত্তে এ রকম বিপদ হবে তা' স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনার হোটেলের সম্মুখ দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে প্রায় দু'মাইল যাবার পরে একটা খোলা মাঠের মধ্যে বড় রকমের একটি সুন্দর বাড়ী দেখবেন—চিঠি পাওয়া মাত্র আপনি সেখানে যাবেন। বাইরের কোন লোক যাতে ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, সেইজন্য অত্যন্ত গোপনে আমাদের মিটিং হচ্ছে। সেই বাড়ীতে পৌঁছে কোন কারণে আপনি কারু নাম বলবেন না; শুধু বলবেন—লর্ড কিচ্‌নার চীনের সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায়। এই উপদেশটি সযত্নে মনে রাখবেন; অন্যথা হলেই সর্ব্বনাশ। চিঠিখানা পড়েই ছিঁড়ে ফেলবেন; যাতে আর কারু হাতে পড়্‌বার সম্ভাবনা না থাকে।

ইতি

প্র—

চিঠি পড়ে রাধিকা তাড়াতাড়ি কাঁধের ওপরে একটা পাঞ্জাবী ফেলে, একটা ট্যাক্সি নিয়ে সেই বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটল। কয়েক মিনিটের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে পৌঁছে সে ট্যাক্সি বিদায় দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল।

রাধিকা লোকটিকে খুব আস্তে বললে, "ভেতরে গিয়ে বল যে লর্ড কিচ্‌নার চীনের সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"নিশ্চয়। আপনি আসুন আমার সঙ্গে" লোকটি বললে।

রাধিকাকে একটা ঘরে বসিয়ে রেখে লোকটি চলে গেল এবং এক মিনিট পরে এক

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেখানে এলেন। তার সঙ্গে আরও দু'টি লোক।

"অনুগ্রহ করে ভেতরে গিয়ে বলুন যে লর্ড কিচ্‌নার চীনের সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায়", রাধিকা দেরি দেখে একটু বিরক্ত হয়ে বললে।

ডাক্তার নির্ম্মলদেব—বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত পাগলের ডাক্তার উজ্জ্বলভাবে তার দিকে তাকিয়ে, বললেন, "নিশ্চয়, শুধু চীনের সম্রাট কেন কুইন ভিক্টোরিয়া, এমন কি কন্‌ফ্যুসিয়াসের সঙ্গে পর্য্যন্ত তোমার দেখা করিয়ে দিচ্ছি।"

তারপর লোক দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "দশ নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।"

বেলা একটা পর্য্যন্ত রিটার্নিং অফিসার রাধিকাবাবুর নমিনেশন পেপারের জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তার জায়গায় এল নীলাচল রায়।

পাঁচ ঘণ্টা প্রাণপণ চেষ্টা করবার পরে রাধিকা পাগলা-গারদ থেকে মুক্তিলাভ করল। 'আমার ওপরে রাগ করে কোন লাভ নেই' ডাক্তার বললেন; 'পাগলামির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, নিজকে রাজা মহারাজা মনে করে অন্য কোন রাজা কি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া, একটা পাগলা-গারদের সামনে এসে কেউ ওরকম ব্যবহার করলে তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখ্‌বার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। লর্ড কিচনার যদি এখানে এসে চীনের সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাহলে তাকে জোর করে ধরে রেখে চিকিৎসা করা একটুও অন্যায় নয়।'

"তোমার নামে আমি নালিশ করব; তোমার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেব, তোমাকে খুন করব," রাধিকা চেঁচামেচি করতে লাগল।

"খুন করবে? কেমন বলিনি?" ডাক্তার স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন।

চেঁচামেচি করলেও কার্য্যতঃ সে এ-সব কিছুই করেনি। তার বিরুদ্ধে আর কেউ দাঁড়ায়নি বলে, নীলাচল রায় ব্যারাকপুর থেকে কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হল।

"বাঁশরী, মালঞ্চ ও দুইবোন্"

শ্রীসুধাময়ী দেবী

(সমালোচনা)

মালঞ্চ, বাঁশরী ও দুইবোন্—এই তিনখানি বইতেই দেখ্‌তে পাই আজকালকার সাহিত্যের প্রধান বিষয় বস্তু। দুইবোন্ ও মালঞ্চের মধ্যে ঘটেছে বিবাহিত জীবনের ভালবাসার সঙ্গে বিবাহিত জীবনের বাইরের ভালবাসার বিরোধ, আর বাঁশরীর মধ্যে ঘটেছে বিরোধ প্রকৃত ভালবাসা ও কর্ত্তব্যের মধ্যে। সোমশঙ্কর আর সুষমা কর্ত্তব্যের খাতিরে দিচ্ছে প্রেমকে বলি। বাঁশরী হার মান্‌ছেনা নিজের দুর্ব্বলতার কাছে, অন্যের কাছে ত নয়ই।

মানুষ ক্ষত বিক্ষত হয় নিজে, আঘাত করে অন্যকে ; প্রেমকে অস্বীকার কর্তে গিয়ে কিন্তু পারেনাত সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে।

নরনারীর প্রেমের ধর্ম্মই এই যে তা প্রতিদান চায়। নিঃস্বার্থ প্রেম যা, তা দেবতা বা দেবতুল্য মানবেই সম্ভব। অবশ্য ত্যাগই প্রেমের ধর্ম্ম, কিন্তু সেই ত্যাগ সার্থক হয়ে ওঠে যখন প্রেমিক জানতে পারে তার প্রেমাস্পদ গ্রহণ করেছে প্রেমের দান, স্বীকার করে নিয়েছে নীরবে তার ত্যাগের মূল্য।

এই যে প্রেম—এর মধ্যে ভাগাভাগি সহ্য কর্‌বার মত উদারতা বুঝি কোনও মানুষের নাই। এর পরীক্ষা এতদিন চলেছিল মেয়েদের উপর দিয়েই। সমাজ অনুমোদন করে এসেছে এতদিন এই ভাগাভাগি ব্যবস্থা। শুনি নাকি প্রকৃতিও পুরুষের এই স্বেচ্ছাচারের অনুকূল। কিন্তু স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে আজকাল উল্টোদিকে। কি দেখা যাচ্ছে? পুরুষরা কি মাথা পেতে নিতে চাইছে এই ভাগাভাগি ?

প্রেম করে দেয় অবশ্য মানুষের মনকে উদার, ছোটখাটো দাবী দাওয়া ত্যাগ কর্‌তে সে প্রস্তুত। কিন্তু প্রেমাস্পদের উপর যে দাবী, তার মধ্যে ভাগ দিতে রাজী নয়। দাবী সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে বরং প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে হয় প্রেমিকের মৃত্যু—দেহে অথবা মনে।

প্রেমিকের মানসিক মৃত্যু ঘটে, হয় জীবনেরই প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অথবা প্রেমাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া। শ্রদ্ধাই হল প্রেমের প্রধান অবলম্বন। প্রেমাস্পদের প্রতি যখন শ্রদ্ধা পূরাপূরি বজায় থাকে অথচ দাবী ছাড়িয়া দিতে হয় এখন নিজের প্রতিই হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়; নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া তিলে তিলে মানসিক মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য অপদার্থ ভাবিয়া বেশীদিন বাঁচিতে পারে না। আত্মোপলব্ধিবিজয় পথে নব জন্ম লাভ করিয়া সে তখন প্রেমাস্পদকে দেখে করুণার চোখে। করুণার মধ্যেই রয়েছে কতকটা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা।

দুই বোনের মধ্যে শর্ম্মিলার হল মায়ের প্রকৃতি। মাতৃত্ব ফুটে উটেছে তার আন্তরিক স্বামী সেবার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারও চলেছিল মানসিক সংগ্রাম। —নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে সে বল্‌ছে, "আমার জায়গা ও নেয়নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে, কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।" সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে সে বল্‌ছে, "কে কাকে মাপ কর্‌বে বোন্? সংসারটা বড় জটিল। যা মনে করি তা হয় না, যার জন্য প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।" ক্রমশঃ "শর্ম্মিলার উৎকণ্ঠা তার ক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেল। স্বামীর প্রতি করুণায় তার বুকের মধ্যে টন্‌টন করে উঠছে।" "আজ স্বামীর অশ্রদ্ধেয়তা শর্ম্মিলাকে রোগের বেদনার চেয়েও বেশী করে বাজছে।" প্রেমাস্পদের দুর্ব্বলতায় সে হচ্ছে মর্ম্মাহত, হৃদয়ের দেবতাকে দেখ্‌ছে সে ধূলায় লুণ্ঠিত। সে অনুভব করছে এই মোহ তার ভাঙ্গবে—"নিজের মাৎলামির ফল দেখে লজ্জা পাবেন, কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে।"

বাঁশরীর তেজস্বী ও বিদ্রূপাত্মক কথার মধ্যে কান্নার আভাস সুস্পষ্ট। নিজেকে বলি দেওয়ার জন্যই সে মরিয়ে হয়ে করল পণ ক্ষিতীশকে বিয়ে করতে। সোমশঙ্করকে নিজ হাতে পাঠাল তার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র। লীলা যখন বল্লে "এটা যে আত্মহত্যা"—তখন সে বল্লে "তারপরে পুনর্জন্মের প্রথম অধ্যায়।" কিন্তু সোমশঙ্কর যখন এল তার কাছে জানাতে যে তার ব্রত আর তার ভালবাসা আলাদা। তখন সেই বাঁশরীর রইলনা আর কোন ক্ষোভ। সে বুঝলো, "শঙ্কর ক্ষত্রিয়ের মতই ভালবাসতে পারে শুধু ভাব দিয়ে নয় বীর্য্য দিয়ে।" সে বল্লে, "ভালবাসার নীলামে সর্ব্বোচ্চ দরই পেয়েছি।" সুষমার উপর আর তার রাগ রইল না। সে বল্লে, "কেন থাকবে? সে কি আমার চেয়ে জিতেছে?" ভালবাসার প্রতিদান যখন সে পেল তখন ত্যাগের মহিমা বুঝতেও তার দেরী হল না।

মালঞ্চের মধ্যে দেখি নীরজার ভালবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ সেই ভালবাসার বিরুদ্ধে "বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত।" এই ভালবাসা তার ব্যাহত হয়নি বহুকাল। বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে।' এই দশবছরে সরলার সঙ্গে ছিল তাদের যোগ। এর মধ্যে তার প্রতি আদিত্যের সেই ছেলেবেলাকার স্নেহ একটী বারও কি প্রেমের আকর্ষণ রূপে দেখা দিতে পারতোনা? দুই বোনের মধ্যেও দেখি যতক্ষণ শর্ম্মিলা সুস্থ, কর্ম্মক্ষম, ততক্ষণ ঊর্ম্মিমালার প্রতি শশাঙ্কের আকর্ষণ সুস্পষ্ট হতে পারে নাই। অবশ্য আভাসে বোঝা যাচ্ছিল শর্ম্মিলার অতি লালনে শশাঙ্ক হয়ে উঠেছিল ক্লান্ত। মালঞ্চের মধ্যে আদিত্যের প্রকৃতি যে অতিশয় ভাবপ্রবণ, দুর্ব্বল, তার আভাস পাই আমরা। "নীরজার যখন এল প্রসবের সময় তখন ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন সঙ্কট, আদিত্য এত বেশী অস্থির হয়ে পড়ল যে ডাক্তার ভৎর্সনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখ্‌লে।" তারপর নীরজার অসুস্থতায় যখন ধীরে ধীরে আদিত্য হয়ে পড়েছে ক্লান্ত তখন সরলা এল তার মনের সাম্নে বড় হয়ে। 'দুই বোনেও' শর্ম্মিলার অসুস্থতাই শশাঙ্ক ও ঊর্ম্মিলার প্রেমকে পরিণতি লাভের সুযোগ দিলে। দুই বোনে শর্ম্মিলার ঈর্ষা উগ্র হোয়ে ওঠে নাই, কারণ ঊর্ম্মিমালা তার বোন্। একথা দিদি বার বার করে ঊর্ম্মিলাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার অবর্ত্তমানে সব চেয়ে যেটা সান্ত্বনার বিষয় সে ঊর্ম্মিকে নিয়েই। এসংসারে অন্য কোন মেয়ের আবির্ভাব কল্পনা করতেও দিদিকে বাজত।' দুই বোনের শেষ দিকে কবি দেখালেন স্বামীর অনুতাপ, ঊর্ম্মিলার দূরে প্রয়াণ। মালঞ্চের শেষ দৃশ্যটী অতীব করুণ। শেষ দৃশ্যটী দেখিয়া আদিত্যকে বল্‌তে ইচ্ছা করে অমানুষ। যে নীরজাকে হারাবার ভয়ে আদিত্য হয়ে পড়েছিল অস্থির—তারই অন্তিমকালে তাকে এতবড় আঘাত দিতে এতটুকুও লাগলোনা আদিত্যের? নীরজার সংগ্রাম, নীরজার উদারতার প্রয়াস- এসবই তারপক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মুমূর্ষু রোগীর মনটী প্রকৃত বুঝ্‌বার মত এতটুকু দরদ নেই তাঁর? নীরজা যা বল্‌ছে তাই তার আসল মনের কথা এ কেমন করে মনে করতে পারল আদিত্য?

সে জানে নীরজা মরে যাবে আজ বাদে কাল। এ কয়দিনের জন্য তাকে স্বস্তিতে থাকতে দিলনা ? প্রকৃত প্রেম যদি থাক্‌তো আদিত্যের নীরজার উপরেই হোক্ আর সরলার উপরেই হোক্—তবে সে বড় একটা ত্যাগ করতে পারতো। সরলার প্রতি প্রেম যদি হত আরও গভীর তবে তাকে এনে নিষ্ঠুর এক দৃশ্যের অবতারণা করিয়ে ছোট হতে দিতনা। আর নীরজার প্রতি প্রেম থাক্‌লে ত সব সমস্যারই সমাধান হত সহজ।

নীরজার উদারতার অভাব যা দেখি তা' অস্বাভাবিক নয়, খুবই স্বাভাবিক। উদারতা দেখিয়াছে স্ত্রী-কিন্তু হৃদয় গেছে ভেঙ্গে অথবা প্রেমের নিবিড়তা গেছে কমে। শর্ম্মিলা নীরবে উদারতা দেখিয়েছে, চেয়েছে উদার হতে কিন্তু ও আর কিছুই সহ্য কর্‌তে পার্‌ছেনা। কেবলি বলে বলে উঠ্‌ছে, 'মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে···ঠাকুর তুমি মিথ্যে।' কবির মধ্যবর্ত্তিনী গল্পটী মনে করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। স্ত্রী উদারতার বশে স্বামীকে করাল বিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে মন গেল তার ভেঙ্গে। ছোট বৌটীর মৃত্যুর পর আবার যখন তারা চাইল—মিল্‌তে তখন বুঝলো মাঝখানের ব্যবধান হয়ে গেছে প্রকাণ্ড, মধ্যবর্ত্তিনীকে সরিয়ে দেবার মত তাদের আর শক্তি নাই।

একটী বিশেষ জিনিষ চোখে পড়ে, দুইবোন্ ও মালঞ্চের মধ্যে তা হচ্ছে দাম্পত্য প্রেমের ক্লান্তি সন্তানের অভাবে। 'নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারছেনা, এমন সময় ঘটল সন্তান-সম্ভাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃ-হৃদয় উঠল ভরে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠ্‌লো নব জীবনের প্রভাত আভায় রঙ্গীন হয়ে।' 'তারপর অস্ত্রাঘাত কর্‌তে হল, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে।' "নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছিল বাগান।" সকলের চেয়ে তাকে বাজ্‌ল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্য আদিত্যের দূর-সম্পর্কীয় বোন্ সরলাকে আনাতে হয়েছে। দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে তবু এই বাগানের থেকে নির্ব্বাসন। চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। 'দুইবোনে' শর্ম্মিলার মাতৃহৃদয় সন্তানের অভাবে স্বামীর উপরেই তার অতিলালনের ভার চাপিয়ে ছিল। শশাঙ্কের পক্ষে সে ভার হয়ে পড়েছিল দুর্ব্বহ। বড়ো দুঃখে একবার স্ত্রীকে বলেছিল। 'দোহাই তোমার, 'চক্রবর্ত্তী বাড়ীর গিন্নির মত একটা ঠাকুর দেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি।' আর একবার বলেছিল, 'দেখ শর্ম্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা কর্‌বার চেষ্টা করোনা।'

পুরুষ চায় বৈচিত্র্য নূতনত্ব। নূতনত্ব গৃহের মধ্যে যখন ফুরিয়ে যায় তখন সে তা খোঁজে বাইরে। কিন্তু বাইরের সৌন্দর্য্য বা নূতনত্ব মনকে স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারেনা। একদিন না এক দিন ক্লান্তি আসেই, তখন নিজের ভ্রম উপলব্ধি করে গ্লানিতে মন যায় ভরে। শর্ম্মিলা তার

প্রেমপূর্ণ হৃদয় দিয়ে এই সত্য অনুভব করেছিল—'দৈন্য অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আন্‌বেনা ওর মনে? যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটুতে পারলো একদিন হয়ত তাকে মাপ কর্‌তে পারবেন না।'

নিত্য নব নব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দাম্পত্য জীবনের সাধনা। এই নবীনতা এই সৌন্দর্য্য বহির্লোকের নয় অন্তর্লোকের। "মানুষ যাকে কামনা করেছে, তাকে পশুর মত কেবল ক্ষণিক সুখের জন্য চায়নি।...পশুও পায়, মানুষও পায়। পশুর পাওয়া দেহকে পেয়েই ফুরিয়ে যায় মানুষের পাওয়া দেহকে অতিক্রম করে আছে।...শিশু এসে স্বর্ণ সূত্র হয়ে দুজনের বাঁধনকে করে দৃঢ়তর, কাকলিতে ভরিয়ে তোলে গৃহের নীরবতা, সন্তানকে আশ্রয় করে সুরু হয় প্রেমের নূতন জয় যাত্রা।" (ভালবাসার যাদু—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। দেশ, ৭ই ভাদ্র, ১৩৪২)

বিখ্যাত দার্শনিক Will Durant তাঁর The mansions of Philosophyর Love অধ্যায়ের একস্থানে বলেছেন, 'It is remarkable how marriage withers when children stay away. and how it blossoms when they come শিশু এসে লাগায় পিতামাতার চোখে নূতন অঞ্জন। পূর্ব্বোক্ত মনীষি আর একস্থানে বলেছেন, 'The man looking at her falls in love with her anew; this is another woman than before with new resources and abilities, with a patience and tenderness never felt in the violence of love; and though her face may be pale now and her form for a time disfigured, to him it seems as if she comes back out of the jaws of death with a gift absurdly precious; a gift for which he can never sufficiently repay her."
অর্থাৎ শিশুর জন্মের পর পতি পত্নীর প্রতি নূতন করিয়া আকৃষ্ট হয়। তার কাছে মনে হয় এ যেন অন্য এক নারী তার শক্তি, ধৈর্য্য, কোমলতা সবই অননুভূতপূর্ব্ব। মুখ অবশ্য তার বিবর্ণ, শরীর বাহ্যিক শ্রীহীন, কিন্তু স্বামীর নিকট তার সৌন্দর্য্য এখন লাগে অপূর্ব্ব—সে সৌন্দর্য্য যেন মৃত্যুর করাল কবল হইতে নূতন অমূল্য সম্পদ্ ছিনাইয়া আনিয়াছে।'

নারীর নূতন জীবন আরম্ভ হয় শিশুকে নিয়ে। দাম্পত্য প্রেমের অত্যুগ্র মাদকতা স্বভাবতঃই আসে কমে। পরস্পরের সান্নিধ্যের জন্য মন নিরন্তর অশান্ত হইয়া উঠেনা। নানা কর্ত্তব্যের মধ্যে দাম্পত্য প্রেম করে স্নিগ্ধ আলোক বিতরণ। জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পায় নারী সংসারের মধ্যে, সন্তানের মধ্যে। তাই স্বামীর সামান্য অযত্ন অবহেলাকে অতিশয় বড় করিয়া তুলিয়া সে কষ্ট পায় না।

শর্ম্মিলার স্বাভাবিক মাতৃত্ব সন্তানের অভাবে নিয়েছিল অস্বাভাবিক গতি, নীরজার সন্তান বাৎসল্যের আকাঙ্ক্ষা মেটে নাই। তাই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল স্বামীর প্রতি আকর্ষণের মধ্যে। তাই সে কৃপণের মত পারেনি ছেড়ে দিতে এতটুকু স্থান। সন্তানবতী হলে জীবন তার নিরর্থক মনে হতনা। স্বামীর প্রেম হারালেও জীবনের তার অবসান ঘটুত না অমন করুণ মর্ম্মভেদী হাহাকারের মধ্য দিয়ে।

গুরুপাপে লঘু দণ্ড

লঘু পাপে গুরু দণ্ড প্রদানে যেরূপ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না, সেইরূপ গুরুপাপে লঘুদণ্ড প্রদান করিলেও ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়। নরহত্যা করিলে প্রাণদণ্ডের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু সকল-ক্ষেত্রে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হয় না, কারণ বিচারক দেখেন যে হত্যাকারী কি অবস্থায় পড়িয়া অন্য একজন লোককে হত্যা করিয়াছে। যে পাপের স্রোতে সমাজ গুরুতররূপে আক্রান্ত, সেই পাপ নিবারণের জন্য কঠোর দণ্ড আবশ্যক। সংপ্রতি আসামে তিনসুকিয়া নামক স্থানে মহম্মদ চাঁদ নামক এক দুরাচার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা এক বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করাতে দায়রার বিচারে বিচারক জুরীদিগের সহিত আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে একমত হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্তের প্রতি সাত বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। এই বিচার ফলে সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছে, বোধ হয় আসামী ব্যতীত সকলেই ইহাকে পাপের অনুরূপ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে যশোহরের দায়রার বিচারে কয়েকজন আসামীকে গুরুপাপে লঘুদণ্ড হইতে দেখিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত জহিরণ নাম্নী একটি নয় বৎসর বয়স্কা বালিকাকে তাহার ঘর হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অত্যাচারের ফলে কয়েকদিন পরে সেই বালিকার মৃত্যু হয়। পুলিশ দুর্ব্বৃত্তদিগকে গ্রেপ্তার করিলে নিম্ন আদালত আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। দায়রার বিচারে, চারিজন আসামীকে অপরাধী বলিয়া সপ্রমাণ হয়। বিচারক তাহাদিগকে দোষী স্থির করিয়া মাত্র দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে এবং এক্ষেত্রে আসামীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইলেই বোধ হয় যোগ্যদণ্ড হইত। পাশবিক অত্যাচারের ফলে যেখানে একটি বালিকার জীবনান্ত হইল, সেখানেও যদি অপরাধীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর না হয়, তবে কিরূপ অপরাধে দ্বীপান্তর দণ্ড প্রয়োগ করা হইবে? কোন মামলার বিচারে যদি গুরুপাপে লঘুদণ্ড হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট দণ্ড বৃদ্ধি করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে যশোহরের এই মামলার অপরাধীর দণ্ড বৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে আবেদন করা উচিত। নারীর উপর পাশবিক অত্যাচাররূপ পাপ এদেশে যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বিশেষ কঠোর শাস্তি ব্যতীত ঐ পাপ দমনের কোন আশা নাই। আমরা সেইজন্য এই মামলার প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এডুকেশন গেজেট

দীর্ঘজীবি মানুষ

টাঙ্গাইল মহকুমার পাঁচুরিয়া গ্রামের সাহেবুল্লা সেখ ১১৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন—মৃত্যুকালে তিনি ৮০ বৎসর বয়স্ক একপুত্র, একটি পৌত্র একটী প্রপৌত্র রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষি-কার্য্য ইহার জীবিকা ছিল। তত্রস্থ মহকুমার ইনিই প্রাচীনতম ব্যক্তি। আজকাল এরূপ দীর্ঘজীবন লাভ করা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

মেহেরপুর

মেহেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীযুক্তা সুমতী দাশ গুপ্তা ও তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাশ গুপ্ত ও শ্রীমান্ নিত্যানন্দ দাশ গুপ্ত একই সঙ্গে এবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—মাতা প্রথম বিভাগে, প্রথম পুত্র দ্বিতীয় বিভাগে, দ্বিতীয় পুত্র প্রথম বিভাগে।

জার্ম্মানীর অন্তর্গত স্রাঙ্কনি জুতা প্রস্তুতের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। আজকাল দেশে বিদেশে নানা স্থানে জয়ন্তী-উৎসবের অভাব নাই। স্রাঙ্কনির পাদুকা ব্যবসায়ীগণ গত ১৫ই হইতে ১৭ই জুন, এই তিন দিন তাহাদের প্রস্তুত জুতা-শিল্পের জয়ন্তী উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে। এই উপলক্ষে তাহারা একটী সুবৃহৎ জুতা প্রস্তুত করিয়া—তাহা পুরোভাগে রাখিয়া শোভা যাত্রা করে। এই বুট-প্রবরই পৃথিবীর বৃহত্তম জুতা। ইহার নিম্নাংশ মাত্র তৈয়ারী করিতে প্রায় ৪৮১ পাউণ্ড চামড়া লাগিয়াছে। উপরিভাগ নির্ম্মাণেও দশটি গরুর চামড়া খরচ হইয়াছে। বহু মিস্ত্রি একযোগে পরিশ্রম করিয়া ছয়মাসে জুতাটী তৈয়ার করিয়াছে। মিস্ত্রীগণের প্রচেষ্টা ধন্যবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই—তবে এই বুট-প্রবরের উপযুক্ত "চরণ-কমল" কবে হইবে, তাহাই ভাবিতেছি!

লণ্ডনে ব্রতচারী নৃত্য

লণ্ডনে ব্রতচারী নৃত্য হইতেছে। এই নৃত্যের উদ্ভাবয়িতা শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত লণ্ডনে গিয়া উপনীত হইয়াছেন। ইউরোপের ১৮টি দেশ এই নৃত্যে যোগদান করিয়াছে। স্যার রেনেল রড ও মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলি মিঃ দত্তকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। রয়টারের প্রতিনিধির নিকট মিঃ দত্ত বলিয়াছেন যে, ভারতের জাতীয় নৃত্য রক্ষা করা, ভারতীয়দের মধ্যে শারীরিক ব্যায়ামের জন্য প্রেরণা জাগাইয়া তোলা এবং সর্ব্বোপরি রাজনীতিক আলোচনা হইতে ভারতীয়দিগকে তফাত রাখা, এই তিন উদ্দেশ্যে তিনি ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তবে ইউরোপের পল্লী নৃত্য দেখিয়া তিনি বুঝিতেছেন যে, ভারতের পল্লী নৃত্য যথেষ্ট নহে। এখনও পৃথিবীর নিকট হইতে ভারতের অনেক শিখিবার আছে।

শিক্ষা সমাচার

আশার কথা

ঢাকা মেডিকাল স্কুল গত ৬০ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এ পর্য্যন্ত উক্ত স্কুলে কোন মুসলমান ছাত্রী ভর্ত্তি হন নাই! এবার একটি ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছেন। মুসলমান সমাজের পক্ষে ইহা আশা ও আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। কঠোর পর্দ্দা প্রথার ফলে মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষিতার সংখ্যা অতি কম। কিন্তু আধুনিক জগত যে ভাবে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আর শিক্ষা বিষয়ে মুসলমান সমাজকে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—মুসলমান সমাজের মধ্যে এখনও ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতির উপর তেমন আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত রাজকীয় ভাষা শিক্ষা ব্যতীত কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ হইতে পারে না।

৫০০ ভাষাবিদ্ বৃদ্ধ

ক্লিক্-উডের অন্তর্গত অলিভ্ রোডের মিঃ জর্জ্জ ই, হে ৫০০টি ভাষায় কাজ চালাইবার মত জ্ঞান রাখেন। তাঁহার বয়স এখন ৮০ বৎসর। ৬৬ বৎসর কাল ছাপাখানা ও পুস্তকাদি প্রকাশের কাজে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বাল্যকালে তিনি একটির পর একটি করিয়া এত অধিক সংখ্যক ভাষায় জ্ঞানলাভ করেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অদ্ভুত বলিতে হইবে। ভাষা অধ্যয়নই তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য। পৃথিবীতে ৫০০ ভাষাবিদ্ আর কেহ আছেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি অক্লান্তভাবে নানাভাষা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের লোক হইলে কোন্ কালে পারের কড়ি গণিবার কাজে লাগিয়া যাইত।

ত্রিপুরা

ভিক্ষুক সমস্যা

রাস্তায় রাস্তায় ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের প্রাবল্যে কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও পথভ্রমণ বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। মহানগরীর এই বিপদ দূর করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন বাংলা সরকারকে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনতিবিলম্বে যাহাতে এই ভবঘুরেদের জন্য একটি 'হোম' বা আশ্রয়স্থান নির্ম্মিত হয় তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত অর্থদান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কলিকাতার বড় বড় রাস্তায় এই ভিক্ষুক, ও ব্যাধিগ্রস্তের দল যে উপদ্রব সৃষ্টি করে অবিলম্বে তাহার অবসান হওয়া যেমন বাঞ্ছনীয় এই আশ্রয়হীনদের জন্য একটি 'আশ্রয়' নির্ম্মাণ করাও তেমনি অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ কেবল জল্পনা কল্পনাই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। সুতরাং সাধু প্রস্তাব পাশ ও সদিচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে কর্পোরেশন ও বাংলা সরকার কর্ম্মতৎপর হইলেই সহরবাসীর ধন্যবাদভাজন হইবেন।

নবশক্তি

তামাক বিক্রয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি একটী আইন পাশ হইয়াছে, তামাকুলাইসেন্স ইস্যু করিবার জন্য "তামাকু লাইসেন্সিং ডিপার্টমেণ্ট" নামে একটি নূতন ডিপার্টমেণ্ট খোলা হইয়াছে। আবগারি বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর এই ডিপার্টমেণ্টের ভার দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতায় তাঁহার সহকারীরূপে চারিজন সাব ইন্সপেক্টার থাকিবেন। তামাকু বিক্রেতাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। একমাত্র কলিকাতাতেই প্রায় ১০ হাজার বিক্রেতা আছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে। সমগ্র বাঙ্গলা দেশে বিক্রেতার সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ হইবে। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে তামাকু কর কার্য্যকরী হইবে। তবে বিক্রেতাদিগকে এক মাসের সময় অনুগ্রহস্বরূপ দেওয়া হইবে। এই সময় মধ্যে লাইসেন্স না থাকার জন্য তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইবে না। পাইকারী বিক্রেতাদের লাইসেন্স ফি বার্ষিক ৬৲ টাকা এবং খুচরা বিক্রেতাদের ৩৲ টাকা হইবে। হাট ও বাজারে বিক্রয়ের লাইসেন্স ১৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে; ফেরীওয়ালাদের লাইসেন্সের হার হইবে ১ টাকা। তামাকু বিক্রেতাদের এক সপ্তাহের জন্য সাময়িক লাইসেন্স হইবে ১৲ টাকা, তবে বৎসরে ৩ টাকার অধিক হইবে না।

এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে যে তামাকু কর হইতে বৎসরে ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় হইবে।

নারী ইঞ্জিনিয়ার

ভারতের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম দুইজন সিন্ধি বালিকা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষার্থ অগ্রসর তাঁহারা করাচী এন-ই-ডি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। ইঁহারা এবার আই এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহিলা প্রতিনিধি

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সেক্রেটারী মিসেস্ সি মুখার্জ্জি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন সংস্কার কমিশনার মিঃ আর এন গিলক্রাইষ্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত আবেদনে বলা হইয়াছে যে নূতন শাসন সংস্কার অনুযায়ী কেবল মাত্র ঢাকা ও কলিকাতা অঞ্চল হইতে মহিলা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দিয়া বঙ্গের অন্যান্য নগর ও স্থানের মহিলাগণের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে। কারণ অন্যান্য সহরের মহিলাগণও শিক্ষা ও সামাজিক পদমর্য্যাদায় ঢাকা ও কলিকাতার ভগিনীদের অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

উক্ত আবেদনে আরও বলা হইয়াছে যে মহিলাগণের আসনের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত করিতে হইবে। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার ২১৫টি আসনের মধ্যে ৮টি মহিলা আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মাদ্রাজে ১৭৫টি আসনের মধ্যে ৭টি, আর বঙ্গদেশে ২৫০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫টি মহিলা আসন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। আবেদনে বর্দ্ধমান ও কলিকাতা লইয়া একটি নারী নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী লইয়া আর একটি নারীনির্ব্বাচনমণ্ডলী গঠন করিবার প্রস্তাব জানান হইয়াছে।

রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য বাঙ্গালার মহিলাগণের তুমুল আন্দোলন করা প্রয়োজন। নারীশক্তি জাগ্রত হইলে জাতির জড়তা দূর হইবে।

গৃহকার্য্যে সরকারী ভৃত্য।

পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, সবজজ এবং অন্যান্য বিভাগের উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী দিগের মধ্যে অনেকেই আফিসের কার্য্যের জন্য নিযুক্ত, গভর্ণমেণ্টের বেতন ভোগী চাপরাশী, আর্দ্দালি প্রভৃতি দ্বারা আপনাদের সংসারিক কার্য্য করাইয়া লইতেন। ব্রাহ্মণ চাপরাশী বা আর্দ্দালীকে, মফস্বলে অনেক সময়েই উপরিওলার পাচকের কার্য্য করিতে হইত, দোকান ও বাজার হইতে দ্রব্যাদিক্রয়, শিশু সন্তান গণের লালন পালনের ভার পর্য্যন্ত আফিসের আর্দ্দালী প্রভৃতিকে করিতে হইত। অনেক সময় ঐ সকল চাপরাশী, আর্দ্দালী বা পিয়ন হাকিমের দোহাই দিয়া মফস্বলের সরল ও নিরক্ষর দোকাদারদিগকে, ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয়ে বাধ্য করিত। নিখিল বঙ্গ জারীকারক সমিতির চেষ্টায় এতদিন পরে ইহার প্রতিকার হইয়াছে। রাজ কর্ম্মচারীদিগের ঐরূপ কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করাতে সংপ্রতি গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, কোন রাজকর্ম্মচারী নিজ গৃহকার্য্যের জন্য সরকারের বেতনভোগী কোন আর্দ্দালী পিয়ন বা চাপরাশীকে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। এই আদেশ কেহ লঙ্ঘন করিলে তাঁহাকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

ষ্টেশনে কুলীর অত্যাচার।

রেল কর্ত্তৃপক্ষ, প্রত্যেক ষ্টেশনে, মোট বাহক কুলীর পারিশ্রমিকর রেট বাঁধিয়া দিলেও, প্রায় প্রায় সকল বড় বড় ষ্টেশনে, কুলীদিগের অত্যাচারে যাত্রীদিগকে জ্বালাতন হইতে হয় এবং অনেক সময় কুলীদের হাতে অপমান ভোগ করিতে হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন। কুলীদিগের ঐরূপ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য একজন কুলী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত আছেন সত্য, কিন্তু তিনি কখন কোথায় থাকেন, কোথায় তাঁহার আফিস, হাওড়ার ন্যায় ষ্টেশনে তাহা খুজিয়া বাহির করা যাত্রীদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। বিশেষতঃ যে সকল যাত্রী পুত্রকলত্র এবং মোটঘাট সঙ্গে লইয়া যাওয়া আশা করেন। হাওড়া ষ্টেশনে প্রত্যেক কুলীর পারিশ্রমিক ছয় পয়সা নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য কিন্তু তাহারা ষ্টেশনে সমাগত যাত্রীদের গাড়ীর ছাদে বাক্স তোরঙ্গ বিছানা এবং

গাড়ীর ভিতরে স্ত্রীলোক ও বালিক বালিকা দেখিলেই পারিশ্রমিক দ্বিগুণ করিতে আরম্ভ করে। এক এক টাকা দেড় টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ ছয় আনা বা আট আনায় নামিয়া যাত্রীর সঙ্গে "রফা" করে। তাহাদের রফাতে সম্মত না হইলে তাহারা ঘোড়ার গাড়ী হইতে মাল নামাইতে অগ্রসর হয় না। যাত্রী বেচারাকে, কোথায় টিকিট বিক্রয় হয় খুঁজিয়া বাহির করিয়া টিকিট কিনিতে হইবে, কোন প্লাটফরম হইতে গাড়ী ছাড়ে, তাহা জানা না থাকিলে প্লাটফরম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার পর বালক বালিকাদিগকে সামলাইয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাতে বড় অল্প সময় যায় না। ইহার উপর কুলীদের সঙ্গে যদি দশ পনর মিনিট ধরিয়া রফা করিতে হয়, তাহা হইলেও যাত্রীদিগকে নির্দ্দিষ্ট ট্রেণ ছাড়িবার দেড় ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে হয়। এই অসুবিধার উপর আবার কুলীদের রাহাজানি হইলেত সোনায় সোহাগা।

ভূতপূর্ব্ব জিলা জজের কীর্ত্তি

শ্রীযুত রাম লাল দত্তের বর্ত্তমান বয়স ৮১, তিনি পূর্ব্বে জিলা ও দায়রা জজ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল কৃষ্ণলাল দত্তের তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার ১০।১২টি পুত্রকন্যাও আছে। ছেলেরা কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ ইঞ্জিনীয়ার, কেহ বা ডাক্তার। ইহা সত্ত্বেও গত রবিবার তিনি ৬১নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার পাণি গ্রহণ করিতে যান। পল্লীর যুবকগণ ইহা জানিতে পারিয়া কন্যার বাড়ীতে যাইয়া রামলালবাবুকে বিবাহ করিতে দেয় নাই। কন্যাও মেয়েটীও সর্ব্বজনসমক্ষে বলিয়াছে যে, সে "বুড়োকে" কোন মতে বিবাহ করিবে না। স্থানীয় এক বালিকাকে এই অবস্থার বিবাহ করিতে চাহিলে বালিকার পিতা বিবাহ দিতে রাজী হন নাই।

যন্ত্র-সাহায্যে একমাইল দূরবর্ত্তী লোকের অবস্থান নির্দ্দেশ

ব্রিটিশ ইনফ্রারেড বিশেষজ্ঞ মিঃ পল বামফ্রি ম্যাকনেইব একটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে একমাইল দূরে কোন লোক লুকাইয়া থাকিলে সে কোথায় অবস্থান করিতেছে তাহা ঐ যন্ত্র-সাহায্যে জানা যাইবে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। উক্ত আবিষ্কারের বিস্তৃত বিবরণ সম্পূর্ণ গোপন রাখা হইয়াছে। নৌবিভাগ, সামরিক বিভাগ এবং বিমান বিভাগের বিশেষজ্ঞগণের সম্মুখে উক্ত যন্ত্র পরীক্ষিত হইয়াছে এবং আবিষ্কারকের দাবী মৌলিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তাপ তরঙ্গ সম্পর্কে আবিষ্কৃত যন্ত্রের প্যাল ভ্যানো মিটারের অতি অনুভূতির দ্বারাই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর বিশেষজ্ঞগণ উক্ত যন্ত্র সাহায্যে শত্রুপক্ষীয় বিমান আগমনের কথা জানিতে পারিতেন বলিয়া আশা করেন।

ভারত সম্পর্কে ইংরেজসাহিত্যিকের রচনা

খ্যাতনামা ইংরাজ সাহিত্যিক মিঃ জে, বি, প্রিষ্টলী পৃথিবী পরিভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ভারত সম্পর্কে একখানি পুস্তক রচনা করিবেন।

ভারতে নারী আন্দোলন

ভারতের নারী আন্দোলনের প্রসার ও প্রগতির সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ঔৎসুক্যসম্পন্ন বহু নরনারী সম্প্রতি নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সামাজিক বিভাগের অবৈতনিক সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা রেণুকা রায়কে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্তা রায় লণ্ডনের কিংস কলেজে কিছুকাল বার্ত্তাবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া পরে লণ্ডন স্কুল অব, ইকনমিক্স-এ ধর্ম-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন। ইঁহার স্বামী একজন আই-সি-এস, বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা রায় পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছেন।

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের" প্রতিনিধির নিকট শ্রীযুক্তা রায় বলেন,—"চীন ও জাপান অপেক্ষা ভারতের নারী আন্দোলন আরও শক্তিশালী, জাপানী মেয়েরা আমাকে বলেন যে, তাঁহাদের দেশে ঐ প্রকার কোন আন্দোলন নাই, জাপানী মেয়েরা ভোটাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন না করিয়া পাশ্চাত্যের ছোটখাট আচার ব্যবহার অনুসরণ করিতে ভালবাসে। শ্রীযুক্তা রায় বলেন যে, জাপানী মেয়েরা তাহাদের অজ্ঞাতসারেই আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, জাপানের শতকরা ৯৮ জন অধিবাসী প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। মেয়েরা যাহাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য আন্দোলন চলিতেছে। শ্রীযুক্তা রায় বলেন—সম্পত্তি, বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে ভারতীয় নারীদিগের আইনগত যে ক্ষমতা আছে তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহা ইংরাজ রমণীগণের জানা উচিত। তিনি বলেন, ভারতীয় নারীদিগের আইনগত অধিকার সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ভারতসরকার একটি কমিশন নিয়োগ করুন—নিখিল ভারত নারী সম্মেলন ইহাই দাবী করেন।

নূতন ভারতশাসন আইন

নূতন ভারত-শাসন আইন সম্পর্কে শ্রীযুক্তা রায় বলেন,—"উক্ত আইনে আমরা আদৌ সন্তুষ্ট নহি। পার্লামেন্টে ভারতে নারী আন্দোলন শক্তিশালী বলিয়া স্বীকৃত হইলেও আমরা যে সমস্ত জিনিষের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম ঠিক সেইগুলিই আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। গত মাসে পুণায় নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের যে ষাণ্মাষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতীয় নারীর স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং সঙ্ঘবদ্ধ নারীগণের মিলিত দাবী আদৌ গৃহীত হয় নাই দেখিয়া গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের অনেক বিষয়ই তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছে। ভারতীয় নারীরা আইন-সভায় পৃথক আসন অথবা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চাহে নাই এবং যদি মানিয়া লইতেই হয় তাহা হইলে নারীদিগের নির্ব্বাচনে পুরুষ ও নারী উভয়েরই ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে পুণায় ঐ অধিবেশনে স্ত্রী হিসাবে নারীগণকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছিল।

স্বামীর সম্পত্তি থাকিলে স্ত্রী ভোট দিতে পারিবে ইহা প্রত্যেক ভারতীয় নারী সমিতিই আপত্তিজনক বলিয়া মনে করেন। শ্রীযুক্তা রায় বাঙ্গলার নারীগণের ভোটাধিকার সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, "প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় নারী আন্দোলন সুরু হইলেও সামাজিক অবস্থা এখনও এরূপ রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ না করিলে নারীগণ শিক্ষার দিক হইতে ভোটাধিকার পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।"

মরুভূমির নীচে হ্রদ

সিরিয়ার মরুভূমির নিম্নে স্বাদু জলপূর্ণ এক বৃহৎ হ্রদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ঐ মরুভূমি শস্য শ্যামল স্থানে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। এরাক হইতে কেরোসিন তৈল হাইফা বন্দরে লইয়া যাইবার জন্য যে সমস্ত শ্রমজীবী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে জল সরবরাহের জন্য কূপ খনন করিবার সময় ঐ হ্রদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সকল স্থানেই ৬০০ হইতে ৮০০ ফুট নীচে প্রচুর জল পাওয়া গিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা ভারী মানুষ

কোনও সাধারণ ওজন করিবার যন্ত্রে মিঃ এল, ল্যাভটুকে ওজন করা যাইত না। তাঁহাকে যখন শেষবার ওজন করা হয় তখন তার ওজন ছিল ৩৮ ষ্টোন অর্থাৎ প্রায় ৬৷৷০ মণ। তিনি বলিতেন যে, তার ওজন ছিল ৪০ ষ্টোন। অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি মারা গিয়াছেন।

শিশুদের কথা

শ্রীসুনীতি বালা গুপ্তা, বি, এ, বিটি, (কলি) এম্, এড্ (লীড্‌স্)

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়বৃন্দ, আমাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে আমি বক্তা নই এবং সর্ব্বদা বক্তৃতা করিবার অভ্যাস ও আমার নাই। আজ ও আমি বক্তৃতা করিতে আসি নাই কিন্তু শিশুদের আমি বড় ভালবাসি সর্ব্বত্রই তা'দের সঙ্গে আমার বড় ভাব হয় তাই আজ তাহাদের হইয়া দুই চারিটা কথা বলিতে আসিয়াছি। পৃথিবীর হিসাবে বহুদিন হইল যুগযুগান্তর হইতে চলিল আমি শৈশব অতিক্রম করিয়াছি হয়ত বা এই জীবনের পরপারে যে অপর শৈশব আছে সে দিনই আমার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু অন্তরের অন্তরে এমন এক স্থান আছে সেখানে আমার শৈশব চিরজাগরুক। কোথা হইতে কেমন করিয়া সে তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছে জানিনা, কিন্তু পৃথিবীর সকল সংগ্রাম, মলিনতা, কর্কশতা, উত্তাপ, ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে ও সে আপনার মধুর শ্যামলিমা চির অমলিন রাখিয়াছে। বাহিরে আমি দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করি পৃথিবীর গোলক ধাঁধার মধ্যে জটিলতার পথে আপন স্বার্থ সুখকর পথখানি বাছিয়া লই, সামাজিক জীবনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশি, আমোদ আহ্লাদ করি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমার মাতৃহারা পিতৃহারা শৈশব তাহার অসহায় হাত দু'খানি তুলিয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র সে সেই হারাণো স্নেহের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায় যে স্নেহের তুলনা হয় না। তাই বোধ হয় যেখানে যত শিশু দেখি—মায়ের কোলে বাবার বুকে আদরে, সোহাগে লালিত পালিত হাসি মুখ, আনন্দের প্রতিমা—তা'দের মাঝেই আমার সত্যিকার পৃথিবী ও সত্যিকার জীবনকে খুঁজিয়া পাই।

সন্তান সাধনার ধন। আমাদের দেশে বালিকারা শিশুকাল হইতেই ব্রত নিয়ম করে এবং বড় হইলে শিব পূজা করে তাহাদের এই পূজা নিষ্ঠার ভিতর দিয়া এই আন্তরিক প্রার্থনা ধ্বনিত হয় যেন সৎমাতা হইয়া সুসন্তান লাভ করিতে পারি। তাঁহাদের নিকট সন্তান পৃথিবীর সকল ধন ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা বড়। এই সূত্রে আমার একটা ঘটনা মনে পড়িল। আমরা তখন ছোট ছিলাম ভাই বোন কয়েকজন প্রাঙ্গনে খেলা করিতে ছিলাম। এমন সময় একজন ভৃত্য আমাদের দিদিমার পরিত্যক্ত থান ধুতিখানি ধুইতে লইয়া যাইতেছিল। তিনি প্রত্যহ হবিষ্যান্তে মুখ শুদ্ধির নিমিত্ত একটু হরিতকি কিংবা লবঙ্গ খাইতেন। তাহারই কয়েকটী লবঙ্গ কাপড়ের আঁচলে বাঁধা ছিল। চাকরটী আঁচলে গিঁট দেখিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "বুড়োমা, আপনার আঁচলে কি যেন সোনা দানা বাঁধা আছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ওরে আমার সোনা দানা কি আঁচলে বাঁধা থাকে, দেখ তারা উঠানে নেচে বেড়াচ্চে।" তিনি আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে শিব পূজা করিতেন এবং সন্তানগণকে দেবতার দান বলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার চিরন্তন মায়েদের এই

প্রাণের কথা বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্র নাথ তাঁহার একটী কবিতাতে অতি মধুর ভাবে ব্যক্ত• করিয়াছেন। আমি তাহারই একটুখানি পড়িব :—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
"এলাম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তাঁ'র বুকে বেঁধে,—
"ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝেতে॥

ছিলি আমার পুতুল খেলায়
প্রভাতে শিব পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গ'ড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা ক'রেছি॥

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালোবাসায়,
আমার মায়ের, দিদিমায়ের পরাণে—
পুরানো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের পরে
কতকাল যে লুকিয়েছিলি কে জানে॥

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্য কালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সম বয়সী,—
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে
এসেছিলি আনন্দ স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি॥

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই
কেঁদে মরি একটু স'রে দাঁড়ালে।
জানিনে কোন্‌ মায়ার ফাঁদে
বিশ্বের ধন রাখ্‌ব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহুটীর আড়ালে॥"

এখন এখানে অনেক মা ও বাবা উপস্থিত আছেন বলুন দেখি কার সন্তানটী ঠিক এমনই প্রিয় নয়? কাহার ইচ্ছা হয় না সবল বাহুর মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সকল সন্তানকে অকল্যাণ ও অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা করেন। সকল মাতা পিতারই আন্তরিক প্রার্থনা যে কটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে প্রত্যেকে বাঁচিয়া থাকুক। ছোট্ট অসহায় শিশুটি যখন জন্মগ্রহণ করে মা তিলে তিলে বুকের রক্ত দিয়া ও পিতা তাহার শক্তির আবরণে শিশুটিকে বড় করিয়া তোলেন। ক্রমে শৈশব অতিক্রম করিয়া বাল্যে উপনীত হয়, ক্রমে ক্রমে শক্তিমান যুবক ও সুন্দরী তরুণী হইয়া উঠে। তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া বাবা মার মনে কি আনন্দ, কি গর্ব্ব, কি সুখ। ক্রমে যে সন্তান অসহায় মাংসপিণ্ডবৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সে মানুষ হইয়া বার্দ্ধক্যে মাতাপিতার অবলম্বন স্বরূপ হয়। প্রত্যেক মাতাপিতার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, যে সন্তানকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছেন তাহারি সম্মুখে অন্তিমে চক্ষু মুদিবেন এবং দেহান্তে তারি হস্তে গণ্ডূষপাণি ঔর্দ্ধদেহিক আত্মা তৃপ্ত হইবে।

যে সন্তান লাভ করিবার জন্য লোকের এত আকাঙ্ক্ষা, এত আকুলতা। বৎসরে বৎসরে তাহারা মায়ের বাপের বুকে শেল হানিয়া পরলোকে চলিয়া যায়। মাতাপিতার যে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সন্তানকে মানুষ করিবার বড় করিবার সে পথে প্রতিবন্ধক কে জন্মায়?—জন্মায় দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও কুশিক্ষা।

দারিদ্র্য অপেক্ষাও অজ্ঞানতা এবং কুশিক্ষাই এ পথের অধিক অন্তরায়। সুশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত কোন মাতাপিতাই আমাদের দেশে বিবাহের পূর্ব্বে সন্তান পালনের রীতিনীতি শিক্ষা করেন না। শুধু সন্তান জন্মালেই হইল না, তাহাদের মানুষ করিবার জন্য যে সকল বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী রহিয়াছে তাহা প্রত্যেকের শেখার দরকার। গ্রাম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সহরে মানুষ প্রকৃতিদেবী যে তাহার আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের পসরা সাজাইয়া দু'হাত বাড়াইয়া বসিয়া আছেন সেখানে সে ইটের পর ইট সাজাইয়া তার মাঝে কীটের মত মানুষের বাসস্থান করিয়া দিল। ধরিত্রীর অপরূপ সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না, অগণ্য নক্ষত্রখচিত অপরূপ সুন্দর নীল আকাশ, পত্র পুষ্প ও ফলে সুসজ্জিত বৃক্ষ ও লতারাজি, প্রাণদায়ী বায়ু সকল বাহিরে বিদায় করিয়া দিয়া সে নিজের মরণের কারা নিজে রচনা করিল।

এক সময়ে আমাদের এই দেশে কি প্রাণবাণ জীবন্ত পুরুষ সকল বিচরণ করিতেন, সেই সিংহের দেশ শিবার বাসস্থান হইয়াছে। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলাম সেইখানে নবাবের অস্ত্রাগারে নবাব সিরাজদ্দৌলা যে তরবারি কটিদেশে ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন সেই তরবারি দেখিলাম। তরকারীখানি দৈর্ঘ্যে আমার উচ্চতা হইতে বোধহয় দুই ইঞ্চি কম হইবে। তিনি অবলীলাক্রমে এই তরবারি কোমরে ঝুলাইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেন। আপনারা ভাবিয়া দেখুন যাহার কটিতট উচ্চতায় প্রায় আমার মাথার সমান সেই পুরুষ-প্রবরের দৈহিক উচ্চতা কতদূর ছিল। এই উচ্চতা অনুযায়ী তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্যক বিকাশ হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী শক্তি ও তিনি রাখিতেন। যাঁহারা আগ্রার তাজমহল দেখিতে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, সাজাহান বন্দীদশায় যে কারা-কক্ষে থাকিতেন, তাহার এক স্থানে ক্ষুদ্র একটী সবুজ রঙের পাথর বসান আছে, এই পাথর খানি এমন ভাবে বসান, যে তাহাতে সমগ্র তাজমহলের প্রতিকৃতি প্রতিবিম্বিত হয়, সাজাহান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া এই পাথরে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সমাধি মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখিতেন। আমরা যদি সেই পাথরে তাজমহলের ছবি দেখিতে চাই, আমাদের অন্ততঃ ১ হাত উঁচু স্থানে দাঁড়াবার দরকার হয়। বীরকেশরী প্রতাপাদিত্য প্রতাপসিংহের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শক্তিমান যুবাকেও ধরিয়া দাঁড় করাইতে হয়, ১০৩২ সালে যখন ইংলণ্ডে Statistics লওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে, মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের জন সাধারণ গড়ে ২ ইঞ্চি করিয়া উচ্চতাতে বাড়িয়াছে। আমার মনে হয় যদি ভারতবর্ষের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকদের আমরা দেখিতাম, তবে বুঝিতাম যে বিংশ শতাব্দীর ভারতবাসী উচ্চতাতে বাড়া থাক্, গড়ে এক হাত করিয়া কমিয়া গিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, যে, দেশের ভবিষ্যৎ শিশুদের যদি দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করিতে হয়, তবে Fresh Air Excursion এর প্রয়োজন কোথায়? প্রয়োজন বুঝাইতে হইলে বৈজ্ঞানিক কয়েকটী কথা বলার দরকার হয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে আপনারা সকলেই জানেন বলিয়া আমি শুধু ২।৪টী কথায় তাহা বলিব। মানবের শোণিতে তিনটী জিনিষ বর্ত্তমান—Red and white blood corpuscles and platelets প্রত্যেকটী রক্ত বিন্দুতে ৫০০,০০০ হইতে ৪৫, ০০, ০০০ লাল রক্ত কণিকা আছে এবং ৫০০০ হইতে ১০,০০০ শ্বেত রক্ত কণিকা আছে, শ্বেত কণিকারা পুলিশ প্রহরীর ন্যায় সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া রোগের বীজাণু হইতে শরীরকে রক্ষা করিতেছে। লাল রক্ত কণিকা ও শ্বেত রক্ত কণিকার অম্লজান না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলে না। অম্লজানের বলে বলীয়ান হইয়া তাহারা দেহের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করে। অম্লজানের অভাবে তাহারা হতবল হইয়া পড়ে ও দেহে রোগের সঞ্চার হয়। এই বিশুদ্ধ অম্লজান ভগবানের নিজের দেওয়া বিশুদ্ধ বাতাস ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না যেমন মায়ের বক্ষের স্তনের ন্যায় সন্তানের দেহ গঠনের উপযোগী খাদ্য ও পানীয় আর নাই, তেমনই প্রকৃতি মায়ের আকাশ, বাতাস, রৌদ্র, মাটীর মতন মানুষের মত মানুষ আর কেহ গড়িতে পারে না।

মানুষের দেহের সহিত মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ না থাকিলে মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। বাঙ্গলাদেশের শিশুরা বুদ্ধি মত্তায় জগতের যে কোনও দেশের শিশুদের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে দেশের শিশুদের মত তাহারা আহার বাসস্থান, পরিচ্ছদ ও যত্ন পায় না বলিয়া তাহাদের যোগ্যতা সর্ব্বত্র প্রদর্শন করিতে পারেনা বিলাতে দেখিয়াছি প্রত্যেক পরিবারে মাতা, পিতা শিশুদের লইয়া পার্কে আসেন, সেখানে সারাদিন আনন্দে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া যান, শিশুদের আনন্দও হয় শিক্ষা ও হয়, মাতা পিতা প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করেন।'

বিশ্বজগৎ উন্নতির দ্রুততালে নাচিয়া চলিয়াছে, যদি বাঙ্গালী দশের মধ্যে একজন হইতে চায়, তবে তাহাকে তাহাদের শিশুদের ভবিষ্যতের প্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কারণ শিশু তো তাঁহার একার নয়, সে যে, দশের, দেশের ও জাতির। তাহাদের এই সুযোগ দিবার কর্ত্তব্য মাতা, পিতার একলার নহে, ইহা গৃহের পরিবারের বিদ্যালয়ের ও জাতির কর্ত্তব্য।

প্রত্যেকটী বালক, বালিকা ভবিষ্যতের মাতা, পিতা। তাহারা যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, তাহার আগে প্রত্যেকে বিদ্যালয়ে যাহাতে শিশু পালন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে তাহা দেখিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষার পূর্ব্বে প্রত্যেকটী যুবক ও যুবতী যাহাতে মাতৃ ও পিতৃ-জীবনের যোগ্য শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মতভাবে লাভ করে, তাহা দেখিতে হইবে।

১৭ই আগষ্ট কলিকাতা মহাবোধি হলে Childrens' Fresh Air Excursion Societyর বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

"বন ফুল"

শ্রীলীলাবতী সরকার

রয়েছে ফুটিয়া নিজন কাননে
পরেনি আজিও মানব নয়নে ;
সৌন্দর্য্য সৌরভ সব অকারণে
বৃথাই জনম তার।
দেবতা চরণে দিতে অঞ্জলি
তুলেনি পূজারী লয়ে হাতে ডালি ;
গাঁথিবারে মালা তুলে নাই মালী
ফুটেছে লাগিয়া কার ?

আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিয়া ;
পড়িবে গাছের তলটী ভরিয়া,
আপনি কাঁদিয়া উঠে শিহরিয়া
সহিতে পারেনা আর
ওগো ফুল সব কেন বা হেথায় ?
রয়েছ শুকায়ে আর কি আশায় ?
কে আছে তোমায় কোন মমতায় ?
কেউ লইবেনা জীবনের ভার।

অতসী

শ্রীবেলা দেবী

ষ্টেশনের নাম 'তিন-তাল-গাছ', অথচ দু'মাইলের ভিতর যে কোন তাল গাছ ছিল বা আছে, এমন মনে হয়না। গাঁয়ের নাম লোকে এখন বলাবলি করে ছয়গাঁও। অতি প্রাচীনেরা বলেন, এই ষ্টেশনের কাছেই নাকি তিন তিনটি প্রকাণ্ড তালগাছ ছিল, এবং দৌলতখাঁর বন্যায় সেই গাছ তিনটি নাকি ভাসিয়া যায়, না কোন বারশ' তেরাশি সনের ঝড়ে সমুলে ভূপতিত হয়, এমন কি সব কিংবদন্তী আছে। মোট কথা, তাল গাছ কয়টি এখন আর নাই।

দুপুরের ট্রেন আসিয়া গেছে। পূজার অসম্ভব ভীড়, লোকাল ট্রেন এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গাড়ী থামিতেই আরোহীর দল একে একে গন্তব্য স্থানে ছুটিয়া চলিল। ক্ষণিকের জন্য ফেরিওয়ালার বিকট চীৎকারে, কুলীর কোলাহলে এবং যাত্রীবর্গের বিষম হৈ-চৈতে ছোট ষ্টেশনটি একেবারে সরগরম হইয়া উঠিল, আবার পাঁচ মিনিট না যেতেই সেই, সেই। ষ্টেশন প্রায় শূন্য হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একখানি রঙিন শাড়ি পরা ফরসা গোছের একটি স্ত্রীলোক বছর তিনেকের একটি শিশু ক্রোড়ে লইয়া প্লাটফরমের অনতিদূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভাবে-সাবে মনে হইল, সঙ্গের লোক হারাইয়া কাহাকে যেন খুঁজিয়া মরিতেছে। রাখাল ঘোষাল পোস্টমাষ্টার, ষ্টেশনের পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল,—হাটে নাকি বড় বড় কই মাছ বেচাকিনা হইতেছে। মদন মুদী হাত নাড়িয়া ইসারায় তাহাকে কাছে ডাকিল, সমুখে আগাইয়া আসিয়া কহিল, মাষ্টার, বিপদের কথা শোন, মেয়েটির আর কেহ নাই। স্বামী নাকি বেকার, অবসর এবং সুযোগ বুঝিয়া...রাখাল সমজদার লোক, এক কথায়ই অনেক কথা বুঝিয়া লইল। গায়ে পড়িয়া অনেক কথা জানিয়া লইতে ইচ্ছা হইল। মেয়েটির কাছে গিয়া জানিয়া লইল, স্বামী বেচারী পালায় নি, ষ্টেশনের ওই দিকে মারা গিয়াছে, স্ত্রীলোকটি বিপন্না, সাহায্যপ্রার্থী।

কথায় কথায় রেলওয়ে ষ্টেশনের বাবুরা, আশে পাশের দোকানীরা, কবিরাজ মশায়, স্কুলের হেডপণ্ডিত, কুলী মজুর প্রভৃতি সকলেই আসিয়া হাজির হইলেন। সহানুভূতি এবং অশ্রুর বিনিময়ে কেহ কেহ অন্তর্ধান হইলেন। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই, আরো দু'একজন আফিম খাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কেহ বা বাড়ীতে শনির পূজার আয়োজন হইয়াছে, কেহ বা সায়ং সন্ধ্যার অছিলায় ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে সরিয়া পড়িলেন। বাকী রহিল বোকা রাখাল মাষ্টার, জন কয়েক সৎসাহসী যুবক, মদন মুদী আর রসিক পণ্ডিত এবং জন কয়েক গ্রামের নিরীহ লোক।

ব্রাহ্মণের আত্মার সদগতি হইয়াছে, এখন মৃত দেহের সদ্‌গতি করিতে ও ব্যয়ব্যসন আছে বৈকি। টাকার কথা উঠিতেই মেয়েটি সাশ্রুনেত্রে গায়ের দু'একখানি গহনা ধীরে ধীরে খুলিয়া

ফেলিতেই ষ্টেশনের পার্শেল বাবু মধু সামন্ত চুপি চুপি রাখালের কানে কানে কহিল, গয়নাগুলি নিয়ে এস আমার ওখানে, যা'হোক দু'চার পাঁচ টাকা বিপদের সময় না দিলে চল্‌বে কেন ? তারপর দু'জনে——বুঝলেত ?

রাখাল বিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কোনক্রমে কহিল, বলো কি সামন্ত, এত ছ্যাঁচড়া আমি নই যে দু' পাঁচ টাকার লোভে গহনাগুলি আমি আত্মসাৎ করব ! আর এই সময়ে......মধু সুর ধরিয়া কহিল, তোমার যা' খুসী করো, আমাদের খামোকা ডাকাডাকি কেন তবে !

যতীন কবিরাজ মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, 'চলো, আর দেরী করে লাভ কি । টাকা তোমরা না দাও, আমিই দেব । ভাগ বখ্‌রা না হয় পরে হবে । গহনাগুলো দাও আমার হাতেই, আমি ভালো করে রেখে দি'

মেয়েটির বয়স বছর কুড়ির ত বেশী নয়ই, বরং আর একটু নীচে । রঙ্‌ ফর্সা, চেহারা ও সুন্দরী বলিয়া মনে হয় । বিশাল ভ্রূ যোড়া যেন রামধনুকেও হার মানিয়াছে । তাহার আয়ত, উজ্জল চোখ দুটি যেন সন্ধ্যার তারার মত ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছিল । স্ত্রীলোকের অত ফর্সা রঙ দুর্ভাগ্যের লক্ষণ, মদন মুদী মনে মনে বলিয়া উঠিল ।

স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি অসীম কর্ত্তব্য বোধে তাহার চোখে মুখে অসাধারণ একটা ধৈর্য্যের দৃঢ়তা এবং সহ্য করিবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া রাখাল মাষ্টার অবাক হইয়া গেল ।

পল্লীগ্রামের হালচাল মেয়েটির জানা ছিলনা বোধ করি । কোন মতে দুঃখ, কষ্ট বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে রাখাল মাষ্টারের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া অপলক নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, কি হবে !

যতীন কবিরাজ আশ্বাস দিয়া কহিল, ভয় নেই মা, আমরাই সব করে দেব তোমার । এখন টাকার যোগাড় হলেই হয় ।

রাখাল মাষ্টারের হয়ত একথা বলিতে লজ্জা করিত, কিন্তু কবিরাজের মুখে আট্‌কাইলনা দেখিয়া রাখাল কোন মতে মুখ খুলিয়া কহিল, তুমি ভয় পেয়ো না মা, আমি সব ঠিক করে দেব ।

মেয়েটি ফিস ফিস্‌ করিয়া বলিয়া উঠিল, আমার গহনা বিক্রী করে নিন্‌ না, আমার স্বামীই যখন গেছে, তখন আর এ সব দিয়ে কি হবে আমার ।

রসিক চোখে মুখে যেন মেয়েটিকে গিলিতেছিল, সুযোগ পাইয়া টিকি নাড়িয়া কহিল, এতো ঠিক কথা,...অর্থমনর্থম্‌ ভাবয় নিত্যম ।

তাহার মুখে অসময়ে সংস্কৃত ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া আশে পাশের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল । রসিক এমন গুরু গম্ভীর স্বরে ধমক দিয়া উঠিল যে, মেয়েটির কোলের শিশু ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বিদেশে বিভুঁয়ে অপরিচিতের মাঝে পড়িয়া এমন কান্না সুরু করিয়া দিল যে, কিছুকে শান্ত করা গেল না । রাখাল মনে মনে বিষম বিরক্ত হইয়া বহু কষ্টে

আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, ব্যস্ত হবার কিছু নেই মা, সবই হবে যাবে, তুমি ছেলেটিকে নিয়ে এদিকে এসো।

শেষ পর্য্যন্ত গহনাগুলি রাখালের কোঁচার খুঁটেই বাঁধা রহিয়া গেল, এবং ঈশান দারোগা এবং ফৈজদ্দি দফাদার সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরের খবর আমরা তেমন ভালো জানিনা, একটু দেখিয়া শুনিয়া দারোগা সাহেব আর বিশেষ টানা হেঁচড়া কহিলেন না, লাস জ্বালাইবার হুকুম দিলেন।

দিঘড়া ষ্টেশন হইতে তাহারা আসিতেছিল। ছেলেটি আসামের কি একটা অফিসে কাজকর্ম্ম করিত, সম্প্রতি চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ায় অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। দারোগা সাহেব সকল কথাই অকপটে বিশ্বাস করিয়া নিলেন, তিনি মেয়েটির চোখের জলে বিগলিত হইয়াছিলেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর গত হইয়াছে। মৃতদাহের জন্য জিনিষপত্র যোগাড় করিতে প্রায় কিছু সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল। সেই রাখাল মাষ্টার, মদন মুদী, গাঁয়ের তরুণ ছেলেরা, ও জন কয়েক নিরীহ পল্লীবাসীরা সাথে সাথে যাইবে। যতীন, রসিক কেহই আর ফিরিয়া আসে নাই। জামা কাপড় ছাড়িবার নাম করিয়া তাহারা যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছিল, তাহা বুঝি ভগবানও জানেন না।

ষ্টেশন হইতে শ্মশান এক ক্রোশের পথ। পথের দুইধারে বাব্‌লা গাছের সারি, শিয়াকুল, ময়না, চেঁচো ঘাসের অভাব নাই। মাঝে মাঝে জোনাকী জ্বলিতেছে। আকাশে ফাঁকে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, বাতাস ও নিতান্ত মন্দ বহিতেছিল না। কি একটা গাছের ফুলের গন্ধে চতুর্দ্দিকে আমোদিত হইয়া গিয়াছিল। নদীর তীর দিয়া পথ। সেই পথ ধরিয়া রাখাল মাষ্টার, মদন মুদী, এবং আরো অন্যান্য পল্লী যুবকেরা লাস কাঁধে করিয়া চলিয়াছিল। সমবেত কণ্ঠের ভীষণ চীৎকারে গগন মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, আর মাঝে মাঝে সেই তরুণী কিশোরীটি পথের মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতেছিল। শিশু ছেলেটির চোখে বড় একটা ঘুম ছিলনা, গাঁয়ের একটি কিশোর ছেলে তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছিল। সে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তরই কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, মা, আমরা কোথায় যাব, বাড়ী?

—হ্যাঁ বাবা, আমরা বাড়ী যাব!

—মা, বাবা কোথায়? বাবা যাবে না?

যে ছেলেটি তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই জবাব দিল, যাবে, যাবে, সবাই যাবে। খোকা, তোমার কোন ভয় নেই! ছেলেটির বুকপকেটে কিছু বাতাসা, নকুল রাখাল মাষ্টার আগে হইতেই দিয়া রাখিয়াছিল, সে তাই মাঝে মাঝে খোকাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য বলিতেছিল, ক্ষিধে পেয়েছে তোমার?

খোকা প্রতি বারই জবাব দিল, না, পায়নি।

হায়রে অবোধ শিশু; সে বোধ করি তখনও ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার পিতা পরলোক গমন করিয়াছে। সে ইহার কি ভালো বোঝে, জানে!

তরুণীটি রাখাল মাষ্টারের সাথে পথ চলিয়াছিল, কত জায়গায় সে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, কত আশেপাশের কাঁটার বনে পা আটকাইয়া গিয়া কোমল পা দুটি রক্তাক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তবু তাহার চোখে মুখে কোন কষ্ট, বেদনা, দুঃখের রেখা ফুটিয়া ওঠে নাই।

রাখাল মাষ্টার চিরকাল উদাসীন, সুখদুঃখকে সে এক চোখেই দেখিয়া থাকে, সংসারের ভালো মন্দর দিকে তাহার কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। গত দশ বৎসর যাবৎ সে এই গাঁয়ে আসিয়া বসবাস করিতেছে, গ্রামের পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার সে, তবে রাখাল মাষ্টার বলিয়াই তাহাকে সকলে জানে। স্ত্রীপুত্রের বালাই নাই, এবিষয়ে গ্রামে অনেক রকম মতদ্বৈধ আছে! তবে ভিতরের আসল খবর কেহ বলিতে পারে কিনা সন্দেহ। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঘোষাল হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু সে পরোপকারী, চাকুরি করিয়া যে কয়টি টাকা সে পায়, গ্রামের দীন দরিদ্রের সেবায়ই তাহা ব্যয় হইয়া থাকে! যে বাড়ীতে পোষ্টঅফিস, সে খানেই দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তাহার সহজেই জোটে। পাড়াপড়শীর ব্রাহ্মণ-সেবার ব্রাহ্মণের জন্য, বিবাহ, উপনয়ন, বারোমাসে তেরো ব্রত, পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ, কীর্ত্তন এই সব বৃহৎ, ক্ষুদ্র ব্যাপারে রাখাল মাষ্টারের নিমন্ত্রণ হওয়া চাই-ই! গ্রামে কেহ পিসী, কেহ মাসী, কেহ দাদা, কেহ দিদি, এই সব সম্পর্কের ভিতর দিয়া রাখাল মাষ্টার অতি সুখে এই দশ বৎসর অনাত্মীয় দেশে কাল কাটাইয়া দিল!

যখন তাহারা আসিয়া শ্মশানে পৌঁছিল, চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতা যেন বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যাইতেছিল। অদূরে কি একটা পাখী অমঙ্গল সূচক ধ্বনিতে ডাকিয়া উঠিতেছিল! হ্যারিকেনের স্বল্প আলোকে কয়েক জন যুবক মদন মুদীর সাহায্যে কোমর বাঁধিয়া কাজ কর্ম্মে লাগিয়া গেল! রাখাল মাষ্টার তরুণীটির সুমুখে বসিয়া সান্ত্বনাসূচক বাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিতেছিল। তাহার মনের অবস্থা যে কি, তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানিল না, তবু প্রাণপণে সে মনের বিষম বল সঞ্চয় করিয়া আগাগোড়া ব্যাপারটি নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মৃতদেহ যখন জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সে হাহাকার করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদে রাখাল মাষ্টারের পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

রাখাল মাষ্টার ঝড়ের পাখী, এ জীবনে যে কত ঝড় বাদল তাহার জীবনের ওপর দিয়া বহিয়া গেছে, তাহা সে নিজেই ভালো জানে। সুতরাং কোন রকম ঘাবড়াইয়া না গিয়া তরুণীটির দেহ খানি তাহার উত্তরীয়ের ওপর রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সবুজ শ্যামল ঘাসের গালিচার ওপর বসিয়া বোধকরি অতীত সুখ দুঃখের কথা ভাবিতেছিল।

ছেলেটি ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এ বিশ্বজগতের সুখদুঃখের ইতিহাস যে বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে থাকিয়া লিখিয়া রাখিতেছিলেন, তিনি ও বায়স্কর এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল! সকলে আসিয়া জড়ো হইয়া তখন বসিয়াছে মাত্র। মদন কলিকায় তামাকু সেবন করিতে করিতে বিষম কাসিয়া উঠিতেছিল। দু'একজন বহ্নিমান চিতার আশে পাশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের কাজে ব্যাপৃত ছিল। গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কল্লোলিনী কল কল শব্দে ছুটিয়া যাইতেছে। কাহার ও মুখে কোন রা-শব্দ নাই। মদন সহসা বলিয়া উঠিল, ঘোষাল, এত মনমরা হয়ে বসে রইলে কেন? কথা বার্ত্তা বল, তা' হলে ত ভালো লাগ্‌বে! ভোর নাগাদ ত থাকতে হবে, এই ভাবে চুপ করে কাটানো যাবেনা কোন মতেই। একটা গল্প বল না হয়, সময় ও বেশ কেটে যাবে।

সুশীল ষ্টেশন মাষ্টারের ভাইপো, এবার বি-এ পড়ে, গল্পের নামে ভয়ানক পাগল। চাপিয়া ধরিল, ঘোষাল মামা, একটা গল্প বল্‌তেই হবে।

আরো জন কয়েক তাহাকে সায় দিয়া কহিল, নিশ্চয়ই, সময় কাটাবার এমন চমৎকার জিনিষ আর নেই ইত্যাদি নানাবিধ মন্তব্যে বনস্থলী মুখরিত করিয়া তুলিল।

মেয়েটির তখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে কিনা, ঠিক বোঝা গেলনা, বোধ করি সে চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। মানসিক উত্তেজনা, দেহের ক্লান্তি এবং পরিশ্রমে সে মড়ার মত পড়িয়া আছে দেখিয়া রাখাল ঘোষাল বার কয়েক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গলা কাসিয়া বলিতে সুরু করিল।

আজ যে গল্পটি তোমাদের কাছে বলিতে চাই, সে এক ভীষণ ইতিহাস আমাদের গাঁয়েরই পচা ঘোষালের কথা! পচা ঘোষাল আজ বেঁচে থেকে ও জীবনে মরিয়া হয়ে আছে! আমাদের দেশ ছিল বিক্রমপুরে, পদ্মার তীরে। এখন আর দেশে ঘর বাড়ী নেই, আছে পদ্মার আকুল গর্জ্জন,...

—মদন চিন্তিত সুরে প্রশ্ন করিল, পচা ঘোষাল আবার কে?

—এই ধরোনা একজন মানুষ, কিন্তু তার প্রাণ ছিলনা, হৃদপিণ্ডকে উপ্‌ড়ে তুলে নিয়ে গেছল! বলিয়াই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঘোষাল মনে মনে একটু হাসিয়া উঠিল।
—তারপর?

"—তারপর, পচা ঘোষাল বিএ পাশ করিয়া কলিকাতায় কি একটা ব্যবসা বাণিজ্য ফাঁদিয়া বসিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল! দু'দিনেই তাহার চেহারা ফিরিয়া গেল, হাতে পয়সা হইলেই মান, সম্মান, কীর্ত্তি, যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শেষে ঘোষালের বিবাহ

হইল খুব ঘটা করিয়া ধনে জনে গৃহ বাড়ী গম্‌গম করিতেছে......বিবাহের তিন বছর পরে ঘোষালের এক মেয়ে ইহ সংসারে আসিয়া দেখা দিল। রূপে অদ্বিতীয়, হাসিভরা মুখখানি, অতসী ফুলের মত গায়ের রং দেখিয়া পাড়ার দশজনে সখ করিয়া নাম রাখিল অতসী। লক্ষ্মী বুঝি স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে মেয়ে বড় হইল, বারো বছরের মেয়ে—মামার বাড়ীতে গিয়াছিল বেড়াইতে। লোকজন, পাইক, বরকন্দাজ দল ভারী করিয়া ছুটিল সাথে সাথে। তালসোনাপুর গাঁয়ে ঘোষালের শ্বশুর বাড়ী। মাঝখানে ইচ্ছামতী পার হইয়া যাইতে হয়! শীতকাল, বেলা না পড়িতেই সন্ধ্যা হইয়া আসে, তীরে খেয়ানৌকা ছিল না। লোকজন, দাসদাসী খেয়ানৌকার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুযোগ এবং সুবিধা বুঝিয়া একদল দুর্ব্বৃত্ত হঠাৎ আসিয়া ঝড়ের মত পড়িয়া পাল্কী ছিনাইয়া লইয়া গেল! দেহরক্ষীরা যুদ্ধ করিয়া প্রভুপত্নী এবং প্রিয়তমা কন্যার জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, কিছুতেই কিছু হইল না। যাহারা গ্রামে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সদরে খবর পৌঁছিতেই ঘোষাল আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিল। সারা দেশ ব্যাপিয়া হায় হায় রব উঠিতেই ঘোষাল ইহজীবনের মত স্বদেশ, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তি এখন বারভূতে লুটতরাজ করিয়া উপভোগ করিতেছে।

দেশে দেশে কত খোঁজ করিয়া দেখা হইল, কোথাও কোন অনুসন্ধান মিলিল না। কয়েকজন গ্রামবাসী কতকটা আন্দাজ করিয়াই খবর দিল, ইচ্ছামতীর বুকে শেষরাত্রিতে একখানি নৌকা তীব্রবেগে ছুটিয়া যাইতে তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে।

ঘোষাল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নানা দেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কত রূপসী কিশোরীকে ভুল করিয়া অতসী বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে, কত দেশের নারী-নির্য্যাতনের কাহিনী শ্রবণ করিয়া ঘোষাল দিনের পর দিন ক্রুর, এবং হিংসার মত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছিল। অবলা আশ্রমে, নারী-কল্যাণ সমিতিতে, যেখানে যত রকম সংবাদ লওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, কোন স্থানেই ঘোষাল বাদ রাখে নাই।

ক্রমে ক্রমে শোক, দুঃখ, বিয়োগ ব্যথা ভুলিয়া গিয়া ঘোষাল একেবারে চির জনমের মত নিরুদ্দেশের যাত্রী হইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত কোন খোঁজ খবর দিতে পারে কিনা সন্দেহ। যে অতসীর কথা বলিতে ঘোষাল অজ্ঞান ছিল, আজ তাহার সোণার অতসী কোথায়, কি ভাবে...... আর সে কথা বলিতে পারিল না, হঠাৎ বিকট একটি চীৎকার করিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল।" উপস্থিত লোকজনেরা ভয়ে ভয়ে কাছাকাছি আগাইয়া আসিয়া বসিল। মদন গভীর একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কি ভয়ানক ব্যাপার মাষ্টার। এমন কাহিনী জীবনে আর কোন দিন শুনব কিনা সন্দেহ। একি গল্প, না সত্য ঘটনা?

আকাশে একটু মেঘ করিয়াছিল সন্ধ্যা হইতেই। হঠাৎ শেষরাত্রির দিকে ঘনঘটা করিয়া মেঘ জমিয়া আকাশ গভীর কালো হইয়া উঠিতেছিল এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া আকাশ বাতাস গুরু গম্ভীর নিনাদে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

রাখাল মাষ্টার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'গল্প নয় মদন, নিছক সত্য ঘটনা। সেই অতসীকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তারা, কেউ খবর পায়নি, কেউ জানতে পারেনি, ...না, না, একি আমি ভুল বক্‌ছি! না, না মদন, পচা ঘোষালের মেয়েকে সেই দুর্ব্বৃত্তেরা জোর করে নিয়ে গেছে! নারী নির্য্যাতন, নারীর অপমান পথে ঘাটে হচ্ছে মদন। আমরা চোখের ওপর দাঁড়িয়ে দেখি, কিছু করতে পারি না। কেন এমন হয়, মদন, বলতে পারো?" মদন কোন জবাব দিল না দেখিয়া রাখাল মাষ্টার আবার বলিতে সুরু করিল, সতীর অপমান করেছে, অভিশাপ দেব নাকি? না, না ব্রাহ্মণের আর সে প্রতাপ নেই, বলিয়াই তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া অট্টহাস্যে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

মেয়েটি তখন উঠিয়া বসিয়াছে। উপস্থিত লোকেরা ঘোষালের উন্মত্তভাব দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তিত এবং ভীত হইয়া উঠিল, অথচ একটি কথা মুখ ফুটিয়া ঘোষালকে বলিতে কেহই সাহসী হইল না।

রাখাল মাষ্টার উঠিয়া ধীরে ধীরে নদীর তীরে গেল এবং তারস্বরে হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, অতসী, মা, অতসী, ফিরে আয়, ফিরে আয়.........

তাহার আর্ত্তনাদে কেহই সাড়া দিল না বটে, কিন্তু নদীর ওপার থেকে প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করিয়া ব্যরম্বার প্রত্যুত্তর দিতেছিল সত্য।

ঘোষাল দমিয়া গেল না, আবার ডাকিতে লাগিল, অতসী!

হঠাৎ আন্‌মনা ভাবে মেয়েটি হাহাকার করিয়া উঠিল, বাবা, বাবা......

ঘোষাল ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই মদন তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, ঘোষাল, ক্ষেপেছ তুমি?

ঘোষাল চেঁচাইয়া কি জানি বলিতেছিল, কিন্তু তখন এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া গেছে যে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যের গর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই সোনা যাইতেছিল না। নদীর তীরে, সুমুখের গাছে গাছে প্রলয় মাতন সুরু হইয়াছিল, প্রবল বেগে ঝড় বৃষ্টি বহিয়া চলিল। যতদূর চোখে পড়ে, শুধু অন্ধকারের ভিতর এক অপরিচিত পৃথিবীর ম্লান রেখা।

রাত্রি যে কি ভাবে কাটিয়া গেল, তাহার ভাষা বুঝি মানুষের বুকে নাই। ভোরের বেলা হলদে রোদের আভা জগতে ছড়াইয়া পড়িতেই এক একজন যেন মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করিয়া এইমাত্র চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে, সর্ব্বাঙ্গ অবশ, হাত পা কাঁপিতেছিল, মাথা ঝিম ঝিম করিতেছে। তীব্র যন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গ একেবারে সিটিয়ে গিয়াছে। আজ অতসীর মনে..

পড়িতেছিল, "একদিন ইচ্ছামতীর তীরে পাল্কী বেহারা সব লুট হয়ে যায়, কে কোথায় ছিটিয়ে পড়ে। তারপর একদল লোক তাকে আর তার জননীকে বলপূর্ব্বক নৌকাপথে নিয়ে যাচ্ছিল, জননী এক সময় সুযোগ এবং অবসর বুঝে নৌকায় এমন তোলপাড় সুরু করে দেয় যে টাল্ সাম্লাতে না পেরে নৌকোখানি ইচ্ছামতীর বুকে ভরাডুবি হ'ল। মাঝিমাল্লারাও কোনমতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণরক্ষা করল, আর সেই দুর্ব্বৃত্তের দল নাকানি চুবানি খেয়ে তাদের ভাগ্যে যে কি ঘট্লো, কেউ তা আজও জানে না! অতসীও জলের ভেলায় ভেসে যাচ্ছিল, একজন মাঝি কোনরকমে তাকে তীরে নিয়ে আসে, এবং কোন দেশের একজন ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাকে এক সহরে নিয়ে যায়। বড় হয়ে তার দেশের কথা, বাবার কথা সবই মনে পড়ে এবং ভদ্রলোক তার মা-বাবার খোঁজ খবর করেও কোন জবাব পায়নি। সেই থেকে অতসী সেই পরিবারেই মানুষ হয়ে ওঠে এবং সেই ভদ্রলোকটি একটি ভালো ছেলে দেখে অতসীকে পাত্রস্থ করেন। সেই থেকে সবার সাথে অতসীর ছাড়াছাড়ি। একমাত্র স্বামী ছাড়া অতসী কাউকে বড় একটা জান্ত না।......"

* * * *

রাখাল মাষ্টার, মদন মুদী প্রভৃতি যখন গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর প্রায়। অদূরে ধূসর রেখার মত একখানি গ্রাম অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। একখানি আঁকাবাঁকা পথ নদীর তীরের বরাবর চলিয়া গিয়া তিনগাঁয়ের কাছে মিশিয়া গিয়াছে। নদীর বুকে একখানি প্রচণ্ড চড়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, কয়েকটি গাঙ্চিল সেখানে বসিয়া মহানন্দে সদ্য ধৃত কয়েকটি জীবন্ত মৎস্য আহার করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। এই সকল দৃশ্য আজ রাখাল মাষ্টারের চোখে নূতন করিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। বিশাল জগতের মাঝে নেহাত অপরিচিতের মত সে নিজের জীবনকে যেন কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেখানে সংসারের কোন চিহ্নমাত্র নাই, যতদূর চোখে পড়ে, শুধু মায়া মরীচিকা!

শরতে

শ্রীহোস্‌নেআরা বেগম

আকাশে উড়ায়ে নীল আঁচল খানি
আসিল ধরায় নামি শরৎ রাণী
তার সাথে আসে লয়ে কুসুম ডালি
শ্যামলী কল্পময়ী রূপ দুলালী ।
আর আসে সাথে সাথে শিউলী-বধু
রঙায়ে হলুদ-রঙ্গে অধর মধু ।
বনে বনে পায় পাখী নবীন আশা
ভাষাহীন মুখে তাঁর ফুটিল ভাষা
আগমনী গান ওঠে কণ্ঠে তারি ।
চপলা বর্ষা-বালা রূপ কুমারী
নর্ত্তন করে সুখে ছন্দ তালে
ইন্দ্র ধনুর টিপ পরিয়া ভালে ।
যৌবন জাগে মরা নদীর বুকে
কলকল ছলছল হরষ সুখে
গাহে গানে সুরধুনী মধুর তানে
কোন সে প্রেমিক তরে কেবা তা জানে ?
দিকে দিকে ওঠে ধ্বনি শরৎ আসে
সাজায়ে ধরার থালি সবুজ ঘাসে ।

ধানের সবুজ শিরে সোণালি টুপি
প্রকৃতি পরায়ে দেয় আসিয়া চুপি ।
আকাশে বিরহী মেঘ ঘুরিয়া মরে
থাকি থাকি চোখে তার অশ্রু ঝরে
নাহি তবু দেয় ধরা বিজলী বালা
দূরে থাকি ছুড়ে মারে হাসির মালা
ক্ষণেক মারিয়া উঁকি নিমেষ মাঝে
ছুটে যায় কোথা কোন অজানা কাজে ।
গুমরিয়া মরে মেঘ অসহ দুঃখে
বৃথাই ঘুরিবে আর কোন সে সুখে !
নিশীথে নেহারে চাঁদ জাগি একেলা
বিজলী মেঘের এই চপল খেলা ।
হেরিতে হেরিতে তারো বিরহ বাড়ে
বিরহী লুকায় মুখ মেঘের আড়ে ।

শরতের নিশি জাগি ব্যথিতা কবি
হাসি কান্নার হেরি মোহন ছবি ।
হেরি আর ভাবি বসে শরৎ আসে
বরষে বরষে ঘুরে কিসের আশে ।

শারদ অভিবাদন

জয়শ্রীর গ্রাহক গ্রাহিকা ও পৃষ্ঠপোষকদিগকে আমরা আমাদের শারদীয়া মাতৃপূজার উৎসবে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা-অধ্যাপক

সম্প্রতি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস-বিভাগে শ্রীযুক্তা করুণাকণা গুপ্ত ইতিহাসের অধাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি প্রবেশিকা হইতে এম্, এ পর্য্যন্ত প্রথমস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা-অধ্যাপক। যদিও তাঁহার নিয়োগে বহুদিন প্রচলিত যে সংস্কারে আঘাত পড়িয়াছে, তাহা সর্ব্বথাই কাম্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই উদারতার জন্য ধন্যবাদার্হ। অপরপক্ষে এই প্রতিভা-শালিনী মহিলার সেবাদানে দেশের নারীসমাজ বঞ্চিত হইল বলিয়া আমরা দুঃখ অনুভব না করিয়া পারিতেছি না।

স্বর্গীয় বিঠলভাই পাটেলের উইল ও সুভাস বসু

বিদেশে প্রচার কার্য্যের জন্য স্বর্গীয় বিঠলভাই পাটেল উইলে শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুকে লক্ষাধিক টাকা দিয়া গিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বসুও আইনানুমোদিত পথে প্রচার কার্য্য করিতে সম্মতি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্বেও এই উইলের টাকা লইয়া গোলমাল চলিতেছে, উইলের অছিগণ আইনের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া এই অর্থদানে অসম্মত হইয়াছেন। বিনাসর্ত্তে যিনি দান করিয়া গেলেন, তাঁহার ন্যস্ত ধনের জন্য আদালতে মীমাংসা করিতে গেলে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস-ই প্রকাশ পায়। এই ব্যাপারে দেশহিতৈষী মাত্রেই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। এই দান নিঃস্বার্থ-প্রণোদিত, সুতরাং আইনের কুট প্রশ্নে না গিয়া দাতার সদুদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাঁহার যথার্থ তৃপ্তি হইবে।

রাজবন্দীদের সমস্যা সমাধানকল্পে

বাংলার গভর্ণর প্রকাশ করিয়াছেন যে কয়েকশত রাজবন্দীকে চাষবাস শিল্পাদি কার্য্যশিক্ষা দিবার জন্য ট্রেনিং স্কুল খোলা হইবে। উপযুক্ত লোকের তত্বাবধানে ও নিয়মের মধ্যে থাকিয়া তাহারা শিক্ষা পাইবে। শিক্ষাধীনকালে তাহাদের ব্যবহার সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে তাহারা মুক্তি পাইতে পারিবে।

রাজবন্দীর সংখ্যা আড়াই হাজারের উর্দ্ধে, তন্মধ্যে কয়েকশত বন্দীর জন্য কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থাও মন্দের ভাল যদি ভবিষ্যতে বহুসংখ্যক রাজবন্দীর জন্যও এরূপ কিম্বা অন্যবিধ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়। দীর্ঘকাল অলস অবস্থায় থাকিয়া ইহাদের কর্ম্মশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ অবস্থায় যে কোনপ্রকার কার্য্যের সুবিধা সম্ভবতঃ অনেকেই গ্রহণ করিতে চাহিতে পারে। তবে বন্দীদের শিক্ষা দীক্ষা, শক্তি সামর্থ্য সমান নয়। সকলকে একই নিয়মে কৃষক বা কুটীর শিল্পী তৈরী করিবার চেষ্টা না করিয়া রুচি ও শিক্ষা অনুযায়ী কার্য্যের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তাহাও ভাবিলে ফলপ্রদ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

আবেসিনিয়ার সম্রাজ্ঞী

আবেসিনিয়ার সম্রাজ্ঞী স্বদেশের মঙ্গল কামনায় দীর্ঘকাল উপবাস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে শান্তির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন কিন্তু দেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহা সম্ভব না হইলে তিনিং স্বয়ং প্রজাদিগকে যুদ্ধকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবেন, পুরাকালের রাজপুত বীরাঙ্গনাদের কথা তাঁহার আদর্শের সঙ্গে সকলেরই স্মরণে আসে। স্বাধীন দেশের নারীর চরিত্রেই কঠোরতা ও কোমলতার এরূপ অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়।

শান্তি-কামনা ও নারীজাতি

পৃথিবীর নারীজাতির যেন শান্তি-কামনায় প্রার্থনা করেন, সম্রাজ্ঞী সকলের নিকট এই নিবেদন করিয়াছেন। যুদ্ধে পুরুষ অসীম ক্লেশ সহ্য করে, প্রাণবিসর্জ্জনও দিতে হয়, কিন্তু প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথায়, অভাবে নারী গৃহে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণাধিক ক্লেশ পাইয়া থাকে। নারীর স্বাভাবিক যুদ্ধ বিতৃষ্ণা জন্মিবারই কথা। শান্তি-কামনার জগতের নারী মাত্রেরই মনোগত বাঞ্ছা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, সুতরাং আবেসিনিয়ার সম্রাজ্ঞীর সহিত মানব সমাজের অন্ততঃ একাংশের সহানুভূতি নিশ্চয় থাকিবে যদিও এই নৈতিক বল বাহু বল ও যন্ত্রবলের যুগে অনেকাংশে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

কলিকাতায় রাস্তায় 'বাস'

বাসে যাহারাই যাতায়াত করিয়াছেন, তাহারা ইহার সুবিধার কথা শতমুখে প্রশংসা করেন। বাস প্রত্যুষে, দ্বিপ্রহরে, গভীর রাত্রিতে সমান ভাবে চলে, সময় যাঁহাদের নিকট বহুমূল্য, দ্রুতগামী বাসে যাতায়াত করিলে তাহাদের অযথা সময় নষ্ট হইবে না। বৃষ্টির সময় কলিকাতার রাস্তার অবস্থার কথা কাহারও অবিদিত নাই, সেই জল প্লাবিত স্থল ভূমি অনায়াসে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন বাসের আরোহীগণ।

পেন্সন ভোগীর নূতন কর্ম্মে নিয়োগ

আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বার্দ্ধক্যহেতু যাহারা সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা বে-সরকারী অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অর্থোপার্জ্জনের লিপ্সাই পেন্সেনভোগীদের এই নূতন কার্য্য গ্রহণ করাইতে বাধ্য করে নতুবা শুধু কর্ম্মশীলতা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবৈতনিক অনেক সমাজ হিতকর কার্য্যে তাহারা আত্ম নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু এই নিদারুণ বেকার সমস্যার দিনে যেখানে যুবশক্তি কর্ম্মাভাবে অযথা অপচয়িত হইতেছে, সেখানে বৃদ্ধদের পুনর্নিয়োগ প্রথা সম্পূর্ণ দূর করা উচিত। যুবকগণ কার্য্যের সুযোগ পাইলে বৃদ্ধাপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিতে পারিবে।

বৃদ্ধগণও শেষজীবনে অন্ততঃ অর্থার্জ্জনের প্রয়াস আংশিক মুক্তি লাভ করিলে সংসারের আবিলতা পরিহার করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গলচিন্তা করিতে পারিবেন।

ম্যালেরিয়া রোগের সংক্রামকতা

ডাঃ অশ্বিনী কুমার সেন, এম্-বি।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া রোগ এত ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই রোগে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া দাড়াইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও কিন্তু দেশের এত দুরবস্থা ছিল না। তখন দেশে এমন স্থানও ছিল যেখানে লোকে ম্যালেরিয়ার নাম-গন্ধও জানিত না। কিন্তু আজকাল এদেশে বিশেষতঃ বাংলা দেশে এই রোগ সুদূর পল্লীগ্রামেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গ্রাম বৃদ্ধদের মুখে শুনাযায় যে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া কদাচিৎ দেখা যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রোগাক্রমন ও মৃত্যুর হারের দিকদিয়া পূর্ব্ববঙ্গ একটী ম্যালেরিয়ার ডিপো হইয়া দাড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহারা বলেন যে, এনোফিলিস নামে এক প্রকার মশা আছে, ইহারাই ম্যালেরিয়া বিষ এক দেহ হইতে অন্য দেহে ছড়াইয়া থাকে। সত্যবটে, এনোফিলিস্ ম্যালেরিয়া বিষ বাহকের কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে, ইহাই ম্যালেরিয়ার সংক্রামকতার একমাত্র সহায়ক নহে। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রামগুলিতে, বিশেষতঃ ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি জেলায়, সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত মশা দেখা যায়। পূর্ব্বে অবশ্য আরও কম সময়ের জন্য মশা দেখা যাইত, কারণ তখন এখনকার মত এত ব্যাপক ভাবে পাটের চাষ হইত না। এই কয়মাস ব্যতীত বৎসরের বাকী কয়টী মাসে মশা একেবারেই দেখা যায় না। কার্ত্তিমাসে বৃষ্টি হইলেই মশা মরিয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়।

বিশেষজ্ঞগণের মতে বর্ষাকালেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইয়া থাকে। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এবং দেখিতেছি যে, অনেক সুস্থকায় লোক ফাল্গুন মাসেও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, আর এই আক্রমণ এত ব্যাপক যে বাড়ী পিছু ২।৪ জন করিয়া ভুগিয়া থাকে। আমার মনে হয় যে আবহাওয়ার দোষেই এই আক্রমণ হইয়া থাকে।

যে গ্রামে ঝোপ জঙ্গল, ডোবা নালা ও পচা পুকুর বেশী, সেই গ্রামেই ম্যালেরিয়া অধিক। এই ধারণা অনেকাংশে সত্য বটে, কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে যে, এই সমস্ত অপরিষ্কৃত এবং অসংস্কৃত স্থান গুলিকে পরিষ্কৃত করার পরেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই এই সংক্রামতার ব্যাপার কে বড়ই রহস্য জনক বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত থাকিলেও আমাদিগকে বাঁচিবার, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শরীরের প্রতিরোধক ক্ষমতার হ্রাস হইলেই যে, বাহিরের রোগ শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য কথা। সুতরাং শরীরের প্রতিরোধক ক্ষমতাকে বাড়াইয়া তুলিতে পারিলেই ম্যালেরিয়ার

আক্রমণ এবং পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, ইহাও ধ্রুব সত্য কথা। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তদনুরূপ খাদ্য সম্ভার বৃদ্ধি না পাওয়ায়, অনুপযুক্ত এবং অপুষ্টিকর আহারের দরুণ সর্ব্বসাধারণের জীবনী-শক্তি যৎপরোনাস্তি হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। তদুপরি আছে এই প্রতিকূল আবহাওয়া। সুতরাং আমাদিগকে যথাসাধ্য পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিতে হইবে এবং তদুপরি এমন জিনিষও গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা ভুক্ত দ্রব্যাদি সহজে হজম করাইয়া দিয়াদেহের রক্ত কণিকা বৃদ্ধি করতঃ নূতন বল ও নূতন উদ্দীপনা শক্তি আনয়ন করিবে, এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়াইয়া দিবে। এই প্রকার অমোঘ ঔষধ হইতেছে 'রুচি' কোম্পানীর 'রুচিটোন'। নিয়মিত ভাবে ম্যালেরিয়ার পর সেবন করিলে যে ইহা প্রাণে নব আশা ও প্রেরণা জাগাইয়া দিবে, তাহা অবধারিত।

যেমন খুসী তেমন

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'আপরুচি খানা, আর পর রুচি পর না'। কথাটা খাঁটি; ব্যাপারটা এই রকমই হওয়া উচিত। আমরা প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমত খাদ্য ও পানীয় বেছে নিয়ে নিজের রুচি অনুযায়ী তা তৈরী করিয়ে গ্রহণ করে থাকি। আহার ও পানীয়ের ব্যাপারে আপরুচি খানা'র নীতিই অনুসৃত হয়ে থাকে; সে নীতি থেকে একচুল কেউ নড়তে রাজী নয়।

যেমন কেউ কেউ হাল্কা চা খেতে ভালবাসে। কেউ ভালবাসে কড়া। কেউ চায়ে প্রচুর দুধ ও চিনি মিশিয়ে খায়, কেউ বা দুধ দেয়, চিনি একেবারে বাদ দিয়ে। চিনি ও দুধ কিছুই না দিয়েও অনেকে চা পছন্দ করে। আর সব উপকরণ সম্বন্ধে রুচি-ভেদ যতই থাক, চা সম্বন্ধে অনুরাগের তারতম্য কোথাও নেই। সকল রকমের রুচিকে তৃপ্ত করতে চায়ের মত আর কোন পানীয় পারে না। নিজের খুসীমত যেমন ভাবে ইচ্ছা চা তৈরী করা যাক না কেন. পানীয় হিসাবে তার বিশেষ গুণ ও উপকারিতার কোন তফাৎই হবে না। আসল জিনিষ হ'ল চা—সেইটিই সকলের কাম্য; তার অনুপান কি হ'ল না হ'ল সেটা বাহ্যিক। মিষ্টি করে চা খাওয়া যার অভ্যাস, কোন সময়ে হাতের কাছে দুধ চিনি না পেলে চা খাওয়ার আনন্দ থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত রাখবে এ কথা ভাবা ভুল। যথা সময়ে পেলে দুধ চিনি বাদ দিয়েও চায়ের পেয়ালা সে সমান আগ্রহে গ্রহণ করবে।

দুধ ও চিনি দিয়ে খাওয়াই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রচলিত রীতি। কিন্তু চা খাওয়ার আরো অনেক পদ্ধতি আছে। পানীয় হিসাবে চা যত বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, নানা নতুন ধরণে তা পান করবার পদ্ধতিও তত লোকে খুঁজে বার করছে। দেহ ও মনের তেজস্কর পানীয় হিসাবে চা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহ'লে দুধ বা চিনি বাদ দিলে তা উপভোগের কোন দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় বলে মনে হয় না। এক পেয়ালা চা, সামান্য 'স্বোয়ার' করবার জন্যে একটু টাট্‌কা নেবুর রস দিয়ে পান করেই আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারি।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের পক্ষে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা চা আদর্শ পানীয়। ঠাণ্ডা চা তৈরী করা অত্যন্ত সহজ। আধ সেরে জলের জন্য দু চামচ চা নিলেই হবে। যথারীতি চা তৈরী করে, একটি পাত্রের ভেতর বরফের ওপর সেই গরম চা ঢালতে হবে। তারপর পছন্দমত দুধ চিনি মিশিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হবার পর সে চা পান করা উচিত।

চা যে রকম ভাবে ইচ্ছা তৈরী করে পান করা যায়, শুধু আসল জিনিষটী যেন ভারতবর্ষের নিজস্ব হয়, কারণ ভারতের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর চা কোথাও পাওয়া যায় না।